ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৮, জানুয়ারি, ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
Vol. 12th Issue 28th, January, 2025

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 28th, 20th January, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১২ তম বর্ষ ও ২৮ তম সংখ্যা
২০ জানুয়ারি, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।

২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।

৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com

৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।

৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 8250595647
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি : প্রথম ভাগ
প্রত্যূষকুমার রীত ১১
বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' : নৈতিক মানদণ্ড এবং সামাজিক গুরুত্ব
আজিজুল হক মণ্ডল ২০
'পঞ্চতন্ত্র'র মুজতবা আলী : রচনাশৈলীর অভিনব প্রয়োগে সমাজ-সমস্যার গভীরে
উদয় রতন মুখার্জী ২৫
দলিত আন্দোলন ও সাহিত্যচর্চা : প্রসঙ্গ একলব্য
চিরঞ্জিত ঘোষ ৩২
প্রহসন রচনায় নাট্যকার মধুসূদন দত্তের সমালোচনা ও সাফল্য
জয়ন্ত মন্ডল ৩৯
রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমুনিস' : নকশাল রাজনীতির এক অনন্য দলিল
হাসানুর জামান মণ্ডল ৪৯
সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও দলিতদের সামাজিক অবস্থান : মহাশ্বেতা দেবীর 'ক্ষুধা'
আকাশলীনা ঢোল
কৌষেয়ী ব্যানার্জি ৫৪
সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় তৃতীয়লিঙ্গের অস্তিত্ব : উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবজীবন
অনুশ্রী মাইতি ৫৯
সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য ভাবনায় সংস্কৃতি ও পরিচিতি : আধুনিক-উত্তর
চিন্তার প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা
অপূর্ব সরকার ৬৬
সমাজভাষার আলোকে আফসার আমেদের ত্রয়ী ('জিন্নত বেগমের বিরহমিলন',
'গোনাহ্', 'আদিম') গল্পের ভাষাবৈশিষ্ট্যের নবরূপায়ণ
অর্পিতা ভুঁই
তাপস রায় ৭৪
মোগল সাম্রাজ্যের পতন : প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস
বাপি চন্দ্র দাস ৮২
নারীর জীবন প্রসঙ্গ : ছড়া ও প্রবাদে
বিপ্লব কুমার মাহাত ৮৮
মহাশ্বেতা দেবীর ঘর গল্পে অন্তেবাসী মানুষের স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি
বিপুল মণ্ডল ৯৮
বাঙালি জাতি ও বাঙালির ইতিহাস বিবর্তনের ধারায় বিশ্লেষণ
বিশ্বজিত দেবনাথ
অরূপা চক্রবর্তী ১০৭
প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতির বর্তমান অবস্থান ও বিশ্বায়ন
চন্দন নাড়ু ১১৪

মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ : একটি মূল্যায়ন
ইতিষা নন্দী ১১৯
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ধারা : ঐতিহাসিক চেতনায় বিদ্রোহের রূপ
দেবাশীষ বেরা ১২৬
লোকসংস্কৃতি : সাম্প্রতিক স্বর ও প্রকৃতি
দেবাশিস সর্দার ১৩৪
অনুসৃজনে রামকথা : প্রসঙ্গ চন্দ্রাবতী রামায়ণ
ধনঞ্জয় দাস ১৪১
ভারতে আধুনিক ইতিহাস লিখনপদ্ধতি; রাজেন্দ্রলাল মিত্র : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
দীপঙ্কর রায় ১৪৮
ইবসেনের নাটক : মঞ্চ ও শিল্প ভাবনা
কুন্তল বড়ুয়া ১৫৮
বাংলা ছোটগল্পে অবহেলিত চরিত্রের অবস্থান
ননীগোপাল মালো ১৬৭
‘মিথিলার গোপাল ভাঁড় গণুঝা’ : একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস
পায়েল সিংহ ১৭৩
নন্দিতা বাগচীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব
প্রশান্ত শীল ১৭৭
সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের দেশভাগের বাংলা ছোটগল্প
সৌমেন গিরি ১৮৪
সন্তোষকুমার ঘোষের ‘সময়, আমার সময়’ : প্রেক্ষিত নকশালবাড়ি আন্দোলন
সুব্রত পাল ১৯১
মহাভারতে দণ্ডনীতি : প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র ভাবনার আঙ্গিকে একটি অধ্যয়ণ
শিপ্রা মাইতি ১৯৮
বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের রূপ ও রূপান্তর
মিনাল আলি মিয়া ২০৫
সুন্দরবনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন
প্রভাকর বিশ্বাস ২১২
সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটোগল্পে হা-অন্ন জীবনের লড়াই, দাম্পত্য এবং নারী
উজ্জ্বল গরাই ২১৮
রবীন্দ্রচিন্তায় মহামানব গৌতমবুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষতা : একটি পর্যালোচনা
তাপস হালদার ২২৩
ব্রাত্য বসুর নাটকে মহামারি প্রসঙ্গ
শুভঙ্কর দে ২৩৩
কণা বসু মিশ্রের গল্পভুবন : একটি আলোচনা
সুজিত মণ্ডল ২৩৯
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক : বিষয়ের সন্ধানে
শিউলী মন্ডল ২৪৬

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্যে স্বপ্নদর্শন সমীক্ষা
সোমনাথ চ্যাটার্জী ২৫৪
বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রসঙ্গ
শেখ রফিজুল ২৫৯
কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর : লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও সংগঠক
সফিয়ার রহমান ২৬৮
শামীম রেজার কবিতায় বিপন্ন পাখিকথা
অভিষেক মণ্ডল ২৭৭
মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য : ঔপনিবেশিক প্রতিরূপের অনুসন্ধান
অরিজিৎ ভট্টাচার্য ২৮৩
নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটোগল্পে মৃত্যুচেতনার নানারূপ
শিখা ঘোষ ২৮৭
সৈকত রক্ষিতের হাড়িক : অন্ত্যজ জীবনের দলিল
মানু বধূক ২৯২
ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা : নৈরাশ্যে থেকে জীবনবোধের উত্তরণ
হাসনারা খাতুন ২৯৯
কিন্নর রায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প : বিশ্বায়ন ও পরিবেশ ভাবনা
ঈশিতা সিন্‌হা ৩০৬
“নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা” : রবীন্দ্রকল্পনায় নটরাজ-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ
মন্দিরা দে ৩১৩
বিনতা রায়চৌধুরীর ‘অন্য আমি’ : ‘পুরুষ-বেশ্যা’র শরীরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা প্রেম
প্রলয় মণ্ডল ৩২০
দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাস : ‘পরবাসী’ এবং ‘রক্তে ও শিশিরে’ গল্পদ্বয়ের আলোকে
পূর্ণিমা সাহা ৩২৭
শার্ল বোদলেয়ারের পাপের দর্শন : লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অহনা রায় ৩৩৩
উপনিষদের আলোকে স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রাসঙ্গিকতা
সুদেষ্ণা দে ৩৩৯
সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়
সুফল দাস ৩৪৪
জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঋতু ভাবনা
তৃপ্তি দাস ৩৪৮
পুরাণ কথার অনুসন্ধানে সমরেশ বসু : প্রসঙ্গ ‘শাম্ব’
গৌরী রানী হোড় ৩৫৫
Social Philosophy of Manishi Panchanan Barma :
A Brief Study on Historical Perspectives
Bidyut Sarkar ৩৬৪

The Role of NGOs and Civil Society Organizations in
Tribal Development in Junglemahal
Dipankar Das ৩৭৫
Women in Ancient India: In Historical Context
Utkalika Sahoo ৩৮৩
The Psychological Impact of Stigma and Discrimination on
Individuals with Disabilities : Exploring Coping Mechanisms and
Interventions
Abhisek Ghosh ৩৯২
The Partition, Refugees and Public Health In
West Bengal From 1947 to 1965
Bivas Biswas ৩৯৯
Stress, Stressor and its Management
Nimden Sherpa ৪০৬
Role of Dr. B. R. Ambedkar in Promoting Human Rights of the
'Untouchable' or 'Dalit' Communities
Partha Pratim Roy ৪১২
Backwardness and Caste-like Social Stratification among
Muslims in India with Special Reference to West Bengal
Rakibul Shaikh ৪১৮

সম্পাদকীয়

কোন বিষয়ের গুরুত্ব নির্ভর করে আপনার বিচার বিবেচনাকে কেন্দ্র করে। যেমন ভাবে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন, অন্যরা কিছু সময়ের জন্য হলেও সেটাই দেখে। আপনার দেখানো বিষয় যদি অন্যকে মুগ্ধ করতে পারে তাহলে আপনি সফল। আপনার শানিত বুদ্ধি যদি অন্যকে বশ্যতা শিকারে বাধ্য করে, তাহলে অন্যদের থেকে শত হস্ত এগিয়ে থাকবেন। আপনার এগিয়ে থাকাতেই আপনার নামাঙ্কিত ফলক প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন জিনিসকে কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠা দেবেন সেটাই মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। উচিত অন্যদের মনের মধ্যে নতুন বীজ বপন করা। নতুনত্বের সন্ধানে একজন প্রাবন্ধিক নিজেকেও নতুন করে আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক বারের মত এবারেও ‘এবং প্রান্তিক’ সেই নতুন নতুনের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি : প্রথম ভাগ

প্রত্যূষকুমার রীত
অধ্যাপক, রবীন্দ্রচর্চা বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: অনেক মনিষীর নীরব সাধনা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তুলেছে। সে এক বিস্তৃত, বিচিত্র, কৌতূহলজনক ইতিহাস। সেই ইতিহাসের দিকচিহ্নগুলি কিছু তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া গেল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুরুষ ও মহিলা সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন; বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে তা মর্যাদার সঙ্গে স্মরন করতে হবে।
সূচক শব্দ: বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সুষমা দেবী।

মূল আলোচনা:
পূর্বে ছিল সংস্কৃত শিক্ষা। টোল-পাঠশালা, চতুষ্পাঠীতে আশ্রমে শিক্ষালাভ হত। তারপর পরাধীন বাংলায় ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। অনেক বাঙালি মনীষীর শিক্ষাভাবনার ফলশ্রুতিতে ক্রমশ আমরা স্বাধীন শিক্ষালাভে সমর্থ হই। বাংলার শিক্ষাভাবনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, অনেক মনীষীর নীরব সাধনা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে বিকশিত করেছে। সে এক বিস্তৃত, বিচিত্র ইতিহাস, কৌতূহলজনক ইতিহাস। সেই ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। সে ইতিহাসের দিকচিহ্নগুলি কিছু তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া গেল।

রামমোহন রায় (১০.০৫.১৭৭৪–২৭.০৯.১৮৩৩) রাধানগর, খানাকুল, হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ভারতের জনক। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন। ১৮০৩-৪ সালে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের গভীর পাঠ গ্রহণ করেন। কলকাতায় বাসকালে সমাজ, রাষ্ট্র ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৮১৫-তে বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮১৫-তে একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাতে ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা; এই সভা পরে হয় ‘ব্রাহ্মসমাজ’ (১৮২৮)। বন্ধু দ্বারকানাথ সঙ্গী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সকলে উপাসনা করতে আসেন। পরে হিন্দু, পাদ্রিরা রামমোহনের বিরোধী হয়ে ওঠে। রামমোহন ইংরেজি, বাংলা, ফারসি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি সহমরণ (সতীদাহ প্রথা) প্রথার বিরুদ্ধে আইন করার চেষ্টা করেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে। তিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ ব্যয়ে ‘অ্যাংলো হিন্দু স্কুল’ স্থাপন করেন (১১.১২.১৮২৩)। তাঁর পুত্র (কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় জজ) এই বিদ্যালয়ে পড়তেন। দ্বারকানাথ তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। রামমোহন বিদেশ চলে গেলে এই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, কয়েক বৎসর পরে। তিনি প্রায় ৩০টি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত পূর্ণচন্দ্র মিত্র পরিচালিত ‘ইন্ডিয়ান অ্যাকাদেমি’ স্কুলে ভূদেব মুখোপাধ্যায় পড়েছিলেন, রামমোহনের মৃত্যুর পরে। ইংল্যান্ডে ব্রিস্টল শহরে রামমোহনের মৃত্যু হয়। ১০ বছর পর বন্ধু দ্বারকানাথ ‘আরনেস ভেল’ নামক স্থানে তাঁর সমাধিস্থল নির্মাণ করে দেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০) মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রথম শিক্ষা। তারপর কলিকাতায়। সংস্কৃত কলেজে। সেখানে ইংরেজি শ্রেণী, সাহিত্য শ্রেণী, অলংকার শ্রেণী, বেদান্ত শ্রেণী, স্মৃতি শ্রেণী (১৮৩৮) এবং ল-কমিটির পরীক্ষায় (১৮৩৯) পাশ করেন। তারপর ন্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন। ১৮৪১ সালে জ্যোতিষ শ্রেণী পাশ করেন। এখানে তিনি ১২ বছর ৫ মাস শিক্ষালাভ করেন।

১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করেন, বাংলার প্রধান পণ্ডিতের পদে। তারপর সংস্কৃত কলেজে ১৮৪৬-এর মার্চ। ১৮৫০-এর নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালংকার মুর্শিদাবাদে জজ হয়ে চলে গেলে বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিয়োগ করতে চান। কিন্তু অধ্যক্ষপদ না পেলে বিদ্যাসাগর যোগ দেবেন না, তাই তাঁকে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি কলেজ সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্তনে প্রয়াসী হলেন। উন্নত প্রণালীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হল।

তারপর বাংলার ছোটলাট বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছাড়া অতিরিক্ত মাসিক ২শত টাকা প্রদান করে শিক্ষাবিষয়ক কাজ করার অনুরোধ করেন। তাঁকে বিদ্যালয় সমূহের Inspector করা হয়। তিনি ১৮৫৫-তে নদিয়াতে ৫টি, বর্ধমানে ৫টি, হুগলিতে ৫টি, মেদিনীপুরে ৫টি, ১৮৫৬-তে মেদিনীপুরে আরও ১টি স্কুল— এভাবে প্রত্যেক জেলায় ৫টি করে স্কুল স্থাপন করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে হার্ডিঞ্জের মডেল স্কুলগুলিকে সার্থক করে তোলেন। বীরসিংহ বিদ্যালয়টি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়েই পরিচালিত হয়েছে। জীবনশেষের দিকে কার্মাটাঁড়ে বাস করেন ও নিজ ব্যয়ে সাঁওতালদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বীটন বিদ্যালয় বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি প্রথম সারির সহকর্মী ছিলেন বীটন সাহেবের। ১৮৫৭-১৮৫৮ সালে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারি সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেছেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বাধীনভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। মেট্রোপলিটন কলেজ (ইনস্টিটিউশন) প্রতিষ্ঠা তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। বর্তমানে তা বিদ্যাসাগর কলেজ। বাংলা গদ্যে তিনি যতিচিহ্ন প্রবর্তন করেন। বাংলা গদ্যের যথাযথ শিল্পী। 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি তাঁর অমর সৃষ্টি। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কার্মাটাঁড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। ১৮৩৯, ৬ অক্টোবর, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এর প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কীর্তি, তাঁর ধর্মজীবনের একটি বড় অংশ। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য ৩টি পথ অবলম্বন করেন তিনি। যথা (১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (৩) শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচার।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার (১৮৪০) মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিস্তার কার্য শুরু করেন। পাঠশালার সংবাদ 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' (১৮৪০, ৩ জুন)-এ প্রকাশিত হয়। সেই সংবাদে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বৈশিষ্ট্যের আভাস ছিল। তৎকালে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের বিধান মতো সরকারি বিদ্যালয়ে ইংরেজির মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। ফলত বাংলা পাঠশালা ও বাংলা শিক্ষা দুয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হল। শিক্ষার এই দুরবস্থা দূর করার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহে হিন্দু কলেজ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপন করে (১৮৪০, ১৮ জানুয়ারি)। সংবাদে এই 'new college Patsala'-র কথা আছে। বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এই পাঠশালার মূল উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্যও এক। হিন্দু কলেজ পাঠশালা থেকে দেবেন্দ্রনাথের পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকতর। খ্রিস্টানি শিক্ষার বিধর্মী প্রভাব প্রতিরোধ করায় দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪০-এর ১৩ জুন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে এক বিস্তৃত ইতিহাস। দেবেন্দ্রনাথ নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর হন। পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই বিদ্যালয় কলিকাতায় ৩ বৎসর চলার পর বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হয়।

কয়েক বৎসর স্কুলটি ভালো চলে। পঠনরীতি ও শিক্ষার উৎকর্ষতা সে যুগে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারি শিক্ষা কমিটি (Council of Education) ১৮৪৫-৪৬ সনের কার্যবিবরণীতে এর কথা উল্লেখ করেন। তারপর ৩-৪ বৎসর এই পাঠশালা কৃতিত্বের সঙ্গে চলে। কার-ঠাকুর কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ বিব্রত হন। অর্থসাহায্য ছাড়া পাঠশালা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেই সুযোগে পাদ্রি আলেকজান্ডার ডাফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে ঐ একই স্থানে একটি মিশনারি স্কুল স্থাপন করেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রে এ বিষয়ে কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা থেকে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে বারাকপুরে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয় (১৮৪৬)। এই বৎসরে সুখসাগরে (নদিয়া) একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এই বিদ্যালয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

কলিকাতার হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এটি শুধু বিদ্যালয় নয়, সে সময় আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনের প্রতীক। মিশনারিদের প্রভাবমুক্ত রাখা উদ্দেশ্য, মিশনারিদের অভিসন্ধি, বিধর্ম প্রচার প্রতিরোধ করা লক্ষ্য। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কথা আছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এর ইতিহাস সুপ্ত আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই বিদ্যালয়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পানিহাটির 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'-এর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগ ছিল।

হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন দ্বারকানাথ (১৮৩৩-১৮৪৬)। দ্বারকানাথ ও রামকমল সেনের মৃত্যুর পর ঐ পদে যথাক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আশুতোষ দেব নির্বাচিত হন। সরকারি রিপোর্ট (১৮৪৭-৪৮) শিক্ষাবিষয়ক— এ কথার উল্লেখ জানা যায়। হিন্দু কলেজ পরিচালনায় সরকারি শিক্ষানীতি যখনই জনস্বার্থ বিরোধী হয়েছে, তখনই দেবেন্দ্রনাথ সকল শক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ত্রিপুরার জমিদারিতে (বরকামতা) একটি বঙ্গ-বিদ্যালয় নির্মাণ করেন।

জনশিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার প্রতিও দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেক শক্তি প্রয়োগ করেন। গ্রন্থরচনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ বহু শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১২.০২.১৮২৫ জন্ম) ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র। খানাকুলের নতিবপুর গ্রামের লোক। ভূদেব প্রথমে কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। দু'বৎসর পর রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণচন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি'তে, তারপর নবীনমাধব দেব ও ভোলানাথের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তারপর হিন্দু কলেজে পড়েন। এখানে ভূদেবের সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন দত্ত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়’-এ প্রধানশিক্ষকতা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এক বৎসর পরে নানা কারণে এই স্কুল ত্যাগ করেন। এবং নিজে বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ১৮৪৭ সালে তিনি চন্দননগরে ‘চন্দননগর সেমিনারি’ নামক ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। পরে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন (১৮৪৮)। পর বৎসর হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৪৯)। হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫৬)। ১৮৬২, ১৮৬৩ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় স্কুল পরিদর্শকের সরকারি চাকরি করেন নানা বিভাগে, সে এক বিস্তৃত ইতিহাস। ১৮৮২ সালে ভারত সরকারের ‘হান্টার কমিশন’-এর সদস্য ছিলেন ভূদেব। ‘ভূদেব চরিত’ গ্রন্থে অনেক কথা জানা যায়। তিনি শিক্ষাবিষয়ক দুটি সাময়িকপত্র দীর্ঘকাল প্রকাশ ও পরিচালনা করতেন— ‘শিক্ষাদর্পণ’ ও ‘সংবাদ সার। ভূদেবের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ০৪. ১২. ১৮৬৮। ‘সাপ্তাহিক বার্তাবহ’ তাঁরই মতানুসারে প্রকাশিত হয়। তাঁর ‘শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৬) গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ।

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ (১৮.০২.১৮৩৬-১৬.০৮.১৮৮৬)। হাজার বৎসরের বাঙালির সমস্ত ভালো কিছুর নির্যাস শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জীবনচেতনার শিক্ষক, তিনি শিক্ষাচেতনারও ভগীরথ। তাঁর লোকোত্তর শিক্ষা, লোকশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কথামৃতে শিক্ষাকথায় তিনি লোকশিক্ষক। সাধারণ মানুষকে জৈবতা থেকে দৈবতায় উত্তীর্ণ করেন। তিনি সুশিক্ষিত না হলেও ছিলেন স্বশিক্ষিত। শিক্ষার মুক্তাঙ্গনেই তাঁর শিক্ষাভ্যাস।

শিক্ষার শেষ ধাপ লোকশিক্ষাব্রত। তাঁর প্রতীতি জনসাধারণকে মুক্তির মন্ত্রদানই লোকশিক্ষা। গিরিশ ঘোষের নাট্যজীবনে নতুন মোড় তিনিই দেখিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁকে ‘ক্ষীর সমুদ্র’ বলেছিলেন। স্বেচ্ছায় তাঁর বাদুড়বাগানের গৃহে নিজেই গিয়েছিলেন।

বর্তমানকালে রামকৃষ্ণ ভাবনার বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষামহলও তাঁর শিক্ষাচেতনার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক, এই প্রত্যাশা রাখি। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ কর্মযোগের মাধ্যমে বিশ্বময় দিয়েছেন সেই শিক্ষার প্রসার। বিবেকানন্দের ‘Education is the manifestation of the perfection already in man’ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন (১৮৪৪-১৮৮৪) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ‘Educator’। বাড়ির অনেকের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁর। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ইংরেজি শিক্ষার ভার ছিল তাঁর উপর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠিতেও হেমেন্দ্রনাথকে সে কথা লিখে জানিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অনেকের শিক্ষার ভার ছিল হেমেন্দ্রনাথের উপর।

হেমেন্দ্র-পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা বিষয়ে অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে। স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, যা ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘স্ত্রীশিক্ষা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি’ গ্রন্থে (প্রতিভাস) সেগুলি সংকলিত হয়েছে। ‘আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা’ গ্রন্থটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। গ্রন্থটি সমকালীন অনেক পত্রপত্রিকায় বহুল প্রশংসা পেয়েছে। গ্রন্থটিতে অনেক প্রসঙ্গ আছে যা বর্তমানকালের শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। বিজ্ঞানশিক্ষা নিয়েও তাঁর ভাবনা নানা প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। শিক্ষাসমস্যা, কৃষিশিক্ষা, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি রচনা করেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে সেকালের শিক্ষাচিত্রের বিভিন্ন ছবি পাওয়া যায়। তিনি উপন্যাসে এমন অনেক মন্তব্য ও ঘটনার সংযোজন করেছেন, যেগুলিতে সে সময়ের শিক্ষার ছবিটি আমরা স্পষ্ট করে পাই।

'শিক্ষা' একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আর লেখাপড়া শেখা— শিক্ষার সমার্থক নয় কেবল। ব্যবহারিক শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা, মানবিক শিক্ষা, সাংসারিক শিক্ষা, আর্থিক শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষাই প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষার প্রদীপকে গৃহে, সমাজে নিয়ে যেতে হবে— এই ভাবনার কথা ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন। বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনার ছায়া দেখা যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'রামারঞ্জিকা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায়, "The want of suitable books for the Hindu Females has induced the writer to undertake this little work, the contents of which are as follow ... paper 1, 2 and 3 treat of Female Education in an moral and industrial point of view." স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর এই ভূমিকা বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। গবেষক এই গ্রন্থের বিষয়ের বিশদ আলোচনা করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার জাগরণের একটি অন্যতম স্তম্ভ। কৃতী ছাত্র, দক্ষ প্রশাসক, সাহিত্যসম্রাট, ঋষি, স্বাধীনতার প্রেরণাপুরুষ, সমাজ ও ধর্মচেতনার পথপ্রদর্শক, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বোত্তম মানুষ' তিনি। তাঁর শিক্ষাভাবনা উপেক্ষিত, প্রায় অনালোচিত। কিন্তু তাঁর শিক্ষাচেতনাও মৌলিকত্বে আজও উজ্জ্বল। যথার্থ মুক্তশিক্ষা, যাকে সর্বশিক্ষাও বলা হয়— তার প্রথম উদগাতা হলেন তিনি। তিনি সমকালীন শিক্ষাবিদদের মতো (ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার উন্নতিতে অংশগ্রহণ না করলেও, ভাবনার মৌলিকত্বে শিক্ষাচেতনার উজ্জ্বল কথা লিখে গেছেন। তিনি দুটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ছাত্রদের জন্য 'রচনা শিক্ষা'। তার ভূমিকা, বিজ্ঞাপন আলোচনার দাবি রাখে। পাঠের শেষে অনুশীলনী ছিল। এই মডেল শুধু শিক্ষাদানে উপকরণ সংগ্রহশালা নয়, শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করেছে। যা বর্তমানকালে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। অন্য রচনা 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা'। এ গ্রন্থ আলোচনার দাবি রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Bengali Selections' সম্পাদনা করেছিলেন (১৭ জানুয়ারি, ১৮৯২)। প্রাচীন ও আধুনিক চেতনাবাহক এ সংকলন। ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন ত্রিস্তর শিক্ষার কথা বলেছেন— Information, Knowledge & Wisdom। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা একই প্রকার। যথার্থ শিক্ষাব্রতীর।

রামকৃষ্ণদেব ভেবেছিলেন, বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা দেবে। রামকৃষ্ণদেবের পরশমণি বঙ্কিমচন্দ্রকেও উদবোধিত করেছিল। তাঁর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের লোকশিক্ষার জন্য উদবেজনা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। আটটি অনুচ্ছেদের এই প্রবন্ধ সর্বশিক্ষার পথপ্রদর্শক। প্রবন্ধের শুরুতে আছে— "বাংলার ছয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তার কারণ এই যে বাংলায় লোকশিক্ষা নাই।" দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লোকশিক্ষার অভাবের কারণ তুলে ধরেছেন। কেবল বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। "চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্যকার্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা।" ৩য় অনুচ্ছেদে লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলেছেন। ৪র্থ অনুচ্ছেদে পাশ্চাত্যের মতো সংবাদপত্রের মাধ্যমে গণ-উপকার পেতে হলে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন দেখিয়েছেন। ৫ম অনুচ্ছেদ শাক্যসিংহ চৈতন্যদেবের গণশিক্ষার উত্তরাধিকারের প্রশংসা

করেছেন। ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে আছে কথকতার মাধ্যমে লোকশিক্ষার কথা। ৭ম অনুচ্ছেদে অশিক্ষিতের জন্য সুশিক্ষিতের সমবেদনাহীনতাকে লোকশিক্ষার অন্তরায় দেখিয়েছেন। শেষে অনুচ্ছেদে সমবেদনার বোধটিকে জাগ্রত করার কথা বলেছেন, তাহলে লোকশিক্ষা সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ কবি, ঋষি, সত্যদ্রষ্টা, দার্শনিক। শিক্ষা, ধর্ম, পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার প্রাসঙ্গিকতা দিনে দিনে বড় বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। বর্তমানকালে শিক্ষার সংকট—প্রভৃতি নানা সমস্যাতেই রবীন্দ্রনাথ আজও আলোকবর্তিকা। তা রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত। সাম্প্রতিক শিক্ষাসংকটের ছবি আমরা প্রত্যহ সংবাদপত্রে দেখি, রবীন্দ্রনাথ যার সমাধান সূত্র আগেই দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর শিক্ষাভাবনাকে গড়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিক্ষাসংক্রান্ত রচনাগুলিকে একত্র করলেও তাঁর শিক্ষাভাবনার পরিধিটি আমরা বুঝতে পারব। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, স্বদেশি আন্দোলন কালে শিক্ষার আন্দোলন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যবিস্তার বাংলা শিক্ষাভাবনার ইতিহাসে মাইলফলক। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত তাঁর 'সারস্বত আয়তন' বিদ্যালয়টির (১৯০১) নাম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে এগারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা—

প্রথম অধ্যায়:	রবীন্দ্র-জীবনদর্শন/ধর্মদর্শন/প্রেমদর্শন/সৌন্দর্যদর্শন/ রবীন্দ্রসংগীতে দর্শন/মুক্তিদর্শন প্রভৃতি।
দ্বিতীয় অধ্যায়:	রবীন্দ্রদর্শনে শিক্ষাভাবনা/উপনিষদ-এর প্রেক্ষাপটে/ ব্রহ্মসংগীত-এর প্রেক্ষাপটে।
তৃতীয় অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থ ও শিক্ষাভাবনা এবং শিক্ষাদর্শন।
চতুর্থ অধ্যায়:	শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বাংলা প্রবন্ধ ও ইংরেজি রচনায় রবীন্দ্রদর্শন/রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, কবিতা প্রভৃতিতে শিক্ষাদর্শন।
পঞ্চম অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে মাতৃভাষা/রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিক্ষা/ভাষাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ।
ষষ্ঠ অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার নানা প্রেক্ষিত/পাঠক্রম/পরীক্ষাপদ্ধতি/প্রশ্নমালা/শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতি।
সপ্তম অধ্যায়:	রবীন্দ্র-কর্মোদ্যোগ/শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী/শ্রীনিকেতন/ ব্রহ্মবিদ্যালয়/ শিক্ষাসত্র/ লোকশিক্ষাসংসদ/শিক্ষাচর্চাভবন/শিল্পভবন প্রভৃতি।
অষ্টম অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন/স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।
নবম অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন/কৃষি ও শিল্প/বিজ্ঞান।
দশম অধ্যায়:	রবীন্দ্রনাথেরশিক্ষাদর্শন (প্রতিতুলনায়)/রামমোহন/গান্ধীজী/অরবিন্দ/মদনমোহন মালব্য/বিবেকানন্দ প্রমুখ।
একাদশ অধ্যায়:	ফলকথা ও উপসংহার/শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ/কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ/রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য/বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা।

বঙ্গভঙ্গের কালে 'য়ুনিভার্সিটি বিল' নিয়ে কবি প্রতিবাদে সোচ্চার। 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ'-এর জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত এবং নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকেছেন।

এ সময় 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা করে শিক্ষা উন্নয়ন ভাবনাকেও সঞ্জীবিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার এক সর্বাঙ্গীণ পরিমণ্ডল গড়তে চেয়েছেন; যেখানে আনন্দ, মুক্তি ও সৃজনশীলতার অবকাশ থাকে। মুখস্থবিদ্যার মাপকাঠিতে পরীক্ষানির্ভর প্রাণহীন খণ্ডিত 'অ-শিক্ষা'র শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর কাম্য নয়।
শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারার প্রধান লক্ষ্য মনুষত্বের বিকাশ। এরপরেই তাঁর শিক্ষাচিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছিল স্বদেশ তথা জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার যোগসাধন এবং সমাজ সভ্যতার চলমানতার সঙ্গে তাঁকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগগত রূপটি গড়ে উঠেছিল ইংরেজ প্রবর্তিত অন্তঃসারশূন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবেই। বলা যেতে পারে, সে এক 'কঠিন এক্সপেরিমেন্ট', 'দুঃসাহসিক অ্যাভেঞ্চার' কিংবা 'মহৎ সাধনা'র ইতিহাস। তার সাফল্য সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত।

বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে নিয়েও শিক্ষাকর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনার পরিপূরক বা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে জড়িত। একদা স্কুল পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, তাঁর মনোমত করেই, পরিপূর্ণ 'মানুষ' করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, শিক্ষার সম্পূর্ণতাসহ, যেখানে আছে 'আনন্দ', যেখানে আছে 'সৌন্দর্য', যেখানে আছে 'সত্য', যেখানে আছে 'ব্যক্তিত্ব্যের বিকাশ', তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রকৃতির সান্নিধ্য—অনেক কিছুই মিলেমিশে একাকার রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে। উপনিষদের মর্মবাণী অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন কবি বা পরোক্ষে উপনিষদিক ভাবনাই কবির জীবন দর্শনকে গড়ে দিয়েছিল। শিক্ষা-দর্শন বা শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে ক্রিয়াশীল। কবি বলেছেন—

> "জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে, তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্যে।"

শিক্ষা মানুষকে নবদৃষ্টি দেয়, চেতনাকে জাগ্রত করে—এটা হল শিক্ষাদর্শনের মূল সুর। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন এই পথের যাত্রী হলেও পরে তা নানা অভিনবত্বে মণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে জমিদারী কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অশিক্ষা দেখে ব্যথিত হয়ে 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লেখেন 'ওই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।' প্রায় সমসময়েই লেখেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ; শিক্ষা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা এটি—এখানে মাতৃভাষার পক্ষে সওয়াল করেছেন কবি। শিক্ষায় আপামর জনসাধারণের উন্নতি রবীন্দ্রনাথের কাম্য। তবেই দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি হবে। ভারতের নবজাগরণে নব্য ভারত গঠনে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন নানাভাবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনাচিন্তা তথা দার্শনিক মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার পরম্পরিত রূপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষাশিক্ষা ও ভাষাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কবির শিক্ষাদর্শনের এক নতুন দিক উন্মোচিত করে।

মাতৃভাষা নিয়ে কবির ভাবনাগুলি সমকালে নানা বিতর্কের পরেও অভিনব মাত্রা নিয়ে আজও বিরাজমান। কবির শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞানভাবনার দিকটির মূল্যায়ন আজও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে কৃষি ও শিল্প প্রসঙ্গটিরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা তো কবির স্বপ্ন; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কবির শিক্ষাদর্শনের মূল্যায়ন জরুরী। ব্রহ্মবিদ্যালয়, শ্রীনিকেতন, শিক্ষাসত্র, লোকশিক্ষা সংসদ, লোকশিক্ষা সংসদ থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে

বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ, শিক্ষাচর্চাভবন, শিল্পভবন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কর্মোদ্যোগগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবী রাখে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষের চৈতন্যকে উদ্বোধিত করার জন্য গানই রচনা করেননি, স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি যে শিক্ষার আন্দোলন হয়েছিল, তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। ভারতের ইতিহাসে শিক্ষা নিয়ে এত বড় আন্দোলন, সেই প্রথম আর সেই শেষ—রবীন্দ্রনাথ যার কাণ্ডারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের ইতিহাসে যার মূল্যায়ন প্রয়োজন। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ কবি নানা কথায় মূল্যবান কথা বলেছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্য, ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক, বিদ্যালয়, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শৃঙ্খলা এবং মানুষ গড়াই ছিল শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন। সহশিক্ষা (co-education) রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রচলন করেন তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ে। তারপরই তা সহজ হয়েছে আমাদের কাছে। বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন কেমনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সে কথাও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের তুলনায় তা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ কবি-শিল্পী-কর্মী-ঋষি। তাঁর প্রবন্ধ, ভাষণ, পত্র, সাহিত্যে নানাভাবে ধরা পড়েছে তাঁর জীবন দর্শন। তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর দার্শনিক চিন্তা। কবির জীবন ও সাহিত্যে তাঁর শিক্ষাভাবনা, শিক্ষাদর্শন সম্পৃক্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে, কারণ মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।" শিক্ষা কেমন হতে পারে এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনে গ্রন্থ রচনা করতেও তিনি পিছিয়ে যাননি।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
৩. S. Radhakrishnan, Philosophy of Rabindranath Tagore.
৪. প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা।
৫. সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন।
৬. রণজিৎ ঘোষ, আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা।
৭. সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সংকলিত), রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা।
৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী (১-৯ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স।
৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (১-৪ খণ্ড)।
১০. সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা।
১১. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ।
১২. হৃষীকেশ চৌধুরী, রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য।
১৩. অনাথনাথ দাস, আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ।
১৪. ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্রভাবনা।
১৫. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১-৪ খণ্ড)।
১৬. অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি।
১৭. সুনীলচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা।
১৮. শ্রী অরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।
১৯. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

২০. Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore.
২১. Kathleen M. O’Connell, Rabindranath Tagore on Education.
২২. Kathleen M. O’Connell, Rabindranath Tagore: The Poet as Educator
২৩. L. K. Elmhirst, Poet and plowman.
২৪. L. K. Elmhirst, Rabindranath Tagore : Pioneer in Education.
২৫. Sisir Kumar Das, The English Writings of Rabindranath.
২৬. দেবাশিস ভৌমিক ও অপর্ণা পাল সম্পাদিত ‘শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ’, গ্রন্থতীর্থ, ২০১৩।

সহায়ক পত্রপত্রিকা:

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
২। ভারতী।
৩। সাধনা।
৪। প্রবাসী।
৫। ভাণ্ডার পত্রিকা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।
৬। পরিচয়, আষাঢ় ১৩৬২ (শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ/গোপাল হালদার)
৭। The Modern Review.
৮। Visva Bharati Quarterly
৯। Visva Bharati News.

বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ : নৈতিক মানদণ্ড এবং সামাজিক গুরুত্ব

আজিজুল হক মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বামনপুকুর হুমায়ুন কবীর মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির এই মহৎ বিষয়দুটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়েই হয়তো ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের সব প্রদেশের সব ভাষায় নৈতিকতার পাঠ দিয়েই শুরু হয় বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠন। ঠিক যেমনভাবে বাংলা ভাষায় বাঙালির বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠন শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুল পরিচিত ‘বর্ণপরিচয়’, আদর্শলিপি কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ মূলত শিশু-শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে কিংবা শিশু-মনস্তত্ত্ব অনুসারে তাদের পাঠের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লেখার তাগিদ থেকে রচিত একটি পুস্তিকা। কিন্তু এই ছোট্ট বইটিতে তিনি আমাদের মৌলিক কিছু মূল্যবোধের কথা সচেতনভাবে উল্লেখ করে গেছেন, যা সম্পূর্ণ রূপে ধ্রুপদী, যা আজও প্রাসঙ্গিক, ছোটো বড় সকলের জন্য। বইটির মধ্যে আছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতা। বিদ্যাসাগর গোপাল এবং রাখাল নামের দুজন বালকের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতার পাঠ দিয়ে গেছেন। তিনি নৈতিক আদর্শের প্রতীক হিসেবে গোপালের মতো হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, রাখালের অপগুণগুলিকে পরিত্যাগের মাধ্যমে জীবনকে সুগঠিত করার মন্ত্রণা দিয়েছেন। ‘বর্ণপরিচয়’-এর বক্তব্য বিষয় যদি কোনোদিন আমাদের নৈতিকতাবোধের দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ে, তাহলে আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কিংবা ইনস্‌টিঙ্কটগুলিকে সরিয়ে রেখে গোপালের রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। এটাই বর্ণপরিচয়ের সামাজিক গুরুত্ব। এই গুরুত্বকে মান্যতা দেওয়ার অর্থ আমাদের দেশের হাজার হাজার মনীষীর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদান করা কিংবা রাষ্ট্রের গুরুত্বের প্রতি মান্যতা দেওয়া হবে।
সূচক শব্দ: শিশুশিক্ষা, শিশুমনস্তত্ত্ব, পাঠ্যপুস্তক, ভারতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সামাজিক গুরুত্ব।

মূল আলোচনা:
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আধার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। সে কারণেই হয়তো আমাদের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের সব প্রদেশের সব ভাষায় বিদ্যায়তনিক পঠন-পাঠনের সূচনা হয় নৈতিকতা আশ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা দিয়ে। আজ আমরা বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের প্রারম্ভিক পর্বের একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তক নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি। পুস্তিকাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) ‘বর্ণপরিচয়’। বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগ। আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কেবল প্রথম ভাগটি এখানে গ্রহণ করেছি।

‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর যদিও বাংলা বর্ণমালার (স্বর ১২টি, ব্যঞ্জন ৪০টি) প্রয়োগ ও তার যৌক্তিকতা বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। মূলত শিশুশিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করতে এবং শিশুমনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের পঠন-পাঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াস থেকেই তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র এই

পুস্তকটির মধ্যে আমাদের বুনিয়াদি কতকগুলি মূল্যবোধের কথা তিনি সচেতন মনে উচ্চারণ করে গেছেন। যার প্রাসঙ্গিকতা আজও পূর্ববৎ। আগামীতেও থাকবে। বর্ণপরিচয় গ্রন্থের প্রথম ভাগে একুশটি পাঠ আছে। যার মধ্যে বেশ কিছু পাঠে নৈতিক মূল্যের কথা আমরা খুঁজে পাই। খুঁজে পাই তার সামাজিক গুরুত্বকেও।

তবে পাঠের মধ্যেকার নৈতিকতা কিংবা মূল্য অন্বেষণের পূর্বে পুস্তিকাটির শুরুর দিকের বিষয়গুলি নিয়ে দু-চারটি কথা বলে নিতে চাই। 'বর্ণপরিচয়'-এর শুরুতে আছে বারটি স্বরবর্ণ। যেগুলিকে সহজে স্মৃতিগত করার জন্য তিনি আমাদের পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বিষয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। বিষয়গুলি সবই উক্ত বারটি বর্ণ সমন্বিত। অনুরূপভাবে চল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকেও তিনি সুনির্দিষ্ট বিষয়-সমন্বিত করে উপস্থাপন করেছেন। স্বরবর্ণের জন্য নির্বাচিত বারটি এবং ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য নির্বাচিত চল্লিশটি, মোট বাহান্নটি বিষয় উল্লেখনীয়ভাবে আমাদের জীবন, সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পৃক্ত। বর্ণ অনুযায়ী তিনি যে বিষয়গুলি নির্বাচন করেছেন সেগুলির আমাদের জীবনে বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবে তার থেকে অধিক গুরুত্ব আছে বিষয়গুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মনে যে ভাবনা কাজ করেছে তার। তিনি শুরু করেছেন 'অজগর' দিয়ে এবং শেষ করেছেন 'চাঁদ' দিয়ে। তুলনায় ইংরেজি ভাষার দিকে লক্ষ দিলে দেখা যায় তাঁরা শুরু করেছেন 'Apple' দিয়ে এবং শেষ করেছেন 'Zebra' দিয়ে। এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের চেতনার মধ্যে আমাদের দেশের সংস্কার তথা সংস্কৃতির প্রস্ফুটন ঘটেছে। আমরা ভারতীয়রা বারে বারে অজগর-রূপ শত্রুর ছোবল খেয়েও চন্দ্রমা বিজয় করতে সমর্থ হয়েছি। তুলনায় ইউরোপ-আমেরিকা জীবন-যাপনে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেও ভারতের মতো সাংস্কৃতিক চেতনাকে আজও আয়ত্ত করতে পারেনি, হয়তো পারবেও না।

এরপর বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বর্ণযোজনা' করেছেন। উল্লেখ করেছেন 'আ' ধ্বনি থেকে 'ঔ' ধ্বনি পর্যন্ত মোট দশটি ধ্বনির ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। তারপর তিনি একেএকে উল্লেখ করেছেন দুই অক্ষরের মিশ্রশব্দ, তিন অক্ষরের মিশ্রশব্দ, চার অক্ষরের মিশ্রশব্দ, পাঁচ অক্ষরের মিশ্রশব্দ, অনুস্বারের ব্যবহার, বিসর্গ-এর ব্যবহার এবং চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বিধি। শুধু তাই নয়, 'উ', 'ঊ' এবং 'ঋ' ধ্বনির ব্যবহারে ব্যঞ্জনবর্ণের লিপিগত রূপের যে পরিবর্তন হয় সেগুলিও তিনি তুলে ধরেছেন। এই পর্যন্ত গেল প্রথম পর্যায়ের আলোচনা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রয়োজনীয় পাঠগুলির আলোচনাতে প্রবেশ করতে চাই। চতুর্থ পাঠে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

১। 'কোথা যাও। ধীরে চল।'

অর্থাৎ পথ চলার মধ্যে একটা মার্জিত রুচির কথা তিনি বলতে চাইছেন। যার মধ্যে একাধারে নিজের এবং পথিক জনের পারস্পরিক নিরাপত্তা বজায় থাকে। নবম পাঠে আছে—

২। আমি মুখ ধুইয়াছি।

৩। গোপালের পড়িবার বই নাই।

৪। যাদব এখনও শুইয়া আছে।

৫। রাখাল সারাদিন খেলা করে।

নবম পাঠের প্রথম বাক্যটিতে একটি প্রাত্যহিক কাজের উল্লেখ আছে। সে কাজ নিতান্ত স্বাভাবিক, মুখ ধোয়া। আমরা প্রত্যেকে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মুখ ধুয়ে থাকি। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যটিতে শুধুমাত্র একটা কাজের উল্লেখ করেন নি। বরং সকল বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, তাদেরকেও প্রত্যহ সকালে উঠে ভালো করে মুখ ধুতে হবে। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে দারিদ্র্যতার চিহ্ন পাই। এ চিহ্ন আমাদের পরিজনের চিহ্ন, সমাজের চিহ্ন। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজকে অর্থনৈতিক দৃঢ়তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

প্রচেষ্টা কিংবা সংকল্প আমাদের প্রত্যেকের নিতে হবে। তবেই মঙ্গল। তৃতীয় বাক্যে আমাদের আলস্যের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলস্যজনিত কারণে আমরা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি না। বিদ্যাসাগর সে দিকটিও খেয়াল রেখেছেন। চতুর্থ বাক্যটিতে বালক-বালিকাদের খেলাধূলা নিয়ে কথা বলেছেন। খেলাধুলার বিপক্ষে নন তিনি। কিন্তু রাখাল যেভাবে খেলে, সেটা আবার কোনো বালক-বালিকার জন্য যুক্তি সঙ্গত নয়। তাই সারাদিন খেললে চলবে না। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে খেলতে হবে। নবম পাঠের এই কথাগুলির অনেকটাই তিনি এই পুস্তকের শেষের দিকে পুনরায় উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থের দ্বাদশ পাঠে একগুচ্ছ নৈতিক মূল্যের কথা বলে গেছেন। যার সবকটি আমাদের সমাজ গঠনে সাংঘাতিকভাবে কার্যকরী অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দ্বাদশ পাঠে তিনি বলেছেন—

৬। কখনও মিছা কথা কহিও না।
৭। কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
৮। কাহাকেও গালি দিও না।
৯। ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
১০। রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
১১। পড়িবার সময় গোল করিও না।
১২। সারা দিন খেলা করিও না।

মিথ্যা কথা কোনোভাবে আদৃত হতে পারে না। একটা সমাজে মানুষ যখন সামান্যতম কারণে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেবে এবং সেটা যখন সর্বত্র দেখা যাবে তখন আমাদের ভেবে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সেই সমাজের নৈতিকমানদণ্ড ভেঙে পড়েছে। যদিও আজকের দিনে বিদ্যাসাগরের এই ‘কখনও মিছা কথা কহিও না’র যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে মিথ্যা কথার প্রবণতা না কমালে দেশের এবং দেশবাসীর কল্যাণ হবে না। আমাদের শাস্ত্র এবং শরীয়ত অবশ্য বিদ্যাসাগরের কথাকে সঙ্গত মনে করে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় মানুষের আসন্ন মৃত্যু যেখানে একটা মিথ্যে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারে সেখানে এবং রাষ্ট্রের সংহতি ও সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে মিথ্যে বলা যেতে পারে। যদিও এটা দীর্ঘ অভ্যাস এবং পরিচর্যার বিষয়। কিন্তু এটাই রাস্তা— বাঁচার এবং ধর্মের। এ বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে। সে কথা মাথায় রেখেও বলা যায়, মিথ্যা কোনো সমাধান হতে পারে না। এবার আসা যাক দ্বিতীয় বাক্যে— ‘কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।’ সোজা কথা হচ্ছে— পায়ের উপর পা তুলে ঝগড়া করা আর রিজার্ভেশন টিকিট কেটেও আপনি বসে যাবেন এবং অন্যজন ‘আরএসি’ টিকিট কেটে আপনার জায়গায় ঘুমাতে ঘুমাতে যাবেন’ বলে ঝগড়া করা— দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগর পায়ের উপর পা তুলে ঝগড়া করার ক্ষেত্রে বাদসেদেছেন। অযাচিতভাবে ঝগড়া না করা শিখতে হবে। শুধু শিখলে হবে না, অভ্যাসে আনতে হবে। তবেই শান্তি। তা না হলে ‘সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে’। তৃতীয় বাক্য— ‘কাহাকেও গালি দিও না।’ ভারত চিরদৃষ্টান্তের দেশ। পৃথিবীকে ভদ্রতা, সভ্যতা, নৈতিকতা ভারত যেভাবে শিখিয়েছে, গোটা বিশ্ব তুলনায় অনেক কম। ভারতের অনৈতিক কাজের ইতিহাস অনেক লম্বা। কিন্তু সেই অনৈতিকতার শিক্ষা থেকে এখানে জন্ম নিয়েছেন অনেক সাধু-সন্ত পুরুষ। যাঁদের বার্তা মানবজাতির জন্য অমৃত ধারার মতো। পান করতে পারলে মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকা যায়। মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে। ফলে গালি দেওয়াটাও কোনো ভদ্রতার পরিচয় নয়। বিদ্যাসাগর সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। চতুর্থ বাক্য— ‘ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।’ ঘর আমাদের প্রত্যেকের কাছে ‘পাখির নীড়ের মতো’। ঘর আমাদের অভিব্যক্তির সহযোগী। জীবনের যা কিছু সমস্যা তার সমাধান ঘরে বসে আমরা বার করতে চেষ্টা করি। শিশুদের জন্য বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের এই

অমূল্য কথাটি বললেও এর অর্থ অনেক গভীরে নিহিত আছে। যদিও প্রত্যেকটি শিশুপাঠ্য কিংবা শিশুসাহিত্য গভীর অর্থব্যঞ্জক হয়। যেটা বড়দের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। একটা উদাহরণ দিতে চাই—

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা ?' (রায়, পৃষ্ঠা-১৮)

অন্নদাশঙ্করের এই শিশুপাঠ্য ছড়াটির মধ্যে আসলে ভারতের তথাকথিত বড়, বুদ্ধিজীবী একদল মানুষের চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো উপকরণ আছে। যাক সেকথা। মূল কথায় ফেরত আসি। শিশুরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে উৎপাত করে, বড়রা কর্মক্ষেত্র থেকে। বেডরুম আমাদের আরাম আর বিশ্রামের স্থান। আবার সেই বেডরুমে বসে আমরা ডিসিশন নিই যে, আমার স্ত্রীর গর্ভে থাকা কন্যাসন্তানটিকে পৃথিবীর আলো দেখাবো কি না। এত কিছু ঘরে বসেই করি। ফলে 'উৎপাত' প্রাসঙ্গিক হতে হবে। জীবনের প্রাসঙ্গিক। প্রাণের প্রাসঙ্গিক। কখনই হিংসা বা মৃত্যুর জন্য নয়। পঞ্চম এবং সপ্তম বাক্য— 'রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।' কিংবা 'সারা দিন খেলা করিও না।' দুটি বাক্যই শিশুদের সময়ের চেতনা তৈরিতে সহযোগিতা করে। সময় এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সময় বিষয়টা সাংঘাতিকভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।" (ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫)। ফলে রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি তো চলবেই না, খেলাধূলাও সব সময় নয়। মানতে পারলে অনেক জীবনীসমস্যা দূর করা যাবে। ষষ্ঠ "বাক্য— পড়িবার সময় গোল করিও না।' এটা আমাদের চিরকালের একটা সমস্যা। যখনই পড়াশোনায় মনোসংযোগ করি, কিছু না কিছু একটা গোল বেঁধেই যায়। ছেলে 'মাসা এণ্ড দ্য বিয়ার'-এর মাসার সঙ্গে চিৎকার করছে কিংবা স্ত্রী বাপেরবাড়ি যাবে, কোন রঙের শাড়িটা পরবে, ঢাকাই জামদানী না জাস্ট তাঁত, সেই নিয়ে মতামত জানতে চাইছে। এই সব আর কি ? সমস্যাটা হচ্ছে পড়ার সময় ইহলৌকিক নানাবিধ বিষয় আমাদেরকে গুলিয়ে দেয়, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে। সেকারণে কোনো বিষয়ের 'গোল' থেকে নিজের পড়াশোনাকে বাঁচাতে হবে আর কি। সেটাই অন্তত বিদ্যাসাগরের বলার উদ্দেশ্য।

চতুর্দশ পাঠে বিদ্যাসাগর ওই কথাগুলি আর একটু স্পষ্ট করে বলছেন। শুধু পাত্র-পাত্রী কিংবা পুরুষের (প্রথম উত্তম মধ্যম) পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন—

১৩। ভোর হইয়াছে।
১৪। আর শুইয়া থাকিব না।
১৫। উঠিয়া মুখ ধুই।
১৬। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি।
১৭। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি।
১৮। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না।
১৯। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়া দিবেন না।

এখানে সবকিছু দেখানো হচ্ছে উত্তম পুরুষে। আর আগে দেখানো হয়েছে মধ্যম পুরুষে। যেমন—'আর শুইয়া থাকিব না।' বক্তা এখানে নিজের কথা নিজেই বলছেন। কিন্তু আগে ছিল 'যাদব এখনও শুইয়া আছে।' যাদব মধ্যম পুরুষ।

পঞ্চদশ পাঠে তিনি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

> ২০। কাল আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম; সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

এই কথাটিও সময়ের সঙ্গে যুক্ত। সময়ের জ্ঞান না থাকলে জীবনে অনেক বিষয়ের মহৎ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমাদের দেশের সেনা-বাহিনীর নৈতিক আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিলেই একমাত্র আমরা বুঝতে পারি সময় কতটা গুরুত্ব রাখে, মানুষের জীবনে, সমাজে, সংসারে। নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। কাজের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন যে নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত রাখে সেটা যদি সমাজের সর্বস্তরে সম্ভব হত তাহলে ভারতকে আর একবার বিশ্বগুরু হতে সময় কম লাগত। সেই চেতনা আমাদের মধ্যে আনতে হবে।

একটু আগে যে মধ্যম পুরুষের কথা বলছিলাম তার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের অষ্টাদশতম পাঠে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গিরিশ নামক একজন বালকের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর আমাদেরকে নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতার কথা বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> ২১। গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম, কোনো কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারাদিন খেলা করিয়াছ, রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ। বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু করিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।'

এখানে একটি বাক্যে একটু বেশি জোর দিতে হবে। বাক্যটি হল— 'আজ তোমাকে কিছু করিলাম না।' অর্থাৎ ভুল একবার করা যায়। বারবার একই ভুল করলে সেটা আর ভুল থাকে না। হয়ে যায় অপরাধ। আর অপরাধের শাস্তি থাকে, যেটা ভুলে থাকে না।

এরপর বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ এবং বিংশতিতম পাঠে গোপাল এবং রাখাল নামের দুজন বালকের মাধ্যমে পূর্বে উল্লিখিত সকল নৈতিকতাকে তুলনা করতে চেয়েছেন। তুলনা করে তিনি নৈতিক আদর্শের প্রতীক হিসেবে গোপালের মতো হতে বলেছেন। অন্যদিকে রাখালের অপগুণগুলিকে পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন। সমগ্র বিষয়টি আমাদের নৈতিকতাবোধের দোরগোড়ায় এসে যদি কড়া নাড়ে তাহলে আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কিংবা ইনস্‌টিঙ্কটগুলিকে সরিয়ে রেখে গোপালের রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। এটাই বর্ণপরিচয়ের সামাজিক গুরুত্ব। এই গুরুত্বকে মান্যতা দেওয়ার অর্থ আমাদের দেশের হাজার হাজার মনীষীর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা কিংবা রাষ্ট্রের গুরুত্বের প্রতি মান্যতা দেওয়া হবে।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত ভ্যালুর সঙ্গে রাষ্ট্র-ভ্যালুর গভীর একটা সম্পর্ক আছে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত জীবন এবং দর্শনের উপর একটা জাতির দর্শন গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ভ্যালু থেকে সামাজিক ভ্যালু গড়ে ওঠে। আর সামাজিক ভ্যালু থেকে জন্ম নেয় রাষ্ট্র-ভ্যালু। আমাদের সামূহিক ভ্যালুই যদি ভারতের ভ্যালু হয়, তবে আমাদের দায়িত্ব অনেক বড় হয়ে যায় অর্থাৎ বেড়ে যায়। আমাদের সকলকে সেই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হতে হবে। সেটাই রাষ্ট্রের দাবি। সেটাই ভারতের দাবি।

তথ্যসূত্র:

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ), ২০০১, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা।
- রায়, অন্নদাশঙ্কর, ১৯৯৮, অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), কলকাতা, বাণীশিল্প।

‘পঞ্চতন্ত্র’র মুজতবা আলী : রচনাশৈলীর অভিনব প্রয়োগে সমাজ-সমস্যার গভীরে

উদয় রতন মুখার্জী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) 'দেশে বিদেশে'র লেখক হিসেবেই বেশি পরিচিত। কিন্তু ভ্রমণকাহিনি ছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং রম্যরচয়িতা। অজস্র বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিলো, নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' তেমনই নানা বিষয়কেন্দ্রিক রচনার সমাহার। প্রাচীন যুগে বিষ্ণুশর্মা যেমন 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে নীতিকথা শিখিয়েছিলেন, আধুনিক যুগেও আলীসাহেব বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চতন্ত্র' বইটি অভিনব।

শুধু বিষয় নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' অভিনবত্বের দাবি রাখে। এই বইয়ের রচনাগুলির কোনো কোনোটি প্রবন্ধ, কিছু রম্যরচনা, কিছু স্মৃতিকথাধর্মী, কয়েকটি আত্মকথামূলক, কিছু গল্পধর্মী এবং কয়েকটি এগুলির কোনোটির মধ্যেই পড়ে না। তাই কোনো একটি অভিধায় একে ধরা কঠিন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' বইতে কিছু ধরনের রচনাকে প্রবন্ধ না বলে 'রচনা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন, 'পঞ্চতন্ত্র'কে সেই গোত্রে ফেলা যেতে পারে।

আমরা 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের হাস্যরসমূলক কয়েকটি রচনা নিয়ে আলোচনা করবো। রচনাগুলি হলো,---*বই কেনা, সিনিয়র এপ্রেন্টিস্* এবং *রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম*। উল্লিখিত রচনাগুলিতে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে পরিচিত কিছু গল্পের মাধ্যমে মুজতবা আলী যেভাবে অনায়াসে কোনো সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন, তা পৃথক অভিনিবেশের দাবি রাখে। 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের উল্লিখিত তিনটি রচনাকে ঘিরেই আমাদেরবর্তমান প্রবন্ধটি আবর্তিত হবে। উক্ত তিনটি রচনা থেকে আলীসাহেবের রচনাভঙ্গি আর মনোভঙ্গির একটি দিক এবং তাঁর সমাজ-সচেতনতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে, এটা আশা করা যায়।

সূচক শব্দ: সৈয়দ মুজতবা আলী, পঞ্চতন্ত্র, রচনাশৈলী, সমাজ-সমস্যা, বই কেনা, সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্, রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম।

মূল প্রবন্ধ:

শুরুর কথা

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) 'দেশে বিদেশে'র লেখক হিসেবেই বেশি পরিচিত। কিন্তু ভ্রমণকাহিনি ছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং রম্যরচয়িতা। বেশ কিছু বিদেশি ভাষার বই তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন। মুজতবা আলী ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। তিনি বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়েছেন। আলীসাহেব গবেষণা করেছিলেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে। তিনি যেমন বহুভাষাবিদ ছিলেন, তেমনই পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণও করেছেন। অজস্র বিষয়ে তাঁর

কৌতূহল ছিলো, নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' তেমনই নানা বিষয়কেন্দ্রিক রচনার সমাহার। এই বইয়ের দু'টি পর্ব, প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে, দ্বিতীয় পর্বটি ১৯৬৬ সালে। এই বইয়ের অধিকাংশ রচনা রবিবাসরীয় 'বসুমতী' এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রাচীন যুগে বিষ্ণুশর্মা যেমন 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে নীতিকথা শিখিয়েছিলেন, আধুনিক যুগেও আলীসাহেব বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চতন্ত্র' বইটি অভিনব।

শুধু বিষয় নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' অভিনবত্বের দাবি রাখে। এই বইয়ের রচনাগুলির কোনো কোনোটি প্রবন্ধ, কিছু রম্যরচনা, কিছু স্মৃতিকথাধর্মী, কয়েকটি আত্মকথামূলক, কিছু গল্পধর্মী এবং কয়েকটি এগুলির কোনোটির মধ্যেই পড়ে না। তাই কোনো একটি অভিধায় একে ধরা কঠিন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' বইতে কিছু ধরনের রচনাকে প্রবন্ধ না বলে 'রচনা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন, 'পঞ্চতন্ত্র'কে সেই গোত্রে ফেলা যেতে পারে। রীতিগত বিতর্কে না গিয়ে আমরা 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের হাস্যরসমূলক কয়েকটি রচনা নিয়ে আলোচনা করবো। সেগুলির প্রত্যেকটিই বইয়ের প্রথম পর্বের অন্তর্গত। রচনাগুলি হলো,---*বই কেনা, সিনিয়র এপ্রেন্টিস্* এবং *রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম*। উল্লিখিত রচনাগুলিতে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে পরিচিত কিছু গল্পের মাধ্যমে মুজতবা আলী যেভাবে অনায়াসে কোনো সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন, তা পৃথক অভিনিবেশের দাবি রাখে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের উল্লিখিত তিনটি রচনাকে ঘিরেই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধটি আবর্তিত হবে।'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের প্রথম পর্বে পঁয়ত্রিশটি এবং দ্বিতীয় পর্বে চৌত্রিশটি রচনা আছে। উনসত্তরটির মধ্যে তিনটি রচনা থেকে বইটির সামগ্রিক পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসবে না, সেই উদ্দেশ্যও আমাদের নেই। উক্ত তিনটি রচনা থেকে আলীসাহেবের রচনাভঙ্গি আর মনোভঙ্গির একটি দিক এবং তাঁর সমাজ-সচেতনতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে, এটা আশা করা যায়।

বই কেনা

'পঞ্চতন্ত্র'র প্রথম পর্বের প্রথম রচনা হলো 'বই কেনা'। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বই পড়া' প্রবন্ধে (যা আসলে ছিলো একটি ভাষণের লিখিত রূপ) বই পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন এবং আক্ষেপ করেছিলেন যে বাঙালি প্রয়োজন না হলে বই পড়ে না। তিনি বাঙালির বই পড়ার অভ্যাস তৈরির জন্য লাইব্রেরি স্থাপনের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। মুজতবা আলী আলোচ্য রচনায় বলেছেন, মানুষের দেখার চোখ মাত্র দু'টি, কিন্তু মনের চোখ অসংখ্য। মনের চোখ বাড়ানো যায় জ্ঞানার্জনের মধ্যমে। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন বই পড়া, আর তার জন্য দরকার বই কেনা। বই কেনার জন্য বই কেনার প্রবৃত্তি থাকতে হয়, যা অধিকাংশ বাঙালিরই নেই। দেশভ্রমণ করেও মনের চোখের সংখ্যা বাড়ানো যায়। কিন্তু দেশভ্রমণের সামর্থ্য সকলের থাকে না। তাই শেষ পর্যন্ত একমাত্র উপায় হলো বই। তাই ভেবেই হয়তো ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,---

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্তযৌবনা---যদি তেমন বই হয়।

বাঙালি বই কিনতে চায় না অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে। আলীসাহেব বলেছেন, বইয়ের দাম কমালে নিশ্চয়ই বইয়ের বিক্রি বাড়বে। প্রকাশককে দাম কমাতে বলা হলে তাঁরা অন্য যুক্তি দেন। বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে দাম কমানো যাবে না। লেখক বলেন, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বর ভাষা। ফরাসি ভাষায় বাংলার চেয়ে অনেক কম মানুষ কথা বলে। তবু তাদের দেশে কম দামে ভালো ভালো বই পাওয়া যায়। বাংলায় তেমন হয় না কেন? তখন প্রকাশক বলেন,---

> ''আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?''

আলীসাহেব আক্ষেপ করে বলেছেন,---

> ''তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।''

কিন্তু এই চক্র তো ছিন্ন করতেই হবে। কে করবে? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ এটা তার জীবিকার প্রশ্ন। তাই তার পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ক্রেতাকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আলীসাহেব বলেছেন, বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয়নি। কেউ যদি বই কেনার খরচ তিনগুণও বাড়িয়ে দেয়, তাহলেও তার সংসারে কেউ না খেয়ে মরবে না। তিনি এক বাঙালি ধনী রমণীর গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। গল্পটা তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক,---

> ''এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'
>
> যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।''

বিরক্ত হয়ে মুজতবা আলী বলেছেন,---'আর কত বলবো? বাঙ্গালীর কি চেতনা হবে?' তাঁর আরো আক্ষেপ এই যে, বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা মোটেই কম নয়। কিন্তু তার যতো অনীহা শুধু বই কেনার ক্ষেত্রে। রচনার শেষে লেখক আর একটি গল্প বলেছেন। সকলের জানা গল্প, আরব্যোপন্যাসের কাহিনি। তবে তিনি এটি নতুন তাৎপর্যে হাজির করেছেন।

> ''এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে। রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে

গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।''

গল্পটি বলার পরে মুজতবা আলী মন্তব্য করেছেন,---

''বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।''

শেষে গিয়ে আলীসাহেব বেশ কড়াভাবেই বাঙালির বই কেনার অনীহাকে ব্যঙ্গ করেছেন। অবশ্য ব্যঙ্গাত্মক হলেও তাঁর প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গি পাঠকের মন প্রসন্ন করে তোলে। একটি জাতি শুধু বই কেনার প্রতি বৈরাগ্যবশত কীভাবে তলিয়ে যেতে পারে, গত শতকের পঞ্চাশের দশকে, অর্থাৎ স্বাধীনতার ঠিক পরপরই তা নিয়ে তিনি সচেতন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাবধান বাণী আমরা শুনিনি। আজ, দেশের স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আলীসাহেবের মন্তব্যের তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি। সত্যিই পারি কি?

রেডুক্ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম

একটি অতি সাধারণ প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে কীভাবে একটি গভীর তত্ত্বে পৌঁছোনো যায়, আলোচ্য রচনায় তা দেখিয়েছেন মুজতবা আলী। তাঁর কোলকাতাস্থিত চিনা পণ্ডিত বন্ধু অধ্যাপক ঊ একদিন একটি ফুলের সুবাসে মুগ্ধ হয়ে আলীসাহেবের কাছে ফুলটির নাম জানতে চান। আলীসাহেব বলেন,---

''বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে ''বকুল'', হেথাকার নেটিভ ভাষাতে ''মোলশী''।''

অধ্যাপক ঊ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,---

''বকুল, মোলশী,---মোলশী, বকুল। উঁহু, বকুলটিই মিষ্টি।''

আলীসাহেব মজা করে বলেন,---

''মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে প্রাণনাথ বলে ডাকলেই পারেন।''

''সে আবার কি?''

''প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।''

''আরো বুঝিয়ে বলো।''

তখন আলীসাহেব একটি গল্প শোনান তাঁর চিনা বন্ধুকে। তিনি নিজে সিলেটি বাঙাল। তাঁর দেশের এক বাঙাল এসেছে কোলকাতায়। বাজারে গিয়ে বেগুন কিনতে গিয়ে সে দোকানিকে বললো,---'দাও তো হে, এক সের বাইগন।' দোকানি পশ্চিম বাংলার লোক। 'বেগুন'-এর উচ্চারণ 'বাইগন' শুনে সে মজা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো,---'কি বললে হে জিনিষটার নাম?' বাঙাল লোকটি বুঝলো, তার উচ্চারণ নিয়ে মস্করা করা হচ্ছে। তাছাড়া চারপাশে 'ঘটি' মানুষের সংখ্যাই বেশি। সে বললো,---'বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি?'

দোকানি একটু আত্মম্ভরিতার হাসি হেসে বললো,---

''ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি---বেগুন, বেগুন।''

বাঙাল জবাব দিলো,---

''মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে ''প্রাণনাথ'' ডাকলেই পারো। দাও, তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা?''

গল্পটা শুনে ঊ অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, এই গল্পের মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব লুকোনো আছে? আলীসাহেব বললেন, তিনি তা জানেন না। ঊ বললেন, যখন কোনো বিষয় নিয়ে টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়, তখন তাকে বলে 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম'। মুজতবা আলীর গল্পটার ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করলেন,---

> ''আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম ''প্রাণনাথ''। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।''

এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ঊ চলে গেলেন আরো গভীর তত্ত্বকথায়। তিনি বলে চললেন,---

''এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙ্গের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দু'দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মতো কেরদানী, কোনো সন্দ নেই।

পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয়? দু'দল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

কিন্তু কার্যত হল কি? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দু'দল বেরিয়ে এলেন দু'দিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি।

...মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশী হল বল তো।''

বাঙাল-ঘটির সাধারণ ভাষাগত বিবাদ থেকে মুজতবা আলী এই রচনায় পৌঁছে গেলেন সভ্যতার অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি মূল প্রশ্নে। শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন---

> ''তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।
> 'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড আবসুর্ডুম!'''

আজ যখন পৃথিবীতে মানুষ যন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, মানুষ যন্ত্রকে চালনা করছে, নাকি সে যন্ত্র দ্বারা চালিত হচ্ছে---এই প্রশ্ন প্রায়ই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তখন ছয় দশক আগে আলীসাহেবের এই মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আর বিষয়টির অবতারণা তিনি করেছেন পণ্ডিতি দেখিয়ে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে নয়, বরং সম্পূর্ণ মজার ছলে, গল্প বলার মাধ্যমে। বাংলা রম্যরচনার একটি নতুন ধারা তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে।

সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌

বিষ্ণুশর্মা রচিত সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ গল্পের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য জানানো মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র'র অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত দু'টি রচনায় আমরা তা দেখেছি। আমাদের আলোচ্য শেষ রচনা *সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌*-এ এই বিষয়টি আরো বেশি করে দেখতে পাওয়া যাবে। গল্পটা আলীসাহেবের ভাষাতেই শোনা যাক।

> ''গণেশ বেচারী এপ্রেন্‌টিস্‌ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ লয়ে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব

কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়ল, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে---সে কখনো এপ্রেন্টিসি করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'
কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্টিসির আঁকশি দিয়ে একটিকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বিবেচনা করেন না।
গণেশের চোখ বসে গেছে, গলা ভেঙে গেছে, রগের চুলে দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওয় ফাইফরমাশ করে দেয়---আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকুরি কিন্তু হল না।''

গণেশের মতো দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবন আমাদের পরিচিত অনেকেরই দেখা যায়। হতাশা ছাড়া তাদের জীবন থেকে আর কিছুই পাওয়ার থাকে না। তবু তারা আশা ছাড়তেও পারে না। গণেশের জীবনও সেভাবেই চলছিলো। কিন্তু আলীসাহেবের গল্পের শেষটা একটু অন্যরকম। গণেশের জীবনে আশার ক্ষীণতম সম্ভাবনা দেখা না গেলেও তার ভিতরে কোথাও যেন একটা প্রতিবাদী সত্তা সুপ্ত ছিলো।সুযোগ পেয়ে সেই সত্তাটি কিছুটা হলেও জাগ্রত হলো।

একদিন বড়োসাহেব, বড়োবাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, সেদিন তাঁকে একটা জরুরি রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে। তাই দরজায় যেন কোনো পাকা লোককে বসিয়ে রাখা হয়। সেদিন দারোয়ানেরা ধর্মঘট করেছিলো। বড়োবাবু গণেশের চেয়ে পাকা লোক আর খুঁজে পেলেন না। গণেশ টুলে বসে তার ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগলো।

এমন সময় রাস্তায় খুব হইচই শোনা গেলো। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কৌপিনটুকু পর্যন্ত নেই। তার পিছনে প্রচুর রাস্তার ছেলে তাড়া করেছে। পাগলটি সোজা গণেশদের অফিসের দিকেই এলো। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ঢুকতে গেলো বড়োসাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু পাগলকে বাধা দিলো না। সাংঘাতিক কাণ্ড! পাগলের পিছনে পিছনে রাস্তার ছোকরাগুলিও ঢুকেছে সাহেবের ঘরে। পাগল আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে তাঁর রিভলভিং চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষ পর্যন্ত পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করলো।

সাহেব তো রেগে কাঁই। বড়োবাবুকে ডেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন তিনি। বড়োবাবু দোষ চাপালেন গণেশের উপর। গণেশের ডাক পড়লো। সাহেব জানতে চাইলেন, সে পাগলকে ঠেকালো না কেন? গণেশ খুব বিনয়ী ছেলে। সে উত্তর দিলো,---

''আমি ভেবেছিলুম উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?''

একথা শুনে সাহেব তো হতবাক! এই কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। গণেশ বুঝিয়ে বললো,---

> "হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হয়েছেন।"

অসাধারণ স্যাটায়ার! তবে এর মধ্যে হিউমারও দুর্লক্ষ নয়। গণেশের জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে মুজতবা আলী সমকালীন বাঙালি তথা ভারতীয়দের যুগযন্ত্রণার নির্মম ছবি তুলে ধরেছেন। শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন,---

> "১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্টিস্ হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।"

আলীসাহেবের মন্তব্যের পরে আমাদের আর কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটা কথা মনে রাখাই যথেষ্ট। 'পঞ্চতন্ত্র'র প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৫২ সালে, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ বছর পরে। আর আজ, স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক পরে দেশের বেকার সমস্যা যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মুজতবা আলী যে কতোটা দূরদর্শী ছিলেন, এই একটি রচনা থেকেই সেটা আমরা বুঝতে পারি। অথচ গুরুগম্ভীর একটি সমাজ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও তিনি তাঁর রসবোধ একটুও ত্যাগ করেননি। মজার একটি গল্পের মাধ্যমে সমস্যাটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। এটাই তাঁর রচনাভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শেষ বলে কিছু নেই

আলোচিত তিনটি রচনার মধ্য দিয়ে 'পঞ্চতন্ত্র' বই তথা মুজতবা আলী-র রচনারীতির বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও ধরা পড়েছে বলে আশা করা যায়। তিনি আধুনিক যুগের বিষ্ণুশর্মার মতোই ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে কোনো বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে বিষ্ণুশর্মার সঙ্গে আলীসাহেবের রচনারীতির দু'টি মূল পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত, বিষ্ণুশর্মা মূলত তাঁর ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্পগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু মুজতবা আলী নীতিশিক্ষা দিতে চাননি। তিনি সমস্যাগুলি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন শুধু। দ্বিতীয়ত, আলীসাহেব অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন হাস্যরসের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে বিষ্ণুশর্মা মূলত রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যেখানে হাস্যরসের প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায়নি। তাই সবদিক থেকে বিচার করলে সৈয়দ মুজতবা আলী-র 'পঞ্চতন্ত্র'কে বাংলা রচনা সাহিত্যের একটি অভিনব সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করলে একেবারেই ভুল হবে না।।

আকর গ্রন্থ :

১. সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দশম সংস্করণ, কোলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭।

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের বিভিন্ন রচনাগুলির উদ্ধৃতিগুলি এই আকর গ্রন্থ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

দলিত আন্দোলন ও সাহিত্যচর্চা : প্রসঙ্গ একলব্য

চিরঞ্জিত ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বহরমপুর গার্লস্ কলেজ

সার-সংক্ষেপ: 'দাল্লিদা' পালি শব্দ থেকে 'দলিত' শব্দটি উদ্ভূত। এটির বাংলা অর্থ দারিদ্র। কেবল বিত্তহীন সর্বহারা শ্রেণির লোকদের সংস্কৃত অভিধানে দাল্লিদা শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী দলিতদের সম্মানিত করতে 'হরিজন' বা 'ঈশ্বরের সন্তান' পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। ভগবান ব্রহ্মা হল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দেহ-সৌষ্ঠব থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চার শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরুদেশ থেকে বৈশ্যের এবং পাদদেশ থেকে শূদ্রের আগমন ঘটেছে। যেহেতু পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে; তাই এঁরা সমাজের নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। অনার্য ভারতবাসী তথা সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, হো, ওঁরাও, মালো, বাগদী, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি জনজাতিকে মোটা দাগে অন্তর্গত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চবিত্ত হওয়ায় এই শ্রেণিভুক্ত মানুষজনদের 'অস্পৃশ্য' হিসাবে প্রচার করতে থাকে। আমাদের রাষ্ট্রীয় বর্ণাশ্রম প্রথার এই চতুর্থ বর্ণকে 'অবর্ণ' তকমা দিয়ে সমাজ থেকে একপ্রকার দূরীকরণ করা চেষ্টায় সর্বদা মত্ত রয়েছে আজও। 'এডুকেট', 'আজিটেট' এবং 'অরগানাইজ'-এই ত্রিবিধ শ্লোগানই দলিত জাতির উন্নয়নের মূলমন্ত্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আম্বেদকর দলিত জাতির স্বার্থ নিমিত্তার্থে সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবাত্মক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'দলিত প্যান্থার' আয়োজিত দলিত সাহিত্য সম্মেলনে 'দলিত' শব্দটিকে বৃহত্তর দরবারে আন্দোলনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়। এই আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করলে পশ্চিম ভারত তথা মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী দলনেতা জ্যোতিবা ফুলে 'দলিত' পরিভাষাটিকে জনসমক্ষে ও লিখিত আকারে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। মারাঠি দলিত সাহিত্যের লেখক দয়া পাওয়ার, যশোবন্ত মনোহর, নামদেও ধাসাল, শরণকুমার লিম্বালে, বাবুরাও বাগুল ও অর্জুন ডাঙলে প্রমুখের লিখনচর্চায় দলিত সাহিত্য বৈশ্বিক দুনিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায়।

মহাভারতের আদি পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য দলিত চরিত্র একলব্য। তিনি নিষাদ রাজ্যের ভিল অধিবাসী রাজা হিরণ্যধনু ও রানী বিশাখার একমাত্র পুত্র। ধনুর্বিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের নিকটে উপস্থিত হন পরবর্তী বিদ্যালাভের জন্য। একলব্য নিষাদ রাজ্যের ব্যাধ তথা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় গুরু দ্রোণ তাঁকে অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে কেবল অসম্মতই হননি; ভবিষ্যতে যাতে এই জ্ঞান প্রাপ্ত না করতে পারেন সেই হেতু তাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তনও করেছিলেন। তাঁর উপর অত্যাচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক— যা মহাভারত মহাকাব্যে লক্ষণীয়। একলব্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে জন্মের ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র কর্মের ভিত্তিতে গুরুত্ব পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত যোদ্ধা হওয়ায় একলব্যের জীবনগাথা আমাদের হৃদয়ে পীড়ার জন্ম দেয় আজও।

সূচক শব্দাবলী: দলিত, অস্পৃশ্য, জ্যোতিবা ফুলে, সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন, একলব্য ও দ্রোণাচার্য।

মূল আলোচনা:
'দলিত' বিশেষণ পদ। অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ বুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন: দল+ত্ (ক্ত) + র্ম্ম = দলিত।[১] অর্থাৎ, এর আক্ষরিক অর্থ দলন করা হয়েছে এমন বা মর্দিত, পিষ্ট, দমিত বা পরাস্ত। লক্ষণীয়, সংস্কৃত 'দল্' ধাতু থেকে 'দলিত' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। সর্বাংশে, সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গের মানুষদের চিহ্নিতকরণে 'দলিত' বর্তমানে এক শ্রেণিচেতনার নির্দেশ দেয়। অন্যথায়, 'দাল্লিদা' পালি শব্দ থেকে 'দলিত' শব্দটি এসেছে। যার অর্থ দারিদ্র। কেবল বিত্তহীন সর্বহারা শ্রেণির লোকদের সংস্কৃত অভিধানে দাল্লিদা বোঝানো হয়। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী দলিতদের সম্মানিত করতে 'হরিজন' বা 'ঈশ্বরের সন্তান' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হরিজন সেবক সংঘ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র ভারতব্যাপী তাঁদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি 'হরিজন' নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। তবে এই 'হরিজন' পদবন্ধটিকে অস্বীকার করে বাবাসাহেব আম্বেদকর 'দলিত' শব্দটিকেই সর্বাপ্রেক্ষা গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ, ড. বি. আর. আম্বেদকরের সঙ্গে গাঁধীজির রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হয়েছিল।

ড. বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রি.) মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূলানির মাহার সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত নিম্নবর্গ জনজাতি হওয়ায় তাঁকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর অবমাননা এবং সর্বস্তরের অধিকার থেকে বিবিধ বঞ্চনার শিকার হতে হত। এ-মতাবস্থায়, নিজ জনজাতির সুরক্ষা ও সম্মান রক্ষার্থে ড. আম্বেদকর দলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরব হয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'মূকনায়ক' (১৯২০ খ্রি.) ও 'বহিষ্কৃত' (১৯২৭ খ্রি.) এই আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছিল। 'এডুকেট', 'আজিটেট' এবং 'অরগানাইজ'—এই ত্রিবিধ শ্লোগানের মধ্য দিয়ে দলিত জাতির প্রকৃত সত্তা উন্মোচনে জন-বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন আম্বেদকর। লক্ষণীয়, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আম্বেদকর দলিত জাতির স্বার্থ নিমিত্তার্থে সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবাত্মক চেতনার সম্প্রসারণ করেছিলেন।

এই শ্রেণির মধ্যে অনার্য ভারতবাসী তথা সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, হো, ওঁরাও, মালো, বাগদী, রাজবংশী ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি জনজাতিকে মোটা দাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ এমন আত্ম-অহমিকায় পৌঁছোয় যে, এই শ্রেণির মানুষজনদের 'অস্পৃশ্য' ভাবতে শুরু করে। আমাদের রাষ্ট্রীয় বর্ণাশ্রম প্রথার এই চতুর্থ বর্ণকে 'অবর্ণ' তকমা দিয়ে সমাজ থেকে একপ্রকার দূরীকরণ করা চেষ্টায় সর্বদা মত্ত থাকে। উচ্চ হিন্দু বর্ণের মহাজন তথা শাসকের দৃষ্টিতে এঁদের স্পর্শ ও কণ্ঠিত ধ্বনি শ্রুত হওয়া অপবিত্র বলে প্রচার করতে থাকেন। এই চতুঃবর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে দীর্ঘ অবমাননার শিকার হয়; তাঁরা সমাজে উচ্ছিষ্ট হওয়ায় বিপ্লবাত্মক মনোভাব পোষণ করতে থাকেন।

'তপশিলী জাতি' ও 'অন্যান্য অনগ্রসর জাতি'কে এই দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যবসিত করা হয়েছে। এই দলিত-এর সংখ্যা দেশের প্রায় ৮৫% মানুষ। দলিত শব্দের দ্বারা ভারতের সর্বাপ্রেক্ষা নিম্নতম শ্রেণিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আসলে আমাদের চতুঃবর্ণের যে উচ্চাসীন তিন সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যাঁদের অস্পৃশ্য বা সমাজের অপাংক্তেয় মনে করেন সর্বদা—তাঁরাই মূলত দলিত শ্রেণি। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তাঁরা সাধারণত সমাজের একেবারে প্রান্তে

বসবাস করে থাকেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সমাজের মূলস্রোত থেকে বিতারিত বলা যায়। ‘অস্পৃশ্য’, ‘ম্লেচ্ছ’ ও ‘অপবিত্র’ ইত্যাদি তকমায় তাঁদের দেগে দেওয়ায় সামাজিক অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় সমাবেশে এমনকি মন্দিরে প্রবেশও তাঁদের অধিকার নেই। তাই এরকম সমাজচ্যুত অবমাননাকর গ্লানি থেকে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ‘অস্পৃশ্যতা’ অবমোচন ঘটাতে তাঁরা আন্দোলনে সামিল হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতি প্রয়োগ করে শ্রেণি বৈষম্য তৈরি করলে তাঁরা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন এবং দলন প্রক্রিয়ার এইরূপ চক্রান্তে নমঃশূদ্রগণ গর্জে ওঠেন। সুতরাং, সার্বিক বিচারে এই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকারে চতুর্দিক প্রসারিত হলে তার বিদ্রোহের প্রকৃতি ‘দলিত নন্দনতত্ত্ব’ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে এইভাবে:

> “দলিত ও নিগ্রো সাহিত্য, দলিত ও নিগ্রো জীবনের দুঃখ ও দারিদ্র্যের প্রতিবিম্ব। জীবন আর অভিজ্ঞতা, সমাজ আর সমস্যা, বেদনা আর বিদ্রোহ ইত্যাদির রসায়নে এই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা ও লড়াকু মানসিকতার অভিব্যক্তি এই সাহিত্যে বিপুলভাবে পাওয়া যায়।”[২]

ঋক্ বেদে বলা হয়েছে, ভগবান ব্রহ্মা হল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দেহসৌষ্ঠব থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চার শ্রেণির উৎপত্তি ঘটেছে। ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরুদেশ থেকে বৈশ্যের এবং পাদদেশ থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে; তাই এঁরা সমাজের নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। এই চার শ্রেণির মধ্যে শূদ্রদের কাজই ছিল অপর তিন বর্ণ-সম্প্রদায়কে সেবা ও পরিচর্যা করা। মূলত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অনুমত্যানুসারে কায়িক পরিশ্রম বা বেগার খাটা ছিল শূদ্রদের জন্মগত অধিকার। ‘শূচ্’ ধাতুর সঙ্গে ‘রক্’ প্রত্যয় যোগে ‘শূদ্র’ শব্দটি আগত। উচ্চতর তিন বর্ণের অত্যাচারে শোকের ছায়া এই শ্রেণির উপর বর্তিত হওয়ায় এঁরা নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করায় আত্ম-অবমাননায় বলিপ্রদত্ত জাতি শূদ্র। আর্য-অনার্যদের দ্বন্দ্বে এই শ্রেণি মাৎস্যন্যায় নীতি অনুসারে চিরকাল দলিত হয়েছে সমাজের উচ্চতর শ্রেণির দ্বারা। সমাজে শাসক শ্রেণির অধীনে থাকায় এঁরা অধীনস্থ দলিত জাতি। দলন ক্রিয়ার মধ্যে এঁরা অবহেলিত হওয়া এঁদেরকে ‘সাব-অল্টার্ন (Sub-Altern) বলা হয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে নিম্নবর্ণের মানুষদের শণাক্ত করতে ‘অবদমিত শ্রেণি’ বা ‘Depressed Classes’ পরিভাষাটি ‘বোম্বে গাজেটিয়ার’-এ প্রথম ব্যবহৃত করেছিলেন। সরকারি কাজকর্ম পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক পরিভাষা হিসাবে এটি প্রথমদিকে চালুছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারত সরকার আইন’ কার্যকরী হলে ‘অবদমিত শ্রেণি’ বা ‘Depressed Classes’ পরিভাষাটির পরিবর্তে ‘তপশিলিজাতি’ বা ‘Scheduled Caste’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়। এর প্রায় চার দশক পর ১৯৭২ সালে দলিত প্যান্থার আয়োজিত দলিত সাহিত্য সম্মেলনে ‘দলিত’ শব্দটিকে বৃহত্তর দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করলে পশ্চিম ভারত তথা মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক ও বর্ণবৈষম্য বিরোধী দলনেতা জ্যোতিবা ফুলে ‘দলিত’ পরিভাষাটিকে জনসমক্ষে ও লিখিত আকারে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্যকে নস্যাৎ করার জন্য তিনি নিম্ন জাতের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এই ধারার আন্দোলনকে প্রবল সহায়তা করেছিলেন। জ্যোতিবা ফুলে ‘মালি’ সম্প্রদায় তথা দলিতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অমানসিক অবমাননার শিকার হয়েছিলেন শৈশবে। যার ফলস্বরূপ, এইরূপ ঘৃণ্য সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দলিত আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তিনি। নির্মাণ

করেছিলেন নিম্নবর্গ শিশু ও নারীদের জন্য একাধিক সেবামূলক ট্রাস্ট, বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম। অর্থাৎ, বৃহত্তর অর্থে সমগ্র মহারাষ্ট্রের দলিতদের উন্নয়নে একজন রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'অস্মিতাদর্শ' পত্রিকার কর্ণধার মারাঠি পণ্ডিত গঙ্গাধর পান্তবানের মতে, দলিত কোন জাতি নয়। দলিত হল আন্দোলন বা বিপ্লবের প্রতীক। দলিত শব্দটি আইনত অবৈধ। এর দ্বারা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি মর্যাদার হানি ও অপমানার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে দলিত শ্রেণির মতে বিশেষত ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে দলিত শব্দই যথোপযুক্ত, এই শব্দের মধ্যেই দলিতের আত্ম-বেদনা ও আত্ম-কথা অধিকতর পরিস্ফুট হয়। আলোচ্য শব্দের মাধ্যমেই এই আন্দোলন সমগ্র ভারতে প্রসারিত হতে থাকে। আত্মোন্নতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক সোচ্চার বিপ্লবাত্মক বহিঃপ্রকাশ দলিত আন্দোলনের মূলমন্ত্র—যা সমাজ ও সংস্কৃতিতে দাবানলের মতো বৃদ্ধি পায় উত্তরোত্তর। প্রথমদিকে এই বিপ্লব কতিপয় সমাজ সংস্কারক তথা রামচন্দ্র, চৈতন্য, কবীর ও তুকারাস প্রমুখের উদ্যোগে ভক্তি আন্দোলনের পথ ধরে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির দাবিতে সোচ্চার হয়। শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম বিশেষে তাঁদের সমানাধিকার দাবিতে যাতে সম্মানিত করা যায় তার এক দৃষ্টিগত পর্যবেক্ষণ দলিত আন্দোলন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ'-এর কার্যকারিতা দলিত আন্দোলনের চালিকা শক্তিরূপে নেপথ্যে সুপ্ত অবস্থায় কাজ করে যায়। দয়ানন্দজী এখানে মূলত কর্মের ভিত্তিতে সমাজের স্তর নির্মাণের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শূদ্র যদি নিজ যোগ্যতায় ব্রাহ্মণের থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে সামাজিক অবস্থানে সে উচ্চ মর্যাদাধিকারী হতে পারেন। মানুষের পরিচয় তাঁর কর্মের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁর জন্মের আলোকে নয়। সুতরাং, উচ্চ-নীচ জাতি ভেদাভেদ তত্ত্বকে তীব্র অস্বীকার করে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পরোক্ষভাবে সমকালীন ব্রাহ্মণ অধিনস্থ জাতি তথা সাব-অল্টার্নকে সমগোত্রীয় মনে করেছেন।

দলিতদের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়ন থেকেই দলিত আন্দোলনের সূত্রপাত। দলিতের মুখেই দলিত যন্ত্রণা বিপ্লবের আকার নিয়েছিল মার্ক্সীয় ম্যানিফেস্টোর মতো। দলিতরাই তাঁদের জীবনের অসাম্যের কথা সাহিত্যের পাতায় উপস্থাপন করতে শুরু করেছিলেন সর্বপ্রথম। একজন দলিতই উপলব্ধি করতে পারেন দলিতের যন্ত্রণা। ইদানিং অ-দলিতেরাও দলিতের জীবন যুদ্ধের গল্প লিখছেন সাবলীলভাবে। মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে সর্বপ্রথম দলিত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর বি. আর. আম্বেদকরের 'মনুস্মৃতি' ধর্মগ্রন্থ পোড়ানোর মধ্য দিয়েই দলিত আন্দোলন সাহিত্যের স্তরে সর্বপ্রথম উন্নীত হতে থাকে। দলিত আন্দোলন ও সাহিত্যের পুরোধা আম্বেদকরের দৃষ্টিতে আকর্ষিত হয়ে মহারাষ্ট্রের দলিত সম্প্রদায়ের লেখনীতে দলিত কথা ও সাহিত্য অস্ফুট স্বরে প্রকাশ পায়। তারপর তা ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার দলিতেরা তাঁদের অচ্ছুত কলমে সৃষ্টি করলেন দলিতদের সমাজ বহিষ্কৃত নানাবিধ হৃদয়বিদ্ধ মর্ম-ব্যথা। সমাজের উচ্চ-বর্ণদের (ব্রাহ্মণ্যবাদ) আভিজাত্য ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে দলিত চেতনা ও মনের গূঢ় কথাকে উপস্থাপন করা দলিত সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। বিশ শতকের দু'য়ের দশক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত বাবাসাহেব আম্বেদকরের লেখনচর্চা, রাজনৈতিক নানা খসড়া ও বিভিন্ন সভা-সমিতি দ্বারা উদ্বেলিত হয়েছে দলিতের প্রধান সমস্যা ও চাহিদাগুলি। তিনি গ্রামীণ সাব-অল্টার্ন মানুষের সমানাধিকারের দাবি ব্রিটিশ সরকার থেকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকর্তাদের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রতীকি জীবন সর্বস্ববাদ মারাঠি দলিত সাহিত্যের লেখক দয়া

পাওয়ার, যশোবন্ত মনোহর, নামদেও ধাসাল, শরণকুমার লিম্বালে, বাবুরাও বাগুল ও অর্জুন ডাঙলে প্রমুখের লেখা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়ে এই ধারার সাহিত্য প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। কাজেই, দলিত সাহিত্য রাজনৈতিক পরিসর থেকে সাংস্কৃতিক স্তরে তাঁদের দাবি-দাওয়া ও ন্যায্য অধিকারকে বৌদ্ধিক চেতনায় উন্নীত করে— যা অনুবাদক মৃন্ময় প্রামাণিক ব্যক্ত করেছেন:

> "দলিত সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই নব্য বৌদ্ধ লেখকরা প্রচুর লেখালিখি করেছেন। পরবর্তীকালে এই সমস্ত নব্য বৌদ্ধ লেখকদের অন্য অনেক দলিত-উপজাতি, আদিবাসী সম্প্রদায়, যাযাবর গোষ্ঠী থেকে লেখকরা উঠে আসেন।"[৩]

মহাত্ত্বাদ্ ভারতবত্ত্বাম মহাভরতমুচ্যতে—যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে। এই উক্তির আলোকে মহর্ষি বেদব্যাস রচিত 'মহাভারত' মহাকাব্যে দলিত সম্প্রদায়ের জীবন যুদ্ধ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে দলিতের অবস্থান এবং মর্যাদার স্বীকৃতির এক ইতিহাসচর্চা করা হবে। আমাদের জ্ঞাত যে, মহাভারতের আদি পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য দলিত চরিত্র একলব্য। তিনি নিষাদ রাজ্যের ভিল অধিবাসী রাজা হিরণ্যধনু ও রানী বিশাখার একমাত্র পুত্র। ধনুর্বিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে সমপীত হন পরবর্তী বিদ্যালাভের জন্য। কিন্তু একলব্য নিষাদ রাজ্যের ব্যাধ তথা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় গুরু দ্রোণ তাঁকে অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে অসম্মত হন। এতদ্ সত্ত্বেও ধনুর্ধর হওয়ার প্রবল নেশায় এবং নিজ জাতিগত সম্মান রক্ষার্থে দ্রোণের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করে একলব্য বনমধ্যে একাকী যোগবলে অস্ত্রশিক্ষা শুরু করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর কুরু-পাণ্ডবের এক কুকুরের চিৎকারে মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হলে একলব্য বাণ দ্বারা তার মুখ বন্ধ করে দেন। এখানেই তাঁর উন্নত অস্ত্রশিক্ষার চরমতম নিদর্শন পাওয়া যায়:

> "না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
> অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা।।"[৪]

লক্ষণীয়, ধনুর্বিদ্যায় এইরূপ কৃতিত্ব দেখে কুরু-পাণ্ডবগণ ও গুরুদেব দ্রোণাচার্য প্রবল বিস্মৃত হন। তাঁরা অন্বেষণ করে জানতে পারেন, এই প্রবল পরাক্রান্ত ধনুর্ধারী হলেন নিষাদ শূদ্র একলব্য।

কুরু পাণ্ডবগণ বহুবিদ্যা অর্জন করলেও এরকম বিদ্যা না জানার জন্য চরম লজ্জিত হলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে দ্রোণ প্রিয় শিষ্য বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, **'তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।'**[৫] সেইসূত্রে, দ্রোণ একলব্যের কাছে যান এবং জানতে পারেন তাঁকে কাল্পনিক গুরু ধরে এরূপ বিদ্যা অর্জন করেছেন। ফলত, তিনি একলব্যকে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দাবি করলেন। তাই কোনরূপ দ্বিধা না করেই একলব্য নিজের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করে দ্রোণাচার্যকে উপহার দিলেন। এর ফলে প্রবল ধনুর্ধারী পরাক্রমী যোদ্ধা বৃদ্ধাঙ্গুলি হারিয়ে অর্জিত বিদ্যায় অকৃতকার্য হয়ে পরলেন। এতদিনের গভীর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে যে স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। যদিও তীরন্দাজদের কাজে বৃদ্ধাঙ্গুলির ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রিয়। প্রধানত, দক্ষিণ হস্তের তর্জনি ও মধ্যমার সাহায্যে বাণ ধনুকের জ্যাতে প্রতিস্থাপন ও নিক্ষেপ করেন তাঁরা। কিন্তু এসব ব্যতীত, একজন প্রান্তেয় বর্গের নিম্নজাতির মানুষ কোনভাবেই রাজবিদ্যা মূলত অস্ত্র চালনা করতে পারেন না। এটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল। নমঃশূদ্র একলব্য এইরূপ বিদ্যা আরোপ করে উচ্চজাতি ওরফে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের

তীব্র অপমান করেছেন। তাই একলব্যের প্রতি এহেন গুরু দ্রোণের দক্ষিণা যথার্থই ছিল। অন্যথায়, দ্রোণাচার্য ছিলেন কুরুবংশের নিয়োজিত অস্ত্রগুরু। তাঁর গুরুকুল নির্মাণও করে দিয়েছিলেন গঙ্গা পুত্র মহামহীম দেবব্রত ভীষ্ম। যার ফলস্বরূপ, এখানে কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারগণ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির গুরুকুলের অধীনে বিদ্যার্জন করার সুযোগ ছিল না। যেহেতু দ্রোণ কুরুবংশের পারিশ্রমিক প্রাপ্ত শিক্ষক, সেহেতু তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেও অন্য কাউকে শিক্ষাদান করতে পারতেন না। এই রকম নিয়োগ প্রথার জন্য দ্রোণাচার্য ছলনার আশ্রয়ে তাঁকে প্রত্যাখান করেছিলেন। সর্বোপরি বিচারে বলা যায়, দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণার মধ্যে অতীব নিষ্ঠুরতা দেখা গেলেও একলব্য ধনুক চালানোর প্রকৃত শিক্ষায় পেয়েছিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি হারিয়ে স্বাভাবিক কর্মে তাঁর কিছুটা অসুবিধে হওয়ার কারণে একলব্যকে প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিতে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

একলব্য ছিলেন নিষাদ রাজ্যের হিরণ্যধনুর পালিত পুত্র। হরিবংশ পুরাণ মতে, যাদব বসুদেবের ভাই দেবশ্রবার পুত্র অভয়। যার পোশাকি নাম অভিধন্যু। অর্থাৎ, যদুকুলের সর্বোৎকৃষ্ট রাজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রাজকুমার অভিধন্যু। কিন্তু তাঁর জন্মগ্রহণের সময় দৈববাণী হয় যে, যদু বংশের কোন বীর পুরুষের হাতে এই নবজাত রাজকুমারের মৃত্যু ঘটবে। এই ঘটনায় ভয়ার্ত হয়ে পিতা দেবশ্রবা পুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। নদীর স্রোতে ওই ভাসমান রাজকুমার মগধ বনে এক কাঁটার তারে আটকে যায়। ওই ক্ষণলগ্নে ভিলাধিবাসী রাজা হিরণ্যধন্যু জলে ভাসবান সন্তানকে উদ্ধার করে পুত্রজ্ঞানে লালন করতে থাকেন। তিনি এই পালিত পুত্রের নাম দেন একলব্য। মহাভারত থেকে জানা যায়, একলব্যের পালক পিতা হিরণ্যধনু ছিলেন। মহারাজা জরাসন্ধের সুযোগ্য প্রবল পরাক্রমী সেনাপতি ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, যদুবংশকে রক্ষা করতে মথুরা মহারাজ কংসকে হত্যা করেছিলেন নিজ ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ। এদিকে কংস ছিলেন মহারাজ জরাসন্ধের জামাতা। সেইসূত্রে শ্রীকৃষ্ণ বৃহত্তর অর্থে যদুকুল রাজা জরাসন্ধের জাতশত্রু। তাই চূড়ান্ত প্রতিশোধ স্পৃহায় শ্রীকৃষ্ণকে নিধন করতে সতেরো বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন জরাসন্ধ। 'হরিবংশ' পুরাণ থেকে জ্ঞাত, প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে পরবর্তীকালে বীর তীরন্দাজ একলব্য মগধরাজা জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে একাকী যাদবসেনার বিরাট অংশ ধ্বংস করেছিলেন। এতে একপ্রকার ভয় পেয়েই শ্রীকৃষ্ণ একলব্যকে নিধন করেছিলেন বলা যায়। সুতরাং, মহাভারত মহাকাব্যের একলব্য এক বিরলতম পৌরাণিক দলিত যোদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দলিতের বসবাস গ্রামের প্রান্তেয় স্থানে হওয়া উচিত, তাঁদের নাম উচ্চারণ করলে সমাজের অমঙ্গল হয়, তাঁরা কখনই সম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন না এবং তাঁদের কাজ হল সর্বদা অদলিতদের সেবা ও হুকুম মান্য করা— এহেন সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাঁদের উত্তরণই হল দলিত আন্দোলনের সারকথা। ভারতীয় পুরাণ থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা কালপর্বে দলিতদের দলন প্রক্রিয়া আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিভাত হলেও আম্বেদকর নির্মিত সংবিধানে তা লিখিত আকারে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলে মহাভারত মহাকাব্যে একলব্যের উপর অত্যাচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি সমাজ ও সংস্কৃতিতে জন্মের ভিত্তিতে নয় কর্মের ভিত্তিতে গুরুত্ব পেলে একজন উচ্চস্থানীয় পরাক্রমী যোদ্ধা হয়ে উঠতেন। সুতরাং, রামায়ণ মহাকাব্যের শম্বুক শূদ্র হয়ে বেদপাঠ করেছিলেন বলে তাঁকে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল যেমন; সেরূপভাবেই মহাভারতের একলব্যের প্রতি বিরূপ আচরণে আজও বিস্মিত হতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, ২০১৬, নবম মুদ্রণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ১০৮৯
২. মৃন্ময়, প্রামাণিক (অনুবাদক), এপ্রিল ২০১৭, প্রথম প্রকাশ, 'দলিত নন্দনতত্ত্ব' (শরণকুমার লিম্বালে), কলকাতা, তৃতীয় পরিসর, পৃ. ১৫৫
৩. তত্রৈব, পৃ. ৭৫
৪. বক্সী, পাঁচুগোপাল, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৮, 'মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চেতনা', কলকাতা, পুনশ্চ,পৃ. ১১৪
৫. তত্রৈব, পৃ. ১১৩।

প্রহসন রচনায় নাট্যকার মধুসূদন দত্তের সমালোচনা ও সাফল্য

জয়ন্ত মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আড়ষা কলেজ

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ নাট্যকার নাটক রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন কোনো না কোনো রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে। নাট্যকার মধুসূদন দত্ত তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর নাটক রচনার প্রধানতম কারণ ছিল বাংলা নাটকের দুরবস্থা। মধুসূদন দত্ত অল্প বয়সেই ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং ইংরেজিতে কবিতা লেখার যোগ্যতা অর্জনও করেছিলেন। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি ইংরেজিতে 'Rizia' নামক একটি ইংরেজি নাটক লিখেছিলেন। যদিও তাঁর এই নাটকটি ছাপানো হয়নি। মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ধীরে ধীরে বাংলা নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় কলকাতায় সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে কলকাতার পাইকপাড়ার নাট্যোৎসাহী জমিদার সিংহদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ করা 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখার জন্য মধুসূদন দত্ত আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে হতাশ হলেন এবং নিজেই বাংলা ভাষায় নাটক লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু উপাদান মধুসূদন দত্তকে মানসিক ভাবে শক্তিশালী করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যেমন আধুনিকতার দ্বারোদঘাটন করেন, তেমনি প্রকৃত পক্ষে তিনিই বাংলা নাট্য-সাহিত্যেও আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচনা করলেও প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করতে পারেননি। অবশ্য নাট্যমঞ্চের যুগে শুধু মধুসূদন দত্ত কেন, অন্য কোনো নাট্যকার সার্থক নাটক রচনা করতে পারেননি। তুলনা করলে দেখা যাবে, সেই যুগে যারা শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত ছিলেন অন্যতম। পূর্বসূরীদের মত তিনিও পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক প্রহসন রচনা করলেও তিনিই প্রথম বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সার্থক ঐতিহাসিকও নাটক রচনা করেন।

মধুসূদন দত্ত তাঁর সমগ্র নাট্য সাধনায় দুটি মাত্রই প্রহসন রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘারে রোঁ'। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দোষ ত্রুটি ছিল একথা স্বীকার্য কিন্তু তাঁর প্রহসন দুটি ছিল সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত সার্থক প্রহসন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে প্রথম দিকে যে কয়েকজন নাট্যকার প্রহসন রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যে মধুসূদন দত্ত অন্যতম ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি দুটোর বেশি প্রহসন রচনা করেননি। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র ও অমৃতলাল বসু প্রহসন রচনায় যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা বহু আগেই মধুসূদন দত্ত অর্জন করতে পারতেন। অবশ্য মধুসূদন দত্তের দুইয়ের বেশি প্রহসন রচনা না করার পিছনেও কিছু কারণ ছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি প্রহসন রচনা শুরু করলেও এক সময় তিনি প্রহসন রচনা করে নিজেই আক্ষেপ করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তখনকার যুবকসমাজের দোষ ও অনাচারকে তুলে ধরার ফলে যুবকসমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি পাইকপাড়ার জমিদারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে এক

সময় বাধ্য হয়েই পাইকপাড়ার রঙ্গমঞ্চে মধুসূদন দত্তের দুটো প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছিল। সেই সময় যদি যুবকসমাজ মধুসূদন দত্তের প্রহসনের বিরোধিতা না করত, তাঁকে নিরুৎসাহিত না করত, তাহলে হয়ত তিনি আরও প্রহসন রচনা করতেন। তিনি সমাজের দোষ ত্রুটিকে প্রহসনে তুলে ধরতে গিয়ে তৎকালীন সমাজের কাছে বহু সমালোচনা ও তিরস্কার লাভ করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত নিজের অনুশোচনার কারণেই হয়ত পরবর্তীকালে আর কোনো প্রহসন রচনায় নিজের মনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি দুটো প্রহসনে সমাজের যুবকসমাজ এবং রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে যেভাবে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরেছেন তা সকলের কাছে উপভোগ করার মত বিষয় ছিল। এই কারণেই মধুসূদন দত্ত নিজেই প্রহসন রচনা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

প্রহসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল স্থূল হাস্যরস ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক ভণ্ডামিকে প্রকাশ করা। প্রহসনে এলোমেলো কিছু ঘটনা থাকবে অর্থাৎ ঘটনাই প্রহসনের মূল বিষয়। আবার প্রহসনের চরিত্রগুলো হবে টাইপধর্মী। সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যদিয়ে জীবনের এক খণ্ডাংশকে প্রকাশ করতে হয়। তাই বলা যায়, প্রহসন রচনা করতে হলে সমকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় নিজেকে গড়েছিলেন। ফলে বাংলার সমাজ জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের অভাব ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাঁর প্রহসন দুটির সংলাপ শুনলে মনে হয় না বাংলার বাস্তব সমাজ জীবন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল। মধুসূদন দত্ত প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করেননি। তিনি নিজে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সদস্য হয়েও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে যেভাবে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কুপ্রভাব তুলে ধরেছেন এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কথা তেমনি সমান গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা সবসময়ে গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর থাকত সেই মধুসূদন দত্ত কত সুন্দর ভাবে লঘু ও সরল ভাষায় এমন দুটি প্রহসন রচনা করলেন যা বাংলা নাট্য-সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রহসন রূপে স্থানলাভ করেছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর প্রহসন দুটি সমকালে শুধুমাত্র বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ নয়, অন্য কোথাও অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। মধুসূদন বিরোধী তৎকালীন কলকাতার যুবকসমাজ রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাদের শাসিয়ে রেখেছিল। ফলে মধুসূদন দত্ত নিজেও অনুরোধ করেছিলেন যদি তাঁর নাটক বা প্রহসনে কারোর যদি সমস্যা থাকে তাহলে তাঁর নাটক বা প্রহসন যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হয়।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রহসন সংস্কৃত প্রহসনের কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠলেও হুবহু সংস্কৃত প্রহসনের অনুসরণে গড়ে ওঠেনি। আবার মধুসূদন দত্তের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে সকল প্রহসন রচিত হয়েছিল সেগুলোর ইংরেজি কমেডি বা ফার্স জাতীয় রচনার সঙ্গে এই সকল প্রহসন রচয়িতাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাও মনে হয়না। প্রাক্ মধুসূদন পর্বে বাংলা প্রহসনে সামাজিক সমস্যা বিশেষ প্রকট ছিল না। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা উপস্থাপন করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সামাজিক সমস্যা ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে তার উপস্থাপনা করে জাতীয় জীবনে নতুন ভাবনার সঞ্চার ঘটানোই ছিল প্রহসন রচয়িতাদের প্রধান লক্ষ্য। প্রাক্ মধুসূদন পর্বে বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রহসন ছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে আমন্ত্রিত মধুসূদন দত্ত রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে তিনি বাংলা নাটকের দুরবস্থার কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে নিজেই বাংলা ভাষায় নাটক রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', ও 'মায়াকানন', নামে যেমন চারটি

সার্থক নাটক রচনা করেন, তেমনি একই বছরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় প্রাচীন ও নবীন পন্থীদের মতবিরোধের সংঘর্ষ ভীষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল। একদিকে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর হিন্দুত্ব বিরোধী কার্যকলাপ এবং অপরদিকে রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজ, যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে অধার্মিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। মধুসূদন দত্ত শুধুমাত্র ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বা প্রাচীন পন্থীদের কথা বলতে চাননি। তিনি তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে যেমন নবীন পন্থীদের কালচারকে তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে প্রাচীন পন্থীদের রক্ষণশীলতার ভগ্নধ্বজাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রহসন দুটি যদি ভাগে ভাগে আলোচনা করা যায় তাহলে উপরিউক্ত বিষয় দুটি আমাদের কাছে আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের মধ্যে আদর্শ ও মতাদর্শ নিয়ে চরম বিরোধ ছিল। প্যাঁরিচাদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখেরা সেই সময়কালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। একদিকে রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকদের আধুনিক যুক্তিবাদ ছিল অত্যন্ত প্রকট। সেই সময় ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত বা পৈতা নিতে অস্বীকার করা, মুন্ডিত ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পন্ডিত দেখলেই তাদের বিরক্ত করতে 'আমরা গো-মাংস খাইগো' বলে চিৎকার করা, হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের সুরাপান করা, এবং মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ গ্রহণ ও জুয়াচুরীর মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়া প্রভৃতি ছিল নব্য সমাজের আদর্শ। স্বয়ং মধুসূদন দত্ত এক সময় এই দলের সদস্য ছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের মধ্যে তিনি হয়ত নিজেকেই তুলে ধরেছেন নবকুমার চরিত্রের মধ্যদিয়ে। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় এই প্রহসনে। তিনি নিজেও ছিলেন সেই 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর এক প্রধান প্রতিনিধি। নবকুমার চরিত্রের মধ্যদিয়ে তাঁর নিজের চরিত্রের আত্মতিরস্করণ ঘটেছে। এই প্রহসনে দেখা যায় প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সিক্‌দার পাড়ার গলিতে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কালীবাবু, নবকুমারদের আধুনিক চিন্তা ভাবনার বিপরীতে কতটা অসঙ্গতি রয়েছে তা সহজেই অনুভব করা যায় 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার' সভাপতি নবকুমারের একটি বক্তব্য থেকে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেছে –

> "নব। আচ্ছা; জেন্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেওয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখচেন,
> এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।
> সকলে। হিয়ার, হিয়ার।
> নব। জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বার—আমরা এখানে মীট কর্‌্যে যাতে জ্ঞান
> জন্মে তাই করে থাকি—এন্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।
> সকলে। হিয়ার, হিয়ার।
> নব। জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা

পুত্তলিকা দেখে হাঁটু দোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন
আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল-রিফর-মেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।
সকলে। হিয়ার, হিয়ার।
নব। জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ
দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংল্যান্ড সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ
নয়!
সকলে। হিয়ার, হিয়ার।
নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল
অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্
অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভস্।"[১]

নবকুমারের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল এক রকম কিন্তু ভিতরের ছবি ছিল অন্যরকম। সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানচর্চা, নারীদের স্বাধীনতা দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া, নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও বাস্তবে তার চিত্র ছিল বিপরীত। এই সভার ভিতরে মদপান করে নাচনীওয়ালী বা বাইজীদের নিয়ে আনন্দ করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। অনায়সে মিথ্যা বলা, নিজের পিতার সঠিক পরিচয় না দেওয়া ছিল এই নব্য যুবকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া গায়ে লাগলেই তারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে ইংরেজি ভাষাকে আপন করতে চেয়েছে। বিশেষ কাজ থাকায় সভায় আসতে নবকুমারের একটু দেড়ি হয়েছে। সভার সদস্য শিবু নবকুমারকে লাইয়র অর্থাৎ মিথ্যুক বললে তার উত্তরে নবকুমার চৈতনকে বলেছে –

> "ও আমাকে লাইয়র বললে—আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বলল না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।"[২]

নবকুমারের বন্ধু কালীবাবুর সঙ্গে নবকুমারের পিতার প্রথম পরিচয়ে কালীবাবুর যে উত্তর প্রদান তা অবশ্যই আমাদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করে। কালীবাবু কর্তামহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করার পূর্বে নবকুমারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছে।

"কালী। প্রণাম।
কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?
কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—
কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?
কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক বাপু। বসো। তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমারের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে। ... জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুণ--

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং হবে।...

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি। ...

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।”[৩]

এই প্রহসনে কর্তামশাই বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কর্তামশাই ফিরে না এলে একশ্রেণীর ভন্ড বৈষ্ণবদের ভন্ডামি বোঝা যেত না। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার পরিদর্শনে এসেছিল বাবাজী নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত। এই বাবাজীও উৎকোচ নিয়ে মিথ্যা কথা বলার প্রতিজ্ঞা করেছে। বারবিলাসিনীদের দৃষ্টিতে বাবাজী যেন তুলসীবনের বাঘ। একই সঙ্গে সারজন, চৌকিদার, মাতাল সকলের চরিত্র আমাদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়েছে। আবার দুজন শ্রমিক মুটিয়ার কথায় জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সদস্যদের চরিত্র আর পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মুটিয়াদের কথায় এই সভার সদস্যরা না মানে আল্লা না মানে দেবতা। নবকুমারের স্ত্রীর নাম হরকামিনী এবং ছোট বোনের নাম প্রসন্নময়ী। রাতের বেলা মদপান করে এসে নবকুমার তার বোনের গালে চুমু করেছে এবং স্ত্রী হরকামিনীকে পয়োধরী বলে সম্ভোধন করেছে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় দাঁড়িয়ে যে নবকুমার নারীশিক্ষার কথা প্রচার করে সেই নবকুমারের ঘরেই নিজের স্ত্রী ও বোনের শিক্ষার বিরোধিতা করেছে। মদ্যপ অবস্থায় নবকুমারকে বাড়িতে দেখে তার স্ত্রী হরকামিনী বলেছে –

> “ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই হে বিধাতা! তুমি আমার উপর এত বাম হলে কেন?... বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা পোড়া কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? –একেই কি বলে সভ্যতা?”[৪]

‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর প্রভাব পরোক্ষ ভাবে পড়েছে ‘জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা’র উপর। উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রকৃত মনোভাব যেমন অনুধাবন

করতে পেরেছিল তেমনি ভাবে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র সভাপতি নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনীও অনুভব করেছিল জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার বাতাস বাঙালির নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝড়ের বেগে বইতে শুরু করলে এই যুবক সম্প্রদায় নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে নতুন সংস্কৃতির বাতাসে উড়তে শুরু করে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে। নবকুমারের স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও মনে প্রাণে সে পাশ্চাত্য শিক্ষার কু-প্রভাব অনুভব করতে পেরেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলকথা মদ মাংস খেয়ে ঢলাঢলি করা ছিল না। পাশ্চাত্যের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নবজাগরণ ঘটানো। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সদস্যগণ মুখে মুখে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করলেও অভ্যন্তরে তারাই ছিল বিপরীত মুখি। নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হলে পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন সেই শ্রদ্ধাবোধ নবকুমার, কালীবাবু, চেতন- কারোর মধ্যেই ছিল না। নব্য যুবক সম্প্রদায় নতুন সংস্কৃতি গ্রহণের নামে যে এক অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল তারই পরিচয় পাওয়া যায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে। এই নাটকের চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও ঘটনাবলী ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার নব্য যুবক সম্প্রদায়ের পরোক্ষ ভাবে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনা। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' বাংলা নাট্য-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর সার্থক প্রহসন হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি আলোচনা করে নাট্যকারের কৃতিত্ব এবং প্রহসনের সার্থকতা আলোচনা করা যেতে পারে। মধুসূদন দত্ত একই বছরে দুটো প্রহসন রচনা করলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের উদ্দেশ্য ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরা এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের মূলে যে ভন্ডামি রয়েছে তাকে তুলে ধরা। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই নামকরণ করেছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। প্রহসন হিসেবে এর নামকরণ যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিষয়বস্তুও বিস্ময়কর ও হাস্যকর। এই প্রহসনটিও মাত্র দুই অঙ্কের দুই গর্ভাঙ্ক এবং মাত্র নয়টি চরিত্র বিশিষ্ট। এই প্রহসনটিতে মধুসূদন দত্ত তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতার মাঝে লুকিয়ে থাকা কুকীর্তিকে তুলে ধরেছেন। এখানে মধুসূদন দত্তের চরম উপহাস প্রকাশ পেয়েছে ভন্ড, প্রতারক ও অত্যাচারী ভক্তপ্রসাদবাবুকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে এই ভক্তপ্রসাদ। মধুসূদন দত্তের দুটি প্রহসন দুই শ্রেণীর মানুষের কাছে সমালোচিত হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির অভিনয় বন্ধ করার জন্য সেই সময় কলকাতার নব্য সমাজ যেমন তীব্র প্রতিবাদ করেছিল তেমনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিও প্রাচীন সমাজ দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধে মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় প্রহসনটির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে, মুসলমান রমণীর প্রতি ভক্তপ্রসাদের এমন আসক্তি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। তবে সেই সময় যে ভক্তপ্রসাদের মত চরিত্র আমাদের প্রাচীন সমাজে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর তাঁর 'মাইকেল মধুসুদনের জীবন-চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন-

> "মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ; সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্যব্রত ছিল।"[৫]

সেকালের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী পল্লীসমাজের ছবিকে তুলে ধরতে গিয়ে মধুসূদন দত্ত ভক্তপ্রসাদবাবুকে আবিষ্কার করেছেন। একদিকে ধর্মীয় ভাবনা, সাধারণ প্রজাকে শোষণ এবং অপরদিকে পরনারীর প্রতি লালসা ভক্তপ্রসাদকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে। একদিকে তিনি সচেতন জমিদার। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে তার কাছে যেমন এক পয়সাও ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয় তেমনি বিপদের দিনে কানাকড়ি সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়। অথচ সেই ভক্তপ্রসাদবাবু যখন কোনো সুন্দরী নারীর সন্ধান পান তখন সেই নারীকে কাছে পেতে তিনি বহু টাকা খরচ করতে পারেন। তিনি রাধা-কৃষ্ণের পরমভক্ত। তাই দেখা যায় কোনো সুন্দরী নারীর গন্ধ পেলেই বুড়ো বয়সে সাজপোশাক দ্বারা যুবক সাজার চেষ্টা করেন এবং কখনো কবি ভারতচন্দ্র আবার কখনো কবি রামপ্রসাদের কবিতার লাইন আবৃত্তি করতে থাকেন। হানিফ জমিদার ভক্তপ্রসাদের একজন দরিদ্র প্রজা। খাজনা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না হলেও অন্যপথে খাজনা পরিশোধ করার মত স্ত্রী ফতেমা রয়েছে তার ঘরে। ভক্তপ্রসাদ, গদাধর এবং হানিফ এই তিনজন চরিত্রের কথোপকথনের কিছুটা অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

> "হানি। আগ্যে কত্তা, এবার হার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ হয়েচেন।
> ভক্ত। তোদের ফসল হউক আর না হউক তাতে আমার কি বয়ে গেল।
> হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—
> ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্-- খাজনা দিবি কিনা।
> হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখানে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাব কনে। আমি
> এখনে বারোটি গোন্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।
> ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত নস রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে চাস্।
> গদা—
> গদা। আজ্ঞে এএএ।
> ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।
> গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।
> হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবে কনে? ...
> গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।
> ভক্ত। কেন?
> গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁরীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?
> ভক্ত। না।
> গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বলবো। বয়সে বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা।
> ভক্ত। (মালা শিঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?
> গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলচি? আপনি তাকে দেখতে চান তো বলুন।
> ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! স্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হল তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের
নিয়ে কেলি কত্যেন।
ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হ্যাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি?”[৬]

ভক্তপ্রসাদবাবুর নারীর প্রতি লোভ লালসাকে আরও বেশি তীব্র করে তুলেছে তার চাকর গদাধর। গদাধর নারীর খোঁজ দিয়েছে আর সেই নারীকে কাছে পেতে পুঁটিকে দূতীর কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু ভক্তপ্রসাদবাবুর যে ভন্ডামি তা প্রকাশ পেয়েছে তার ব্যক্তিগত আচরণে। গদাধরের মুখে হানিফের স্ত্রী ফতেমার রূপ গুণের কথা শুনেই পবিত্র জপমালাকে দ্রুত চালনা করেছে এবং একই বিষয়বোধক অব্যয়কে পরপর দুবার ব্যবহার করায় তার ভন্ড রূপটি আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইষ্টবাক্য উচ্চারণেও রয়েছে তার ভন্ডামী। যেকোনো কুকর্মের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বারবার উচ্চারণ করেন ‘রাধে হে, তোমার ইচ্ছা, প্রভু তুমিই সত্য, কখনো বা দীনবন্ধো! আবার কখনো হরিবোল, হরিবোল।

ভক্তপ্রসাদবাবুর যৌন চাহিদার কাছে জাতপাতের যেমন বিচার নেই, তেমনি সম্পর্কেরও কোনো মূল্য নেই। গ্রামের মেয়ে পাঞ্চী যার বিয়ে হয়েছে কৃষ্ণনগরের পাল বাড়িতে। মা ভগীর সঙ্গে কন্যা পাঞ্চী ঘাটে যাচ্ছিল জল আনতে। পাঞ্চীকে দেখা মাত্র ভক্তপ্রসাদবাবুর মনে যৌবন উঁকিঝুঁকি করতে থাকে। ভগীকে ‘বড় বউ’ বলে সম্ভোধন করেছেন এবং পাঞ্চীর সঙ্গে কথা বলার অজুহাত খুঁজছেন। পাঞ্চীকে কাছে ডাকলে ভগী তার মেয়েকে বলেছে ‘যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর। বাবু যে তোর জেঠা হন’।

“ভক্ত। ... বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাকবে।
ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।
ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন—আমি কি আর এক
মাসে একটা তেলির মেয়েকে বশ করতে পারবো না? (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা।”[৭]

ফতেমার শরীরকে ভোগ করার জন্য দূতি পুঁটির মাধ্যমে পঞ্চাশ টাকায় চুক্তি হয়েছে। নিজের রাইওত প্রজাদের যেখানে এক কড়িও খাজনা ছাড়তে রাজি নন সেখানে পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে রাজি হয়েছেন। পঞ্চানন বাচস্পতি ভক্তপ্রসাদকে ‘কলিদেব’ বলেও ব্যঙ্গ করেছে। সাঁঝের বেলা ভক্তপ্রসাদবাবু ফতেমার জন্য অভিসারে যাবেন বলে সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। বৈঠকখানায় বসে ভক্তপ্রসাদবাবু আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

‘ভক্ত। (স্বগত) আঃ ! বেলাটা কি আজ ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়িকে
পাওয়া দুষ্কর! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্‌্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার
হস্তে পরাভূত হলেন। যা হউক, একন যে হানিফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী
দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবন মদে একবারে যেন ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা!

(চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) ইঃ ! এখন ও না হবে তো প্রায় দুই দিন দন্ডবেলা আছে। কি উৎপাত।”[৮]

মধুসূদন দত্ত এই প্রহসনে ‘ভগ্ন মন্দির’ উল্লেখের মধ্যদিয়ে তৎকালীন সমাজে ধর্মের নামে যে প্রতারণা চলছিল হয়ত তার পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। অথবা এই ‘ভগ্ন মন্দির’-কে ব্যবহার করা হয়েছে প্রহসনকে ব্যঞ্জনাধর্মী ও প্রতীকময় করে তোলার জন্য। ভগ্ন শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর অর্থ হল সামাজিক অপরাধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। আবার এই ভগ্ন মন্দিরের পাশেই যেন শিব রূপে হানিফের আবির্ভাব ঘটেছে সামাজিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে। ভক্তপ্রসাদবাবু দিনরাত ধর্মীয় বুলি উচ্চারণ করলেও তিনি ছিলেন একজন শোষণকারী। মুসলিম প্রজাদের উপর ভক্তপ্রসাদের শোষণ ও ঘৃণা খুব বেশি হলেও ফতেমার শরীর উপভোগ করতে তার কোনো সমস্যা নেই। শুধু তাই নয়, যিনি সারাদিন রাধা ও কৃষ্ণ নাম জপ করেন তিনিই আবার একজন মুসলিম নারীকে নিয়ে ভগ্ন মন্দিরের ভিতরে যেতেও রাজি হয়েছেন। তৎকালীন সমাজের ভন্ড ও প্রতারকদের এমন ভাবে ব্যঙ্গ পূর্বে আর কেউ করতে সাহস পাননি, যা মধুসূদন দত্ত করেছেন। পুঁটি আর ফতেমা অনেক সময় ধরেই ভগ্ন মন্দিরের পাশে সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভক্তপ্রসাদবাবুর জন্য অপেক্ষা করছে। ভক্তপ্রসাদবাবু যখন এসে পৌঁছালেন তখন ফতেমার স্বামী হানিফ ও পঞ্চানন বাচস্পতি এসে উপস্থিত হয়েছে ভগ্ন মন্দিরের পাশেই। ভক্তপ্রসাদবাবু যে মুহূর্তে কুকর্ম করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই বাচস্পতি ও হানিফ এসে উপস্থিত হল। ফতেমা পালিয়ে গেলেও হানিফ কিন্তু ভক্তপ্রসাদবাবুকে ব্যঙ্গবানে জর্জরিত করেছে।

“হানিফ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস কল্লাম তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরের দিকি
পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়েছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জানতি
পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপনারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তার এর জন্যি
আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

“ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলাম,
তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি,
কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি।

হানিফ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্‌ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্‌ সেই নেড়্যে হতি বসেছেন, এর
চায়ে খুশির কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্বনাশ! বলিস্‌ কি হানিফ?... আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এই
নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা যে এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখনও না ঘটে।”[৯]

উনিশ শতকের বাংলায় যে সকল রক্ষণশীল সমাজের ধারক ও বাহকরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তিনি মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটির বিরোধিতা করে বলেছিলেন – গোঁড়া হিন্দুরা নানা রকম অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও নিজেদের জাত নষ্ট করে কখনও মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তেমন কোনও কুকর্ম করেনি। তাঁর এই নিন্দা বা সমালোচনা যুক্তি বা প্রমাণের জন্য নয়, রক্ষণশীলতার জন্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, প্যাঁরীচাদ মিত্র ও আরও অনেকে তৎকালীন বাঙালি সমাজের যে সকল তথ্য নানা লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছিলেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি রচনা করে অন্যায় কিছু করেননি। তিনি তো শুধুমাত্র সমাজের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন। প্রহসন দুটি রচনার প্রথমদিকে যদি মধুসূদন দত্তের বিরোধিতা না করা হত, তাহলে হয়ত মধুসূদন দত্তের লেখনীতে আমরা আরও কিছু শ্রেষ্ঠ প্রহসন পেতাম। তাঁর প্রহসন রচনার ইচ্ছাকে শুরুতেই যেন গলা টিপে মেরে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নাটক রচনা শুরু করেছিলেন বাংলা নাটকের দুরবস্থা দেখে। ফলে সেই সময় তাঁকে উৎসাহ দেওয়ার চেয়ে তাঁর বিরোধিতা ও সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর নাট্যের সৃষ্টি শিল্পকে আর বেশিদূর এগোতে দেওয়া হয়নি। তবে আনন্দের বিষয় হল, তাঁর প্রহসন দুটি সেযুগে যতবেশি সমালোচিত হয়েছিল এযুগে ততবেশিই যেন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। শুধু সেযুগেই নয়, এযুগেও মধুসূদন দত্তের মত এমন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় আর কোনও নাট্যকার এমন প্রহসন রচনা করতে পারেননি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি যেমন বাংলা নাট্যসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রহসন রূপে স্থানলাভ করে আছে তেমনি মধুসূদন দত্তও বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রহসন রচয়িতার খেতাব লাভ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. একেই কি বলে সভ্যতা, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯।
২. তদেব। পৃষ্ঠা – ১১৮।
৩. তদেব। পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯।
৪. তদেব। পৃষ্ঠা ১১৫।
৫. মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত, পৃষ্ঠা ৩০৪।
৬. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পৃষ্ঠা ১২৮।
৭. তদেব। পৃষ্ঠা ১৩২।
৮. তদেব। পৃষ্ঠা ১৩৭।
৯. তদেব। পৃষ্ঠা ১৪৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গুপ্ত, ড. ক্ষেত্র, সম্পাদনা, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়েরোঁ, সাহিত্যসঙ্গী পাবলিকেশন, চতুর্থসংস্করণ- জানুয়ারি ২০১৯।
২. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি পাবলিকেশন, জানুয়ারি – ২০১৪।
৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি – ২০০৫।
৪. সেনগুপ্ত, ড. নীতিশ, বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশার্স, মার্চ – ২০০৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ –১৯৬৬।
৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ্ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – ১৯০৪।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ : নকশাল রাজনীতির এক অনন্য দলিল

হাসানুর জামান মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রাজনীতি হল রাজার নীতি এবং সেই রাজনীতি যখন তার সেই নীতি পরিবর্তন করে ক্ষমতা দখলের নীতিতে পরিণত হয়েছে, তখন সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন সমাজের নানান স্তরের বহু বিশিষ্ট মানুষজন। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যাওয়ার সূত্রে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জন করেছেন নানান অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে এবং মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান-পতনের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। কৈশোর-যৌবনের একটা অংশে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই সূত্রে তিনি তিন বছর জেলও খেটেছিলেন। আবার রাজনীতির সেই নানান অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে সাহিত্যের ভূমিতে প্রবেশ করিয়েছিল। রাজনীতির মাঠে-ময়দানের বিপ্লব তখন খাতায়-কলমের বিপ্লবে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের নানান অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে শুধু নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজনীতি নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে নব্বই দশকের রাজনীতি কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন তথা রাজনীতির প্রসঙ্গও তিনি তুলে এনেছেন তাঁর সাহিত্যে। সামগ্রিকভাবে আমরা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক পটভূমিকে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করতে পারি। প্রথম পর্বে প্রতিফলিত নকশালবাদী আন্দোলনের রাজনীতির প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্বে নকশালবাদী পরবর্তী দুটি কিংবা তিনটি দশকের রাজনীতির প্রসঙ্গ অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বের রাজনীতির প্রসঙ্গ আর তৃতীয় পর্বে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের ২০০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় পর্বের রাজনীতির নগ্নচিত্র। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই রাজনীতির নানান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘কমুনিস’ উপন্যাসটি। উপন্যাসটিতে নকশাল রাজনীতির নানান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সূচক শব্দ: রাজনীতি, বিপ্লব, নকশাল, আন্দোলন, সংগ্রাম।

মূল প্রবন্ধ:

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম উপন্যাস হল ‘কমুনিস’ (১৯৭৩-১৯৭৪), নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ছাপ এই উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে। সত্তর দশকে যুবক-যুবতীরা কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করেই কীভাবে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল তা এই উপন্যাসের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। মাঝেমধ্যে ফ্ল্যাশব্যাকের ধরনে পুরনো কথা উঠে এলেও উপন্যাসটিতে আখ্যানের গতি সামনের দিকে প্রবাহিত। সময়ের ক্রম মেনে এগিয়ে চলেছে ঘটনা পরম্পরা। কাহিনির কথক প্রথম পুরুষে বর্ণনা করলেও একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র আছে, তার নাম গোরা। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত সত্তর দশকের তরুণ-তরুণীদের কয়েকটি মাত্র দিনের ঘটনাবহুলতা পাঠককে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা যেন অন্য ধাতুতে গড়া। তার বাবা

সরকারি চিকিৎসক, এক সময় ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ফলত দেশের স্বাধীনতা নিয়ে তার কিছুটা গর্বও ছিল। কিন্তু গোরা ছিল অন্য পথের পথিক, সে বিশ্বাস করত 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' —তাই সে বাবার সঙ্গে তর্ক করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসে রাজনীতিতে যোগ দেয়। আর ওই সময় পর্বেই শুরু হয় একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম— "বাবুর বন্ধুকে যখন পেছন থেকে সিপিএম রড মারল, আর ওদের চটপটে পঞ্চুকে ভোঁতা একটা কাটারি দিয়ে থেঁতলে ঘাড়ের মজ্জা ছাড়িয়ে দিল বাবু, তখন থেকেই রাস্তা বড় পিছলা হয়ে আছে। আর যত শত্রু বাড়ছে রক্তের উষ্ণতাও বাড়ছে তত।"[১] এইরকম এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে শুধু গোরা নয়— সোনা, সুকু, বীরু, মন্টু, নারায়ণের মতো একদল তরুণ যুবক তারুণ্যের দৃপ্ত তেজে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজকে পাল্টানোর স্বপ্ন নিয়ে যোগ দেয় নকশাল রাজনীতিতে। বিপ্লবের নেশা তাদের পেয়ে বসে। প্রথম প্রথম বাড়ির লোকেরা আশঙ্কায় দিন কাটালেও পরবর্তীকালে তারা বাধ্য হয়েই ঈশ্বরের নামে তাদের সঁপে দেয়। অবশ্য যুবক দলের ওই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

নকশাল রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তারা বুঝতে পারে যে— "মেন রাস্তা ধরে চলা আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফে বাতিল, নর্দমা, গলি, পাঁচিল আর রেললাইন আসা-যাওয়া চলাফেরার লাইন।"[২] গোপনীয়তার নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশল তারা আয়ত্ত করে। তবে তারা বিপদে-আপদে গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর কথা কখনো ভুলে যায় না। গোরা তার সঙ্গী বন্ধুদের বলেছে, "একটা জিনিস মনে রাখিস— আদর্শ-ফাদর্শের চেয়ে মানুষটাই বড় কথা।"[৩] কিন্তু তাদের রাজনীতির সঙ্গে ভোটের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই ওই সময়ে ভোটকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলির (সিপিএম, কংগ্রেস) সঙ্গে তাদের অবিরত সংঘর্ষ বেধে যেত। তাছাড়া প্রথাগত সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিও তাদের কোনো আস্থা ছিল না। সরকার তথা প্রশাসনও ছিল তাদের বিপক্ষে। ফলত নকশালদের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দল এবং সরকার তথা প্রশাসনের সংঘর্ষ শুরু হয়। সংশোধনবাদ ছিল তাদের প্রধান শত্রু। তখন সংশোধনবাদী বলতে বোঝানো হতো নকশালবাদী ছাড়া অন্য বামপন্থীদের; যাদের সম্পর্কে তাদের ভাবনা ছিল— "ওটা মজদুরের পার্টি নয়, দুনিয়ার ধান্দাবাজের আড্ডা।"[৪] ফলত সেই সময় সমাজ পরিবেশ হয়ে উঠেছিল যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে হত্যার বদলে হত্যা, রক্তের বিনিময়ে রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে গোরাদের পথ যেন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় তারা একপ্রকার আত্মগোপন করে থেকে রাতের বেলায় তাদের সমস্ত কাজকর্ম করত। যতদিন যাচ্ছিল সবকিছু ততই তাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সরকার মওকা বুঝে তাদের পেছনে খোঁচর লেলিয়ে দিয়েছিল। এই সময় সোনা বলেছিল, মার্কস-লেলিনের তত্ত্বকথায় তার কাজ নেই— "তার চেয়ে বাবা আমাকে বল গার্ড দিতে, পুলিশের ঘেরাও ভাঙতে, আগুনের ফুলকি ছোটাতে সোনা এক পায়ে রাজি।"[৫]

শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার লড়াইও সোনাদের এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ফলে কাজ হারানো একদল কর্মহীন শ্রমিক যুবকও যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। এই রকমই এক কর্মহীন যুবক নিবারণ বলেছে— "কাশীবাবুর কারখানা তো শালা আমার চোখের সামনে বড় হল। একেবারে শুরুর দিকে তো ছিলুম মোটে আমরা তিনজন। ঢালাইয়ের কাজ হতো। আর একটা লেদ ছিল। কাশীবাবু চিনে পাড়ায় এক মাগির সাথে থাকত তখন। ঘর থেকে আর একটা কানাকড়িও ঢালেনি। শুয়োরের মতো খেটে তবে তিনটে শেড হল। আর এখন শালা আমাকেই লাথ মারল। বুঝলে গোরাদা কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেব। দেখো ঠিক, লাগাব, শালা কারও মানা শুনব না।"[৬] এইভাবে রাজনীতি করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তাদের পুলিশের সঙ্গে, খোঁচরদের

সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে তাদের অনেকেরই বেঘোরে প্রাণ চলে গেছে। গোরার সঙ্গী সোনা খুন হয়ে যায়। সোনা খুন হওয়ার প্রতিবাদে নকশালদের পক্ষ থেকে বেলেঘাটা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। যে দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে 'অজ্ঞাতবাস' অংশে ঔপন্যাসিক বলছেন— "তরতাজা একটা জানের শোকে বেলিয়াহাট্টায় রাত্তির। সত্তরের বেলেঘাটা। বারুদের গন্ধ বুকে নিয়ে চোখের ডিম নখ বিঁধিয়ে পড়ে আছে।"[৭]

সোনা খুন হওয়ার পর সাময়িকভাবে গোরা ভেঙে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই শোককে সে শক্তিতে পরিণত করে সংকল্প গ্রহণ করে যে— কমরেড হত্যার বদলা চাই, চাই অ্যাকশন। আর তখনই তার নারায়ণদার কথা মনে পড়ে। সে ভাবে যদি তারা নারায়ণদার সঙ্গ পেত তাহলে ভরসা পেত। এই নারায়ণদাই বলেছিল— "কমিউনিস্ট হওয়া অত সস্তা নয়...আমার মা বলত, 'মরে নারী ওড়ে ছাই, তয় নারীর কলঙ্ক নাই'...আমাদের হল সেই হাল। জিন্দেগিভর যে মজুরের লড়াইকে ইমানদারির সাথে সাথ দিতে পারে, সে বেটা কমিউনিস্ট।"[৮]

সোনার খুন হওয়ার ঘটনায় তাকে কেন্দ্র করে প্রচ্ছন্ন রাজনীতিকরণের দিকটাও উঠে আসে এবং সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়। সোনার খুনের খবর সংবাদপত্রে এভাবে ছাপা হয়— "পুলিশের সহিত সংঘর্ষে সোনা নামক যুবক নিহত...যুবকের নিকট রেডবুক...। আর রিভলভার। আর আপত্তিকর কাগজপত্র আসলে যেন সব আগে থাকতেই কম্পোজ করা থাকে। শুধু যুবকের নামটা পালটায়। আর গোটা বাংলাদেশের আবাগি মা, হতভাগা, বেকার, দামাল ছেলেটার নাম খোঁজে ছাপার লাইনে।"[৯] রাজনীতির সেই উত্তাল সময়ে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের পরিবর্তে যে একটা সুপ্ত রাজনৈতিক বার্তাবহ সংবাদই পরিবেশিত হত তা বারবার এখানে উঠে এসেছে। সেই সাথে সত্তর দশকের খুন হত্যার ঘটনা যে রোজকার সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল সেটাও উঠে এসেছে।

গোরার দলের মতো অসংখ্য নকশালপন্থী তরুণরা সেদিন বিপ্লব সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল এবং ভেবেছিল বিপ্লব সফল হলে কলকাতার ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। গোটা দেশ উজাড় করে মানুষের ঢল নামবে সেই ময়দানে। রক্তের ফোঁটার মতো পতাকা গর্বে, আনন্দে, অহংকারে পত পত করে উড়তে থাকবে, মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি। বিপ্লব সফল হওয়ার পরিবর্তে— "ক্রমে সেই রস জারিয়ে, হাভাতে মানুষের হাড্ডি থেকে জ্বালা নিংড়ে এখন একটু থির হতে পারছে না। এখন তারকাটা দিয়ে এক-একটা পাড়ার গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ফাঁস লটকে দেয়। এখন গ্যাসপোস্টের তলায় জোয়ান রক্তের উষ্ণবান। এখন শোক রাগ আর জ্বালা।"[১০] এই প্রেক্ষাপটে দলের নীচুতলার কর্মীরা পার্টির নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। একসময় আসে পার্টির নির্দেশ। পার্টির লোকাল কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এ বি বা অশোক বসু শোনায় দলের সেই নির্দেশ— "অ্যাকশন হল পার্টি-লাইন না মানলে পার্টি ছাড়তে হবে। ক্ষতির হিসেব করলে চলবে না, সিনা টান করে সামনে হাঁটতে হবে। আর প্রতিক্রিয়ার আঘাতের ভয় ডরে যদি দাঁত কপাটি লাগে তাহলে রাস্তা দেখতে হবে। দুসরা রাস্তা।"[১১] এরপর শুরু হয়ে যায় অ্যাকশন। গোরার দল আওয়াজ ওঠাতে লাগল; স্লোগানে স্লোগানে আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। তাদের শরীরে এল ভয়ংকর জোশ। এমন সময়— "হঠাৎ মাল পড়ল। গোরার মাথায় রডের বাড়ি। আর চিৎকার। পুতলিকলের সিকিউরিটি ফোর্সের ফাঁকা গুলি। বুড়ো শিবতলায় কংগ্রেসি মস্তানরা লক্কর নিয়ে ছুটছে: মার শালা খানকির ছেলেদের। আর পুলিশ। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্তর।"[১২] সত্তরের সেই উত্তাল প্রহরে— "ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়/দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ।"[১৩] নকশাল আন্দোলনের সময় স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সময় পেরিয়ে দারিদ্র্য ও সামাজিক

বৈষম্য রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার প্রভাব পড়েছে আখ্যানেও।

পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যে এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিল সেটাও ঔপন্যাসিক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আধফোটা প্রেমের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে মিনু আর শান্তা বিপ্লবের কাজে জড়িয়ে পড়েছিল ভিন্নভাবে। মিনু প্রেমিকের মৃত্যুর অসহনীয় জ্বালায় অধৈর্য হয়ে প্রতিহিংসার বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, শান্তা নিজে ধৈর্যশীল হয়ে নিজের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে মেয়েদের নিয়ে মিছিল সংগঠনের চেষ্টা করে। আর থাকে মিনতি বৌদি— যে কিনা হিংস্র পুলিশ আর গুণ্ডাদের আক্রমণের হাত থেকে ছেলেগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করে। এছাড়া রয়েছে বেলা বৌদি। সে হয়তো অনেক কথাই বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে, "ওরা আগাপাছতলা পালটাতে চায়। মন্ত্রিটন্ত্রি বদল নয়। এক্কেবারে শেকড়সুদ্ধু টান। একেবারে উলটে দিতে চায়।"[১৪] এইসব স্বপ্নের কথা শুনে তার মনের মধ্যেও শুরু হয়ে যায় তোলপাড়। তাই সে টাকা পয়সা কিংবা নিজের সংসারের পরিবর্তে ওই ছেলেগুলিকে নিয়ে ভাবে।

'কমুনিস' উপন্যাসে দরিদ্র, ভুখমারা, অভাবগ্রস্ত, নিম্নবর্গের মানুষদের কথাও রয়েছে। ভুখমারা সমাজের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন— "অথচ, ভুখমারা ভারতবর্ষের বেলেঘাটায়, বেলেঘাটার লোনা দেওয়ালে এখনও জ্বল জ্বল করে মাওয়ের স্টেনসিলের ছাপ: নিপীড়ন হলে প্রতিবাদ হবে। পেটোর গহেরা দাগ বুকে নিয়ে পড়ে আছে ভিআইপি রোড। বেলেঘাটার বুড়ি ছুঁয়ে। বিদেশ থেকে হত্তাকত্তা ওই রাস্তা দিয়ে ফুঁস করে চলে যায়। নীলা চোখে বেলেঘাটার উপর নজর বুলিয়ে।"[১৫] কিছুটা হয়তো আলাদা কিন্তু ওই চিত্র এখনও বর্তমান। বেলেঘাটা নাম পালটে আজ তা রাজারহাট কিংবা ভাঙড় কিংবা আমলাশোল। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলেও একসময় রক্তাক্ত পথে তা থমকে যায়। ঔপন্যাসিক বলছেন, "অ্যাকশন। সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রাম। ফুলঝুরির মতো আতশবাজির মতো। সংগ্রাম ফেটে পড়েছিল গ্রামগঞ্জ এবং আজব কলকাতা শহরে। অ্যাকশনের ফোয়ার ছুটেছিল ফিনকি দিয়ে। যদিও ভাঁটার মরা চাঁদ জোয়ারের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে এখন। এখন বাতাসে আগুন উস্কানো গ্যাসের অভাব। এখন বাছা বাছা কমরেডের লাশ হাত-পা বিছিয়ে দিচ্ছে শক্ত মাটিতে। জেলের পাঁচিলটা প্রকৃতি বিজ্ঞানে পড়া কলসপত্রী গাছের মতো গন্ধ শুঁকে এক-একটা জোয়ান ছেলে টেনে নিচ্ছে পেটের ভেতর।"[১৬] তবে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি থেকে তারা সরে আসে। তারা সমাজকে— সমাজের গরিব, দরিদ্র, শ্রমিক মজুরদের জীবনযাত্রার মানকে বদলাতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, '১৯৭০', 'কমুনিস', চর্চাপদ, ২০১৪, পৃ. ৩৪
২. তদেব, পৃ. ৩৬
৩. তদেব, পৃ. ৪০
৪. তদেব, পৃ. ৪৬
৫. তদেব, পৃ. ৫৫
৬. তদেব, পৃ. ৫৯
৭. তদেব, পৃ. ৭০
৮. তদেব, পৃ. ১০৫

৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৮২
১১. তদেব, পৃ. ৯০
১২. তদেব, পৃ. ৯১
১৩. ঘোষ, শঙ্খ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'তিমির বিষয়ে দু টুকরো', দে'জ, দশম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ৮৮
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, '১৯৭০', 'কমুনিস', চর্চাপদ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১০২
১৫. তদেব, পৃ. ১৬১
১৬. তদেব, পৃ. ১৫২।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও দলিতদের সামাজিক অবস্থান : মহাশ্বেতা দেবীর 'ক্ষুধা'

আকাশলীনা ঢোল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
কৌষেয়ী ব্যানার্জি
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্য জগতের একজন অন্যতম মহিলা ঔপন্যাসিক হলেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। তাঁর উপন্যাসের পরিসরে দলিত-আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে বারবার। 'ক্ষুধা' (১৯৯২) উপন্যাসটি সেইরকমই একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একদিকে দলিত সমাজের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার দিকগুলি তুলে ধরতে যেমন সচেষ্ট হয়েছেন, তেমনই তাদের ওপর শোষক-শ্রেণির অত্যাচারের দিকটিও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। কুনারী, কোসিলা এরা সকলেই সেই দলিত সমাজের প্রতিনিধি। তাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক বর্ণনার মধ্যে দিয়েই ঔপন্যাসিক সমাজে তাদের অবস্থানটা যেন স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এই সকল মানুষগুলি যেমন বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তেমনই কখনও কখনও দেখা গিয়েছে তাদের প্রতিবাদে সামিল হতে। তাদের আন্দোলন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু এই আন্দোলন, প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রেরণা দিয়েছে আপামর জনসাধারণকে। সাহিত্য মূলত চিরকালীন হয়ে থাকে, এই উপন্যাসের কাহিনিও কোনও নির্দিষ্ট সময়পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমাজের একটি চিরকালীন সমস্যাকেই তুলে ধরার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।
সূচক শব্দ: দলিত, প্রতিবন্ধকতা, দুর্দশা, শিকার, আত্মত্যাগ, আন্দোলন।

মূল আলোচনা:
বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য জগতের একজন অন্যতম মহিলা ঔপন্যাসিক হলেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। লেখিকা তাঁর সাহিত্যিক জীবনে বহু উপন্যাস, ছোটগল্প উপহার দিয়ে গিয়েছেন পাঠক সমাজকে। তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন উঠে আসে সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা, অপরদিকে তেমনি উঠে আসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্র। মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনা করার সময় দলিত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বাংলার লোধা, শবর, আদিবাসী দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং নিজেও আদিবাসী ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেইকারণেই হয়তো, তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসে উঠে আসে আদিবাসী, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল নয়, যাদের সহজ-সরল জীবনের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ হানে শোষক শ্রেণি, যাদের জীবন-জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে যায় সুবিধাবাদী দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে। যুগ যুগ ধরে নিপীড়নের শিকার হয় তারা। সেইরকমই একটি উপন্যাস হল 'ক্ষুধা' (১৯৯২), যে উপন্যাসটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। এখন প্রশ্ন হল, এই

সকল দলিত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ কী? জীবনে চলার পথে তারা কী ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়? তাদের সামাজিক অবস্থাই বা কেমন? এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথের সন্ধান কি তারা পায়? বিষয়গুলি আলোচনার অবকাশ রাখে।

আলোচনার মূল পর্বে প্রবেশ করার আগে আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। 'ক্ষুধা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে দলিত সম্প্রদায়ের ওপর উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রত্যক্ষ অত্যাচারের দৃশ্য। পালামৌ অঞ্চলের কুনারী ভুঁইন নামের একটি আদিবাসী মেয়ের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে গিয়েছে পরিণতির দিকে। কুনারী এসেছিল জঙ্গলে মৌয়া কুড়োতে, আর তখনই সে জমিদার কৌয়ারের লালসার শিকার হয়। কুনারী তার হাতে কার্যত শ্লীলতাহানির শিকার হয় এবং কৌয়ার তাকে বাঘের খাঁচায় রেখে বাঘকে খাওয়ায়। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর, অনেক বিদ্রোহ, আন্দোলনে সামিল হয় পালামৌ-এর এই দলিত মানুষগুলো, কিন্তু কৌয়ারের মনে জেগে থাকে নিম্নবর্ণের নারীমাংসের জন্য এক প্রবল পাশবিক ক্ষুধা। আর এই ক্ষুধার কারণেই তার জীবনের পরিণতিও হয় নির্মম।

এই উপন্যাসে রয়েছে পালামৌ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন-যন্ত্রণার চিত্র। সেই অঞ্চলের জমিদার কৌয়ার ক্ষুধিত, নীচু জাতের নারীমাংসের জন্য। জঙ্গলের মধ্যে মৌয়া কুড়োতে এসে অনেক নারীকেই হতে হয়েছে তার লালসার শিকার। কিন্তু, কুনারী ভুঁইনকে হত্যা করার পরেই পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করে। প্রতিবাদে সোচ্চার হতে থাকে আদিবাসীরা। শুধুমাত্র, নারী-নির্যাতনই নয়, নিরক্ষর দলিত এই মানুষগুলিকে ঋণের জালেও বিভিন্নভাবে জর্জরিত করত জমিদারের লোকজন। একবার কোনও কারণে ঋণ নিয়ে ফেললে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম হয়ে যেত জমিদারের ক্রীতদাস। এইসব কারণে বহুদিন ধরেই আদিবাসীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল, অবশেষে তারা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার সহ্য করার পর আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় টাটাতে। সেখানে এক সাংবাদিক তাদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করে সংবাদপত্রে। সেইসঙ্গে তুলে ধরে কৌয়ারের অত্যাচারের বিভিন্ন দিকও। সংবাদপত্রে কৌয়ারকে 'আদমখোর' অর্থাৎ মানুষখেকো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কৌয়ার মানুষ, বাচ্চা, মহিলাদের মেরে বাঘকে খাওয়ায়, কামিয়া মেয়েদের ইজ্জত নেয়, স্কুল, হাসপাতাল কিছু গড়তে দেয় না, পুলিশ ঢুকতে দেয় না জমিদারীতে, এমনকি সরকারি জঙ্গলের গাছ কেটে বিক্রি করে আদিবাসীদের ভাতে মারার ব্যবস্থাও করে। এইসব খবর সাংবাদিককে জানিয়েছে কৌয়ারের কাছে কর্মরত একজন কামিয়া, বরজু। কারণ সে নিজেও দলিত এবং অত্যাচারিত শ্রেণিরই মানুষ। কিন্তু, কৌয়ারের স্বভাব খুবই হিংস্র, তার দাসমজুররা তার বিরুদ্ধে গেলে সে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকে, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও সে একইরকম পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে। কিন্তু তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না সহজে, কারণ সরকার আইন প্রণয়ন করে দাস প্রথার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়। যদিও এই প্রথার উচ্ছেদ হয় না পুরোপুরি। এরপরই উপন্যাসের পরিসরে উঠে এসেছে মির্জাপুর গালিচা কারখানায় কর্মরত শিশুদের ওপর কারখানার মালিকের অত্যাচারের কথা। অর্থাৎ শোষকশ্রেণির অত্যাচারের শিকার হয়েছে দলিত শিশুরাও। অপরদিকে, এই উপন্যাসে উঠে এসেছে নদী বাঁধ প্রকল্পের প্রসঙ্গ। নদীতে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা আসলে আদিবাসীদের শাস্তি দেওয়ার একটি অন্যতম উপায়। 'খড়ি-বাঁধ প্রকল্পের জন্যও ত্রিশটি আদিবাসী গ্রাম মৃত্যুদণ্ড পায়'।[১] কিন্তু, ধীরে ধীরে পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করে, রাজপুত-ব্রাহ্মণ মালিক জমিদারের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ের জন্য পালামৌয়ে গড়ে ওঠে 'ক্রান্তি ফৌজ'। ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য গঠন করা হয় 'শোষিত মুক্তি দল'। এইভাবেই আদিবাসীরা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়।

অন্যদিকে তেতরি ভুঁইন নামের এক প্রৌঢ়ার নেতৃত্বে আদিবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়। জঙ্গল থেকে মৌয়া কুড়িয়ে এনে আগে দিতে হত জমিদারের লোকদের, কিন্তু তেতরির নির্দেশে তারা নিজেরা মৌয়া বিক্রি করতে শুরু করে। এই তেতরি হল বুঝার অঞ্চলের বাসিন্দা, তার কথা থেকেই জানা যায়, কৌয়ারের বাবা বুঝার জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে তেতরি রোজগারের তাগিদে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গিয়েছে, কিন্তু শ্রমের মূল্য যে কোথাও তারা পায়নি সেই বিষয়টি উঠে আসে তেতরি ও ববুয়ার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে- 'সরকার তো সবাই। জঙ্গলবাবুই কি বিড়িপাতার দাম দেয়, না মুখিয়ারা রাস্তা বানালে, কুয়া কাটলে সাচাই মজুরি দেয়?'[২] অর্থাৎ দলিতরা তাদের প্রাপ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়।

তেতরি ভুঁইনের নেতৃত্বে যে সময় থেকে আদিবাসীরা মৌয়া নিজেরা বিক্রি করতে থাকে, সেইসময় থেকেই কৌয়ারের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠতে শুরু করে। অন্যদিকে, যে লালবদনের কাছে আদিবাসীরা মৌয়া বিক্রি করে, সেই লালবদনই কৌয়ার ঘনিষ্ঠ তশীলদারকে সব কথা জানিয়ে দেয় এবং সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এরপরই দেখা যায় মৌয়া বিক্রি করতে তশীলদার বাধা দিচ্ছে তেতরিদের, অত্যাচারও করছে তাদের ওপর। পরিস্থিতি সামাল দিতে থানার দারোগা সেখানে পৌঁছোয় এবং সকলকে থানায় যেতে নির্দেশ দেয় সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু, কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই লালবদন থানায় এসে পুলিশকে অনুরোধ করে, আদিবাসীদের দ্বারা গৃহীত অভিযোগের প্রমাণ যেন নষ্ট করে ফেলা হয়। নিজেকে কৌয়ারের রোষ থেকে বাঁচানোর জন্যই এমন কথা বলে লালবদন, কিন্তু নিজের জন্য গ্রামের গরীব মানুষগুলোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে তার বাধে না।

এই ঘটনার কিছু সময় পরেই দেখা যায়, তেতরি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় থানাতে এবং বলে, 'শীগগির চলো দারোগাসায়েব, তশীলদার আমাদের মারতে লেগেছে, আওরতদের, আর বোরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। হাজারী ভোগতাইনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এবার নয়া-খেড়ি জ্বালাবে বলছে'।[৩] দারোগার কাছে অন্যান্য মেয়েরাও অভিযোগ করে, তারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হয়েছে তশীলদারের হাতে। কিন্তু, তশীলদারদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ তারা মনে করে নীচু জাতের মেয়েদের গায়ে হাত তোলায় কোনও অপরাধ নেই। তারা আবারও থানায় যায় এবং অভিযোগ জানায় কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হবে, এমন ভরসা খুব একটা পায় না। নিম্নশ্রেনির মানুষের অসহায়তার দিকটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৌয়া বিক্রি নিয়ে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার কথাই জানতে পারে কৌয়ার। তেতরির পাশাপাশি এই বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আরও এক আদিবাসী মহিলা, তার নাম কোসিলা খারোয়ার। এই কোসিলাকে দমন করার জন্য কৌয়ারের মন চঞ্চল হয়, ক্ষুধার্ত হয়। তশীলদারকে দিয়ে কোসিলাকে তুলে আনার পরিকল্পনা করে কৌয়ার, কারণ 'অনেকদিন শিকার খেলা হয় নি'।[৪] কৌয়ারের শিকার খেলার বর্ণনা রয়েছে তশীলদারের ভাবনায়- 'আদিবাসী মেয়েদের কৌয়ার চিড়িয়াখানার কাছের চত্বরে নিয়ে যেতেন। আলো নিভিয়ে ওদের ভোগ করা নিয়ম, ওই চত্বরে তো বাতি নেই। বাঘের গর্জনে মেয়েগুলো ভয়ে অসাড় হয়ে যেত'।[৫] এই ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে দলিত মেয়েদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আরও একবার অবগত হয় পাঠক। কিন্তু, এই শোষণের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয় আদিবাসীরা এবং তাদের হাতেই তশীলদার মৃত্যুবরণ করে। ফলে, কৌয়ারের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সফল হয় না। এরপর প্রতিবাদ আরও জোরালো হতে

থাকে, গড়ে ওঠে 'নারীমুক্তি দলও'। মেয়েরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, যার কাছে সবচেয়ে বেশি দাম পাবে, তার কাছেই মৌয়া বিক্রি করবে তারা। কিন্তু, প্রতিবাদ করতে গেলে তারা সমাজের কাছে পরিচিত হয় উগ্রপন্থী হিসেবে। এমনকি জমিদারের ভয়ে পুলিশও তাদের কোনওরকম সাহায্য করার সাহস দেখাতে পারে না। অন্যদিকে কৌয়ার আদিবাসীদের শাস্তি হিসেবে পরিকল্পনা করতে থাকে নারীহত্যার। একদিন তার কাছারিতে ক্রীতদাসদের ডেকে কৌয়ার তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'একটা পরিবার কাজের খোঁজে বাইরে গেছে শুনেছি তো এখানে কেটে রেখে যাব'।[৬] কৌয়ারের এহেন আচরণে সমকালীন দলিত সম্প্রদায়ের পরাধীনতার দিকটিই পাঠকের চোখে ধরা দিয়ে যায়। কিন্তু, এই ঘটনায় কৌয়ারের আচরণের তীব্র বিরোধিতা করে কোসিলা, ফলে কোসিলার ওপর আরও ক্ষুব্ধ হয় কৌয়ার এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয় তাকে। দলিতদের ওপর শোষকশ্রেণির অত্যাচারের চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে 'ক্ষুধা' উপন্যাসের পরিণতিতে। কৌয়ার হুমকি দেওয়ার পর থেকেই আদিবাসীরা বিপদের আশঙ্কা করতে থাকে এবং থানায় গিয়ে নিরাপত্তার দাবি জানায়। কিন্তু পুলিশ তাদের কোনও নিরাপত্তাই দিতে পারে না উপরন্তু গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হয় কৌয়ার ও তার লোকেদের নিয়মিত টহলদারি। এইরকম পরিস্থিতিতে একদিন মেয়েরা সকলে মিলে শহরের বাজারে পাত্তল বিক্রি করতে গেলে, কৌয়ার ঘনিষ্ঠ শেরদিল সিং বলপূর্বক তুলে আনে কোসিলাকে এবং কৌয়ারের হাতে কোসিলা শ্লীলতাহানির শিকার হয়। তবে, এখানেই শেষ নয়, আদিবাসীরা এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পালামৌয়ের চারিদিকে। অবশেষে, কৌয়ারকে হত্যা করে বরজু ভুঁইয়া এবং কোসিলাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। সেইসঙ্গে, শেরদিল সিংদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বরজু আগুন লাগিয়ে দেয় বাঘের খাঁচার আশেপাশের শুকনো ঘাসপাতায়। সেই ক্ষুধার্ত আগুন সবকিছু গ্রাস করতে করতে এগিয়ে চলে কৌয়ার মহলের দিকে।

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী 'আজীবন শোষিত-বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের পাশে থেকেছেন',[৭] লোধা-সাঁওতাল-শবর-সহিস-কিরিবুরু-হরিজনদের জীবনযাপনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে তাদের কথা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছেন, আর সেই সকল দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদেরই জীবন আলেখ্য 'ক্ষুধা' উপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, সমকালীন সময়ে দলিতদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না এবং তাদের জীবনে ছিল প্রভূত রকমের সামাজিক প্রতিকূলতা। কিন্তু, এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ কী? উপন্যাস পাঠ করলে প্রথমেই মনে হয় এর প্রধান কারণ অপরিসীম দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের কারণেই তারা সকলে ঠিকমতো লেখাপড়া শিখতে পারে না, ভাল জায়গায় কাজের সুযোগ পায় না, ভাল ঘরে থাকার সুযোগ পায় না, এমনকি তারা হয় অপুষ্টির শিকার। কিন্তু, একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এই সমস্ত কারণই গৌণ, মুখ্য কারণ হল তাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। সবদিক থেকেই তারা বঞ্চিত হয়, এমনকি বনজ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীরা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেরা বিক্রি করতে পারে না, কারণ তা আত্মসাৎ করে নেয় সুবিধাবাদী ধনী শ্রেণির মানুষজন। মূলত এইসকল কারণেই তাদের দারিদ্র্যেরও অবসান হয় না। উপন্যাসে আরও দেখানো হয়েছে যে জমিদারের কথা না শুনলে আদিবাসীদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, মেয়েদের হতে হয় জমিদারের লালসার শিকার। নদীতে বাঁধ দিয়ে আদিবাসী গ্রাম ডুবিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গও উপন্যাসের পরিসরেই উঠে এসেছে। কিন্তু, সামাজিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে, প্রতিবাদে সামিল হয় তারা, যার ফলে আত্মত্যাগ করতে হয় কোসিলার মতো আরও অনেককেই। আসলে, এই

ঘটনাগুলি সমকালীন পরিস্থিতিকে অনেকখানি তুলে ধরলেও এইধরনের সমস্যা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপন্যাসের চরিত্রেরা আসলে দলিত সমাজের একেকজন প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে, যাদের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে এক চিরকালীন সত্য পাঠকের সামনে উঠে আসে। এইসকল প্রতিনিধিদের আত্মত্যাগে যেমন বিদ্রোহের অবসান হয় না তেমনি শোষণের যে সমাপ্তি ঘটে তারও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই উপন্যাসের পরিসরে। ফলে, উপন্যাসগুলির কাহিনি থেকে দলিতদের সামাজিক অবস্থাটা সহজেই অনুধাবন করতে পারে পাঠক। অতএব, আলোচ্য উপন্যাসটিকে দলিত সম্প্রদায়ের জীবন্ত দলিল বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

তথ্যসূত্র:

১) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ৬১।
২) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ৭৩-৭৪।
৩) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ১০১।
৪) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ১১১।
৫) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ১১২।
৬) দেবী, মহাশ্বেতা, প্রকাশকাল ১৯৯২, ‘ক্ষুধা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ: ১৫৯।
৭) আচার্য্য, দেবেশ কুমার, প্রথম প্রকাশ ১৮ আগস্ট ২০১০, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৯৫০-২০০০)’, কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পৃ: ৯০৯।

সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় তৃতীয়লিঙ্গের অস্তিত্ব : উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবজীবন

অনুশ্রী মাইতি
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: বৃহন্নলা শব্দটির ইংরাজি অর্থ 'হার্মাফ্রোডাইট'। এখন যদিও বলা হয় ইন্টারসেক্স কিন্তু আগে হার্মাফ্রোডাইট বলা হত। হার্মাফ্রোডাইট কথাটির উৎস গ্রিক পুরাণ। দেবতা হার্মেস ও দেবী অ্যাফ্রোদিতির যোগফল। এই উভলিঙ্গত্ব কেবল গ্রীক পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান, যেমন দেবতাদের মধ্যে তেমনি মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় অনেক প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব ছিল। প্রাণীজগতের গোড়ার দিকে প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা এই সমস্ত প্রাণীদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ ছিল। অনেকের আবার নিজের শরীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানুর স্বঃনিষেক ঘটে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হত। তারপর ধীরে ধীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানু আলাদা আলাদা শরীরে জায়গা পেতে শুরু করে। তবে এখনও বেশকিছু প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব রয়েছে। উভলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো আদর্শ উদাহরণ, এছাড়া রয়েছে জোঁক, কৃমি, শামুক। ফুলের মধ্যে জবা, ধুতুরা, বক, বেল ইত্যাদি উভলিঙ্গ ফুল রয়েছে। জবাফুলের মধ্যে পুংকেশর ও গর্ভকেশর খুব ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়।
সূচক শব্দ: বৃহন্নলা, তৃতীয়লিঙ্গ, উভয়লিঙ্গত্ব, রূপান্তরিত লিঙ্গ, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, সৃষ্টি।

মূল আলোচনা:

এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে। মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর লিঙ্গ জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়। প্রাণী পুরুষ নাকি স্ত্রী হবে, তা সাধারণত ক্রোমোজোমের ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে সামুদ্রিক প্রাণীসহ অনেক প্রাণীতে সেক্স ক্রোমোজোম না থাকায় তদের সেক্স বা লিঙ্গ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয় না। মস্তিষ্কের প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় কিছু কিছু প্রাণীর লিঙ্গ। বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণী আছে যারা এক লিঙ্গ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও তারা পরবর্তীকালে তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের প্রবাল প্রাচীরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো ক্লাওন ফিশ তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে। জন্মের সময় এরা সবাই পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, জীবনের এক পর্যায়ে এসে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়, এরা একবার পুরুষ থেকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলে আর পুরুষ লিঙ্গে ফিরে আসতে পারে না। দুটি পুরুষ মাছ মিলনের সময় যেটি আকারে বড় সেটি স্ত্রীতে পরিণত হয়, এদের দলের কোনো স্ত্রী মাছ যদি মারা যায় তাহলে সেই অভাব পূরণের জন্য পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়। প্রবাল প্রাচীরের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো হক ফিশ স্ত্রী হিসেবে জন্ম নিলেও পরিণত বয়সে পুরুষে রূপান্তরিত হয়। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে এই পরিবর্তন বেশ কিছু মাছের মধ্যে দেখা গেলেও হক ফিশ ব্যতিক্রম। এরা প্রয়োজন অনুসারে ও অনুকূল পরিবেশে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। জন্মের সময় স্ত্রী মাছ তারপরে পুরুষে রূপান্তরিত হয়, আবার প্রয়োজনে স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়। প্রবাল দ্বীপের যার্শ মাছ, যাদের বেশিরভাগ নব যৌবনে ছোটোখাটো অনুজ্জ্বল চেহারার নারী, পূর্ণ যৌবনে তারাই

হয়ে যায় বড়সড় চকচকে পুরুষ। বেশকিছু ঈল প্রজাতি রূপান্তরিত লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যেমন-জেব্রা এবং ড্রাগন মোরে মিল। জীবনের কোনো পর্যায়ে যদি পুরুষ সদস্যের সংখ্যা কমে যায় তবে তারা পুরুষে পরিবর্তিত হয়। স্নো ফ্লেক ঈল স্ত্রী হিসেবে জন্ম নিলেও পুরুষে রূপান্তরিত হয়। রিবন মোরে ঈল পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলেও পরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী ঈলে পরিণত হয়। পুরুষ রিবন মোরে ঈলের পৃষ্ঠদেশ হলুদ পাখনা থাকে। তারা যখন পূর্ণ বয়স্ক ও ডিম নিষিক্ত করতে থাকে তখন তাদের মুখ ধীরে ধীরে নীল ও হলুদ হতে থাকে, যখন কিছুটা বড়ো হয় তখন স্ত্রী জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে। এরপর বাকি জীবন ডিম দানকারী স্ত্রী ঈল হিসেবে কাটিয়ে দেয়। সমুদ্রে বসবাসকারী পান্ডালিড চিংড়িও নিজেদেরকে রূপান্তরিত করে। যৌবনের প্রথমভাগে যারা পরিপূর্ণ পুরুষ, মধ্যাহ্নে তারা রূপান্তরিত হয় পূর্ণাঙ্গ নারীতে। কিছু মাছ অবশ্য নব যৌবনেই পুরুষ, কিন্তু তাদের পৌরুষ ঢেকে রাখে নারী রূপের ছদ্মবেশে, যার কারণ হল বড় চেহারার পুরুষদের নজর এড়িয়ে তাদের দখলে থাকা সুন্দরী স্ত্রী মাছদের কাছে পৌঁছানোর ছলনা। দৈত্যাকার কাটল ফিশদের মধ্যেও এরকম ট্রান্সভেস্টাইট অর্থাৎ 'বিপরীত লিঙ্গের ছদ্মবেশধারী' পুরুষ দেখা যায়। একোরিয়ামে পোষা মিনো বা সোরডটেল খুব সাধারণ খুব সাধারণ মাছ। সরাসরি বাচ্চা জন্ম দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাচ্চা হবার পরে একটি কম বয়সী স্ত্রী মাছ বদলে হয়ে গেলে পুরোপুরি পুরুষ।

জিনগত ত্রুটির কারণে কিছু প্রাণী ও পতঙ্গে একইসাথে পুরুষ ও স্ত্রী বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষ লিঙ্গধারী অংশ পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং স্ত্রী লিঙ্গধারী অংশ স্ত্রী লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এভাবে একই প্রাণীতে একইসাথে স্ত্রী এবং পুরুষ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় থাকলে তাকে গাইনানড্রোমরফিজম বলা হয়। মুরগির মধ্যে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন মুরগির এক পাশে পুরুষ বৈশিষ্ট্য ও অন্য পাশে নারী বৈশিষ্ট্য থাকে। এইসব মুরগিরা অন্য স্ত্রী মুরগির সাথে সঙ্গমের জন্য লাফিয়ে ওঠে, এরা আবার ডিমও পাড়ে। এদের অণ্ডকোশ ও ডিম্বকোশ দুটোই থাকে। দুই লিঙ্গধারী মুরগির মতো বৈশিষ্ট্য মাঝেমাঝে কর্ডিনাল পাখিতেও দেখা যায়। এই পাখির একদিকের অর্ধাংশ স্ত্রী পখির মতো ধূসর পালকে আবৃত থাকে আর বাকি অর্ধাংশ পুরুষ পাখির মতো উজ্জ্বল লাল বর্ণের পালক দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর বামপাশটা স্ত্রী ও ডানপাশটা পুরুষ পাখির বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। ওয়েস্টার্ন ইলিওনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রায়ান পিয়ার ও তাঁর সহকর্মী রবার্ট মোট্জ বন্য পরিবেশে গাইনানড্রোমরফিজম বিষয়টি নিয়ে ২ বছর ধরে ৪০ টি নর্দার্ন কার্ডিনাল পাখির ওপর পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন যে এই ধরণের দ্বিপার্শ্বীয় পুরুষ-স্ত্রী কার্ডিনাল পাখি কখনোই ডাকেনি এবং মিলনে আগ্রহ প্রকাশ করেনি, স্বাভাবিক পাখিগুলো কখনোই এই পাখিগুলোকে আক্রমণও করেনি।

গবেষণাগারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাঙের লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটানো যায় কিন্তু বন্য পরিবেশে পুরুষ ব্যাঙ থেকে স্ত্রী ব্যাঙে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা লক্ষ করা যায়। ফসলের আগাছা দমনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক অ্যান্ট্রাজিনের প্রভাবে পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর স্ত্রী ব্যাঙ সন্তান উৎপাদন করতে পারে। বর্তমানে ইউরোপীয় দেশগুলোতে অ্যান্ট্রাজিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অ্যান্ট্রাজিন ব্যাঙের টেস্টোস্টেরন উৎপাদন কমিয়ে দেয় অপরদিকে ইস্ট্রোজেন উৎপাদনে সাহায্য করে। ফলে দেখা যায় কোনো এক জলজ পরিবেশে শুধু স্ত্রী ব্যাঙ উৎপাদিত হয়ে প্রজননে ব্যাহত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা খুঁজে পান বেয়ার্ডেড ড্রাগন লিজার্ড ডিমের ভিতরে থাকার সময়ই লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে। তাঁরা দেখেছেন যারা পুরুষ থেকে স্ত্রীতে পরিবর্তিত হয় তারাই ভালো মাতৃগুণাবলীর

অধিকারী হয়ে থাকে। গবেষণায় জানা যায়, ডিম ফোটানোর সময় তাপমাত্রা যখন বেশি হয় তখন অধিকাংশ স্ত্রী ড্রাগনের জন্ম হয়। তাপমাত্রার প্রভাবে আরও কিছু প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, যেমন- কুমির, লিওপার্ড গেকো, সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। লেক্সিয়াস পার্ডালিস প্রজাতির প্রজাপতির মধ্যে একইদেহে পুরুষ ও স্ত্রী বর্তমান। পাখনার একদিকে পুরুষ প্রজাপতি ও অন্য পাখনায় মহিলা প্রজাপতি। কিছু সামুদ্রিক কাঁকড়ার মধ্যে এই গুণ দেখা যায়। বেশকিছু প্রাণী আছে যাদের ক্লিটোরিস এত বড়ো হয় যে, তাদের দেখলে পুরুষ মনে হয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী হায়নাদের কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলে মনে হয়। এদের ক্লিটোরিস এত বড়ো হয় যে দেখলে পুরুষদের পেনিসের মতো মনে হয়। পুরুষদের মতো দেখতে ক্লিটোরিস শুধু হায়নাদের মধ্যে নয়, কাঠবেড়ালির মতো নিশাচর বুশ বেবী এবং স্পাইডার মাঙ্কি এবং উলি মাঙ্কির মধ্যেও দেখা যায় আবার পুরুষদের মেয়েদের মতো যৌনাঙ্গ দেখা যায়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো কোনো বহিস্থ পুরুষাঙ্গ দেখা যায়না। এই জলজ প্রাণীদের কোনো অণ্ডকোশ নেই। মৌমাছিদের মৌচাকে তিনধরনের মৌমাছি থাকে, পুরুষ মৌমাছি, রানি মৌমাছি, কর্মী মৌমাছি। রানি মৌমাছি ডিম পাড়ে, এছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না, পুরুষ মৌমাছিরা শুধুমাত্র মিলনে সাহায্য করে কিন্তু কর্মী মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে, মধু আহরণ করে, মৌচাক পাহারা দেয়। মৌচাকে বিভিন্ন আয়তনের কুঠুরি থাকে, রানি আয়তনের প্রার্থক্য সম্বন্ধে বিবেচনা না করে ডিম পাড়ে কিন্তু সর্বশেষে দেখা যায় আয়তনের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মৌমাছি জন্মগ্রহণ করেছে; অর্থাৎ ছোটো কুঠুরি থেকে কর্মী মৌমাছি, মাঝারি কুঠুরি থেকে পুরুষ মৌমাছি, সবচেয়ে বড়ো কুঠুরি থেকে রানি মৌমাছি। রানি যখন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ডিম পাড়বার জন্যে শরীরের পশ্চাৎভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয় তখন চাপ লাগবার ফলে অভ্যন্তরস্থ থলি থেকে পুং-রস নির্গত হয়ে ডিমটিকে নিষিক্ত করে দেয়। পুরুষ মৌমাছিদের প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত বড়ো হয় বলে তাতে ডিম পাড়বার সময় চাপ লাগে না তাই ডিম অনিষিক্ত হয়ে থেকে যায়। সবচেয়ে বড়ো প্রকোষ্ঠ থেকে রানি মৌমাছির জন্ম হয়। রানিদের মতো এই কর্মী মৌমাছিরাও স্ত্রী মৌমাছি কিন্তু সন্তান উৎপাদন করতে পারেন না, কর্মী মৌমাছিদের প্রজনন যন্ত্র পরিপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয় না, তাই কর্মীরা বন্ধ্যা।

(১)

(২)

(৩)

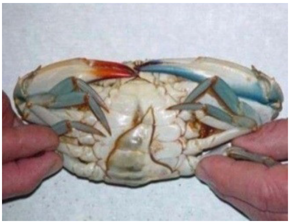

(৪)

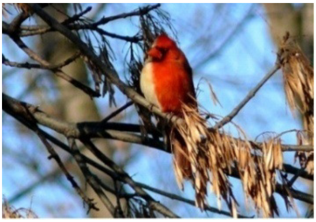

(৫)

শুধু প্রাণী নয়, প্রাণীদের মতো এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের দেহে একইসঙ্গে দুই লিঙ্গ বর্তমান, কেউ বা লিঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য লিঙ্গতে রূপান্তরিত হয়, কেউ বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে থাকে। এরকম চরিত্র বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্রে পাই। তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিচয় পাই। বৈদিক সাহিত্যে নপুংসক ও ক্লীবদের জন্মের কারণ দেখানো হয়েছে-

> "A few Verse from the Vedic canon refer to men taking birth among the third sex as a means of purification. In such cases, first gender males who abuse woman. Or brahmans who engage in prohibited in hell."

বৈদিক যুগে একটা মানুষ নপুংসক কিনা তার পরীক্ষা হত পাঁচটি ধাপে-
১। জ্যোতিষীদের সঙ্গে কথা বলে।
২। তাদের সারা শরীর পরীক্ষা করা হত।
৩। একজন মহিলার সাথে তার যৌন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা হত।
৪। প্রস্রাবে ফেনা হয় কিনা দেখা হত।
৫। মল জলে ডুবে যায় কিনা দেখা হত।

যদি এইসব পরীক্ষায় সফল না হত তবে তাকে নপুংসক হিসেবে গণ্য করা হত। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে বিয়ের আগে বরের ক্ষমতা ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত। নারদ স্মৃতিতে বিশেষ করে সমকামী ও অন্যান্য নপুংসক পুরুষদের নারীদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং বলা হয়েছে স্বামীর মধ্যে পুরুষত্বের অভাব দেখা দিলে সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রগুলি নপুংসক স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন নপুংসক স্বামীর স্ত্রী তার অনুমতিক্রমে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভধারণ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে উভয় পুরুষই ছেলের বৈধ পিতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

চরক সংহিতাতে ৮ প্রকার নপুংসকের কথা আছে-
১। দ্বিরেতাস — যার পুরুষ এবং মহিলা উভয় লিঙ্গই রয়েছে।
২। পবনেন্দ্রিয় — যার কোনো বীর্য নিঃসরন হয় না।
৩। সংস্কারবাহী — যিনি পূর্বের জীবনের আবেগ অনুযায়ী জাগ্রত হন।
৪। নরাসন্ধা — যার পুরুষত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
৫। নারীসন্ধা — যার নারীত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
৬। ভাকরি — যার পুংজননাঙ্গ বিকৃত বা বাঁকা।
৭। ইরশ্যাভিরতি — যিনি শুধুমাত্র অন্যদের যৌন মিলনের অভিনয় দেখে ঈর্ষান্বিত অনুভূতি দ্বারা জাগ্রত হন।
৮। ভাটিকা — যিনি টেস্টিস ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন।

'চরক সংহিতা' বৈদিক যুগের একটি চিকিৎসাশাস্ত্র যা ২০০ খ্রিঃপূঃ কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। সুশ্রুত সংহিতা ও বৈদিক সাহিত্যে একটি চিকিসাশাস্ত্র যা ৬০০ খ্রিঃপূঃ রচিত হয়েছিল। 'সুশ্রুত সংহিতা'তে পাঁচ প্রকার ক্লীবের কথা বলা হয়েছে।
১। অশেক্য — যিনি একজন পুরুষের বীর্য গ্রাস করে উত্তেজিত হন।
২। সৌগন্ধিক — তিনি শুধুমাত্র অন্যের যৌনাঙ্গের গন্ধ দ্বারা উত্তেজিত হন।

৩। কুম্ভিকা — তিনি পায়ুপথের যৌনমিলনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
৪। ইর্শ্যক — যিনি শুধুমাত্র অন্যজনের যৌনমিলন দেখে উদ্দীপিত হয়।
৫। সন্ধা — যার মধ্যে একজন নারীর গুণ ও আচরণ রয়েছে।

'শব্দ-কল্প-দ্রুম-এ' ২০ প্রকার নপুংসকের বর্ণনা আছে। এখানে সমস্ত নপুংসক পুরুষদের কথা বলা হয়েছে।

১। নিসর্গ — যিনি সঠিক যৌনাঙ্গ ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন।
২। বাড্ডা — যার কোনো অণ্ডকোশ নেই।
৩। পক্ষ — যিনি পর্যায়ক্রমে মহিলাদের সাথে পুরুষত্বহীন হন (প্রতি পাক্ষিক, মাস ইত্যাদি)।
৪। কিলাকা — যিনি একজন মহিলার সঙ্গে যৌন মিলনের জন্য কিছু যন্ত্র ব্যবহার করেন।
৫। সপদী — যিনি অভিশাপের কারণে যৌন আনন্দ উপভোগ করতে পারেন না।
৬। স্তব্ধ — যার পেনিস অবশ, শুক্রাণু নেই।
৭। ইর্শ্যক — যিনি শুধুমাত্র অন্যজনের যৌনমিলন দেখে উদ্দীপিত হন।
৮। সেব্যক — যিনি অন্যপুরুষদের দ্বারা যৌন উপভোগ করেন।
৯। অক্ষিপ্ত — যার বীর্যের ঘাটতি বা সঠিকভাবে নিঃসরণ হয় না।
১০। মোহবিজ — নারীর সাথে যার মিলনের চেষ্টা বিফল।
১১। সেলিনা — যিনি খুব লাজুক বা মহিলার কাছে যেতে পারেন না।
১২। অন্যপতি — যিনি নারী ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস বা প্রাণীর সাথে মিলন করেন।
১৩। মুখেভাগ — যিনি পুরুষদের সাথে ওরাল সেক্স করেন।
১৪। ভাতরেতাস — যার বীর্য নিঃসরণ হয় না।
১৫। কুম্ভিকা — যিনি পায়ু যৌনতায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
১৬। পান্ডা — তার লিঙ্গ নারীর স্পর্শে সাড়া দেয় না।
১৭। নষ্ট — রোগের কারণে তিনি শুক্রাণুবিহীন।
১৮। আশেক্য — যিনি একজন পুরুষের বীর্য পান করে উত্তেজিত হন।
১৯। সৌগন্ধিকা — অন্যের যৌনাঙ্গের গন্ধ পেয়েই যিনি উত্তেজিত হন।
২০। সন্ধা — যার মধ্যে মহিলার গুণ রয়েছে। যিনি মহিলাদের মতো আচরণ ও কথাবার্তা বলেন।

'নারদ স্মৃতি' তে যেসব পুরুষ বিয়ের জন্য যথাযথ নয় তাদেরকে ১৪ ভাগ করা হয়েছে।

১। নিসর্গ — যিনি সঠিক যৌনাঙ্গ ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেন।
২। ভাধরি — তার অণ্ডকোশ কেটে ফেলা হয়েছে।
৩। পক্ষ — যিনি পর্যায়ক্রমে মহিলাদের সঙ্গে পুরুষত্বহীন।
৪। অভিশাপদ গুরু — যিনি গুরুর অভিশাপের কারণে পুরুষত্বহীন।
৫। রোগাত — যিনি রোগাক্রান্ত।
৬। দেব ক্রোধ — যিনি ভগবানের ক্রোধের কারণে পুরুষত্বহীন।
৭। ইর্শ্যক — যিনি শুধুমাত্র অন্যজনের যৌনমিলন দেখে উত্তেজিত হন।
৮। সেব্যক — যিনি অন্য পুরুষদের দ্বারা যৌন উপভোগ করেন।
৯। ভাতরেতাস — যার বীর্য নিঃসরণ হয় না।
১০। মুখেভাগ — যিনি ওরাল সেক্স করেন।
১১। অক্ষিপ্ত — যার বীর্যের ঘাটতি রয়েছে বা সঠিকভাবে নিঃসরণ হয় না।
১২। মোহবিজ — নারীর সাথে মিলনের চেষ্টা নিষ্ফল।

১৩। সেলিনা — যিনি খুব লাজুক বা মহিলাদের কাছে যেতে চান না।
১৪। অন্যপতি — তিনি নারী ব্যতীত অন্যান্য জিনিস বা প্রাণীর সাথে যৌন মিলন করেন।

'নারদ-স্মৃতি' একটি ধর্মশাস্ত্র যা খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল। 'নারদ-স্মৃতি' চোদ্দ প্রকার নপুংসকের মধ্যে সাতটিকে দুরারোগ্য এবং বিবাহের জন্য ঘোষণা করেছে, যেমন-নিসর্গ, ভাধরি, ইর্শ্যক, সেব্যক, ভাতরেতাস, মুখেভাগ, অন্যপতি। আর বাকি সাতটিকে নিরাময়যোগ্য বলে মনে করেছে, যেমন-পক্ষ, অভিশাপদ গুরু, রোগ, দেব ক্রোধ, অক্ষিপ্ত, মোহবীজ এবং সেলিনা।

যেসব মহিলারা যৌনকার্যে পারদর্শী নয় বৈদিক সাহিত্য তাদেরকে দশভাগে ভাগ করেছেন। দশপ্রকার তৃতীয় লিঙ্গ মহিলাদের বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

১। স্বৈরিণী — যিনি অন্য মহিলাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত থাকেন।
২। কামিনী — যিনি মহিলা ও পুরুষের উভয়ের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত থাকেন।
৩। স্ত্রীপুমস — যিনি আচরণে ও আকারে পুরুষদের মতো।
৪। শাঁধি — যিনি পুরুষ বিদ্বেষী এবং যার ঋতুস্রাব হয় না বা স্তন নেই।
৫। নারীসন্ধা — তার নারীত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।
৬। বার্তা — যার স্ত্রী 'বীজ' জরায়ুতে আক্রান্ত হয়।
৭। সূচিবক্তা বা সূচিমুখী — যার একটি অত্যন্ত ছোটো, অনুন্নত যোনি রয়েছে।
৮। বন্ধ্যা — তার ঋতুস্রাব অনুপস্থিত বা একদম কম হয়।
৯। মোগাপুষ্প — যার সাথে পুরুষের মিলনের চেষ্টা নিষ্ফল হয়।
১০। পুত্রাঘ্নি — যার বারবার গর্ভপাত হয়।

স্বৈরিণী 'কামসূত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। কামিনী 'ভাগবত পুরাণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রীপুমস 'মহাভারত' এবং বিভিন্ন 'জ্যোতিষশাস্ত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, সুচিবক্তা, বন্ধ্যা, পুত্রাঘ্নি 'সুশ্রুত সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, নারীসন্ধা, বার্তা, সুচিমুখী, পুত্রাঘ্নি 'চরক সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনপ্রকার শারীরিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম আর বাকি সাতটি সন্তান ধারণ অক্ষম।

আসলে এই মানুষগুলোর অস্তিত্ব ও বঞ্চনা শুধু আধুনিক যুগে নয় সেই বৈদিক যুগ থেকে রয়েছে, বরং বলা ভালো পৃথিবীতে মানবসভ্যতা সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে, আর বঞ্চনার জন্ম সেদিন থেকে যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হতে শুরু করেছে। কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে শুধু মানুষ নয় পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে প্রাণ সৃষ্টির সহজাত প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এই উভলিঙ্গত্ব ও লিঙ্গ রূপান্তরের চিত্র পাই। তাই তাদের আর অবজ্ঞার চোখে না দেখে আমরা আধুনিক মানুষ স্বাভাবিক চোখে দেখলে তাদের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১। Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI : PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013, p.p-99.

ছবিঋণ:

১। অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৫।

২। Saiful Islam Sohel, 'যে প্রাণীগুলো লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম', roar.media, 23 May, 2018. https://roar.media/bangla/main/plants-animals/some-animal-capable-of-sex-change. Dated 18 November 2022.

৩। অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৬।

৪। অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৬।

৫। Saiful Islam Sohel, 'যে প্রাণীগুলো লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম', roar.media, 23 May, 2018. https://roar.media/bangla/main/plants-animals/some-animal-capable-of-sex-change. Dated 18 November 2022.

তথ্যঋণ:

১। মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯।

২। মহর্ষি বাৎস্যায়ন, সম্পাদনা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কামসূত্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯,

৩। Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI: PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013.

৪। অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০।

৫। Saiful Islam Sohel, 'যে প্রাণীগুলো লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম', roar.media, 23 May, 2018. https://roar.media/bangla/main/plants-animals/some-animal-capable-of-sex-change. Dated 18 November 2022.

৬। Astro World. জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গম : অর্ধনারীশ্বর অথবা তৃতীয় প্রকৃতি, m.facebook.com, 31 January, 2020. https://m.facebook.com/112722536823190/photos/a.112724426823001/162598575168919/?type=3, Dated 18 November 2022.

৭। হিন্দু পুরাণে এলজিবিটি বিষয়বস্তু, bn.m.wikipedia.org; https://bn.m.wikipedia.org/হিন্দু_পুরাণে_এলজিবিটি_বিষয়বস্তু. Dated 18 November 2022.

৮। শেঠ আনন্দরাম, 'ইন্টারসেক্স বা উভলিঙ্গ কাদের বলে', bn.quora.com, https://bn.quora.com/ইন্টারসেক্স-বা-উভলিঙ্গ. Dated 23 November 2022।

সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য ভাবনায় সংস্কৃতি ও পরিচিতি : আধুনিক-উত্তর চিন্তার প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা

অপূর্ব সরকার
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিবিম্ব হিসাবে বিবেচিত সাহিত্য, সমাজে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিপালন করে চলেছে আবহমান কাল ধরে, যা অনিবার্য ভাবে মনুষ্য পরিচিতি কে অন্তর্ভুক্ত করে। আধুনিক জাতীয়তাবাদীদের সচেতন মূলক অভিলাষ হল তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক। এদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ও মিথস্ক্রিয়ায় সংস্কৃতি যে এক উন্নততর দিগন্তের পথ নির্দেশক তা বলাই যায়। অবশ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি ব্যক্তির সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বৌদ্ধিক ও আত্মিকতার সমাহার হিসাবে একসময় প্রদর্শিত হলেও বর্তমানে তা একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার কূটনীতির পরিচালনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে আর এভাবেই সংস্কৃতির মোড়কে যেকোনো ধারণাকে বিধিসিদ্ধ করার চেষ্টা যে চলছে সে সম্পর্কে সকল ব্যক্তি মানুষই অবগত। সাহিত্যিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি সামগ্রিক জীবনের পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত বঙ্গ সমাজের তীক্ষ্ণ তার্কিক চিন্তার অধিকারী লেখকদের হাতেও উঠে এসেছে আধুনিক সমাজ পর্বে সদ্য আগত নব্য বাবু সংস্কৃতির আধিক্যের শাণিত বিশ্লেষণ। এই আধুনিক সময় পর্বে একদিকে যেমন ব্যক্তি সাধারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে থাকে তেমনি অন্যদিকে তাদের মননে ও চিন্তনে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটে, তার্কিক ও যুক্তিবোধের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যার ফলপ্রসূ সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা তথা সমাজনীতিতে আধুনিকতার বাতাবরণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক-উত্তর বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমাজে সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে যুক্তি কোনো দক্ষতা দেখাতে পারে না। আসলে সত্য মিথ্যা নির্মাণে ক্ষমতার প্রভাব যেখানে বেশি সেটাই সত্য হিসাবে নির্দেশিত হয় আর যেখানে ক্ষমতার প্রভাব নেই বললেই চলে তা মিথ্যা রূপে পরিগণিত হয়। একইভাবে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলেও ক্ষমতার প্রভাব বিদ্যমান আর তার কারণেই পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতি অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে প্রাচ্যের তুলনায়। বঙ্গ সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্যেও যে এই পাশ্চাত্যের ঢেউ আছড়ে পরে তা দৃশ্যমান। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি কে আধুনিক উত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণামূলক পুনর্বিবেচনা কে উপস্থাপন করে।

শব্দ সূচক : সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, পরিচিতি, আধুনিক উত্তর চিন্তা।

ভূমিকা:

উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সভ্যতার অন্তরালে অবস্থান করে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। মূলত একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার অগ্রগতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে একটি সমাজ ব্যবস্থার বেশ কতকগুলি উপাদান রয়েছে যা উক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবিম্ব হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন-

সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বৌদ্ধিক চিন্তাধারা সহ একাধিক বিষয়। সেই হিসেবে বলতে গেলে আমাদের বঙ্গভূমি সমাজ ব্যবস্থার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। পণ্ডিতদের মতে, সাহিত্য সমাজের দর্পণ এবং এটি কার্যত প্রাসঙ্গিক। কেননা সমাজব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ পরিস্ফূট হয় সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিকদের বৌদ্ধিক, কাল্পনিক, ঐতিহাসিক ও তার্কিক লেখনীর মধ্য দিয়ে। সাহিত্য সমাজকে যেমন বিভিন্ন দিক থেকে পরিপুষ্ট করে, তেমনি সমাজে একটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিপালন করে চলেছে আবহমান কাল ধরে, যা অনিবার্য ভাবে মনুষ্য পরিচিতি কে অন্তর্ভুক্ত করে। সে অর্থে বলতেই হয় একটি সভ্যতার অগ্রগমনে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সমান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বঙ্গ সমাজের উদাহরণ টেনে বলা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক-কবি-ঔপন্যাসিক-শিক্ষাবিদ, তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা চিত্র তুলে ধরেছেন জন মানুষে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবন্ধিত “গোরা” উপন্যাসে ধরা পড়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে বেড়িয়ে এসে সমগ্র জগৎ সংসারে নিজের পরিচিতি ও অস্তিত্বের উপলব্ধি।[1] ঠিক একইভাবে “সভ্যতার সংকট” গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে লেখকের দীর্ঘদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা যা দ্বারা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তৎকালীন ইংরেজ শাসনাধীন সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র ভারতভূমির মধ্যে সঙ্গতির অভাব, ইংরেজ সরকারের প্রতি একশ্রেণীর চাটুকারিতা ও পদলেহন যা আমাদের অধীনতা কে দীর্ঘায়িত করেছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন।[2] অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় রম্য লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর ব্যঙ্গ রসাত্মক লেখনী “দেবতার জন্ম” তে উঠে এসেছে সমাজ ব্যবস্থায় কুসংস্কার, দৈবাৎ বিশ্বাসের প্রতি ব্যক্তি মানুষের আস্থা ও ভক্তি। সেই সাথে একদল ভন্ড, সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর বিনা পুঁজির ব্যবসা।[3] এই সকল সাহিত্যচর্চায় প্রাক্ আধুনিক পর্বের সমাজ ব্যবস্থা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো তীক্ষ্ণ তার্কিক চিন্তার অধিকারী লেখকদের হাতে উঠে এসেছে আধুনিক সমাজ পর্বে সদ্য আগত নব্য বাবু সংস্কৃতির আধিক্যের শাণিত বিশ্লেষণ। তিনি এই পথভ্রষ্ট, দেশীয় সংস্কৃতি বিমুখ বাবুদের জীবনের চালচিত্র কে তুলোধনা করেছেন তাঁর “হুতুম প্যাঁচার নকশা” গ্রন্থে।[4] সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েই যে গোটা সমাজের অভ্যন্তরীণ ছোট-বড় নানা ঘটনা উদ্ঘাটিত হয় জন-মানুষে তা আরও একবার ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থে প্রমাণিত। ইংরেজ শাসন দেশ থেকে বিদায় নিলেও তাদের ফেলে যাওয়া, তৈরি করা নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা, নীতি ও পদ্ধতি সহ বহু বিষয় যে আজও ভারতবর্ষ বয়ে নিয়ে চলেছে তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অন্যতম, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সংঘাত, সাম্প্রদায়িকতা, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়গুলি সাহিত্য রচনায় ঠাঁই পেয়েছে, উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগের মতো করুণ বেদনার ইতিহাস ও তৎসংলগ্ন সামাজিক চালচিত্র। স্বাধীনতার আজ সাতদশক পার হয়েছে, ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে সাবলম্বী হয়ে উঠছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সমাজের চালচিত্রও বদলাতে শুরু করেছে- সমাজে নানা মত, চিন্তা, প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হয়েছে। সেই সাথে সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি – সকলেই তার পুরাতন কাঠামো ত্যাগ করে সাদরে গ্রহণ করেছে পরিবেশ সচেতনতা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক উত্তরণ, বাজার ব্যবস্থা, আধুনিক ন্যায়-নীতি, সন্ত্রাসবাদ সহ নানা বিষয়। আধুনিক-উত্তর সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিকতার এই উপকরণ গুলির বর্তমান যৌক্তিকতা কি? এছাড়াও পাশ্চাত্য ভাবনা কিভাবে আজও দেশীয় সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে আছন্ন করে তুলেছে? – উপরিউক্ত সামাজিক ধারাকে প্রতিপাদন করতে আলোচ্য প্রশ্ন সমূহের সাপেক্ষে গবেষণা প্রবন্ধটির মূল পর্যালোচনাটি উপস্থাপন করা হল।

পর্যালোচনা:

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক রাজনীতি চর্চার আলোচনায় বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অনুসন্ধানে ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকালো মেকিয়াভেলির (Niccolo Machiavelly) সময় থেকেই ক্ষমতাকে রাজনীতি চর্চার মূল একক হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।[5] উত্তরাধুনিক চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো (Michel Foucault) -র মতে ক্ষমতার আঙ্গিকেই চর্চিত হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ক্রিয়া কৌশল। তিনি আরও বলেন ক্ষমতা সর্বব্যাপী এবং আধুনিক যুগে ক্ষমতায় আমাদের পরিচিতি কে তৈরি করেছে।[6] তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার এক অন্যতম প্রকরণ (Discourse) হিসাবে সংস্কৃতিকে দেখা যেতে পারে। সংস্কৃতি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে যেমন বিবেচিত হয় তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শাস্ত্রের পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় সংস্কৃতি নমনীয় ক্ষমতা কূটনীতির (Soft Power Diplomacy) প্রধান উপাদান হিসাবে চর্চিত হয়ে থাকে।[7] সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) মনে করেন আধুনিক জাতীয়তাবাদীদের সচেতন মূলক অভিলাষ হল তাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক।[8] র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) এর ধারণা অনুসারে সংস্কৃতি সামাজিক কাঠামোকে একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে সমাজে সংস্কৃতির পরিবর্তন কাঠামোর পরিবর্তনকেই নির্দেশায়িত করে। সুতরাং সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এক নয়া সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানের কথা বলা যেতে পারে। আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে বলেছেন আমরা আজ যেদিকেই দৃষ্টি দিই না কেন সকল স্থানেই শ্রমের বিভাজন দেখতে পাব যা 'সাংস্কৃতিক সমসত্ত্বতা' (Cultural Homogeneity) কেই তুলে ধরে।[9]

"The Structure of Society" গ্রন্থে মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী জে. লেভি. জুনিয়র (J. Levy Junior) সমাজ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একাধিক আন্তঃবিষয়ের মূল একক ও কেন্দ্রীয় সংগঠক ধারনার একটি গবেষণালব্ধ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেখানে উঠে এসেছে এ সকল সমাজ বিজ্ঞানের অন্তঃসার উপাদান (Core Matter) যা দ্বারা উক্ত আন্তঃবিষয়ক শাস্ত্র গুলির অধ্যয়নের পরিধি স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।[10] তবে আলোচনার খাতিরে বলতেই হয় যে, এই সকল শাস্ত্র গুলির কেন্দ্রীয় সংগঠক ধারণা ও মূল একক গুলি সব সময় একমাত্র একক হিসাবেই যে গৃহীত হবে তেমনটা বলা যায় না। আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না যে এগুলিকে বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট সমাজবিজ্ঞানগুলির সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝাই যাবে না। অতএব এদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ও মিথস্ক্রিয়ায় সংস্কৃতি যে এক উন্নততর দিগন্তের পথ নির্দেশক তা বলাই যায়। সংস্কৃতি সম্পর্কিত চর্চাটি সমাজতত্ত্বের মৌলিক বিষয় হিসেবে গবেষণামূলক ভাবে আলোচিত হচ্ছে তবে সংস্কৃতি সভ্যতার প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই সাহিত্যের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল তা একাধিক প্রাচীন পুঁথিপত্র, লেখ, শিলালিপি, ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে সংস্কৃতিকে দেখা হয় সামাজিক উত্তরাধিকার হিসাবে যেখানে প্রাধান্য পায় ব্যক্তি সমূহের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রচলন, আইন-কানুন, নীতি-নৈতিকতা, শিল্পকলা, মানবিক সামর্থ্য ও দক্ষতা সমূহ যেগুলি কোনো মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে। অন্যদিকে, সমাজ রাজনীতির আলোকে সংস্কৃতিকে দেখা হয় বস্তুগত, বৌদ্ধিক, আত্মিক এবং মানবিক ক্ষেত্র হিসাবে যা ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা ও ভাবের সঙ্গে সর্বাঙ্গীনভাবে যুক্ত। পরন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায় 'সংস্কৃতি' ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা

হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ও পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় সংস্কৃতিকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয় তা সমাজতত্ত্বের আলোচিত সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই আলাদা। রেমন্ড উইলিয়ামস (Raymond Williams) এর মতে 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থগুলির মধ্যে যেসব প্রশ্নগুলি এখন কেন্দ্রীভূত সেগুলোর অনেকগুলি সেইসব বিপুল ঐতিহাসিক পরিবর্তন থেকে উত্থিত যাদের প্রতিভূ হল শিল্প,ধর্ম, গণতন্ত্র এবং শ্রেণীর নিজেদের অর্থের মধ্যে পরিবর্তন। সংস্কৃতি ব্যক্তির সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বৌদ্ধিক ও আত্মিকতার সমাহার হিসাবে প্রদর্শিত হলেও বর্তমানে তা একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার কূটনীতির পরিচালনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে আর এভাবেই সংস্কৃতির মোড়কে যেকোনো ধারণাকে বিধিসিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এই ধারার আমদানী মূলত পশ্চিমী দেশ থেকেই অগ্রসর হতে শুরু করেছে। তবে বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি সামগ্রিক জীবনের পথ (a whole way of life) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[11] তবে তাঁদের এই বর্ণনাকে বিশ্লেষণ করলে যে সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়ে, তাতে দেখা যায় এখানে সংস্কৃতির আঙ্গিকে যে সামগ্রিক জীবনচর্চার কথা বলা হয়েছে তা সর্বতোভাবে কখনোই সমগ্র জীবন চর্চাকে দর্শায় না বরং সেখানে আলোচিত হয়েছে বিশেষীকৃত ধারণা, আর এভাবেই পশ্চিমী সংস্কৃতির ধারণায় এলিট শ্রেণীর বারংবার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাদের অগ্রসরকে সংস্কৃতি যে এক প্রকার গতি প্রদান করেছে তা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। কেননা পুঁজিবাদের হাত ধরেই বদলাতে শুরু করে উৎপাদন পদ্ধতি আর তারই প্রতিফলন দেখা যায় ব্যক্তি জীবনে। আগে যেখানে যে দ্রব্য বা সেবা এতদিন সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল তা পুঁজিবাদের প্রচেষ্টায় ব্যক্তি মানুষের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যেতে থাকে। আর এভাবেই সাধারণ মানুষ বস্তুতান্ত্রিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে ওঠে, যা ধীরে ধীরে এক বস্তুগত সংস্কৃতির অবলোকন করে। ইউরোপীয়দের আনুকূল্যে বঙ্গ সমাজেও এই বস্তুগত সংস্কৃতির আগমন ঘটে বাঙালী উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে যা আজ শুধুমাত্র সমগ্র বঙ্গ সমাজ নয়, অখণ্ড বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় প্রবাহমান। সুতরাং বলাই যায় পুঁজিবাদ নিয়ে আসে 'high leaving and plain thinking' মূলক এক গণসংস্কৃতি।[12] প্রখ্যাত পশ্চিমী মার্কসবাদী হার্বার্ট মারকিউস (Herbert Marcuse) তাঁর "One Dimensional Man"(1964) নামক গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন পশ্চিমী শ্রমিক শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশই প্রাগ্রসর পুঁজিবাদের অর্থ ব্যবস্থায় এবং সমাজে গঠিত হয়েছে আর সেটা কেবল ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির ফল হিসাবে ভোগের স্তরে নয়। সুতরাং পুঁজিবাদের এই গণউৎপাদনমুখীতা যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তাই কালক্রমে শাসনব্যবস্থার মোড়কে উপস্থিত হয়েছে অনুমোদন সিদ্ধভাবে অর্থাৎ উক্ত সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থার পরিচিতি। যেমন- পুঁজিবাদী সংস্কৃতি বলতেই উদারনৈতিক শাসন কাঠামোকেই দেখা হয়ে থাকে। এই ধরনের সংস্কৃতিকেই আন্তনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' (Passive Revolution) হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[13] তাঁর মতে পুঁজিবাদীরা তাদের এই সংস্কৃতির মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজে আধিপত্য কায়েম করেছে আর এভাবেই তাদের প্রভুত্ব কে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে এই সংস্কৃতিকে গণসংস্কৃতির (Public Culture) মাধ্যমে বিস্তারিত করার চেষ্টা করেছে।[14] গণসংস্কৃতিকে বৃহত্তর প্রসারে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে গণমাধ্যম। তবে শুধুমাত্র গণমাধ্যম ছাড়াও বেশ কিছু এমন ক্ষেত্র রয়েছে যা এই সংস্কৃতির প্রসারকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে এবং একই সাথে সাধারণ মানুষের জীবন প্রণালীর এক আবশ্যিক বিষয় হয়ে উঠেছে। উত্তর আধুনিক চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো (Michel Foucault) মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার এহেন প্রয়াস সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা কে ছন্দবদ্ধ

করার এক সুচারু কৌশল মাত্র। পর্যটন, ক্রীড়া, বিনোদন প্রভৃতি বিষয়গুলি এক সময়ে অভিজাতদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, ধীরে ধীরে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের হাতের নাগালে চলে আসায় পুঁজিবাদের গণমুখী সংস্কৃতির আরও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ও ডেভিড রিকার্ডো (David Recardo) -র মতো ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা অবাধ বাজার অর্থনীতির মডেলকে সামনে রেখে সামাজিক জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দ্বারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন যা এক প্রকার পুঁজিবাদী সংস্কৃতিরই শুভ সূচনা করে। আর এই সংস্কৃতিই হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদী সমাজের একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী শ্রেণী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকেই করায়ত্ত করেনি একই সাথে অভিন্ন ভাষা তৈরীর মাধ্যমে জনগোষ্ঠী গুলিকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছে এক অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson) এর মতে 'মুদ্রণ ধনতন্ত্রের' (Print Capitalism) মধ্য দিয়েই মুদ্রণ জগতে আসে এক গভীর পরিবর্তন, যার ফলে শুরু হয় মাতৃভাষায় বইপ্রকাশ তথা সাহিত্য চর্চা যা ব্যক্তিমানুষকে ভাবগত দিক থেকে কাছাকাছি নিয়ে আসে, উন্মেষ ঘটে জাতির।[15] আর এভাবেই বৌদ্ধিক, আত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রের সমাহার কাটিয়ে সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট সমাজ তথা জীবনধারার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে সুতরাং বলতে আর কোনো দ্বিধা নেই যে সমাজ সাহিত্যের সম্মেলনে সংস্কৃতি ও পরিচিতি হয়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক।

বিজ্ঞানের নবউদ্ভাবন, যুক্তিবাদের প্রসার, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং সর্বোপরি শিল্প বিপ্লব ও ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত সমাজের সর্বজনীন যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতার আদর্শ অবলম্বন করে এক অভূতপূর্ব বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্ব কে পর্যায়ক্রমে মানসিক অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে বেড় করে আনে। এই আধুনিক সময়পর্বে একদিকে যেমন ব্যক্তি সাধারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে থাকে তেমনি অন্যদিকে তাদের মননে ও চিন্তনে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটে, তার্কিক ও যুক্তিবোধের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যার ফলপ্রসূ সাহিত্য, চিত্রকলা, শিল্প, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা তথা সমাজনীতিতে আধুনিকতার বাতাবরণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালী সমাজে এই নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক প্রাণপুরুষদের অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। মহান চুক্তিবাদী রাষ্ট্র দার্শনিক জন লক (Jhon Locke) তাঁর "Two treaties of Civil Government" গ্রন্থে ব্যক্তি মানুষের তিনটি স্বাভাবিক অধিকারের উল্লেখ করেন। যথা - স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও জীবনের অধিকার যা রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এক নয়া দিক উত্থাপন করে।[16] অন্যদিকে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর আমলাতন্ত্রের ধারণায় বৈধতা যুক্ত ক্ষমতার ব্যাখ্যা করেন। [17] তবে উভয়ের রচনাতেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই যে প্রসারিত করা হয়েছে তা বলাই যায়। পক্ষান্তরে আধুনিকতার নামে যে সমাজব্যবস্থাকে চিত্রায়ন করে বুদ্ধিজীবী মহল তাতে সকল সাধারণ ব্যক্তি মানুষের সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার ছিল খুবই স্বল্প, সমাজ ব্যবস্থার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ ছিল এলিট শ্রেণীর হাতে, শুধু তাই নয় এই আধুনিকতার অন্যতম অবদান ছিল এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন যা আধুনিকতাবাদ (Modernity) কে আরও বৃহৎত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করে। মূলত ইউরোপের এই সামাজিক প্রেক্ষাপট কে ঘিরে পাশ্চাত্যে যে আধুনিকতার আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় তাকেই সমালোচনা করে উত্তরাধুনিকতাবাদ। উত্তরাধুনিক পর্বে রাজনীতিকে এক অর্থে "শাসনকার্যের শিল্প" বলে গণ্য করা

হয়। সেই অর্থে শাসনকর্ম বলতে ক্ষমতার পরিচালনাকেই বোঝায়। উত্তরাধুনিক ভাবনার প্রধান লক্ষণগুলি হল সত্য, অর্থ, পরিচিতি, অধিকার- এগুলির সকলের মূল্য এক ও অভিন্ন যা রাজনীতি তথা সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। পূর্বতন সমাজতাত্ত্বিকগণ সমাজতত্ত্বের যে ধারণা দিয়েছেন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে স্থায়িত্ব ও অনমনীয় স্থবির সমাজব্যবস্থার এক প্রকাশিত রূপ কিন্তু উত্তরাধুনিকতাবাদ এই সকল তত্ত্বকে বিনির্মাণের দ্বারা খারিজ করে। উত্তরাধুনিক চিন্তাবিদ জ্যাঁক দেরিদা (Jacques Derrida) তাঁর 'বিনির্মাণ তত্ত্বে' (Dconstruction Theory) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার Grand Narratives কেই ভাঙার তথা বিরোধিতার কথা বলেছেন।[18] উত্তরাধুনিক চিন্তার অধ্যয়নে যে রাজনৈতিক বিরোধিতার কথা বলা হয় তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রতি এক প্রতিবাদ স্বরূপ, আর এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই এক প্রকার ছক ভাঙ্গার ইঙ্গিত দিয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদ (Postmodernism)। ফরাসি উত্তরাধুনিক চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো (Michel Foucault)র মতে ক্ষমতার দ্বারায় জ্ঞান নির্মিত হয়। সমাজে সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে যুক্তি কোনো দক্ষতা দেখাতে পারে না। আসলে সত্য মিথ্যা নির্মাণে ক্ষমতার প্রভাব যেখানে বেশি সেটাই সত্য হিসাবে নির্দেশিত হয় আর যেখানে ক্ষমতার প্রভাব নেই বললেই চলে তা মিথ্যা রূপে পরিগণিত হয়।[19] একইভাবে সংস্কৃতির পরিমন্ডলেও ক্ষমতার প্রভাব বিদ্যমান আর তার কারণেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে প্রাচ্যের তুলনায়। সুতরাং সংস্কৃতির মাধ্যমে যে পরিচিতির সৃষ্টি হয়েছে সেখানে একই নিয়ম চালু রয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্যও যে সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে মুখবন্ধ রূপে বিরাজমান তা কোনো ভাবেই অনস্বীকার্য নয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রচিন্তার অধ্যয়নে যথাক্রমে সংস্কৃতি ও ক্ষমতা ভাবগত উপাদান হিসাবে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান, অবশ্য সাহিত্যের আলোকবর্তিকায় উভয় ক্ষেত্রই আরও এক ধাপ সুষ্ঠু সমাজ নির্মাণের দিকে অগ্রগতি লাভ করে।

উপসংহার:

সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। নদীর মতই সে আপন বেগে নিরন্তর ঘটে চলা অভ্যন্তরীণ ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত কে সঙ্গে নিয়ে সদা চলমান। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে একাধিক বার তবুও তার যাত্রা কখনই থেমে যায়নি। সমাজের সঙ্গে মিল রেখেই অগ্রবর্তী হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা যা সমাজ ব্যবস্থারই বৃহত্তর রূপ। সমাজের প্রতিবিম্ব রূপে আবির্ভূত সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প সকলেই নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। কেউই নিয়ম বহির্ভূত নয়। সেইরূপ আধুনিক সমাজে যে ধরনের সাহিত্যের চর্চা হয়েছে তা বিবর্তনের পটভূমিতে সমালোচিত হয়েছে বহুবার, তবে সেই শূন্য স্থান অধিকার করেছে বর্তমানের আধুনিক-উত্তর ভাবনা দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম। প্রবন্ধে উল্লিখিত আধুনিক-উত্তর ভাবনার অধ্যয়নে পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে বঙ্গ সমাজেও যে এই ভাবনার সূত্রপাত হয়নি তা বলা যাবে না। আধুনিক কবি শঙ্খ ঘোষের অনবদ্য সৃষ্টি "মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে" কবিতায় উঠে এসেছে ভোগবাদী সমাজের প্রচার কৌশলের অতিরঞ্জিত ব্যবস্থাপনা।[20] আধুনিক সমাজ সৃষ্ট প্রচলিত স্থবির ধারণা গুলি কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছে আধুনিক-উত্তর ভাবনার পৃষ্ঠপোষক তসলিমা নাসরিনের লেখনীতে। সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিবর্গের শোষণ, অবিচার, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, বুদ্ধিজীবীদের স্তাবকতা ও বিবেকহীনতা বর্ণিত হয়েছে আধুনিক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত "উলঙ্গ রাজা" কবিতায়, যা আজও বঙ্গ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত।[21] সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবিম্ব হিসাবে উপস্থিত সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবই এক আদর্শ সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে উৎকৃষ্ট অবদান রাখে, যার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয় জাতির নিজস্ব পরিচিতি। একই সাথে আধুনিক

ভাবধারার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য যেমন নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতিপালন করে তেমনি আধুনিক উত্তর দর্শনের আনুকূল্যে সেই আধুনিক মতাদর্শের সমালোচনাও করে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson) তাঁর 'Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism' প্রবন্ধে জাতি অর্থে সামাজিক ভাবে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীকে বর্ণনা করেছেন।[22] তাঁর মতে জনসমাজের সকল ব্যক্তি মানুষ প্রধানত ভাষা, গণমাধ্যম ও শিক্ষার মতো সাংস্কৃতিক অনুশীলন দ্বারা জাতিগত পরিচিতি নির্মাণ করে যা মূলত একটি দার্শনিক প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটায়। মূলত এ সকল দার্শনিক প্রত্যয়ই এক একটি ধারাবাহিক আখ্যান (Narratives) রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। আধুনিক-উত্তর ভাবনা সর্বদা এই ধারাবাহিক আখ্যান গুলির যৌক্তিকতাকেই চ্যালেঞ্জ জানায়।

তথ্যসূত্র:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯০৮-১৯১০), গোরা, কলকাতা, প্রবাসী পত্রিকা।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০০৯), "সভ্যতার সংকট" *আবশ্যিক বাংলা পাঠ সংকলন*, কল্যাণী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩০-৩৪।
3. চক্রবর্তী, শিবরাম (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), দেবতার জন্ম, কলকাতা, রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন, পৃ.১২-২১। https://archive.org/details/in.ernet.dil.2015.455432/mode/1up
4. সিংহ, কালী প্রসন্ন (১৩৬২ বঙ্গাব্দ), হুতুম প্যাঁচার নকশা, কলকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন।
5. Gauba, O.P. (2018), Western Political Thought, New Delhi, Mayur Books, PP. 94-96.
6. Foucault, Michel. (1980), Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977, Phantheon Books, pp. 109-133.
7. Jiyoon, KIM, et al. (2015), "Soft Power Competition." *Measuring A Giant: South Korean Perceptions of the United States*, Asan Institute for Policy Studies, pp. 23–28. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/resrep20692.7. Accessed 25 May 2023.
8. Gellner, Ernest. (1995), Culture, Identity and Politics, New York, Cambridze University Press, p. 10.
9. Ibid., p. 19.
10. মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য (২০০৪), "সংস্কৃতি ও রাজনীতি", *রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি,* সত্যব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, প্রকাশন একুশে, পৃ.২৯৩।
11. তদেব, পৃ.৩০১।
12. তদেব, পৃ.৩০৫।
13. Morton, Adam David. (2007) Waiting for Gramsci: State Formation, Passive Revolution and the International, Millennium – Journal of International Studies, pp. 607-609. https://doi.org/10.1177/03058298070350031301
14. Ibid., pp. 613-661.
15. Anderson, Benedict. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, PP. 45-46.
16. Gauba, O.P. (2018), Western Political Thought, New Delhi, Mayur Books, P. 137
17. Blau, Peter M. (1963), Critical Remarks on Weber's Theory of Authority, The American Political Science Review, Vol. 57, No. 2, pp. 314-316. *JSTOR,* http://www.jstor.org/stable/192824

18. Leledakis, Kanakis. (2000) Derrida, Deconstruction and Social Theory, European Journal of Social Theory 3(2), pp. 175-193.
19. Foucault, Michel. (1980), Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977, Phantheon Books, pp. 109-133.
20. ঘোষ, শঙ্খ (১৯৮৪), মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। https://www.ebanglalibrary.com/102439/
21. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (১৯৭১), উলঙ্গ রাজা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। https://www.ebanglalibrary.com/13442/
22. Anderson, Benedict. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, PP. 40.

সমাজভাষার আলোকে আফসার আমেদের ত্রয়ী (‘জিন্নত বেগমের বিরহমিলন’, ‘গোনাহ্’, ‘আদিম’) গল্পের ভাষাবৈশিষ্ট্যের নবরূপায়ণ

অর্পিতা ভুঁই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
তাপস রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ নিঃসন্দেহে একজন ভাষা সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্পভুবনের ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে সমাজভাষা প্রয়োগের অনন্যতা ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মীতা তাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় অনন্য একজন শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অপরদিকে তিনি একজন সমাজ সচেতন সাহিত্যিকও। তাঁর গল্পে বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের সামাজিক চিত্র, অর্থনৈতিক সংকট ও মুসলিম নারীদের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক চিত্র ফুটে উঠেছে। ভাষা ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। ভাষা কখনো সমাজ নিরপেক্ষ হতে পারে না। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের এই আপ্ত বাক্যকে বিনম্র চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর গল্পে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা (নারীর ভাষা বা Women Language, ধর্মের ভিন্নতা অনুযায়ী ভাষাবৈচিত্র্য (Religion Variety) এবং অপভাষা বা Slang Language এর প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর গল্পমালার ‘জিন্নত বেগমের বিরহমিলন’, ‘গোনাহ্’, ‘আদিম’ এবং ‘হাড়’ প্রভৃতি গল্পের ভাষাবৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খকভাবে বিচার ও অর্ন্তর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজভাষার নিখুঁত ও নিটোল প্রয়োগ সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে।
মুলশব্দ: সমাজভাষা, নারীর ভাষা, ধর্ম, অপশব্দ এবং বৈচিত্র্যতা।

মূল আলোচনা:

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ সমাজভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন সার্থক শিল্পী। বাংলা ছোটগল্পের জগৎ যেমন বিষয়গত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে বৈচিত্র্যলাভ করেছে তেমনি ভাষাগত দিক থেকেও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। ভাষাগত বৈচিত্র্যতার ক্ষেত্রে আফসার আমেদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আফসার আমেদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হল, সেই অধ্যায়ের নাম সমাজভাষা। ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব রীতি বা স্টাইল ব্যবহার করেছেন, যা বাংলা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিরল ও অভিনব। তাঁর সমাজভাবনা এবং সমাজভাষা যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে তাঁর সাহিত্যে। এখানেই ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যতা ও স্বাতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি ভাষা এবং সমাজকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করেননি তাঁর গল্পভুবনে যে সমাজের সমাজভাষা উঠে এসেছে, তা হল হাওড়া জেলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজের সমাজভাষা ও নারীর ভাষা বা Women Language। তাঁর গল্পভুবনের মূল ভিত্তি হল সমাজ বাস্তবতা। তিনি মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের মানুষজনকে ও তাদের ভাষাকে খুব অন্তরঙ্গ

ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই মুসলিম সমাজের সমাজভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এক সুদক্ষ সৈনিক। আফসার আমেদের ছোটগল্প-র ভূমিকায় অমলেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "আফসার সর্বাংশে গ্রামের ছেলে। বর্ষার কাদায় শীত গ্রীষ্মের ধুলোয় পা ডুবিয়ে হাঁটা তার আজন্ম অভ্যাস।.....অন্যদের যেখানে গিয়ে পৌঁছতে হয়, আফসার আমেদ সেখানে আজন্ম বর্ধিত হয়ে উঠেছে উদ্ভিদ বা বৃক্ষের আদলে। যে মানুষগুলি তার চরিত্র, ব্যক্তিগত জীবনাচরণে তাদের অনেকের হয়ত স্বজন প্রতিবেশী"।[১] প্রত্যক্ষ দর্শন ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমাজভাষার এত নিপুণ বিন্যাস সম্ভব হতো না। হাওড়া জেলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজকে তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাছের কাঁটার মতো চিরে চিরে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর গল্পের ভাষাবুননে সমাজভাষার নিঁখুত বিন্যাস সে কথায় প্রমাণ করে। মূলত তাঁর গল্পে সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে কয়টি শাখা গুরুত্বপূর্ণ বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলি হল- ধর্ম, অপভাষা বা Slang Language এবং সর্বোপরি নারীর ভাষা বা Women Language। তিনি সমাজভাষার কত বড় দক্ষ ও নিপুণ সৈনিক, তাঁর গল্পজগতের ভাষাবয়নে ব্যবহৃত নারীদের একান্ত ব্যতিক্রমী ভাষা গালি-গালাজ, কটুক্তি, রসিকতাময় বাক্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ সে কথায় প্রমাণ করে।

আফসার আমেদের গল্পে সমাজভাষার নিপুণ প্রয়োগ দেখাতে গেলে গল্প-মধ্যস্থিত সংলাপের নিরীখে বিচার করা আবশ্যক। এইজন্য তাঁর গল্প সম্ভার থেকে তিনটি গল্প নির্বাচন করে নিয়েছি। সেই তিনটি গল্প হল-জিন্নত বেগমের বিরহমিলন, আদিম এবং গোনাহ্। এই তিন গল্পের ভাষাশৈলীর মাধ্যমে সমাজভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব।

'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পটি সমাজভাষা প্রয়োগ বৈচিত্র্যের এক সার্থক নির্দশন। বিশেষত 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পটিতে মুসলিম নারীদের অসহায়তা, শোষণ, হৃদয়-বিদীর্ণ করা মর্মবেদনা ও অন্তর বেদনার কথা উঠে এসেছে। এই মুসলিম সমাজর নারীরা একাকী এবং অন্তর বেদনায় ক্ষত বিক্ষত। লেখক শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন মুসলিম সমাজের নারীদের হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন, তাদের ব্যবহৃত সমাজভাষার দ্বারাই। তিনি কৃত্রিম ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার প্রয়োগ ঘটান নি। ফলে চরিত্রগুলি আরও জীবন্ত, সজীব ও সতেজ হয়ে উঠেছে। লেখক তাঁর মননের ভাষাকে ব্যক্ত করেছেন গল্পের চরিত্রগুলির দ্বারা। 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পে আফসার আমেদ মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের নারীদের অন্দরমহলে তিনি পদার্পণ করেছেন এবং মুসলিম নারীদের মনের অন্তঃগহনে লুকিয়ে থাকা ভাষাকেও তিনি অবলীলাক্রমে তাঁর ভাষাশৈলীতে প্রকাশ করেছেন।

'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পে নারী-মনস্তাত্ত্বিকতাকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই গল্পে মুসলিম নারী সমাজের কথ্যভাষা, মৌখিক ভাষা, নিম্নমানের গালি-গালাজ, মেয়েলী টার্ম, কটুক্তি সমস্ত কিছুকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গল্পের ভাষাশৈলীতে স্থান দিয়েছেন। গল্পের ভাষাবুননে সমাজভাষা ব্যবহারের ফলে লেখকের চরিত্রগুলি কৃত্রিমতার রঙে রঙীন হয়ে উঠেনি, হয়ে উঠেছে সমাজ বাস্তবতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পের ভাষাশৈলীতে সমাজভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেগুলি হল- আঞ্চলিক উপভাষা, নারীর ভাষা বা Women Language, অপভাষা বা Slang Language এবং ধর্ম-বৈচিত্র্যতা বা Religion Variety। আফসার আমেদের গল্পের মূল ভিত্তি হল সমাজ বাস্তবতা। এই গল্পের পটভূমি মুসলিম নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণা, সামাজিক শোষণ, অনুশাসন ও নিপীড়নের এক মর্মান্তিক জীবন আলেখ্য। 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পে লেখক সমগ্র মুসলিম সমাজের নারীর মর্মযন্ত্রণা ও হৃদয়বেদনাকে কুলশন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করাতে চেয়েছেন। এ

যেন কুলশন বিবির একার মর্মযন্ত্রণা নয়, গোটা মুসলিম অধ্যুষিত নারী সমাজের হৃদয়স্পর্শী মর্মযন্ত্রণা। ‘জিন্নত বেগমের বিরহমিলন’ গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু হল মুসলিম নারীদের দীর্ঘ সময়ব্যপী স্বামী সঙ্গ পরিত্যাগ করে থাকার এক দুঃসহ হৃদয় বেদনা। এমনকি সন্তান–সম্ভবা অবস্থাতেও তাঁরা স্বামী পরিত্যক্ত। এই গল্পের পুরুষেরা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলে পাড়ি দেয়। এ যাত্রা অনির্দিষ্টকালের যাত্রাতে পরিণত হয়। শহরে গিয়ে ভিন্ন জীবনধারায় তাদের মনন থেকে স্ত্রী ও সন্তানের প্রতিচ্ছবি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু প্রতিটি নারী তাদের প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশ্যে অন্তহীন অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। সপ্তাহের অন্তে কারও বা অপেক্ষার অবসান ঘটে, আর কারও বা নতুন করে অপেক্ষার প্রহর গোনা শুরু হয়।

নিম্নে জিন্নত বেগমের বিরহমিলন গল্পে সমাজভাষার কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ শাখার প্রতিফলন ঘটেছে, তা নিম্নে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব। গল্পটি পটভূমি যে মুসলিম সমাজের আধারে রচিত তা বেশ কয়েকটি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে সুস্পষ্ট। যেমন– পানি (জল), জিন্দা (জীবিত), পীর (মুসলিমদের আরাধ্য দেবতা), গোর (কবর), বিবি (স্ত্রী বা বৌ), নশিব (ভাগ্য), পোলা (সন্তান বা ছেলে) প্রভৃতি। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ধর্মের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বৈচিত্র্যের প্রগাঢ় সম্পর্ক বর্তমান। ধর্মের বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ভাষার যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, একথা পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী মেকলে ১৯৭৭ সালে প্রথম এই ধারণার প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষাবিদ রাজীব হুমায়ুন মত প্রকাশ করেছেন যে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্মবলম্বীদের মধ্যে সূক্ষ ভাষাগত বৈচিত্র্য বর্তমান।[২] ‘জিন্নত বেগমের বিরহমিলন’ গল্পে সমাজভাষার কতটা প্রতিফলন ঘটেছে, তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব।

১) “কোন্ মিনসে পরের দিকে তাকায় না গ।
আ মরণ, সারাবছর রস দিতে পারে নাই কেনে?”[৩]

- ‘মিনসে’, ‘আ মরণ’ শব্দ দুটি একান্তভাবেই নারীর ভাষা। পুরুষ কতৃক এই শব্দ দুটি একেবারেই অনুচ্চারিত। বিশেষত গ্রামীণ সমাজে অশিক্ষিত, সংস্কারহীন নারীরা স্বামীকে ‘মিনসে’ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে থাকে। ‘আ মরণ’ শব্দটি বয়স্কা নারীমহলে বিশেষভাবে প্রচলিত।

২) “ও লো কটিটার মুখে চুমু খা লো, মায়ের গাল লাগবে নি”।[৪]

- উপরোক্ত অংশে ‘লো’ শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই ‘লো’ শব্দটি একান্তভাবেই নারীর ভাষা। ফরাশি ঐতিহাসিক রোশফোর বলেছেন, “পুরুষের এমন কিছু নিজস্ব অভিবাচন আছে যা নারীরা বোঝে কিন্তু নিজেরা তা কখনো বলে না। অপরদিকে নারীদেরও কিছু নিজস্ব শব্দ এবং পদচয় আছে, যা পুরুষেরা কখনো ব্যবহার করে না”। এখানে ‘লো’ শব্দটি একান্তই নারীর নিজস্ব অভিবাচন, যা পুরুষের দ্বারা কখনো উচ্চারিত হয় নি।

৩) “মানুষজন কেউই খবর দিল নাই তবু মরদটা আইসেছে।
ওলো সই, তোর ভাতার রঙদার হইয়ে এইসেছে”।[৫]

- উপরোক্ত অংশে ‘মরদ’ শব্দটি একান্তভাবেই মেয়েলী সমাজের ভাষা। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজের মহিলারা নিজের স্বামীকে ‘মরদ’ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে। ওড়িষ্যাতে মহিলারা নিজের স্বামীকে ‘ঘইতা’ বলে সম্বোধন করে। পশ্চিম বাংলায় যার আক্ষরিক অর্থ হল ‘স্বামী’। এই রীতি আদিবাসী মহিলা সমাজেও বহুল প্রচলিত। ‘সই’ শব্দটি নারীদের অন্দরমহলে

ব্যবহৃত মেয়েলী শব্দ। 'সই' শব্দটি কখনোই পুরুষ কতৃক উচ্চারিত হয় না, এটি একান্তভাবেই নারীর ভাষা বা Women Word।

৪) "হ্যালা সাতভাতারি মাগি, নাক টিপলে ছটির দুধ বেরবে, ভাতার শিখাচ্ছিস মোকে"।[৬]

- এখানে 'সাতভাতারি মাগি' শব্দটি একটি অপশব্দ বা Slang Language। এটি সমাজভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

  -'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন গল্পে সাহিত্যিক আফসার আমেদের নারীর ভাষা বা Women Language এর উপর দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা অসাধারণত্বের দাবী রাখে। এই গল্পের ভাষাশৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত নারী সমাজের ভাষা এবং মেয়েলী টার্ম। নিম্নে গল্প মধ্যস্থিত গল্পে কয়েকটি মেয়েলি টার্ম তুলে ধরার চেষ্টা করব। তবে এই টার্মগুলি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত। যেমন–১) 'কে ছোটকি লয়'?, ২) 'সব্বনাশী, মরদগুলানকে আঁচলে বাঁধতে হয়, জানিস না কি লা'? ৩) 'ওগো হাসিনার বাপ' ৪) 'ওলো মাগি' ৫) 'আ লো তোর ব্যাটা হইচে' ৬) 'যাই লো সই' ৭) 'মর শহুরে মাগি'। এই বাক্য বা টার্মগুলি নারীর একান্ত নিজস্ব অভিবাচন বা পদচয়। যা পুরুষ কতৃক কখনো উচ্চারিত হবে না। নারীর এই নিজস্ব ব্যবহৃত টার্ম বা পদচয়ের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজভাষাবিজ্ঞানী রোশফোর গুরুত্বপূর্ণ মতামত পোষোণ করেছেন।

৫) "রাইত থিকে ব্যাথা খাইছিস মাগি, ব্যাটা বিয়োবি নাকি লা? পা দিয়া ক্যাঁতাক ক্যাঁতাক লাথি মারে"[৭]। (আঞ্চলিক উপভাষার রূপ)

- "রাত থেকে এতো ব্যাথা হচ্ছে তোর, ছেলে প্রসব করবি না কি? পা দিয়ে ক্যাঁতাক ক্যাঁতাক লাথি মারে"। (আদর্শ বাংলা ভাষার রূপ)

উপরোক্ত বাক্যটি যে আঞ্চলিক উপভাষার লেখ্যরূপ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মূলত হাওড়া অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত নিম্নবর্গীয় সমাজের সমাজভাষা আফসার আমেদের সাহিত্যে অঙ্গনে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। 'বিয়োবি' শব্দটি অত্যন্ত নিম্ন সামাজিক শ্রেণীর মেয়েলি সমাজের ভাষা। মান্য বা শিষ্ট চলিত বাংলা ভাষায় 'বিয়োবি' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'সন্তান প্রসব করা'। অশিক্ষিত, অন্ত্যজ ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে অত্যন্ত নিম্নরুচিসম্পন্ন নারী সমাজ 'বিয়োবি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। 'মাগি' শব্দটি একটি অপশব্দ বা Slang Word এর উদাহরণ। কিন্তু মধ্যযুগে 'মাগ' বা 'মাগি' শব্দটিকে অপভাষা বা Slang Language বলে গণ্য করা হতো না। কিন্তু বর্তমান শিষ্ট বাংলার পরিমণ্ডলের আবেষ্টনীতে অতি আধুনিক নাগরিক সমাজে 'মাগ' শব্দটিকে অপশব্দ বলে গণ্য করা হয়।

৬) 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পটি যে মুসলিম অধ্যুষিত সামাজিক পরিমণ্ডলে তা বেশ কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে সেই মুসলিম সমাজের শব্দগুলি তুলে ধরার সাথে সাথে হিন্দু সমাজের সাথে মুসলিম সমাজের ভাষাগত বৈপরীত্যের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। বাংলা সাহিত্যে রাজীব হুমায়ুন ১৯৯৩ সালে প্রথম ধর্মগত দিক থেকে ভাষা বৈচিত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেন।[৮]

৭) 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' গল্পে বেশ কয়েকটি বিরল সমাজভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলি হল- ১) পুতা - (নাতি বা নাতনী) ২) ঝরোকা – জানালা বা জানলা ৩) ঢ্যাঙা - (অতিরিক্ত লম্বা), মাগ (পত্নী), ৪) রা কাড়তে পারচি নি – কথা বলতে পারছি না, ৫) ছ্যাঁওড়দের – ছেলেমেয়েদের ৬) রঙদার – ফর্সা রঙ।

৮) "এই আটকুঁড়ির ব্যাটা তাইকে আছিস কেনে, অমন পারা তোর মা বুনের দিকে তাইকে থাকবি"।[৯]

- এই 'আটকুঁড়ি' শব্দটি একান্তভাবেই গ্রামীণ সমাজের মেয়েলি সমাজভাষা। 'আটকুঁড়ি' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'সন্তান ধারণে অক্ষম নারী'। প্রত্যন্ত, অশিক্ষিত, ও নিম্নরুচিসম্পন্ন গ্রামীণ সমাজে বন্ধ্যা নারীকে 'আটকুঁড়ি' বলে সম্বোধন করা হয়।
- আফসার আমেদের 'গোনাহ্' গল্পটি মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের সমাজভাষা নির্ভর গল্প। গল্পটির প্রকাশকাল ১৯৮০ সালে পরিচয় পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়।[১০] 'গোনাহ্' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পাপ। হিন্দু ধর্মে যাকে পাপ বলে অবিহিত করা হয়, মুসলিম সমাজে তাকেই বলা হয় 'গোনাহ্'। 'গোনাহ্' গল্পের মাধ্যমে লেখক পাপ এবং পুণ্যের বৈপরীত্যের চিত্রটি অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'গোনাহ্' গল্পে সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছে, সেগুলি হল-ধর্মীয় দিক থেকে ভাষাবৈচিত্র্য, সমাজোপভাষা এবং অপভাষা বা Slang Language।
- গল্পের মূল চরিত্র হল ফরিদা। ষোলো বছর বয়সী ফরিদার দেহ এবং দৈহিক শ্রম ব্যবহৃত হয় নানান কাজের মাধ্যমে। গল্পের মূল সুর হল আর্থ সামাজিক শাসন ব্যবস্থায় নারীর শোষিত হওয়া। একদিকে ফরিদার দৈহিক শ্রমের উপর নির্ভর করে কাজী পরিবারে চা-পান-শরবৎ এবং নাস্তা তৈরী হয়। আবার অন্যদিকে কাজীর বড়ছেলে মালেক সুযোগ পেলেই ফরিদার সাথে মৈথুনে রত হয়ে দৈহিক চাহিদা মেটাতে চায় মালেক। ফরিদার কাছে তাদের এই অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গোনাহ্ বা পাপ বলে হলেও, মালেকের অন্তর চেতনায় তা পাপ বলে প্রতিপন্ন হয় না

১) গল্পের সামাজিক পটভূমি যে মুসলিম সমাজের আধারে রচিত এবং চরিত্ররা যে মুসলিম অধ্যুষিত সমাজের প্রতিনিধি, তা কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উল্লেখের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন - পানি-জল, আল্লা - মুসলিম জনসমাজের আরাধ্য দেবতা, কাজী, মেহমান - আত্মীয়-স্বজন, নামাজ - প্রার্থনা, রোজা - উপবাস প্রভৃতি। সুতরাং ধর্মের ভিন্নতার সাথে সাথে ভাষারও যে ভিন্নতা সূচিত হয়, তা প্রমাণিত।

২) "অনেকে বলে আল্লা আছে। আল্লা সব জায়গাতেই আছে। এই এখানে বুকের মধ্যে বাস"।[১১]

- এই 'আল্লা' শব্দটি মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত। 'আল্লা' হল মুসলিম সমাজের আরাধ্য দেবতা। হিন্দুরা যে আরাধ্য দেবতাকে ভগবান বা ঈশ্বর বলে অবিহিত করে, মুসলিম সমাজ তাকেই আল্লা বলে অবিহিত করে। যার আক্ষরিক অর্থ হল স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

৩) ফরাশি ঐতিহাসিক রোশফোর এর মতে, "নারীদের নিজস্ব কিছু অভিবাচন, শব্দ এবং পদচয় আছে, যা পুরুষেরা কখনো ব্যবহার করে না"।[১২] 'গোনাহ্' গল্পে এমন কিছু অভিবাচন এবং টার্ম ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি বিশেষত নারী সমাজ বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও শিক্ষাহীন নারী সমাজের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

যেমন- ১) 'হেলা তোর বেটার বে দে না' ২) রূপ লিয়ে কী করবি লা মাগী, গুণ দেখবিনি?' এই টার্মগুলি নারী সমাজে প্রচলিত। পুরুষদের দ্বারা এই টার্মগুলি কখনোই উচ্চারিত হবে না।

৪) "মাগীর তাগড়া মরদ দরকার। একদিন ত জহুরের চোখে পড়ে গেল"।[১৩]

উপরোক্ত সংলাপটি যে আদর্শ বাংলা ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার আধারে রচিত নয়, সে ধারণা সুস্পষ্ট। ভাষার দ্বারা চরিত্রগুলির সামাজিক শ্রেণী, লিঙ্গ-বৈষম্য সহজেই নির্ধারণ করা যায়। 'মরদ' এবং 'ছোঁড়া' এই শব্দ দুটি একান্তভাবেই নারীর নিজস্ব সমাজভাষা। অশিক্ষিত, নিম্নমানের, কদর্য রুচিসম্পন্ন নারী সমাজে 'মাগী', 'মাগ', 'ছোঁড়া', 'মরদ' এই অপভাষা বা Slang Language ব্যবহৃত হয়েছে অধিক পরিমাণে।

'গোনাহ্' গল্পটি যে প্রত্যন্ত গ্রামীণ মুসলিম অধ্যুষিত সমাজ অবলম্বনে রচিত তা কয়েকটি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে প্রমাণিত। যেমন – ছাঁচতলা, হেসেল, আঁটকুড়ির বেটা, মরদ এবং এগনা প্রভৃতি। 'এগনা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল 'আঙ্গিনা'। গ্রামীণ সমাজে আঙ্গিনা শব্দটির বিকৃতকরণ করে এগনা বলা হয়। এই আঙ্গিনা বা এগনাকে ওড়িয়া ভাষায় বলা হয় 'দাঁড়বাহার'।[১৪]

'গোনাহ্' গল্পে বেশ কয়েকটি বিরল সমাজভাষার নির্দশন পাওয়া যায়। সেগুলি নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেমন- ১) গোনাহ্ - পাপ ২) জেনা – অবৈধ যৌনাচার।

আফসার আমেদের 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প সংকলনের' একটি ভিন্ন স্বাদের গল্পের উদাহরণ হল 'আদিম' গল্পটি। এই গল্পের কাহিনী বিন্যাসে মানুষের জীবন প্রবাহে কোনো জটিলতা নেই। গল্পটির সূচনা হয়েছে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর। 'আদিম' গল্পে এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বির্পযয়ের ফলে গল্পের মূল চরিত্র কায়েম আলির স্বচ্ছ, নিত্য প্রবহমান দৈনিক জীবনস্রোতে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কায়েম আলির পিতা তাঁর চেয়ে বয়েসে কনিষ্ঠা আজনগাছির সাবেরাকে বিয়ে করে তাঁর প্রেমশূন্য দাম্পত্য জীবনে নতুন করে প্রেমময় রসময় দাম্পত্য জীবনের আস্বাদ পেতে চেয়েছেন।

অসম বয়সে পিতার অল্প বয়সী মেয়েকে বিবাহের ফলে সন্তান কায়েম আলিকে প্রতিবেশীদের কটাক্ষ, জ্বালাময়ী তীক্ষ্ণ বাক্য, বিদ্রুপ বাণীতে বিদ্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু কায়েম আলি উদার উন্মুক্ত মানসিকতার অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর বিবাহ নিয়ে কায়েম আলির মনে কলুষতার বীজ বপন করতে চাইলেও কায়েম আলি তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আফসার আমেদ গ্রামীণ মুসলিম সমাজভাষার সুদক্ষ সৈনিক। তাঁর গল্পে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের সমাজভাষার প্রতি তিনি যতটা আত্মিক, অন্যান্য লেখক যেমন-কামাল হোসেন, আবুল বাশার, হুমায়ুন আহমেদ এবং আনসারউদ্দিন প্রভৃতি মুসলিম লেখকদের গল্পের ভাষাশৈলীতে সমাজভাষার ততটা আত্মিকতা পরিলক্ষিত হয় না বা পরিক্ষিত হলেও তাঁর প্রভাব অনেকটা ম্লান বা পানসে। আফসার আমেদের গল্পের ভাষাশৈলী সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি গ্রামীণ মুসলিম সমাজের নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যজ এবং সাব অলটার্ন শ্রেণীর মানুষের ছন্দে পা মেলাতে চেয়েছেন, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি সমাজ ও সমাজের মানুষের ভাষাকে আলাদা ভাবে প্রতিপন্ন করতে চাননি। ফলে তাঁর গল্পভুবনের চরিত্রগুলি কৃত্রিমতায় পর্যবেশিত হয় নি। বিশেষত সমাজভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি আফসার আমেদের গল্পের ভাষাশৈলীতে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, তা হল গ্রাম্য নারীর ভাষা বা Rural-area Women Language। তাঁর 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প সংকলনের' মধ্যে আদিম, জনস্রোত জলস্রোত, গোনাহ্, 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' এবং হাড় এই গল্পগুলির ভাষাশৈলীতে নারীর ভাষা বা Women Language এর ব্যপক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

আফসার আমেদ নারী মনস্তাত্বিকতাকে খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গ্রামীণ মুসলিম নারী সমাজের কথনভঙ্গি, সুর, বিশেষ বিশেষ নারী কতৃক ব্যবহৃত টার্ম, শব্দ এবং

শব্দগুচ্ছকে তিনি তাঁর সাহিত্যে আন্তরিকতার সঙ্গে স্থান দিলেন। নারীর ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর।

১) "হ্যালা তোকে কে দেখেছে লো-বউ হয়ে মাথা কেটেচিস"!
"আহা তুই নতুনবেলা কী করেছিলি লা?"
"তোর তো ছেলে লো"।[১৫] (আদিম/ আফসার আমেদ)।

- উপরোক্ত সংলাপে 'ওলো', 'হ্যালা', 'লো', 'লা' প্রভৃতি শব্দগুলি একান্তভাবেই নারীর ভাষা বা Women Language। সমাজভাষাবিজ্ঞানী য়েসপেরসেন প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী পুরুষের ভাষার প্রভেদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ফরাশি ঐতিহাসিক রোশফোর বলেছেনঃ "নারীদেরও কিছু নিজস্ব শব্দ এবং পদচয় আছে, যা পুরুষেরা কখনো ব্যবহার করে না, ব্যবহার করলে তা হাস্যস্পদ বলে বিবেচিত হবে"।[১৬]

২) "রশিদের মা মাথায় কাপড় তুলে দেয়। যা লো বুবু, মরদ ডাকছে"।
"তোকে কুনু বেগানা মরদ ধরতে এল যেন?"[১৭]
"নিজের মরদ সাবেরাকে এই অবস্থায় দেখেনি বারেক"। (আদিম/আফসার আমেদ)

- এখানে 'মরদ' শব্দটি একান্তভাবেই নারীর ভাষা। বিশেষত নিম্নবৃত্ত পরিসরে অশিক্ষিত, সংস্কৃতিহীন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম্য নারী কতৃক উচ্চারিত। অতি আধুনিক কলকাতার উচ্চ অভিজাত পরিবারের নারীরা নিজের স্বামীকে ইংরেজি শব্দ Husband বলে সম্বোধন করে, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা নিজের স্বামীকে স্বামী বা বর প্রতিশব্দ দ্বারা সম্বোধন করে। কিন্তু প্রান্তিক বা অন্ত্যজ শ্রেণীর সামাজিক ধারায় বিশেষত সাঁওতাল, আদিবাসী, পাহাড়ি জনজাতির মধ্যে নারীরা তাঁদের স্বামীকে 'মরদ' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে।

৩) "ওই সই ঘরকে যেয়ে নিদ যাবি।
এই আঁধারে কে বলবে দুই শাশুড়ি পুত্রবধূ বসে আছে? দুই সই?"

- উপরোক্ত অংশে 'সই' শব্দটি একান্তভাবেই গ্রামীণ অঞ্চলে নারীর (বিশেষত কিশোরী, যুবতীর) ভাষা। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে একজন যুবতী বা কিশোরী মেয়ে অপরজনের কাছে খুব প্রিয় বা হার্দিক সর্ম্পকে জড়িত হলে একে অপরের সাথে সই পাতাতো। তারপর থেকে একে অপরকে নামের পরিবর্তে 'সই' বলে সম্বোধন করত। তাই 'সই' শব্দটি একান্তভাবেই নারীর ভাষা বা Women Language।

৪) "কুটুম এইচে?"
'দ্যাখো দিকি কত রাত হল-কুটুমমানুষ এখুনো খেলনি। তুমি কিছু খেয়েচ গা?' নিরুত্তর সাবেরা"।
(আদিম-আফসার আমেদ)।[১৮]

- এখানে 'কুটুম' প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত বা গ্রামাঞ্চলে বা গ্রামীণ সমাজে ব্যবহৃত একটি শব্দ। এই 'কুটুম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল আত্মীয়-স্বজন। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের সামাজিক শ্রেণীর মানদণ্ড অনুযায়ী সমাজের অতি উচ্চবিত্ত অভিজাত পরিবারে কুটুম শব্দটিকে বলা হয় রিলেটিভ (Relative)। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারে বলা হয় আত্মীয়-স্বজন। অশিক্ষিত, সংস্কারবিহীন, অতি নিম্নবিত্ত পরিবারে বা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়-স্বজনকে 'কুটুম' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানী লেবোভ সামাজিক শ্রেণীর ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষিক ভিন্নতার যে মত তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় অতি সহজেই।

- উপরোক্ত বাক্যে 'হ্যাঁ লো' এবং 'ছোঁড়া' শব্দদুটি একান্তভাবেই নারী কতৃক উচ্চারিত। দুটি শব্দই নারীর ভাষা বা Women Language।

৫) কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ গ্রামীণ মুসলিম নারীর ভাষাকে খুব গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। বিশেষত মুসলিম নারীর মনঃস্তাত্ত্বিকতাকে ও প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের মুসলিম নারীদের কথনভঙ্গি, ভাষাশৈলী এবং নারীদের অপভাষা বা Slang Language বর্ণণায় তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যে একক এবং অত্যন্ত সুদক্ষ কান্ডারী। 'আদিম' গল্পের ভাষাশৈলী তাঁর সেই ভাষাদক্ষতাকে সুউচ্চ শ্রেণীতে পর্যবেশিত করেছে। মুসলিম নারীর মনের ভাব বা অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছেন, মুসলিম নারী অধ্যুষিত সমাজভাষার দ্বারাই। তিনি শুধু মুসলিম নারী সমাজের ভাষাকেই হৃদয়ঙ্গম বা আত্মস্থ করেননি, তিনি নারীদের, সুর, কথন ভঙ্গিমা এবং রীতি বা Style কেও আত্মস্থ করেছিলেন গভীরভাবে। নিম্নে সেইগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেমন–'ওই যা ডাকে লো', 'মরণ দ্যাখ', 'কেন লো কী হয়েছে?', 'ঢং', 'হ্যালা কায়েমের মাগ', 'কই লো তুরা', 'ও আমার লজ্জাবতী লতা রে, 'ওগো!' প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র:

১) পৃ-৬৭১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দেবেশ কুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯, ১৮ই আগষ্ট, ২০১০।
২) পৃ-১২৯। ভাষা ও সমাজ, মৃণাল নাথ, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০ ০০৬, জানুয়ারি ১৯৯৯।
৩) সেরা পঞ্চাশটি গল্প, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১২। পৃ-২৭।
৪) পৃ-৩৯। প্রাগুক্ত।
৫) পৃ-৩৭। প্রাগুক্ত।
৬) পৃ-৩৬। প্রাগুক্ত।
৭) পৃ-২৯। প্রাগুক্ত।
৮) পৃ-১৩০। ভাষা ও সমাজ, মৃণাল নাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০০৬, জানুয়ারি ১৯৯৯।
৯) পৃ-৩৩। সেরা পঞ্চাশটি গল্প, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১২।
১০) পৃ-২৬। প্রাগুক্ত।
১১) পৃ-১৯। সেরা পঞ্চাশটি গল্প, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১২।
১২) পৃ-৯৭। ভাষা ও সমাজ, মৃণাল নাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯।
১৩) পৃ-২৩। প্রাগুক্ত।
১৪) পৃ-১৬৬। উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি, নলিনী বেরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, জানুয়ারি ২০১৯।
১৫) পৃ-৪৬। সেরা পঞ্চাশটি গল্প, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১২।
১৬) পৃ-৯৭। ভাষা ও সমাজ, মৃণাল নাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৯।
১৭) পৃ-৪৭। সেরা পঞ্চাশটি গল্প, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১২।
১৮) পৃ-৪৮। প্রাগুক্ত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সমাজভাষাবিজ্ঞান, রাজীব হুমায়ুন, দ্বীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০।
২) প্রসঙ্গ ভাষাতত্ত্ব ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, ডঃ প্রকাশ কুমার মাইতি, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা-৭০০ ০০৯, জানুয়ারি, ২০১১।
৩) ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ), তপোধীর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, আগষ্ট ২০১৭।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন : প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস

বাপি চন্দ্র দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, আসাম

সারসংক্ষেপ: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আর এক বছরের মধ্যে উপন্যাসটির মোট চারটি সংস্করণ হয়। চতুর্থ সংস্করণে সবচেয়ে বেশি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হলে একদিকে উপন্যাসটির কলেবর যেমন পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় তেমনি অপরদিকে এটির চাহিদাও পাঠকের কাছে বেড়ে যায়। রাজসিংহের পূর্ববর্তী সামাজিক উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) এবং পরবর্তী স্বাদেশিক উপন্যাস আনন্দমঠ (১৮৮২)। এই দুই উপন্যাসের মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ (১৮৮২)। উপন্যাসটি চয়নে ঔপন্যাসিক ইতিহাসবিদ জেমস টডের ' দ্য অ্যানালাস অ্যান্ড অ্যাটকুইটিজ অফ রাজস্থান' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। রাজসিংহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তা সত্ত্বেও আমরা রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে থাকি। তাছাড়া উপন্যাসের ভূমিকা অংশ লেখক রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকারও করেছেন। উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে লেখক রাজপুত ও মোগলদের ইতিহাস সামান্তরালভাবে বিন্যস্ত করেছেন। উপন্যাসের শেষে রাজপুতদের বিজয় ও মোগলদের পতন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া উপন্যাসের উপসংহারে ঔপন্যাসিক মোগলদের পতনের কারণ ও স্পষ্ট করে অতি সচেতনভাবে ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মোগলদের পতন ইচ্ছে করে ঘটিয়েছেন কিংবা পক্ষপাত দোষে দোষী তিনি এ বিষয়ে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে। সাহিত্যের সম্রাট যিনি তিনি তো সত্য-শিব-সুন্দরের পূজা থেকে স্বীয় দ্রষ্টা চক্ষুকে সরাতে পারেন না। তাহলে তিনি সাহিত্যের চিরাচরিত রীতি সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ বিষয়েও আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে অনিবার্যভাবে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে আমরা ইতিহাসের আলোকে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিকটি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছি।
সূচক শব্দ: মোগল, সাম্রাজ্য, সম্রাট, ইতিহাস, রাজপুত, সাহিত্য।

ভূমিকা:

রাজসিংহ বঙ্কিম উপন্যাস ধারায় আটতম উপন্যাস। 'Rajmohans wife' (১৮৬৪) থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ১৮ বছর পর বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে বঙ্কিম চন্দ্র চয়ন করেন রাজসিংহ (১৮৮২)। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানরূপী আফিমের নেশায় বিভোর হয়ে যেমন জীবনদর্শন করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও এক অনন্য মাত্রা দিয়েছেন তেমনি জীবনের গভীরতর সত্য উদঘাটনে ঐতিহাসিক চরিত্রকেও স্মৃতি কোঠায় আবদ্ধ করে উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেছেন। রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রের চারিত্রিক কার্যকলাপ ঔপন্যাসিককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। মহাভারতের বেদব্যাস পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধ বিদ্রোহের অন্তরালে শাশ্বত জীবন সত্যের যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র মোগল ও রাজপুতদের মধ্যে যুদ্ধ

বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বীয় জীবন অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করেছেন। লক্ষণীয় সব যুদ্ধের মূলে নারী। মহাভারতের যুদ্ধের মূলে একাংশে দ্রৌপদী। আর আলোচ্য উপন্যাসে বিন্যস্ত মোগল-রাজপুত যুদ্ধের মূলে জয়পুরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী। আর লক্ষনীয় যে ভগবান রাম ও রাবণের যুদ্ধের মূলেও মাতা সীতা দেবী ছিলেন। সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল রাবণ কর্তৃক সীতা দেবী হরণে। কৌরব কুল ধ্বংস দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে। তিন শতাধিক বছরের মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন ঔরঙ্গজেবের নারীর প্রতি অপরিসীম লোলুপতার কারণে। যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রও এই ঐতিহাসিক সত্যের অনুসরণে কাহিনি বিন্যস্ত করে উপন্যাসের পরিসমাপ্তির সঙ্গে মোগলদের পতন চিত্র চিত্রিত করেছেন। এ বিষয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য - "ইতিহাসের ব্যাখ্যায় যে মুঘল সম্রাটকে ধর্মান্ধরূপে পাই, তাকে বঙ্কিম এইভাবে রূপায়িত করেছেন। বলা যায় না কি ইতিহাসে প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অমান্য না করে বঙ্কিম মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একগুয়ে এবং জেদী আরঙ্গজীবকে, ধূর্ত আরঙ্গজেবকে রাজসিংহ উপন্যাসে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নানা কিছুর মধ্যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অনুসন্ধান করা হয়, বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় তার কোনোটিকেই অস্বীকার করা হয়নি।"[১]

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রত্যেক গবেষণা পত্র কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে রচিত হয়। আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্রটি চয়নে আমরা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, যেখানে নারী অত্যাচারিত,লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়েছে সেখানে পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাস শুরু হয়েছে নারীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটি মোট আটটি খন্ড ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত। আটটি খন্ডের নাম যথাক্রমে 'চিত্রে চরণ', 'নন্দকে নরক', 'বিবাহে বিকল্প', 'রন্দ্রে রন্ধ্রে', 'অগ্নির আয়োজন', 'অগ্নির উৎপাদন', 'অগ্নি জ্বলিল' ও 'আগুনে কে কে পুড়িল' এবং উপসংহার অংশটি 'গ্রন্থকারের নিবেদন' নামে নামাঙ্কিত। 'চিত্রে চরণ' খন্ডে দেখা যায় যে এক বুড়ি ছবিওয়ালি রূপনগরের রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন রাজ-রাজড়াদের ছবি বিক্রি করতে এসেছে। আর রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী বুড়ির কাছ থেকে ঔরঙ্গজেবের ছবি কিনে সেটিকে লাথি মেরে মেরে ভেঙে ফেললেন। "চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলংকার শোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপর সংস্থাপিত করলেন – চিত্রের শোভাবৃদ্ধি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন - মড় মড় শব্দ হইল। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্তি রাজপুত কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।"[২] ছবিওয়ালি ঔরঙ্গজেবের ছবির আগে একাধিক মোগল বাদশাহ- আকবর বাদশাহ্, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, নুরজাহান ও নুরমহালের ছবি চঞ্চলকুমারীকে দেখিয়েছে। কিন্তু তাদের ছবির প্রতি কোনো ঘৃণা বা ক্ষোভ চঞ্চলকুমারী দেখালেন না। তিনি বরং তাদের কুটুম্ব বলে সম্বোধন করলেন। "তাহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে।"[৩] কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতি এত ঘৃণা কেন চঞ্চলকুমারীর? এর উত্তর ইতিহাসের কষ্টিপাথরে আছে। বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার পর একে একে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান (১৬৫৮) মোগল সাম্রাজ্যের শাসন করেছেন। কিন্তু কোন সম্রাটই নারীর প্রতি তেমন অবজ্ঞা ও নির্যাতন করেননি যেমন করেছেন ঔরঙ্গজেব। নারীর প্রতি দুর্বলতাই ঔরঙ্গজেবের পতনের একটি বড় কারণ। নারীদের বল প্রয়োগ করে এনে খাচায় বন্দি পাখির মতো রেখে নিজের বেগম করেছেন। ঔরঙ্গজেবের বেগম যোধপুরী একজন হিন্দু নারী

ছিলেন। আর উদিপুরী একজন খ্রিস্টান নারী। অবশ্য এই নারী দু'জন প্রথমে ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারার বেগম ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের লোলুপ দৃষ্টি যে নারীর উপর পড়েছে সে হরণ হয়েছে। পিতা-মাতার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে অলংকার ও বৈভবের বিলাসিতায় নারীকে রেখে তাদের ভুলিয়েছেন। এতে পরাধীনতার শিকলে বদ্ধ হয়ে দুর্বিষহ যাতনায় জীবন কাটাতে হয়েছে অসংখ্য নারীদের। যোধপুরী বেগম যদি ঔরঙ্গজেবের সান্নিধ্যে সুখ লাভ করতেন তাহলে ঔরঙ্গজেবের কুদৃষ্টিতে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী পড়েছেন শুনে অস্থির হতেন না। আর গোপনে চঞ্চলকুমারীর কাছে নিজের একমাত্র সম্বল পরিচালিকাকে আজীবনের জন্য মুক্তি দিয়ে সংবাদ পাঠাতেন না এই বলে, “রাজকুমারীকে বলিবে হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে তসবির ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন রূপনগর ওয়ালীকে দিয়া উধিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লিতে আসিও না।”[৪] যোধপুরী বেগমের এই কথা থেকেই ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে নারীর প্রতি সম্মান নেই সেখানে নারীর পরামর্শে নিশ্চয় ঔরঙ্গজেব কর্ণপাত করতেন না। আলোচ্য উপন্যাসে যোধপুরী বেগম স্বামী ঔরঙ্গজেবকে বুঝিয়েছেন যে সামান্য বালিকা চঞ্চল কুমারীকে ক্ষমা করে দিতে। তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাটা উচিত হবে না। “জাহাঁপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে - এক সামান্যা বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য”[৫] কিন্তু অহংকারী ঔরঙ্গজেব স্ত্রীর কথায় কোন প্রশ্রয় দেননি। নিজের সিদ্ধান্ত অটল রাখলেন। ঔরঙ্গজেব নারীর জন্য যে কত ভয়ানক ছিলেন সেটা যোধপুরী বেগম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। যোধপুরী বেগম চাইতেন না যে তার মতো কোনো নারীর জীবন ঔরঙ্গজেবের কবলে পড়ে বিনাশ হোক। তাই নিরুপায় হয়ে নিজের বৈধব্য কামনা করতেন প্রায়ই- “তখন যোধপুরী রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, ‘হে ভগবান! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দু নাম লোপ হইবে।”[৬] যোধপুরী বেগম নিজের স্বামী ঔরঙ্গজেব কে রাক্ষস বলে মনে করতেন। যোধপুরী বেগম নিশ্চয় স্বচক্ষে নিজের স্বামী কর্তৃক নারীর জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখেছেন অহরহ। কেননা ঔরঙ্গজেব শুধু বেগমদের মধ্যে তৃপ্ত থাকেননি। অর্থ-বৈভব যেখানে আয়ত্ত হয় সেখানে ভোগ-বিলাসিতা আসে অনায়াসে। বর্তমান সময়ে অবৈধ বিত্তশালীদের জীবনে কল গার্লদের অভাব নেই। তেমনি ঔরঙ্গজেব অসংখ্য বেতন ভোগিনী বিলাসিনীও রাখতেন- “তাহার মহিষীও অসংখ্য – আর সরাব বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য।”[৭] ঔরঙ্গজেব অর্থ ও সামর্থ্যের মোহে ভুলে গিয়েছিলেন যে, “যে জাতি বা ব্যক্তির যৌন অপবিত্র, সেই ব্যক্তি বা জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।”[৮] পুরুষ নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছেড়ে, কিংবা বিবাহিত নারী স্বামী ছেড়ে পর নারী কিংবা পুরুষের সঙ্গে রমণ করলে পাপ হয় অনিবার্যভাবে। আর সেই পাপে নরকে গমন হয়। যা মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা স্পষ্ট করে বলেছেন-

“নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যাজি যেই জন
পর নারী-পর স্বামী করিবে রমণ
সংসারে যতেক পাপ হইবে পাপী
নরক হইতে পার হইবে না কদাপী”[৯]

বলা যায় ঔরঙ্গজেব কামুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাম তাড়নায় তাড়িত হয়ে নারীর জীবনকে পিষ্ট করতেন। কেননা কবি কৃত্তিবাসের ভাষায় –

“কামুকের কাম পূর্ণ হয় না কখন

যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন”[১০]

নারীর প্রতি ঔরঙ্গজেব এত আসক্ত ছিলেন যে তার জন্য তিনি যে কোনো গুরুতর অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নারী-মাংসের লোভে হত্যা-যুদ্ধ-ধ্বংস তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। যা একজন সম্রাটের পক্ষে একান্তই অনুচিত ছিল। নিজের মাতৃতুল্য অগ্রজ দারার স্ত্রীদেরও ঔরঙ্গজেব ছাড়েননি। যোধপুরী আর উদিপুরী বেগমের রূপ যৌবনে ঔরঙ্গজেব আসক্ত হন। ঔরঙ্গজেব দারাকে শুধু সিংহাসনের জন্য নয়, তার বেগমদের পাওয়ার লোভেও হত্যা করেছিলেন। “দাদাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল।...... তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে ইসলামের ধর্মানুসারে তিনি অগ্রজ পত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রধান মহিষীকে অর্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহুত করিলেন।”[১১] স্বামী বিবেকানন্দের মতে যে ঘরে, যে সমাজে, যে দেশে নারীর সম্মান নেই সেখানে মঙ্গল নেই। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের নারীর প্রতি সীমাহীন দুর্বলতাই যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য একাংশ দায়ী তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, “ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ সালে সিংহাসন আহরণ করে মোগল সাম্রাজ্যকে লোহার মুষ্টি দিয়ে শাসন করেছিলেন এবং এর সীমানা প্রসারিত করার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তার রাজত্ব যা ১৭০৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সাম্রাজ্যটি তার আঞ্চলিক শিখরে পৌঁছেছিল। দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তরে সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরঙ্গজেবের সামরিক অভিযান ছিল নিরলস। কারণ তিনি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে মুঘল আধিপত্যের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন। তাকে ‘আলমগীর বা ওয়ার্ল্ড সিজার’ উপাধি দিয়েছিলেন। যাই হোক তার শাসনকালের নীতির পরিবর্তনের দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়েছিল যা সাম্রাজ্যের সম্পদ এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে এর সম্পর্ককে চাপে ফেলেছিল। তার ইসলামী আইন প্রয়োগ, অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন এবং কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস তার প্রজাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ক্রমাগত যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যের সম্পদের অত্যধিক সম্প্রসারণের সাথে এই ক্রিয়া-কলাপগুলি অভ্যন্তরীণ ভিন্নমত এবং বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ গুলির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। যা শেষ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের দিকে নিয়ে যায়। ১৭০৭ সালে আরঙ্গজেবের মৃত্যু একটি যুগের পরিসমাপ্তি এবং সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রভাবের দ্রুত অবনতির সূচনা করে।”[১২]

আন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত এই ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত ইতিহাসের মধ্যে অমিল প্রায় নেই। ঔরঙ্গজেব লোভী-কঠোর-নিষ্ঠুর-কামুক আর দয়াহীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনের লোভে পিতা শাজাহানকে বন্দী করেন। ভাই দারাকে হত্যা করেন। সাম্রাজ্যের পরিধি বর্ধিত করতে ধ্বংসলীলার আয়োজন করেন। হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তিনি সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করেছিলেন। তার সময়ে সাম্রাজ্য বর্ধিত ও শক্তিশালী হয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। যেখানে সত্য তথা ধর্ম নেই সেখানে পতন অনিবার্য। একথা বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে উপলব্ধি করেছেন। তাই বলেছেন, “ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ,পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রজগুণে গুণমান ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিত নামা রাজাধিরাজ আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ইহার একমাত্র কারণ ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাহার ন্যায় ধূর্ত, কপটচারী, পাপে সংকোচশূণ্য, স্বার্থপর পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়।”[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, পরের অনিষ্ট না করে সাধ্য অনুসারে পরের মঙ্গল সাধন করাই হলো ধর্ম। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম ধর্মেরই জয় দেখিছেন। ঔরঙ্গজেবের মতো অধার্মিকের বিপরীতে সৃষ্টি করেছেন পরম ধার্মিক রাজসিংহ চরিত্র। রাজসিংহ সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী ও প্রজারঞ্জনকারী ক্ষুদ্র রাজা। তবু রাজসিংহ ছোট রাজা হয়েও বিশাল মোগল সৈন্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়, যথা ধর্ম তথা জয়- এই মতের অনুসরণ করেছেন বঙ্কিম চন্দ্র মোগল সাম্রাজ্যের পতন দেখাতে গিয়ে। তাই গ্রন্থের উপসংহারে স্পষ্ট করে বলেছেন, "অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক- সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাহার সময় হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।"[১৪]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, যার উত্থান আছে তার পতনও নিশ্চিত। তবে উত্থানের জন্য মহৎ গুণ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। পতনের জন্য হিংসা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার ইত্যাদি অপগুণ যথেষ্ট। ইতিহাসে দেখা গেছে যারা অতি উত্তম কর্ম করেছে তারা বেশি চর্চিত হয়েছে। আর যারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম করেছে তারাও চর্চিত হয়েছে। রত্নাকর দস্যু, হিটলার, ঔরঙ্গজেব তারা তাদের অপকর্মের জন্য অক্ষয় হয়ে আছেন। তবে রত্নাকর দস্যু নিজের অপগুণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সাধনা বলে মহৎ বাল্মিকী ঋষিতে উন্নিত হয়েছিলেন। রাজা বা সম্রাট হন যিনি তাকে সর্বগুণে গুণান্বিত হতে হয়। আর চরিত্র হবে নিষ্কলঙ্ক। সম্রাটের চরিত্রের সঙ্গে রাজ্যের নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই রাজার চরিত্রের স্খলন ঘটলে রাজ্য পতনের দিকে এগোয়। ঔরঙ্গজেবের চারিত্রিক স্খলনের জন্য তার শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন হয়েছিল। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবকে 'মহাপাপিষ্ট' ও 'অধার্মিক' বলে চিহ্নিত করেছেন। ঔরঙ্গজেব যদি সত্যের পথে ও চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন তাহলে তিনি অদূর ভবিষ্যতের সুপরিকল্পনা করতে পারতেন। তিনি তখন যথার্থ উত্তরাধিকারী তৈরি করে যেতে পারতেন। তার পরবর্তী সময়ে মোগল সাম্রাজ্য যথার্থ উত্তরাধিকারী পায়নি। ফলে অভিজাতদের মধ্যে লড়াই,সেনাবাহিনীর অবনতি, অর্থনৈতিক অবনতি, বিদেশী আগ্রাসনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য দখলের প্রচেষ্টা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবের ফলে অনিবার্যভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয়।

তথ্যসূত্র:

১) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ. ১০৪।

২) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, অক্টোবর ১৯৬০, আদিত্য প্রকাশালয়,২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৭

৩) তদেব, পৃ. ৭

৪) তদেব, পৃ. ৩৭

৫) তদেব, পৃ. ৩৬

৬) তদেব, পৃ. ৩৬

৭) তদেব, পৃ. ৩৬

৮) উদ্বোধন পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ : ১৮

৯) ওঝা কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ জামাপুকুর লেন, কলকাতা- ৯, পৃ: ২২৪

১০) তদেব, পৃ. ১৬২

১১) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, অক্টোবর ১৯৬০, আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৩৩

১২) আন্তর্জাল, htpps//en.wikipedia.org.in, তারিখ ২/০১/২৫, সময় ১১.২৫ ।

১৩) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, অক্টোবর ১৯৬০, আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৩২

১৪) তদেব, পৃ. ২২৪।

নারীর জীবন প্রসঙ্গ : ছড়া ও প্রবাদে

বিপ্লব কুমার মাহাত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম দুটি বিশিষ্ট উপাদান হল ছড়া ও প্রবাদ। সৃষ্টির ইতিহাস বহু প্রাচীন হলেও সকল দেশের সকল ভাষাতেই তার প্রভাব ও প্রয়োগ দেখা যায়। মানুষ এবং একই সঙ্গে নারীর গভীরতাহীন নিত্যদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি নিয়ে ছড়া ও প্রবাদ উৎকর্ষ লাভ করেছে। উল্লেখ্য ছড়া সৃষ্টির মূলে রয়েছে নারীর প্রত্যক্ষ অবদান। সাংসারিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলি ছাড়াও মন্ত্র, খেলা, নীতি নৈতিকতা, এমনকি নারীর প্রেম-প্রণয়ের কথাও প্রকাশ পেয়েছে সাবলীলভাবে। উল্লেখ্য ব্রতের ছড়াগুলি নারীর নিজস্ব সৃষ্টি। কুমারী, অবিবাহিত নারীর স্বপ্ন,সধবা নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা স্পষ্ট হয়েছে ব্রতকেন্দ্রিক ছড়াগুলির মধ্যে। অন্যদিকে লোকসাহিত্যের মূল শাখা প্রবাদ জাতীর সুদীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি ইতিহাস চেতনার উপকরণও প্রবাদে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত, সাংকেতিক, সুনির্দিষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও রস সম্পৃক্তভাবে প্রবাদ বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে এসেছে। সেদিক থেকে বাংলা লোকসাহিত্য চর্চায় প্রবাদের গুরুত্ব কম নয়।

মূলশব্দ: লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, গার্হস্থ্যজীবন, নারীপ্রেম, সংস্কার, ঐন্দ্রজালিক, জীবনবৈচিত্র্য।

মূল আলোচনা:

বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আসন আধিকার করে আছে ছড়া। মানবজীবন সৃষ্টির প্রত্যুষ লগ্ন থেকেই ছড়ার জন্ম। উল্লেখ্য আদিম কাল থেকে নারী বা জননী মুখে মুখে ছড়া সৃষ্টি করে নিজের সন্তান,শিশুকে ভুলিয়ে রাখেন। ছড়াগুলির মূল বিষয়ও শিশু মনের অনুরূপ। মূলত ছড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্যও শিশুর মন হরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই ছড়া শিশুর জন্য গাওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে নারী ও জননীর মধ্যদিয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। বলা যায় বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি ছড়া। বিষয় গভীরতাহীন নিত্যদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি নিয়েই ছড়া উৎকর্ষ লাভ করেছে। আনন্দ দানই এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে দর্শন বা ঐন্দ্রজালিক ভাবনা সে গুলিতে অনুপস্থিত। কারণ ছড়া বহিরঙ্গ বিষয়কেই অধিক মাত্রায় স্পষ্ট করে। ছড়ার সঙ্গে সংগীতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। ছড়ায় অনেক সময় সংগীতের রূপ নিয়েছে যা পরবর্তী সময়ে সমাজ সম্পৃক্ত মানুষের কাছে অত্যধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে ছড়ার মধ্যে একটা কোনো ভাবে মিল দেখানোর প্রবনতা দেখা যায়। শিশু কান্না থামাতে ছড়া কেটে কল্পনায় শিশুর কাছে একটা ছবি তুলে ধরে। শিশু সেই ছবিকে বাস্তবেই অনুভব করে শান্ত হয়,আবার আনন্দে খিলখিল করে হেসে ওঠে –

> “আমার সোনা কেনে গো কাঁদে
> আমি ঝাঁপ দেবগো বাঁধে
> আমার সোনা যখন হাঁসে
> আমি উঠব তরল বাঁশে ”[১]

গ্রামের মহিলারায় অধিকাংশ ছড়ার স্রষ্টা। প্রত্যেক দিনের জীবন বৈচিত্র্যের ছবি তাদের ছড়াগুলির মূল বিষয়। শিশুর মন ভোলানো ছাড়াও দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়গুলিও ছড়ায় স্থান পেয়েছে। লক্ষনীয় এই সমস্ত কিছুতেই নারীর অবাধ প্রবেশ। মনে করা হয় নারী তার নিজস্ব প্রয়োজনেই যেন সৃষ্টি করেছে এই ছড়া। একদিকে তার মাতৃত্ব অন্যদিকে সংসার। শুধু সংসার জীবন নয়, খেলা, মন্ত্র, নীতি, কৌতুক,এমনকি নারীর প্রেম-প্রণয়ের ক্ষেত্রেও রচিত হয়েছে ছড়া।

ব্রত বিষয়ক ছড়াগুলি নারীর নিজস্ব সৃষ্টি। কুমারী, অবিবাহিত নারীর স্বপ্ন, সুখের কথায় এ ব্রতের ছড়া গুলির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। কুমারী ও সধবা নারীর আশা - আকাঙ্খা, কামনা -বাসনা প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে ব্রতের মধ্যে দিয়ে। বাপের বাড়ির সম্পদ কামনায় কুমারী মেয়ে পালন করে যমপুকুর ব্রত। ছড়া এ কথা ব্যক্ত হয়েছে -

"শুষনী কলমী ল ল করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে।।
মারণ পক্ষী সুকোর বিল।
সোনার কৌটা রুপোর খিল।।
খিল খুলতে লাগল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।।"[২]

আবার সধবা নারী সংসার সুখ কামনার কথা প্রকাশ পেয়েছে পুণ্যিপুকুর ব্রতের ছড়ার মধ্যদিয়ে -

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা।
আমি নারী ভাগ্যবতী,
সাতরাজার মা সাধ্বি সতী।
এক গলা গঙ্গাজলে,
মরব হরির চরণতলে।"[৩]

সর্বপ্রকার ধন-সম্পত্তির রক্ষা ও বৃদ্ধি এবং সুখ-শান্তির কামনায় কুমারী মেয়ে পালন করে সেঁজুতি ব্রত। ছড়া তা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে -

"সাঁজ সেঁজুতি পার্বণ-ব্রতী,
কে মালতী সরস্বতী?
সাত ভাই-এর বোন ভাগ্যবতী।
নাম আমার মধুমতী,
হোক নারায়ণ চরণে মতী।"[৪]

অবিবাহিত, কুমারী নারীর মনের বাসনা এবং আকাঙ্খার ছবি স্বাভাবিক ছন্দে ফুটে উঠেছে হরিচরণ ব্রতের ছড়ায় –

"হরির চরণ হরির পা, হরি বলে ওগো মা।
আজ কেন মা পাটি শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল্।
সে যুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর।
রামের মতো স্বামী পাবে, লক্ষনের মতো দেবর হবে।
কৌশল্যার মত শাশুড়ী চায়, আর কি চায় মা আর কি চায়।

দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, সবার সেরা জামাই চায়।
আলনার কাপড় দলদল করে, সিঁথির সিঁন্দুর ঝলমল করে।
পায়ের আল্ তা টকটক করে, ঘটী বাটী সব ঝকঝক করে।
গোয়ালে গরু খামারে ধান,যুগ যুগ যেন বাড়ে মান।
বছর বছর পুত্র হোক,জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে রোক।
এক গলা গঙ্গার জলে,মরণ হবে স্বামী পুত্রের কোলে।”[৫]

নারীর স্বতঃস্ফূর্ত মনের কামনা ইচ্ছায় ব্যক্ত হয়েছে এই ধরনের ছড়াগুলির মধ্যে। ছড়ার মধ্যদিয়ে নারীর জীবন বৈচিত্র্যের আচরণগুলি আপনাআপনি ফুটে উঠেছে।সন্ধ্যামণি ব্রতের ছড়ার মধ্যদিয়ে সাত ভাই এর বোন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে -

“সন্ধ্যামণি কনক তারা ।
সন্ধ্যামণি জলের ঝারা॥
সন্ধযামণি করে কে।
সাত ভায়ের বোন যে॥
আলে ধানে কাল পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োতে॥”[৬]

বলা যায় নারীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সমস্ত দিকই স্বাভাবিকবাবে ফুটে ওঠে ব্রতের ছড়াগুলি মধ্যে।

নারীর সামজিক বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি ছড়ায়। নারীর চেতনায় পুরুষের সুরেই কখনো পুত্র সন্তান লাভের জন্য আনন্দ ও কন্যা সন্তানের জন্য আক্ষেপ ঝরে পড়েছে। ছড়াবলা হয়েছে –

“এই মেয়েটা হত বেটা
দিতাম সোনার কোমরপাটা
থাকতো লোকে চেয়ে...।”[৭]

কোনো কোনো ছড়ায় আবার নারীর আত্মইচ্ছা পরিতৃপ্তির বাসনাও সমসুরে ব্যক্ত হয়েছে। কুমারী কন্যা বিয়ের জন্য ছটপট করে ঠিকই, কিন্তু সে চাই ভালো স্বামী আর সুন্দর, সুখী জীবন। ছড়ায় তার এই আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে এভাবে –

“কোড়ার মাথায় ঢালি চিনি।
আমি যেন হয় রাজরানি।।”

পণপ্রথা, নারীর বাপের বাড়ির যন্ত্রণা এবং একই সঙ্গে নারী ক্রয় বিক্রয়ের সমাজিক ব্যাধির কথাও ছড়ায় সাবলীল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে –

“দাদাভাই চালভাজা খাই,
নয়না মাছের মুড়ো।
হাজার টাকার বউ এনেছি,
খাঁদা নাকের চুড়ো!
খাঁদা হোক, বোঁচা হোক,
সব সইতে পারি,
ঝাপটা-কাটা মুখনাড়াটা—

ওই জ্বালাতে মরি!”[৮]

ছড়া সংসার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তুলে এনে সংসারের ভাড়ামী, পরিহাস, এমনকি সামাজিক কুপ্রথাগুলিকেও প্রকাশ করেছে। বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, শাশুড়ী বৌএর বৈরিতা, ননদের সঙ্গে খুনসুটি ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে-

“শাশুড়ী - হাই থেকে উঠল হাই,
মরুক বউ এর ভাই।
বৌমা- হাই এরও এতজ্বালা,
মরুক শ্বশুরের শালা।”[৯]

বহুবিবাহের পরিচয় ফুটে উঠেছে সর্বদা প্রচলিত একটি ছড়ায় -

“বৃষ্টি পড়ে টাপার টুপুর নদেয় এলো বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।”[১০]

সতীন সমস্যার কথাও উঠে এসেছে ছড়ায় -

“উচ্ছে খাবে ইচ্ছে করে
পটল খাবে চেকে,
দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে করবে
নিজের চোখে দেখে।”[১১]

কৌলিন্য প্রথার কথা উঠে এসেছে ছড়ায় -

“চালে আছে পইয়ের ডাঁরি
কত সিজাবো।
ঘরে আছে বুড়া ভাতার
কত বুঝাবো।
কোলে আছে লুলু ছেল্যা
কাকে গছাবো।”[১২]

ছড়ায় বালিকা বিবাহের প্রসঙ্গটিও উপেক্ষিত হয়নি। বালিকা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে মায়ের মনে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। বালিকা কন্যার সংসার জীবনের কথা ভেবে মা আঁতকে ওঠে তবুও তাকে সমাজের রীতিমেনে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তার স্নেহ সিঞ্চিত যন্ত্রণার রূপ দেখা দেখা গেছে ছড়ায় -

“মণির মেয়ে পাণ বাটে
তাতে পল বালি
শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে
চিত্ত হল কালি।”[১৩]

সংসার জীবন কেন্দ্রীক নারীর প্রেম,নারীর বৈধ ও অবৈধ প্রেম- পিরীতের কথাও ছড়ায় অবলীলায় প্রকাশ পেয়েছে -

“চালের বাতা ধরে শ্যাম ক'য়ে গিয়েছিল কথা,
সেই অবধি জ্বর আমার নিত্য মাথাব্যথা।
এসো শ্যাম বোসো কাছে খাও বাটার পান,

ধীরে ধীরে কও কথা জুড়োও আমার প্রাণ।”[১৪]

অন্য একটি ছড়া নারীর অবৈধ প্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে -

“ঝিঙে ফুল গুপ্ত পিরিত
সন্ধে না হলে ফোটে না।
পরের সঙ্গে পিরিত করে,
সে তো আশ মিটল না।[১৫]

অন্য একটি ছড়ায় আছে -

ফল খাইলাম ফুল খাইলাম
ভাচ্ছিয়া ভরাইলাম কায়া
সুজনের সঙ্গে পিরিত করি
মরণে না ছাড়ি দিয়া।[১৬]

সমাজ ব্যবস্থার প্রথম থেকেই নারী তার নিজস্ব ঘরানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। প্রথাগত সাংসারিক প্রকরণটি আজ সে ভাবে না থাকলেও মোটামুটি ভাবে বলা যায় নারী চিরকাল গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্মগুলোকে নিজের বলেই স্বীকার করে এসেছে। ঘরের সর্বত্র যাতায়াত রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সন্তান পালন সবই যেন নারীর প্রাকৃতিক ভাবেই সম্পন্ন করে থাকে। তার পরিচয়ও ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে -

“এক নৌকা সরু চাল, এক নৌকা ঘি,
ভালো করে রান্না কর ময়রা ঠাকুরঝি।”[১৭]

স্বাভাবিকভাবেই নারীর জীবন বৈচিত্র্যের সমস্ত দিক, আচার - আচরণ, তার নিজস্ব জগত ও প্রেক্ষিতকে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করেছে ছড়া। যা তার নিজস্ব, ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

লোকসাহিত্যের একটি মূল শাখা হল প্রবাদ। আভিধানিক অর্থ প্রচলিত কথা। প্রবহমান সমাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলি প্রবাদের বিষয় হয়ে ওঠে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এমনকি ইতিহাস চেতনার উপকরণও প্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায়।জাতীর সুদীর্ঘদিনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় প্রবাদের মূল বিষয়। তাই প্রবাদের সংজ্ঞায় W.C.Halzitবলেছেন -

"An expression or combination of Words conveying a truth to the mind of a figure,perphipharasis, antithesis or hyperabole."(A dictionary of American proverb and proverbialphrases) অর্থাৎ প্রবাদ হল এমন একটি প্রকরণ যেখানে ছোট পরিসরের মধ্যে সমগ্র মানব জীবনের রূপকে প্রতিফলন করে। অ্যারিস্টটল আবার প্রবাদকে বলেছেন -'... fragments of an elder wisdom' অর্থাৎ একটি প্রাচীন বুদ্ধিমত্তার বিচ্ছিন্ন পরিচয়। ইংরেজি Proverb থেকে মূলত প্রবাদ শব্দটির জন্ম। প্রথম প্রয়োগ করেছেন জেমস লঙ্। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সরস অভিব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন প্রবাদকে। পন্ডিত আর্চার টেলর প্রবাদকে বলেছেন –‘A proverb is a saying current amount the folk.’প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে বলা যায় সুদীর্ঘ কালেরসামগ্রিক অভিজ্ঞতাগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার রীতিই আসলে প্রবাদ। এ প্রসঙ্গে হানিফ পাঠানের মতটিকে সহজেয় গ্রহণ করা যেতে পারে।তিনি বলেছেন -

“আমাদের দৈনন্দিন কর্মের সুষ্ঠু প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা, নীতিকথা, তত্ত্বকথা, রসিকতা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম- প্রীতি, মিলন-বিচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা-প্রশংসা, যাত্রা-

অযাত্রা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কৃষি-স্বাস্থ্য, শিল্প-বানিজ্য, মেঘ-বৃষ্টি, খরা, বাদল, আকাল-সকাল, চুরি, ডাকাতি, শত্রুতা, পাপপুণ্য প্রভৃতি কিছুই প্রবাদকারের অভিজ্ঞতার বাইরে নহে।” সমাজ মানুষের নানা অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ পায় বলেই এগুলি সাহিত্য পদবাচ্য। এই প্রবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য হল-

ক. প্রবাদ সর্বদা সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হবে।

খ. প্রত্যেক লাইনের মধ্যে মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য থাকে এবং তাতে ধ্বনি ঝংকার বর্তমান।

গ. মূল কাঠামো সহজ সরল হলেও তার মধ্যে একটা রসসম্পৃক্ত বুদ্ধিদীপ্ত প্রসঙ্গ লুকিয়ে থাকে।

ঘ. সামগ্রিক বিষয়কে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে রূপকের মাধ্যমে।

গ. মূলত সাংসারিক,পারিবারিক, গার্হস্থ্যজীবনের গভীর অথচ তাৎপর্য পূর্ণ কথায় তুলে ধরে প্রবাদ।

ঘ. মানব জীবন কথায় আসলে প্রবাদের প্রাথমিক উপজীব্য।

ঙ. অলংকার প্রয়োগের মধ্যদিয়ে অতিগূঢ় অর্থকে সাবলীল ভাবে প্রকাশ করে ।

চ. মানব চরিত্র এর মূল লক্ষ্য।

বাংলায় প্রবাদকে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা মুশকিল। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে তার প্রকরণ আলাদা। যদিও আশুতোষ ভট্টাচার্য'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের তিনটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন- ক) প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রবাদ খ) নারী কেন্দ্রিক এবং গ) চরিত্র নীতি বিষয়ক প্রবাদ। তাঁর নির্দিষ্ট প্রবাদের প্রকরণ ছাড়াও আরও অনেক ধরনের প্রবাদ বাংলা সাহিত্যে বহু ক্ষেত্রে মানুষ প্রয়োগ করে থাকে। সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক,সংস্কারকেন্দ্রীক প্রবাদগুলি সমাজে বেশি প্রচলিত। তাছাড়া পৌরাণিক, জীবজন্তু,কৃষিকেন্দ্রিক ইত্যাদি প্রবাদ খুবই জনপ্রিয়।

বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় প্রবাদের গুরুত্ব কমে নয়। সমাজের প্রত্যেকটি বিষয়ই যেহেতু প্রবাদে উঠে এসেছে তাই প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় আকারে পরিচিত হয়েছে। প্রবাদ হাল আমলের সম্পদ নয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদে ব্যবহার করে আসে মানুষ সে দিক থেকে বাংলায় প্রবাদ চর্চার ইতিহাসও প্রাচীন। বিভিন্ন ধরনের প্রবাদগুলি নিচে আলোচনা করা হল -

ক. সমাজ সংক্রান্ত প্রবাদ - মানুষ সামজিক জীব। তার নিজের প্রয়োজনেই সে বিভিন্ন সময় প্রবাদের ব্যবহার করেছে -

“সবাই যখন খায় শোয়
আমি তখন চাল ধুই।”[১৮]

গৃহস্থ বধূর কর্মব্যস্ততা প্রবাদটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। সারাদিনের কাজের ব্যবস্তায় ঘরের বৌ চাল ধোয়ার পর্যন্ত সময় পায়নি, তাই সকলের বিশ্রামের সময় হলেও বৌএর বিশ্রাম করা করার সময় কোথায়! এ প্রবাদে তার নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা ও সাংসারিক যন্ত্রণার কথা অকপটে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্য প্রবাদে আছে -

“মা খাচ্চে ভাচা ভেনে,
বেটা খাচ্চে এলাচ কিনে।”[১৯]

প্রবাদটিতে একটি অভাবগ্রস্থ পরিবারের বাস্তব চিত্র প্রকাশিত। গরীব মা সারাদিন অন্যের বাড়িতে ভাড়া ভাচা করে কোনো রকমে পরিবারের ভরনপোষণ করে আর অন্যদিকে তার

ছেলে মাকে সাহায্য না করে বাবুর মতো বিলাসিতায় মগ্ন। এলাচ শব্দটির মধ্যে বিলাসিতার প্রসঙ্গকে স্পষ্ট করেছে।

স্বামীর কাছে স্ত্রী আপন হয়ে উঠলে শাশুড়ীর মনে মনে রাগ হয়। এই প্রসঙ্গটি ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে -

"আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী,ছালে বন্দী গাছ।"

নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের কথাও উঠে এসেছে প্রবাদে। উল্লেখ্য সমাজ সৃষ্টির পর কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারী ও পুরুষের সামাজিক কাজকর্ম বিন্যাসের একটা প্রচেষ্টা দেখা গেছে। প্রবাদে তা পেয়েছে -

“জাওয়া করম তিজ মরদকে না দিস্।
হাল জুয়াল ইস মায়াকে না দিস্।”[২০]

প্রবাদে জমিদার শাসিত সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠে এসেছে - 'রাজার বেটা পাথর কাটা।'

পারিবারিক অস্থিরতা ও সামাজিক বিপদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে তার দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে প্রবাদ প্রয়োগে -

‘একে মা মনসা তার উপর ধুনার গন্ধ।’

নারীর স্বাধীন সত্তার কথাও প্রবাদে উপেক্ষিত হয়নি -

‘নাচব ভাসুর ন খুশি মা তোমার’[২১]

পূর্বে মানুষের খাবার খাওয়ার পর পান খাওয়ার একটা প্রচলন ছিল।প্রবাদে সে কথা দেখা যায়। মানভূম সংস্কৃতির পরিচায়নের মধ্যেও দেখা যায় প্রবাদের সার্থক ব্যবহার –‘মুখে পান হাতে চুন তবে জানবি মানভূম’
এছাড়া অন্য একটি প্রবাদে আছে –

“নাচা বাজা বেশ
মান ভুঁইয়াদের দেশ।”[২২]

এ প্রবাদ সকলের পরিচিত। মানভূম সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় বহন করে। আসলে মানভূমের কথায় কথায় গান আর মানুষের প্রকৃত আচরণের মধ্যে ভঙ্গি বা নাচ।
বাঙালি জাতি পরিচয়ের ক্ষেত্রেও প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়- ‘কোল কুড়মী কোড়া/বেদ শাস্ত্র ছাড়া।’অর্থাৎ কোল, কুড়মী, কোড়া এই তিন জাতি অতি প্রাচীন। এদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে এরা দূরবর্তী। যদিও হাল আমলে কুড়মী জন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ছাপ ও আচার কিছু দেখা যায়। তবে অন্য জাতি গোষ্ঠীগুলির ধর্মীয় অনুশাসন নিজস্ব, বেদ শাস্ত্র বহির্ভূত। প্রাচীন কাল থেকেই প্রবাদের অবাদ প্রয়োগ। জাতির পরিচয়, সংস্কৃতি, এমনি নিত্য দিনের কাজেও প্রবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ অনেক আগে থেকেই চলে এসেছে। জাতি কেন্দ্রিক সমাজিক কর্ম সম্পর্কেও যে তারা অবগত ছিল তার ছবি পাওয়া যায় প্রবাদে। বলা যায় প্রত্যেকটি জনজাতিকে নিয়েই প্রবাদ পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে।

‘কুইরী চিনায় টাঁড়ে
আর তাঁতি চিনায় পাইড়ে।’[২৩]

অন্য একটি প্রবাদে সামাজিক মানুষের প্রত্যাশার কথা স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে –

‘আশায় মরে চাষা

আর লোভে মরে তাঁতি।'[২৪]

আবার সামাজিক অস্পৃশ্যতার ছবি দেখা গেছে প্রবাদে –'হাড়ি মুচি ডম /সব জাতের কম।'

আরও কিছু প্রবাদ যেগুলি জাতির অন্দরমহলের ছবিকে প্রকাশ করে। যেমন -

১) 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে /কাল হল এঁড়া গরু কিনে।'
২) 'পাশে পালি কামার /ন ফাল পাজায় দে আমার।'
৩) 'ডম আর ডিম ফসকিল ন গেল।'

ইত্যাদি।

সংস্কার ও বিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রাচীন কাল থেকেই জড়িয়ে আছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির অধিকাংশই সংস্কারকেন্দ্রিক। সংস্কার সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস নিয়েই মানুষ যেন বেঁচে আছে গ্রামে। ব্যক্তিজীবনেও তার প্রভাব কমে নয়। বিশ্বাস ও সংস্কারকে উপলক্ষ করে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচুর প্রবাদের প্রয়োগ দেখা গেছে-

'বিহাজন্ম মৃত্যু
তিন বিধাতার দিয়া।'[২৫]

অর্থাৎ মানুষ মনে করেন মানুষের জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ের ব্যাপারটি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল, এতে ব্যক্তি মানুষের হাত নেই। আবার অন্য একটি বিশ্বাস সংক্রান্ত প্রবাদে মানুষের আস্থার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে -

'মানলে শিব না মানলেই পাথর।'

অন্য একটি প্রবাদে দেখা গেছে, সারা বছরের ধানের ফসল কেমন হবে তার জন্য নির্দিষ্ট বছরের আমের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে –'আমে ধান তেঁতুলে বান।'উল্লেখ্য আম ফলনের সঙ্গে যদিও ধানের ফসলের কোনো সম্পর্ক নেই তথাপি মানুষ বিশ্বাস করে,যে বছর আম গাছে বেশি ফলন হয় সেই বছর ধানের মাত্রাও বেশি হয়।

এছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই যে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় মানুষের সংস্কার থেকেই তা জানা যায় –

'বেশি খাটে ভাত নাই
অতি সুন্দরীর জাত নাই।'[২৬]

আবার মানুষের আর্থিক অভাব ও দরিদ্র পীড়িত সমাজের কথাও পাওয়া গেছে সংস্কার মূলক প্রবাদের মধ্যে - 'ভাদর মাসে রাজার ভাঁড়ারও ফাঁকা।'অন্য একটি সংস্কার মূলক প্রবাদে সামাজিক অসংগতির কথা ফুটে উঠেছে –'নিধনার ধন হলে দিনেই দেখে তারা।'

এই সংস্কার ও বিশ্বাসযুক্ত প্রবাদ গুলি আসলে মানুষ তার নিত্যদিনের প্রয়োজন ও সংসার জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি,স্থির - অস্থিরতা, মূল্যায়ন ও মন্থনের জন্যই বিভিন্ন সময় ব্যবহার করে নিজেদের আত্মআস্থাশীল হতে চেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত কৃষি প্রধান সংস্কৃতি। বাংলা তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের খাদ্য সংগ্রহের মূল জীবিকায় হল চাষবাস। চাষের পদ্ধতি, উপকরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত রয়েছে প্রচুর বাংলা প্রবাদ। যেমন –

'ধান পড়লে গোবর
আখ পড়লে দোবড়।'[২৭]

অর্থাৎ ধানের জমিতে গোবর প্রয়োগ করলে ধানের ফলন ভালো হয় আর অন্যদিকে আখ নিঙড়ে রস বের করে নেওয়ায় আখ চাষের সার্থকতা - এই ধ্রুব সত্যটিকে স্পষ্ট করেছে

প্রবাদটি।অন্য একটি প্রবাদে বৃষ্টির পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমানে রোদেরও যে প্রয়োজন ধান চাষে তা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে –'রোদে ধান আর ছায়ায় পান।'

ধান চাষের উপযুক্ত সময় ও তার পরিচর্যার কথা চাষবাস কেন্দ্রিক প্রবাদ থেকে জানা যাই –

"আষাঢ়ে চাষ নামকে
শরাবনে ধানকে
ভাদরের চাষ বীজকে
আশ্বিনে কিসকে।"[২৮]

এছাড়া আরও কিছু চাষবাস কেন্দ্রিক প্রবাদ যেগুলি বিভিন্ন সময় চর্চা হয়ে থাকে। যেমন -

১) চাষের ধান মরাই যায়/চাকরির ধন চুলায় যায়।'
২) হাতে ঠেলা বলদ/কথা ঠেলা মরদ।
৩) বাপের কালে চাষ নাই/বিনা মূলে হুড়।
ইত্যাদি।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সকল ভাষাতেই ছড়াও প্রবাদের প্রচলন আছে। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় মুখে উচ্চারিত করে এসেছে ছড়া ও প্রবাদ। মানুষ প্রথম ছড়াগুলিকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই বেশি প্রয়োগ করেছিল। সেদিক থেকে সাধারণ মানুষই আসলে এই ছড়া ও প্রবাদের মূল স্রষ্টা। একটি জাতির জীবনের সমস্ত স্তরই ব্যাপ্ত হয়েছে ছড়া ও প্রবাদে। উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা ছড়া ও প্রবাদের মূল কথা না হলেও এগুলির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঋগবেদে উর্ব্বশীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি – 'ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যাণি সন্তি/সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।'মূলত প্রবাদ বলেই অধিক পরিচিত। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও রচিত পদগুলির মধ্যে প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়- 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।' (ভুসুকু পা) ছড়া ও প্রবাদের ইতিহাস বহু প্রাচীন। মানুষের জীবন বৈচিত্র্যের প্রত্যেকটি বিষয়ই ছড়া ও প্রবাদে বিষয় হয়েছে। গৃহস্থালির নানা দিক ও দ্রব্যের, সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণি, সংস্থান ও সম্পদের নানা ছবি ধরা পড়েছে ছড়া ও প্রবাদে। চাষা-গয়লা, তাঁতী-নাপিত, কলু- কামার, ন্যাকা-বোকা, বামুন-বোষ্টম, প্রজা-জমিদার, ভূত-প্রেত, কানা-খোঁড়া, ঘর-গৃহস্থ্য, চুরি বাটপারি, নষ্টামি-দুষ্টুমি কোনো কিছুই বাদ পড়ে ছড়া ও প্রবাদে। সেদিক থেকে ছড়া ও প্রবাদ প্রাচীন আমল থেকেই মানুষের নিত্যদিনের রসগ্রহণের বিষয় হয়ে শাশ্বত তথা চিরন্তন রূপ লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৫,কলকাতা - ৭,পৃষ্ঠা ২৭০
২) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২,ক্যালকাটা বুক হাউস,কলকাতা- ১২,পৃষ্ঠা ১৮৭
৩) বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৫,কলকাতা,পৃষ্ঠা ২৮১
৪) তদেব, পৃষ্ঠা ২৮১
৫) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ

১৯৬২,ক্যালকাটা বুক হাউস,কলকাতা-পৃষ্ঠা ১৮৮
৬) তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৭
৭) তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৭
৮) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২,ক্যালকাটা বুক হাউস,কলকাতা-১২,পৃষ্ঠা ৪৫৪
৯) বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৫,কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮০
১০) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২,ক্যালকাটা বুক হাউস,কলকাতা-১২,পৃষ্ঠা ৩২৭,৩২৮
১১) বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী২০১৫,কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮০
১২) তদেব, পৃষ্ঠা ২৮০
১৩) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', দ্বিতীয় খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস,কলকাতা-১২, পৃষ্ঠা ৩৬৩
১৪) বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৫,কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮৩
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৩
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৩
১৭) তদেব,পৃষ্ঠা ২৮৪
১৮) তদেব,পৃষ্ঠা ২৫১
১৯) তদেব,পৃষ্ঠা ২৫১
২০) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৫৭
২১) রায়,ড.সুভাষ, 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩৫১
২২) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫৭
২৩) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৫৯
২৪) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৬১
২৫) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৬৪
২৬) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৬৪
২৭) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৬৫
২৮) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬৬

গ্রন্থঋণ:

- মাহাতো, ড.ক্ষীরোদ চন্দ্র, 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,২০১৬,কলকাতা ৭০০০০৯
- বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৫, কলকাতা -৭
- মাহাত, কিরীটি এবং সেন,শ্রমিক সম্পাদিত, 'লোকভূমি মানভূম', এপ্রিল ২০১৫
- রায়, ড.সুভাষ, 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', ডিসেম্বর-২০২১, তিলবাড়ি, বিষ্ণুপুর ৭২২১২২
- কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, 'বাংলার নারী সংস্কৃতি', পুনশ্চ, ২০০৩, বইমেলা সংখ্যা
- ঘোষ, বক্সী মিতা, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১০
- চট্টোপাধ্যায়, ড: তুষার, 'লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', (দুই খন্ড) ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২
- বিশ্বাস, মিলনকান্তি, 'প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১৪

পত্রিকা :

মন্ডল, বাসুদেব সম্পাদিত, 'আজকের যোধন', বিশেষ পুরুলিয়া সংখ্যা, নভেম্বর ডিসেম্বর ২০১৯।

মহাশ্বেতা দেবীর ঘর গল্পে অন্তেবাসী মানুষের স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি

বিপুল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদিয়া

সারসংক্ষেপ: সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা প্রথমে মানুষের প্রাথমিক এবং প্রয়োজনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হলো মানুষের চিরশান্তির আবাসস্থল ‘ঘর’। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ঘর’ গল্পটি ১৯৭৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় ‘সাহিত্য আকাশ’ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ‘ঘর’ গল্পটির মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা বিপন্ন অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবন বৃত্তান্তের সুখ-দুঃখ অন্বেষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। মানুষ সুখের জন্য 'ঘর গড়ে। কিন্তু সমাজের অনেক মানুষই আছে যারা বেঁচে থাকার তাগিদে, পেটের জ্বালায় অর্থ উপার্জনের জন্য নিজেদের ‘ঘর’ তালাবন্দী করে অনত্র আশ্রয় নেয় নতুন পেশায় অন্য কোনো মাটির বা ইটভাটার ছোট ছোট খুপড়ি ঘরে। আমাদের আলোচ্য ‘ঘর’ গল্পের মধ্যে মহাশ্বেতা সেই বাস্তব জীবনের কথাই তুলে ধরেছেন।
সূচক শব্দ : অন্ত্যজশ্রেণী, সম্প্রদায়ভুক্ত, আবাসস্থল, বাঙালি, শারদীয়।

মূল আলোচনা:
বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ প্রতীম ছোটগল্পকার মহাশ্বেতা দেবী। তিনি বাঙালির সমাজ-মনন-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙালির সমাজ জীবনের তৃনমূল স্তরের শিকড়কে যারা ধরে রেখেছে সেই সব অন্তেবাসী মানুষজনের চিত্র যে সমস্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মে প্রকাশ পেয়েছে মহাশ্বেতা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা প্রথমে মানুষের প্রাথমিক এবং প্রয়োজনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হলো মানুষের চিরশান্তির আবাসস্থল ‘ঘর’। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ঘর’ গল্পটি ১৯৭৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় ‘সাহিত্য আকাশ’ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ‘ঘর’ গল্পটির মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা বিপন্ন অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবন বৃত্তান্তের সুখ-দুঃখ অন্বেষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। মানুষ সুখের জন্য ‘ঘর’ গড়ে। কিন্তু সমাজের অনেক মানুষই আছে যারা বেঁচে থাকার তাগিদে, পেটের জ্বালায় অর্থ উপার্জনের জন্য নিজেদের ‘ঘর’ তালাবন্দী করে অনত্র আশ্রয় নেয় নতুন পেশায় অন্য কোনো মাটির বা ইটভাটার ছোট ছোট খুপড়ি ঘরে। আমাদের আলোচ্য ‘ঘর’ গল্পের মধ্যে মহাশ্বেতা সেই বাস্তব জীবনের কথাই তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নাগরিক জীবনের অংশীদার হয়েও মহাশ্বেতা ভেবেছেন তাদের কথা যারা শহর থেকে অনেক দূরে বাস করেও শহুরে শোষণ থেকে মুক্তি পায় না। সমাজের এই অবহেলিত মানুষেরা মহাশ্বেতার লেখায় এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। আর তদের মুখের ভাষা মহাশ্বেতার লেখায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে বার বার। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ঘর’ গল্পটির কেন্দ্রে সমাজের প্রান্তীয়শ্রেণীর মানুষের স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক

বেদনাময় জীবন ইতিহাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গল্পটির মধ্যে একদিকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যাধি ও বিকারের চিত্রগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তেমনি ফুটে উঠেছে অবহেলিত মানুষের জীবনের অভিশাপকে বরণকরে নিয়ে জীবন অন্বেষণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জীবন যাদের চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছে, সেসব মানুষগুলির মর্মন্তুদ জীবন কাহিনীই তাঁর সাহিত্যে নিপুনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের একটি চিরপরিচিত রীতি তিনি গল্পের পরিসমাপ্তি থেকে শুরু করেন। আমাদের আলোচ্য 'ঘর' গল্পটিতেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। গল্পের প্রথমে দেখা যায় নিম্নবর্গের মানুষ মহন তাঁর পরিবার নিয়ে নামাল থেকে কাজ শেষ করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তাঁদের ছিমোহন গ্রামের আবাসস্থল চিরশান্তির নীড় 'ঘর' এ পৌঁছানোর বাস্তব চিত্রের বহিঃপ্রকাশ করে। তারা ভাগীরথীর পূর্ব তীরে নদিয়াতে ইটভাটায় কাজ করতে এসেছে। ইটভাটার মরসুম শেষ হওয়ার পর এবার অতি আগ্রহে নিজেদের 'ঘর' এ ফেরার কথা এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। মহনের কাঁধে একটি বস্তায় ভর্তি কড়াই, সানকি, জলের ঘটি এবং কিছু চাল। তাঁর স্ত্রী সনার পিঠে তাঁদের পুত্র এবং মাথায় পোঁটলা ভর্তি ব্যবহৃত জিনিসপত্র। তাদের অভাবের সংসার, কাজ না করলে দিন চলে না। তাই সুদূর বিহারের ভাগলপুর থেকে কাজের সন্ধানে তারা নদিয়ার ইটভাটায় কাজ করতে এসেছে, দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকার আশায়। মহনের কাঁধের বস্তাটি খুব ভারী, কারণ চলার পথে হাট থেকে দশ কেজি ওজনের একটি মেটে আলু অবহেলিত সমাজের একটি ছোট মেয়ের কাছ থেকে সস্তায় কিনেছে। এখানে মহনের কাছে এই মেটে আলুই অধিক পুষ্টিকর খাবার, কারণ সে অর্থহীন, এর থেকে ভালো বা উৎকৃষ্ট খাবারের কথা সে ভাবতেও পারে না। আবার অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, যে মেয়েটি এই মেটে আলুটি বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে এসেছে, সেই মেয়েটিও তা বাজার থেকে কুঁড়িয়ে পেয়েছে। আজ তার বাড়িতে আর্থিক সংকট তাই পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও না খেয়ে দুটো টাকার জন্য বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে। এখানে মহাশ্বেতা এই মেয়েটির মধ্য দিয়েই—সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষের আর্থিক সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে চলার পথে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তব করুণ চিত্র দেখে এই 'ঘর' গল্পটির মধ্যে তুলে ধরেছেন।

লেখিকা গল্পে নামাল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নামাল শব্দের অর্থ নীচু জমি, তা চাষের জমি হতে পারে বা পতিত জমি হতে পারে। মহনরা নামালে আট-নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অর্থ-উপার্জন করে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দেশে চলে যায়। হত দরিদ্র এই নিম্নবর্গের মানুষগুলো যখন সামান্য উপার্জন করে বাড়ি ফেরে, তখন পথের মধ্যে ডাকাত দল সবকিছু লুট করে নিয়ে তাদের আরো সর্বশান্ত করে দেয়। লেখিকার কলমে সেই বাস্তব চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে—

> "দিনকাল তো ভালো নয়। পাঁচ দশ টাকা, খানিক চাল, তাও ডাকাতি করে নিয়ে যায়। নামাল ফিরতি মানুষের কাছে আর কিছু থাক-না-থাক চাল থাকতে পারে, সামান্য টাকা।"[১]

মহনের স্ত্রী এবং দুটো পুত্র সন্তান নিয়ে ছোট সংসার। অথচ নিজের গ্রামে কাজকর্ম নেই বলে তাদের নামালে যেতে হয়েছে। সেখানে গিয়েও মহন চিন্তা করে নিজের 'ঘর' এর কথা এবং তার বড় পুত্রের কথা। কারণ অভাবের সংসারে সবার মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সামর্থ তাঁর নেই। সেজন্য বড় ছেলেকে দু-বছর আগে থেকে বাবুর বাড়িতে শুধু খাবারের বিনিময় রাখালের কাজে নিয়োজিত করেছে। সে কেমন আছে, কি করছে, খেয়েছে কিনা তা নিয়ে মহনের মন

খারাপ হয়। কিন্তু গরীব মানুষের কাছে মন খারাপের কোন গুরুত্ব থাকে না। তার পুত্র পেটে ভাতে বড় হচ্ছে এটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মহনরা সন্তানদের লেখাপড়ার কথা ভাবতেও পারে না। কারণ তারা মনে করে বাবুদের বাড়িতে কাজ করলে দু-মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে, আর সরকারি বিদ্যালয়ে গেলে তো শিক্ষা পাবে কিন্তু খাবার পাবে না। তাই বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা অপেক্ষা খাবারকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহনের উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়—

> "বড়ো ছেলেটাও অদেখা থেকেই বড়ো হয়ে গেল। মুহুরি তো বলে, সরকার যদি তোর আমার দরজায় দরজায় ইস্কুল করে দেয়, তাতেও তোর ছেলে পড়তে পাবে না। বাপ মা নামালে যায়, ছেলে থাকে বাগাল। মহন বলে, বাবুর বাড়ি থাকে, তার ভাতটা তো জুটে। সরকার ইস্কুল দেয়, ভাতের ব্যবস্থা তো করে না।"[২]

লক্ষ্যণীয়, বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা এবং খাবার দুটোই পায়। যার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী যখন সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে গল্পটি লিখেছেন এখন সরকারী বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা করেনি। সেই ব্যবস্থা যদি থাকতো, তাহলে নামাল ফেরা মহনের বড় ছেলের ন্যায় আরো অনেক মহনের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে শুধু দু-মুঠো ভাতের বিনিময়ে বাবুদের বাড়িতে কাজে পাঠাতে হতো না। এই হত দরিদ্র মহনদের কাছে পেটেভাতে বেঁচে থাকাই অনেক। শিক্ষার মর্যাদা বা গুরুত্ব তারা বোঝে না বুঝতে চায়ও না। আমাদের দেশের সরকার যদি দেশ স্বাধীনের পরেই বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করতো, তাহলে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নক্ষত্রের ন্যায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়তো—আরো উন্নত হতো দেশ ও জাতি। এখানে মহনের পুত্র শিক্ষার আলো না পেয়ে অন্ধকারেই ডুবে গেল। অবহেলিত মানুষেরা এভাবেই আস্তে আস্তে কলুষিত হয়ে পড়ে সমাজের মধ্যে।

শাসকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণী চিরকালই শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন এবং শোষণ করে চলেছে। মেহনতি মানুষেরা কঠোর পরিশ্রম করেও উপযুক্ত মজুরি পায় না। আলোচ্য 'ঘর' গল্পে ইট ভাটার মালিক, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা বলে, সেই আশায় স্বপ্নের বুক বাঁধে মহন, সনা এবং মুহুরি সরেনরা। তাদের ধারণা এতদিন পরে ঈশ্বর তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। বাড়তি মজুরি পেলে তাদের দুঃখের বারমাস্যা দূর হবে, তাদের মুখে হাসি ফুটবে, সন্তানদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারবে। কিন্তু মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা বলেও তা করেনি। সেই কথা মহনরা শুনে হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পরে। তাদের চোখে আবার নিরাশার স্বপ্ন ভেসে ওঠে। এভাবেই মালিকরা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ তুলে নিয়ে সঠিক পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের শোষণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। শ্রমিকরা এই অভিশাপ থেকে কোনো দিন মুক্তি পাবে কিনা? সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মহাশ্বেতা বলেছেন—

> "কী যে আইন, কী যে পাবে সনা ও মহনরা, তা তো তারা বোঝেনা তাদেরকে খুব বোঝাল মুহুরি সরেন। হেন পাবি, তেন পাবি। ওরা চুপ করে শুনে গেল। তারপর মহন বলল, নে মহুরি, বিড়ি খা। ওই যে বললি হেন পাব, তেন পাব, তাতেই সব পেয়ে গেছি।"[৩]

সনা ও মহনরা কোন আইন-কানুন বোঝে না। মালিকশ্রেণীর কথা শুনে তারা বারবার ঠকেছে, তবুও ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় বছরের মধ্যে ঘরে মাত্র তিন-চার মাস থেকে চারপাশে সিজমনসার ডাল পুঁতে প্রতি বছর নামালের উদ্দশ্যে আসে কিছু অর্থ-উপার্জনের জন্য। লেখিকা মুহুরি সরেনের মধ্য দিয়ে সেই আশার আলোর চিত্রের কথা তুলে ধরেছেন—

> "মুহুরি আশাবাদী মানুষ। কেন সে আশা করে, কোথা থেকে তার আশা আসে, কেউ তা জানে না। মহন তো একা নয়। অনেক মহন, অনেক সনা। মুহুরি তাদেরই একজন। ওদের মতো সেও নামালে যাবার কালে ঘর ঘেরে কাঁটা মনসা বুনে দিয়ে দেয়। ফেরে যখন, কাঁটা ডাল কেটে উপড়ে ঘরে ঢোকে।"[৪]

মহন ও মহুরিরা বুক ভরা আশা নিয়ে কাজের জন্য নামালে আসার আগে চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাদের 'ঘর' এর চার পাশে কাঁটা-মনসা বুনে আসে। চৈত্রের রোদে মানুষ শুকিয়ে যায় কিন্তু কাঁটা-মনসা লকলকিয়ে বাড়ে। এমনকি বর্ষার সময় এই গাছের ডালপালা এমন বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পরে যাতে ঘরে প্রবেশ করা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। কিন্তু মহন ও সনারা নামালের কাজ শেষ হলে ঘরে ফেরার সময় কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে। এখানে মহাশ্বেতা তার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন—

> "বর্ষা নেমে গেলে সিজমনসার ডালপালা কেটে ঢোকাও বড়ো কষ্ট। মানুষ শুকায়, কাঁটামনসা ফনফনিয়ে বাড়ে। তাছাড়া ঘর বলে কথা। ঘরে যদি তুমি বছরে তিন চার মাসও না থাকো, ঘর কি তোমার জন্যে মাথা তুলে চেয়ে থাকবে। ঘর মুখ থুবড়ে পড়বে। কাঁথ গলে যাবে। আবার ঘর তোলা কি সোজা কথা।"[৫]

নদিয়া, বর্ধমানসহ বিভিন্ন জেলায় মহন ও সনারা ঘুরে ঘুরে কাজ করে। কখনও জমিতে আবার কখনও বা ইটভাটায়। তাদের দেশে কাজ নেই বলে এই নিম্নবর্গের মানুষগুলো নিজেদের বাড়ি ঘর রেখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। মহনের স্ত্রী সনা আর ঘুরে ঘুরে কাজ করতে চায় না। সে অন্য গৃহ বধুদের মতো নিজের ঘরে থেকেই সন্তানদের মানুষ করতে চায়। সনার মুখে আমরা শুনতে পাই—

> "শোনা যাচ্ছে দেশে কাজ মিলছে। মিলে কি মিলে না, সনা আর ঘুরতে চায় না। তার মুখে এক কথা, চলো, আমি ঘরে থাকব, তুমি না হয় কাছে পিঠে যাও।"[৬]

বাড়ি ফেরার পথে চলতে চলতে মহনের মন উদাস হয়ে যায়। কারণ সে ভাবছে নিজের ঘরের কথা। দীর্ঘ আট-নয় মাস আগে ঘরের চারপাশে কাঁটামনসা বুনে দিয়ে এসেছে, এখন ঘরটি বসবাসের যোগ্য আছে, না ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়েছে, এই সব কথা ভেবে তার মন খারাপ হয়ে যায়। আবার তার মনে পড়ে নদিয়াতে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত শতশত ইটভাটার ঝুপড়ি ঘরগুলোর কথা। যেখানে রুটি রোজগারের জন্য দীর্ঘ সাত-আট মাস কাজ করতে এসে অতিকষ্টে এই ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করেছে। কিন্তু কষ্ট হলেও অনেক দিন বাস করতে করতে মহন, সনারা এই 'ঘর' গুলোকে নিজেদের বলে আপন করে নিয়েছে। কারণ এই ঘরেই তাদের সুখের প্রশস্তি বহন করছে এতদিন। আবার মহনের মনে পড়ে বর্ধামানের সম্পন্ন চাষিদের তৈরী মজুরদের থাকার জন্য মাটির খুপড়ি ঘরের কথা। এই ঘরগুলোতে দীর্ঘ দিন থাকার কারণে তারা আপন

করে নিয়েছে কিন্তু সব কিছু ছেড়ে যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে মহনরা চলছে তখন এই ঘরগুলোর কথা ভেবে তাদের মন উদাস হয়ে যায়। মহন সেই ঘরের বর্ণনা দিয়েছে—

> "অন্য সব ঘরের কথা বার বার মনে হয়। নদীয়াতে ইটভাটার ঝুপড়ি ঘর। ইটের পর ইট সাজিয়ে দেওয়াল। বাখারি আর নারিকেল পাতার ছাউনি। মনে পড়ে বর্ধমানে সম্পন্ন চাষির অবস্থা।"[৭]

জীবনের বেশীর ভাগ সময় মানুষ যেখানে থাকে সেখানকার ঘর বাড়ির জন্য আস্তে আস্তে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনি মহন নিজের দেশের ঘরের চেয়েও কর্মের জন্য ভিন রাজ্যে এসে যে ঘরে থেকেছে তার প্রতি মায়া-মমতা অনেক বেশি বলে মনে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে 'ঘর' ছোট খুপড়ি হোক আর বড়ই হোক, উভয়ই কিন্তু মানুষের মনের শান্তির নীড়বহন করে। দীর্ঘদিন কাজের সন্ধানে বাহিরে এসে মহন নিজের 'ঘর' কে ঠিকমত আপন করতে পারেনি। আপন করে নিয়েছে অন্য ঘরকে। তাই মহন আক্ষেপ করে বলে—

> "ভাগীরথী পেরিয়ে পশ্চিমে বগবগা নদী পেরিছে ছিমোহন গ্রামে তার যে আপন ঘর, সে ঘরটিকে সংবৎসর আপন করে পাওয়া হয়নি কতকাল।"[৮]

এখানে মহন অনেক দিন থেকে নিজের ঘরকে আপন করে না পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে। শুধু মহন নয় এরকম আরো অনেক মহনরা নিজের 'ঘর' কে না পেয়ে মন খারাপ করে পুরানো স্মৃতি বহন করে চলে। মানুষ জীবনের সুখ শান্তির জন্য ঘর নির্মাণ করে। নানান রকম সুখ-দুঃখের অন্তর্জাল লিপিবদ্ধ থাকে তার মধ্যে। কিন্তু মহন ও সনারা যেহেতু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বাস করেছে সেহেতু খুপড়ি বা বড় যে-কোন ধরনের ঘরের প্রতি তাদের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, আপন-পর এর স্মৃতি বারবার উন্মোচিত হয়েছে। সনার মনে বদ্ধ প্রতিজ্ঞা, সে আর ঘর ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যাবে না, নিজের ঘর কামড়ে পড়ে থাকবে। ঘরে থেকেই সে নতুন কিছু কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করছে যা তাদের পরিবারের জীবন যাত্রা পরিবর্তন করে দেবে একদিন। এরকম শুধু সনা নয় বিশ্বের সমস্ত নারীরাই নিজের ঘরের স্বামী, পুত্র-কন্যা ও পরিজন সামলে এক সাথে থাকতে চায়। এই 'ঘর'ই হলো নারীর মন্দির। যেখানে থেকে সে গৃহদেবতাকে পূজা দেবে।

নদিয়ার ইটভাটা থেকে ভাগীরথী নদী পেরিয়ে মহন ও সনারা বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রথমে বর্ধমান অতিক্রান্ত করার পর তারা গোপালগঞ্জ পৌঁছায়। তারপর বগবগা নদী পেরিয়ে ছিমোহন গ্রামে তাদের বাড়ি। দীর্ঘদিন হেঁটে চলার পর মহন ও সনার পা আর চলে না। অথচ তাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করে ঘরে পৌঁছাতে হবে। তাদের এই পথ চলা প্রবহমান নদীর স্রোতের মতো, কত স্বপ্ন, কত রোমান্স এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। বগবগা নদী অতিক্রান্ত করার আগেই গোপালগঞ্জে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মহনরা আটকা পড়ে স্থান নেয় বাসযাত্রী ছাউনিতে। যাত্রী নিবাস থেকেও তাদের বাড়ি যেতে আরও চার ঘন্টার হাঁটা পথ। মহাশ্বেতার বর্ণনায় পাওয়া যায়—

> "এ ত্তর দিকে তাকায়। মহন বোঝে এখনও চার ঘন্টা পথ চলা সম্ভব নয়। এ অবধি পাকা না হোক, কাঁচা সড়কে এসেছে। তারপর নামতে হবে ঢাল ধরে। আর পথ ধরে চলতে হবে। বগবগা পেরোলে আরও নামুতে যেতে হবে। তারপর কালীমন্দিরের ভিটেয় উঠলে দেখতে পাবে বড়পাড়া, ছিমোহন, গুরুতলা।"[৯]

মহন স্ত্রী সনা, পুত্র এবং বস্তা, পোঁটলা নিয়ে গোপালগঞ্জের বাসযাত্রী ছাউনির পাশে গাছের নীচে বিশ্রাম নেয়। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাদের শরীর আর চলে না। মহন পাশের মিষ্টির

দোকান থেকে ঘটি ভর্তি জল খেয়ে পেটের খিদে নিবারণ করে এবং স্ত্রীর জন্য ঘটিতে জল নিয়ে আসে। এই সব নিম্নবর্গের মানুষের উদ্বৃত্ত টাকাও নেই যা দিয়ে কিছু খাবার কিনে খাবে। থাকার মধ্যে মহনের কাছে বাজার থেকে কেনা একটা মেটে আলু আছে, সেই আলুর গায়ে সে মনের আনন্দে হাত বুলায়। মহনরা মাছ, মাংস খেতে পায় না। কেনার সামর্থও নেই। তাই মেটে আলুই তাদের কাছে অধিক প্রিয় খাবার। মহন স্ত্রী সনাকে বলে–

> "-এবারে সনা, পূবের সিজগাছ কাটব না। সেখানে এই আলু বুনে দিলে সিজ গাছ বেয়ে লতা উঠবে। সে কেমন হবে।"[১০]

এই প্রান্তিক মানুষগুলো বেঁচে থাকার জন্য বেশি কিছু চায় না, মোটা চালের দু-মুঠো ভাত একটু সজি এবং বসবাস করার জন্য একটি ঘর। সরু চালের ভাত, মাছ ও মাংস তাদের কাছে বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা আমাদের বুঝতে হবে মহনের মেটে আলুর প্রতি ভালোবাসা দেখে, প্রতি বছর তারা বাড়ির পাশে মেটে আলু চাষ করবে এটা তাদের মনে প্রাপ্তি বোধের একটা বড় স্বপ্ন। সনা শুধু জল খেয়ে ছোট ছেলেকে বুকের দুধ দিয়ে, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরে মহনের কথা না শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ তার শরীর আর চলছে না।

অপরদিকে মিষ্টির দোকানদার যখন ছিমোহন গ্রামে মহনের বাড়ির কথা জানতে পারে তখন দোকানি মহনকে বলে–

> "–কেন বা বছর বছর নামালে যাও! সরকার তোমাদের কত সুবিধে করে দিচ্ছে... তা যেমন দুমকার মাঝিরা তেমন তোমরা বছর ভোর শুধু ঘরবে।"[১১]

'দুমকা' শব্দটি মহনের মনে কোনো সারা জাগায় না, কারণ অনেক পুরুষ থেকে তারা এদেশে বসবাস করে এসেছে। পাহাড় জঙ্গলের সাথে মহনের তেমন সখ্যতা নেই। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক ঘর মাঝি মিলেই তাদের সমাজ। এখানে দোকানি সরকারি সুবিধা বলতে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের সরকারের কাছ থেকে আর্থিক বা চাকুরির সুবিধার কথা বলেছেন। কিন্তু মহনের কাছে সরকারি সুবিধা আলো আঁধারি ভাষার মতোই রয়ে গেছে। কারণ সরকারের কাছ থেকে তারা কখনও কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি। তাই মহন কথা শুনে স্থির হয়ে যায়। সনা ঘুমালেও মহন সারা রাত পোঁটলা ও বস্তা পাহারা দেয়। তার শরীর শীর্ণ ক্লান্ত হলেও মনে খুব আনন্দ, কারণ আগামী দিন নিজের ঘরে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে পৌঁছাবে। ঘরে ফিরে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভাত রেঁধে খাবে, এটাই তার কাছে পরম প্রাপ্তি, চরম শান্তি এবং চিরসুখের কথা। সনার মতে মহনও মনে করে নদিয়ার ইটের ঝুপড়ি, বর্ধমানের পাতার ঝুপড়ি ঘরে এবং গাছের নীচে আর যাযাবর জাতির ন্যায় ছন্নছাড়া জীবন অতিবাহিত করবে না। এবার তারা এক সাথে ঘরেই থাকবে। রাতের আঁধারে মহনের মনে ভেসে ওঠে–

> "ঘরের ছামুতে বেঁধে খাওয়া। সে ভাতের অন্য স্বাদ মহনের ক্লান্ত দেহে মনে আত্মবিশ্বাস জাগে। মনেই থাকে না তার দেহ কত শীর্ণ, কত অক্ষম সে। না, ঘর কামড়ে সেও থাকবে। ও জেলায় ইটের ঝুপড়ি ও জেলায় পাতার ঝুপড়ি, সে জেলায় গাছতলা, আর নয়, আর নয়।"[১২]

মহনের এই কথা থেকেই বোঝা যায়, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আর অন্য কোনো ইটের ভাটা বা পাতার ঝুপড়িতে রাত কাটাবে না, শত কষ্ট হলেও নিজের ঘরেই থাকবে। কারণ অন্যের ঘর তা কখনও নিজের হতে পারে না, এমনকি নিশ্চিন্ত শান্তিও এনে দিতে পারে না। তাই সে ভেবেছে বাড়ির চারপাশ থেকে কাঁটামনসা ডাল কেটে পরিষ্কার করে নিজের ঘরেই স্ত্রী সন্তানদের সাথে সুখ-দুঃখের জীবন অতিবাহিত করবে। এখানে মহাশ্বেতা শুধু মহনের পরিবারের কথা বলেননি,

তিনি বুঝতে চেয়েছেন সমস্ত ভারত কথা বাংলার পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর কথা তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে, মেঠো পথ দিয়ে হেঁটে, মাটির মানুষের সাথে মিশে দিনের পর দিন কাটিয়ে তাদের জীবন কাহিনী নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। যার মধ্যে প্রকৃতি প্রেমজাত মানব জীবনের বাস্তব কাহিনীর প্রেক্ষাপট উদ্‌ঘাটন হয়েছে।

ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হলেই মহন, স্ত্রী সনা ও পুত্রকে নিয়ে বড় বাস রাস্তা থেকে নেমে ধানক্ষেতের আলপথ দিয়ে হেঁটে বগবগা নদী অতিক্রান্ত হওয়ার পথে এগোতে থাকে। মহনরা আলপথ দিয়ে চলার সময় বুঝতে পারে ধানক্ষেতে হাঁটুজল। তারপরেও তারা 'ঘর' পৌঁছাবে সেই আশায় বিপদকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু তারা সামনের দিকে যত এগোচ্ছে জল তত বেড়ে যাচ্ছে, ফলে বগবগা নদী পর্যন্ত আর যাওয়া হল না। তাদের বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া দেখে পিছন থেকে একদল লোক তাদের ডাকছে। মুহুরি, লালমোহন ও নিতাই। সবাই মিলে মহনকে ফিরে আসতে বলেছে। মহন ও সনা তাদের কথা শুনে হতচকিত হয়ে যায়। তাদের কোমর সমান জল সেই জল পেরিয়ে ফিরে আসাও কঠিন। মহন বলে—

> "পোঁটলা আমায় দে সনা, ছেলে মাথায় ওঠা। ছেলেটি বাঁচাতে হবে, পোঁটলা আর বস্তা ফিরিয়ে নেওয়া চাই। ওরা বড়ো কষ্টে, বড়ো চেষ্টায় উজিয়ে ফিরতে থাকে।"[১৩]

লক্ষ্যণীয়, মহন এবং সনার মত আরো অনেক লোক যেমন—মুহুরি সরেন, লালমোহন ও নিতাইরা বগবদা নদী পেরিয়ে ছিমোহন গ্রামে তাদের নিজেদের 'ঘরে' ফেরার জন্য অধির আগ্রহে চেষ্টা করে। মুহুরি নেমে এসে মহনদের উদ্ধার করে বাস রাস্তার পাশে গাছের নিচে বসায়। সেখানে নামাল ফেরা আরো অনেক মানুষের ভিড়। এখন তারা কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না, লালমোহন বলে—

> "রাত তিনপ্রহরে বগবগায় বাঁধ ভাঙ্গল, ভাগীরথী জল টানতে পারে না। আমরা ওইদিকে যেয়ে ঘুরে ঘুরে।"[১৪]

বস্তুত, বর্ষার জলে বগবগা নদীর দুই তীর প্লাবিত হয়ে বাঁধ ভেঙ্গে চাষের জমি এবং গ্রাম ভেসে গেছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। মহন, মুহুরি, লালমোহন ও নিতাইদের চোখে এমন শুধু স্বপ্ন, কতদিনে জল কমবে, না আদৌ কমবে না কিন্তু মহনের পুরোনো অভিজ্ঞতার স্মৃতি বারবার ভেসে ওঠে মনের মণি কোঠায়। বর্ষার প্লাবনে অনেকবার তারা বাড়িতে যেতে পারেনি, গাছের ছায়া হয়েছে বাসস্থল। সে ভাবছে এবারেও হয়তো ব্যতিক্রমী হবে না। মহনের স্বপ্নালু চোখে দুঃস্বপ্নের কড়াল গ্রাসের ছায়া নেমে আসে—

> "আবার সব অনিশ্চিত হয়ে গেল, হয়ে যায়। মহন বুঝতে পারে, কাঁটামনসার বেড়া কেটে ঘরে ঢুকতে এবারেও পারবে না। বগবগার পাড়ে মাটির বাঁধ। সে বাঁধ ভাঙ্গলে কতদূর জল যাবে কে জানে।"[১৫]

মহনের মনে আশা, আশাই রয়ে গেল, মনের সাধ আর পূরণ হলো না। সে ভেবেছে কাঁটামনসার বেড়া কেটে পরিষ্কার করে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে ঘরে সুখে বসবাস করবে। মেটে আলুর লতা সিজমনসা গাছে বাইয়ে দেবে, আলু বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন করবে আর কাছে পিঠে থেকে কাজকর্ম করবে। স্ত্রী সনা ঘরে থেকে সংসার এবং পুত্রদের দেখাশুনা করবে। মহনের সেই স্বপ্নালু হৃদয়ে অন্ধকার নেমে এলো ভেঙ্গে গেল তার স্বপ্নের বাঁধন। নামাল থেকে অনেক পথ অতিক্রান্ত করার পরেও আজ তাদের বাসস্থান হয়েছে, বগবগা নদীর তীরে খোলা আকাশের নীচে গাছের ছায়ায়। এজন্য মহন নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে, কপাল ভালো হলে তাদের এই

পরিহাস হবে কেন? বিধাতা তাদের ওপর বিরূপ করেছেন, তাই আজ তাদের এই করুণ পরিণতি মহনদের ঘরে সুখে বসবাস করার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, আবার নতুন করে বসবাসের স্থান হবে ইটের, মাটির বা পাতার খুপড়ি ঘর। যদি তাও না মেলে তাহলে গাছের নীচে ঘর মনে করে বাস করতে হবে। মহনের কথায় সেই করুণ আর্তি আবার ভেসে ওঠে—

> "আবার অন্য কোনো জেলা, অন্য কোনো ইটের বা মাটির বা পাতার খুপড়ি। নয়তো গাছতলা। মহনের ঘর মহন ও সনার ছেলে সবাই বিচ্ছিন্ন এখন।"[১৬]

মহাশ্বেতা 'ঘর' গল্পে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন মানুষের বাস্তব জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে শুধু মহন, সনা, মুহুরি, লালমোহন ও নিতাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে আরো অনেক 'ঘর' থেকে বিচ্ছিন্ন বিপন্ন মানুষ আছে যাদের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, ইচ্ছা থাকলে ইচ্ছা সাধন হয় না, তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট কোন ঘর থাকে না, ঘুরে ঘুরে যেখানে কাজ করবে সেখানেই তাদের 'ঘর'। তা হবে হয়তো ইটের বা মাটির বা পাতার খুপড়ি ঘর। আর তাও যদি না মেলে তাহলে গোটা পৃথিবীর মুক্ত নীল আকাশের নীচে সমস্ত গাছের তলাই তাদের 'ঘর' সেখানে তারা পাবে মুক্তো আলো, মুক্তো বায়ুর এক নতুন অনুভূতি। মহাশ্বেতা এখানে তুলে ধরেছেন—

> "ওরা কোনো গাছতলা খুঁজতে থাকে। সনা উঁ উঁ শব্দে কাঁদতে থাকে। মহন শোনে না। বলে—জল হলেও যা খরা হলেও তা, তবে তুই কাঁদিস কেন? বড়ো একটি ছায়া দেওয়া গাছতলা খোঁজে কয়েকটি মানুষ। এখন গাছ তলাই ঘর হবে।"[১৭]

নিম্নবর্গের এই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো দিশাহীন হয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। তাদের 'ঘর' থাকতেও আজ নেই। প্রকৃতিও যেন তাদের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। এই সব ছন্নছাড়া মানুষদের কাছে কিবা দিন কিবা রাত, সুখ ও দুঃখের একই অনুভূতি। নির্দিষ্ট কোন স্থানের 'ঘর' নয় সমস্ত পৃথিবীটাই তাদের কাছে আজ 'ঘর' বলে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়—সময়, সমাজ, পরিবেশে ও পরিস্থিতিকে অনবদ্য ভঙ্গিমায় মহাশ্বেতা এই 'ঘর' গল্পে ব্যবহার করেছেন। গল্পের প্রথমে নামাল ফেরা মানুষের ঘরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য 'ঘরে' পৌঁছোতে পারেনি। মহন, সনা, মুহুরি, লালমোহন ও নিতাইদের বসবাসের 'ঘর' হয়েছে গাছতলা। 'ঘর' কে আঁকড়ে ধরে ঘরের অসঙ্গতির দিকগুলিকেই খুঁজে বের করা হয়েছে। সংস্কার বিশ্বাসের কথা দিয়ে শুরু হলেও সেই সংস্কার বিশ্বাসের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে জেগে থাকে শুধু জটিল জীবন। এ গল্প তাই জীবনের জলছবি। মহাশ্বেতা তাঁর গল্প ও উপন্যাসে জীবনেরই ছবি এঁকেছেন পাতায় পাতায়। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দরিদ্রক্লিষ্ট নিম্নবর্গের, নিম্নগোত্রের মানুষের জীবনের কথা পেশা ও ঘরের কথা নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। অসহায় নামাল ফেরা মানুষ কিভাবে 'ঘর' এ যাওয়ার জন্য নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দগ্ধ হয়েছে, তারই প্রতিচ্ছবি বহন করেছে এ গল্পে। মহাশ্বেতা ব্রাত্য জীবনের রূপকার হলেও 'ঘর' হীন বিচ্ছিন্ন মানুষকে কিভাবে নির্মম-উদাসীন করে তোলে, এ সত্য ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কলমে।

তথ্যসূত্র:

১। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২৬
২। তদেব, পৃ. ১২৬
৩। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২৫
৪। তদেব, পৃ. ১২৬

৫। তদেব, পৃ. ১২৬
৬। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২৬
৭। তদেব, পৃ. ১২৬
৮। তদেব, পৃ. ১২৬
৯। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২৭
১০। তদেব, পৃ. ১২৮
১১। তদেব, পৃ. ১২৮
১২। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২৮
১৩। তদেব, পৃ. ১২৯
১৪। তদেব, পৃ. ১২৯
১৫। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৩০
১৬। তদেব, পৃ. ১৩০
১৭। মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৩০।

বাঙালি জাতি ও বাঙালির ইতিহাস বিবর্তনের ধারায় বিশ্লেষণ

বিশ্বজিত দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ওয়াই. বি. এন. ইউনিভার্সিটি, রাচি, ঝাড়খণ্ড
এবং
অরূপা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ওয়াই. বি. এন. ইউনিভার্সিটি, রাচি, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে গেলে উত্তর উত্তর শ্রী বৃদ্ধির অংশীদার হতে হয়। শ্রী বৃদ্ধির অংশীদার হতে গিয়ে কোন একটি জাতি কিংবা কোন একটি দেশ যদি নিজেদের অতীত ইতিহাস তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে দেয় তবে সেই দেশ বা জাতির পতন অনিবার্য। আমাদের ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন জাতির সংযোগ স্থল। কথায় বলে ভারতবর্ষের যথার্থ কোন ইতিহাস নেই। কারণ ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের শাসনাধীনে ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জাতি বাঙালি জাতি। এই বাঙালি জাতিরও যথার্থ ইতিহাস রচিত হয়নি। আমরা জানি ইতিহাসবিহীন জাতির পতন নিশ্চিত। সে হিসেবে বাঙালি জাতেরও পতন হওয়ার কথা। কিন্তু আজও সেই বাঙালি জাতি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার কারণ একটাই বাঙালি জাতি কোন কালে দুর্বল ছিল না। আমরা আসলে বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না। বাঙালি জাতি পৃথিবীর একমাত্র এমন এক জাতি যারা জন্ম লগ্ন থেকে আজও বিভিন্ন সময়ে সংগ্রাম করেই বেঁচে এসেছে। হয়তো মাঝে মাঝে তারা ভীতু কিংবা দৈবের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজেকে সংসারের কর্তা না ভেবে ভগবানকেই সংসারের কর্তা ভেবে বসেছিলেন। তাই হয়তো তারা নিজেদের ইতিহাস লেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি। তারা যতটা ভগবানের মঙ্গল গান করেছে ততটা মানুষের গান করেনি। কিন্তু তাই বলে বাঙালি কখনো ক্ষুদ্র জাতি ছিল না। বাঙালি জাতির উদ্ভব, বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব, বাংলা শব্দের উদ্ভব ইতিহাসের ধারায় বিশ্লেষণ করলে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সূচক শব্দ: বাঙালি, ইতিহাস, জাতীয়তাবোধ, শশাঙ্ক, পাল-সেন সাম্রাজ্য, পুনরুদ্ধার।

মূল আলোচনা:

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ প্রবন্ধে আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন:-

“বাঙ্গালার ইতিহাস নাই”

বঙ্কিমচন্দ্র এর জন্য বাঙ্গালীদের কেই দায়ী করেছেন। বাঙালিরা জড় প্রকৃতির ও আলস্য যুক্ত। সেই সঙ্গে বহি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে দৈব নির্ভর হয়ে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত বাঙালি জাতি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীদের মধ্যে জাতীয় গৌরববোধের একান্ত অভাব লক্ষ্য করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ইতিহাসবিহীন জাতির যে দুঃখ অপরিসীম তা উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ইতিহাসবিহীন বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। কিভাবে বাঙালি জাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব সেই বিষয়েও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু করতে হবে বাঙালির অতীত ইতিহাস দিয়ে। কিভাবে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে, বাঙালি কারা, তারা কেন বাঙালি নামে

নামাঙ্কিত। বাঙালি জাতির প্রাচীন অবস্থান ঐতিহ্য সংস্কৃতি সমস্ত কিছু মিলেই বাঙালির জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই রচিত হবে বাঙালির প্রকৃতি ইতিহাস।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বঙ্গদেশ:

এক গোষ্ঠী কিংবা এক দেশ নাম বা অভিন্ন গোষ্ঠীর বাঙালির কোন পরিচয় কিন্তু আমরা একেবারে সেই প্রাচীনকালে পাই না। আহমদ শরীফ জানিয়েছেন:-

"মনে হয় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়া, পুণ্ড্র ,বঙ্গা, রাঢ়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে।" তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের রচিত ঐতেরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গা (বঙ্গা বগাধস্বরপাদা:) এবং প্রাণীটির অষ্টাধ্যায় গ্রন্থে গৌড়া: রাঢ়া: পুণ্ড্র: প্রভৃতি গোত্রের সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের কোশমবীর নিকটে প্রভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) বঙ্গপাল নামক রাজার উল্লেখ রয়েছে। মানসোল্লাসে গৌড় বঙ্গল নাম পাওয়া যায়। হাজার বছরের পুরনো চর্যাগীতিতে বঙ্গালী বঙ্গাল দেশের নাম পাওয়া যায়। আবুল ফজল তার আইনে আকবরী গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে জানিয়েছেন বঙ্গাল শব্দ থেকে বাংলা শব্দটি এসেছে। ইউরোপীয় পর্যটকগণ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশকে bengalla বলে এসেছেন। গোপাল হালদার 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে বলেছেন:

> "রাঢ়, সূক্ষ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি প্রথমদিকে বোঝাতো বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে; তারপরে তাদের বাসস্থল হিসাবে এক একটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে।"

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির আবাসস্থল এই সমভূমিকে বলা হত বঙ্গদেশ। ইংরেজিতে যার নাম বেঙ্গল।প্রথম বঙ্গ শব্দটি ছিল এক কুম্ভ গোষ্ঠীর নাম হিসেবে বঙ্গ নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় পুরাণে বঙ্গবাসীদের পক্ষী জাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> "ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব হইতেই ইংরাজ বণিকগণ এই দেশকে Bengal বলিয়া আসিতে ছিলেন। তাহারা বাংলা ভাষাকেও Bengal Language বলিতেন। হাল হেড ইংরাজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাকে Grammar of the Bengal language (1778) বলিয়াছিলেন। মনোএল-দা আস সুম্পসাম ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিসবন হইতে মুদ্রিত করেন তিনি উক্ত ব্যাকরণের আখ্যা দিয়েছিলেন, Vocabulario Idioma Bengalla e Portuguez."

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত গৌড় ও বঙ্গ নামে দুইভাবে নির্দেশিত হতো। তুর্কি পূর্বকালে গৌড়, রাঢ়, সূক্ষ্ম, পুণ্ড্র, বগুড়া থেকে মিথিলা পর্যন্ত বরেন্দ্র, বঙ্গ ও কামরূপ (আসাম) নামে পরিচিত হতো বিভিন্ন অঞ্চল এবং সামন্তের রাজ্য অনুসারে এসব এলাকার পরিসরের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটত। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থ বলেছেন,

> "আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, অধিকাংশ দেশ নাম জাতি নাম হইতে আগত। (সেই জন্য সংস্কৃতিতে দেশ নামে সাধারণত বহুবচন হয়। যেমন "অস্তি মগধেশু চম্পকবতী নামার্ন্যানী", বঙ্গেসু আহববর্তিন:" ইত্যাদি।) সুতরাং

> বঙ্গজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বঙ্গদেশ অথবা বঙ্গে জলময় দেশে যাহারা পূর্বাপর বাস করিত তাহারা বঙ্গ এবং পরে তাহাদের নিবাসভূমি বঙ্গদেশ।"

বঙ্গ প্রদেশের বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের বলতে পারি বাঙালি, প্রাচীন বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল যেগুলি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বঙ্গ সুক্ষ পুন্ড্র ইত্যাদি। বাংলাকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক। রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বারে বারে বাংলার সীমানায় পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বলে কিন্তু বাঙালি জাতির অস্তিত্ব হারিয়ে যায়নি বরং আলোচনার ধারায় আমরা জানতে পারি সেই বাঙালি জাতি পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা লড়াকু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

বাঙালির শারীরিক ও মানসিক গঠন:-

বাঙালির আঙ্গিক গঠন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন অনেকেই। আধুনিককালে বিজলী, রমাপ্রসাদ চন্দ, শংকর গুহ প্রমূখ অনেকেই পর্যালোচনা করেছেন। মাথা কপাল নাক ঠোঁট কিংবা চোখ চুল চামড়া এই পরীক্ষার অবলম্বন। আলোচনায় বলা যায় নেগ্রিটো, আদি অস্ট্রেলীয় ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বাঙালি জাতির বা বাঙালির শারীরিক আঙ্গিক গঠনে। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, ২০ ভাগ মঙ্গোলীয়, ১৫ ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বাঙালি জাতিতে অনুমান করা অসঙ্গতা নয়। নিষাদ, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল শবর পুলিন্দ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি হল অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংকর আদি অস্ট্রেলীয় জাতির। কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচমেচ, মিজ্জার, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হলো মঙ্গোলীয়। পুণ্ড্র, রাঢ়, বঙ্গা, সূক্ষ্ম প্রমুখ ভৌগলিক বাংলায় ছিল প্রধান। অপ্রধানের মধ্যে কুল,শবর, পুলিন্দ,ডোম, চন্ডালরা ছিল নির্যাতিত।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'বাংলার ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে বাঙালি, বাংলা, বাঙালি জাতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন মহাভারতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, সূক্ষ্ম রাজারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে ছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে নৌযুদ্ধে নিপুন ও সাহসী যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বাঙালিরা। রঘুরাজ সেই বাঙালি যোদ্ধাদের পরাজিত করেছিলেন। অতএব বাঙালির গোত্র কিংবা রক্ত পরিচয় যা ই হোক না কেন বলের দিক দিয়ে বা রাজনীতিতে তারা কিন্তু কোনকালে পিছিয়ে ছিলেন না। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের ভাষায় প্রাচীন বাঙালির চরিত্র:-

> "শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞান চর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রান ধর্ম ও হৃদয় বেগের প্রাধান্য.... আবর্তন ও বিপ্লব,দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাট যেন বাংলার ঐতিহ্য ধারায়, বাঙালির বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রুপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমিকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতোই সোজা হইয়া স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালিকে বারবার বাছাইয়াছে।"

ভারত শংকর জাতির দেশ। বাংলার পক্ষে এ কথা আরও বেশি করে খাটি। আদিকাল থেকে এখানে নানা বর্ণের ও নানা গোত্রের লোকের বাস। 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে আহমদ শরীফ জানিয়েছে:

> "অস্ট্রিক, আলপাইন, প্যামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গলীয় প্রভৃতি জাতের সমবায়ে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব। সাত শতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গ গৌড় রাজ্য গড়ে ওঠে। চর্যাপদে বঙ্গ এর সঙ্গে আল ও আলী প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে।"

বাঙালি ভাবপ্রবণ ও কল্পনা প্রিয়। তাদের চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ দেখা যায় ভাবপ্রবণতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বন্ধনবিরুক্তা দ্বান্দ্বিকতা সকল গুনে বাঙালি চরিত্র সমৃদ্ধ। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই তাদের ভেতরকার ভাব ও কল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই বাঙালি যখন কাঁদে তখন কেদে ভাষায় আর যখন হাসে তখন দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয় তখন আগুন জ্বালায়। কিন্তু কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী নয় যেহেতু উচ্ছ্বাস উত্তেজনা মাত্রতাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী। ভাব প্রবণ বলেই বাঙালি মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্য ধর্মী। যখন আমরা স্মরণ করি এই মাটির বুকেই এই মানুষের মনোভূমিতেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নবপ্রেমবাদ, ব্রহ্মদর্শন তখন গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। আমরা যখন স্মরণ করি মীননাথ গোরক্ষনাথ শীলভদ্র জীমূতবাহন রামনাথ রঘুনাথ চৈতন্যদেব রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নজরুল তখন নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা:-

বাঙালির সংস্কৃতির আলোচনায় জাতিসত্ত্বার দিকটি বেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা আছে।তাদের সংস্কৃতি কেবল জীবন জীবিকাগত নয়, স্থান, কাল ও পাত্রে তা হয়ে উঠেছে জাতীয়তার ধারক ও বাহক। যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের অনুকূল পরিবেশ থাকে সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বাত্মক বিকাশের এবং জীবিকার সর্বাত্মক প্রসারে লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার মানুষরা কখনো স্বকীয় মেজাজে আত্মবিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। বাঙালির সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির মননে ও আধ্যাত্ম্‌ বুদ্ধিতে সাংখ্য যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল ছিল। সর্বপ্রেমবাদী তথা জড়বাদী ও যাদুতে তার আস্থা অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, পশুপাখি দেবতা, দেহ চর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। গুপ্তদের ও শশাঙ্কের শাসনকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উৎকল মগধ অংশ হর্ষবর্ধন এবং গৌড় পুণ্ড্র রাঢ় কামরূপ অঞ্চল ভাস্কর বর্মন দখল করে নেন। ভাস্কর বর্মনের পরে রারের অধিপতি রূপে আমরা জয়গান কে পাই। কিন্তু এরপরে প্রায় শত বছরের রাঢ় গৌড়ের ইতিহাস আমরা আর পাই না। তারপরে আমরা দেখি ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে পাল রাজত্ব শুরু এবং ৭৫০ এর দিকে বঙ্গে শান্তিদেব বংশীয়দের রাজত্ব শুরু। ৭২৫ এর দিকে জয়বর্ধন নামে এক শৈল বংশ রাজা কিছু কাল পুণ্ড্র শাসন করেন। আট শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কিছু অংশ জয় করে কিছুকাল শাসনে রাখেন মগধরাজ যশোবর্ধন। শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে সামন্ত রাজারা মাৎস্যনায়ের অবসানে এক সামন্ত গোপালকে সার্বভৌম রাজা করে আনুগত্যের স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেন। গোপাল বাঙালি ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় সন্ধ্যাকর নন্দির রামচরিত থেকে গোপালের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন।

শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান:-

ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে বাংলাদেশে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে গৌড় রাজ্য সর্বাধিক

খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার করে। গৌড় রাজ্যের এই ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে:-

"বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।"

অনেকের মতে তার অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। আবার অনেকে অনুমান করেন যে তিনি পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় মগধরাজ মহাসেন গুপ্তের অধীনে সামন্ত ছিলেন। মহাসেন গুপ্তের মৃত্যুর পর ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তিনি গৌড়ের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন গৌড় বলতে উত্তরবাংলা ও পশ্চিম বাংলাকে বোঝাত। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। যা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে অবস্থিত।গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরেই তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ তাঁর অধিকারী ছিল কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না তবে বাংলার বাইরে অভিযান পাঠাবার পূর্বে নিশ্চয়ই সমগ্র বাংলার উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দক্ষিনে দণ্ডভক্তি উৎকল ও কঙ্গোদ জয় করেন। পশ্চিমে মগধ তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রমেশ চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে,

"শশাঙ্কের পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী রাজা এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।"

পাল সাম্রাজ্যের উত্থান:-

৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুতে উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং আর্যাবর্তের নানা স্থানে কয়েকটি স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে রাজপুতানা ও মালবের প্রতিহার বংশ এবং বাংলা বিহারের পাল বংশ উল্লেখযোগ্য। এসময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। আত্ম কলহ, গৃহযুদ্ধ হত্যা, ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন, দুর্বলের উপর সবল দরিদ্রের উপর ধনির অত্যাচার নৈরাজ্য ও অরাজকতা ছিল বাংলার স্বাভাবিক নিয়ম। সুস্থ ও স্থায়ী প্রশাসন না থাকায় বাহুবলই ছিল শেষ কথা। বৌদ্ধ পন্ডিত তারানাথ এই অবস্থার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন:-

"সারা দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বণিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এর ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না।"

পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে বাংলার মানুষেরও ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। বাংলার এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে মাৎস্যন্যায়। শুধু তাই নয় বাংলার অভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগে এ সময় শুরু হয়েছিল একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বিদেশী আক্রমণ বাংলার জনজীবনকে সীমাহীন নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই অরাজকতার সময়েই বাংলার নেতৃবৃন্দ দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে এক প্রতিপত্তিশালী সামন্ত রাজা কে বাংলা সিংহাসন স্থাপন করেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের ফলে বাংলার বুক থেকে মাৎস্যন্যায় দূর হয় এবং বাংলার ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। এই গোপাল হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রধান কীর্তি হল বাংলার শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিশ্চয়ই সমগ্র বাংলায় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গোপালের পুত্র ধর্ম পালের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং তিনি বাংলাকে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। ধর্মপাল আর্যাবর্তের এক বিস্তীর্ণ স্থানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। কনৌজ তার অধিকার আসে। কনৌজ অতিক্রম করে তিনি কেদার ও গোকর্ণ দখল করেন। কেদার ও গোকর্ণ

বলতে যথাক্রমে গাড়ওয়াল ও নেপালকে বোঝায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধর্মপাল তার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ধর্ম পালের রাজত্বকাল 'বাঙালির জীবন প্রভাত'।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার যোগ্য পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার মতোই বীর ও রণ কুশলী ছিলেন। বাদল স্তম্ভ লিপিতে তাকে উত্তর হিমালয় থেকে বিন্দ পর্বত এবং পূর্বসাগর থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে,

> "ধর্মপাল এবং দেবপালের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মহানযুগ"।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের ক্ষমতা ও অধিকার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। রাজন্যবর্গের দুর্বলতা উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন জাতি বর্গের আক্রমণ পাল বংশের রাজত্বকে দুর্বল করে দেয়। পরবর্তীতে পুনরায় প্রথম মহিপালের নেতৃত্বে সেই পাল বংশের শাসন পুনরুদ্ধার হয়। পতনপ্রায় পাল সাম্রাজ্যকে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নতুন জীবন দান করেন। এই কারণে তাকে দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। মহিপালের মৃত্যুর পর রামপাল, রামপালের পর মদন পাল সিংহাসনে বসলেও পাল রাজত্ব আর রক্ষা পায়নি। সামন্ত রাজা বিজয় সেন মগদে স্বাধীন সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেন বংশের বিস্তার:-

প্রথমে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চল থেকে বাংলায় এসে সামন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সামন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন হলেন স্বাধীন সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কবি উমাপতি ধর রচিত দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি গৌড়, কামরূপ কলিঙ্গ মগধ প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তার সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পশ্চিমে কৌশিক গন্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষাট বৎসর ব্যাপী তার রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে শান্তি ও স্থিতির যুগ হিসেবে চিহ্নিত। তার দুটি রাজধানী ছিল একটি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের বিজয়পুর।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন পুত্র বল্লাল সেন। বল্লাল সেন রাজ্য জয় অপেক্ষা রাজ্য সংরক্ষণ বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ঘোরতর রক্ষণশীল ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লাল সেনের পরেই সিংহাসনে বসেন লক্ষণ সেন। পিতামহ বিজয় সেনের আমলেই লক্ষণ সেন গৌড় কলিঙ্গ কামরূপের রণক্ষেত্রে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পুরী বারাণসী ও প্রয়াগে তার বিজয়স্তম্ভ পাওয়া গেছে। তিনিই সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। লক্ষণ সেনের রাজত্বকালেই তুর্কি নায়ক মোহাম্মদ ঘুরির অনুচর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলা বিহার জয় করেন। বাঙালি জাতির শৌর্য বীর্যের প্রতীক স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়।

বাঙালি জাতিসত্ত্বায় গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ হয়ে জাতীয় বিজয়ের যেসব বিজয় স্তম্ভ পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় বাঙালি জাতি কখনো ক্ষুদ্র কিংবা অবহেলার যোগ্য জাতি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে সে বিষয়টি সমর্থনে জানিয়েছেন:-

> "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গ জয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক

> কেবল মধ্য বঙ্গ বিজিত। ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেন বংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'প্রথম শিক্ষা বাঙালার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এনে বঙ্কিম জানিয়েছেন:

> "পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই। দক্ষিনে সুন্দরবন সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুর রাজা ছিল; পূর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কোচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। যে সময়ে তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"

অতএব বাঙালি জাতির অধঃপতন একদিনে ঘটেনি। হোসেন শাহী আমল কিংবা পাঠান রাজত্বকালেও বাঙালি শিল্পকলা স্থাপত্যে উন্নতির চরম শিখরে ছিল। মোগল সম্রাট আকবর হলেন বাংলার কাল। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাকে বাঙালিকে পরাধীন করেন। ইংরেজ শাসনাধীনও বাঙালি এতটা লাঞ্ছিত হয়নি যতটা হয়েছে মোগল শাসনকালে। বাঙালির রক্ত চুষেই মুঘলরা নিজেদের স্থাপত্য নির্মাণ করেছে। স্বাধীনোত্তর দ্বিখন্ডিত বাংলার বাঙালিরা নিজেদের জাতীয়তাকে পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেই গড়ে উঠবে বাঙালির প্রকৃত জাতীয় সত্তা। বাঙালি জাতির কিংবা বাংলা ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে বাঙালি জাতিকেই। বিশ্বায়নের যুগে জাতিসত্তায় জেগে উঠতে না পারলে, জাতীয়তাবোধ জাগরিত না হলে বাঙালি জাতি কিংবা বাংলা ভাষাকে একদিন থমকে দাঁড়াতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ০৮.
২. তদেব, পৃ.১৪.
৩. শরীফ, আহমদ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) নয়া উদ্যোগ,কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ০৬.
৪. তদেব, পৃ.০৭
৫. মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ, সভ্যতা ও বিশ্ব, শ্রীধর পাবলিশার্স, ২০৭বি, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ.১০২.

গ্রন্থপঞ্জী:

১. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৭০০০০৪।
২. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ৭০০০৭৩।
৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৭/১পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯।
৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, নয়া উদ্যোগ, বিধান সরনী, কলকাতা, 700006।
৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, 700073।

প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতির বর্তমান অবস্থান ও বিশ্বায়ন

চন্দন নাড়ু
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন ভারতীয় 'লোকসংস্কৃতি' ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ যে সংস্কৃতির বিচ্ছেদ নেই। আর এই অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, এটি বর্তমানে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও অন্য দেশের সংস্কৃতির মধ্যে একটি মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর এই মেলবন্ধনের জন্যই আজ বিশ্বায়নের প্রভাব সারা বিশ্বজুড়ে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ভয়ঙ্করভাবে বিস্তারলাভ করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই লোকসংস্কৃতির প্রাধান্য কেমন বিদ্যমান রয়েছে? লোকসংস্কৃতি যা ভারতের ঐতিহ্য, তা বর্তমানে কেন চর্চিত বিষয় হয়ে উঠছে? আর একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতি ভারতবর্ষে কেমন প্রভাববিস্তার করেছে? এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্রকরে প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একটি চর্চিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ভূমিকা: লোকসংস্কৃতি বলতে ঠিক কি বোঝায় তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। তবে সেসব বিতর্কে না গিয়ে লোকসংস্কৃতি নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজি *'Culture'* এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। আচার্য ক্ষিতীমোহন সেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শিল্পসম্বন্ধীয় একটি বাণী **(আত্মসংস্কৃতির্ভাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা ঐতের্যমান আত্মানং সংস্কুরুতে)** থেকে শব্দটিকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মতে, **'ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও লোকসংস্কৃতি মহনীয় সমন্বয়'**। 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলেও শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতি শব্দটিকেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা আজও বর্তমান। 'সংস্কৃতি' শব্দটির পূর্বে 'লোক' শব্দটি প্রয়োগ করে যে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গঠন করা হয়েছে, তাতে জনজীবনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা:

প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে একথা বলতেই হয় যে, এর ঐতিহ্য ও রীতি নীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। তবে এই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য আঞ্চলিকগত দিক থেকে ভিন্ন। তাই ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহুধা বিভক্ত। **'সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর'** এই শিরোনামটি আমরা পেয়েছি ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর *'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'* গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'গ্রাম্যসাহিত্য'* প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল-চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে'। অর্থাৎ প্রায় একশো বছর পেরিয়ে আজ উন্নত প্রযুক্তির কালেও ভারতের গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির সেই পরিবর্তনের মাত্রা বেড়েছে বই কমেনি। অতএব এই বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। সংহত অঞ্চলের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি, যার ক্ষেত্রস্থল মূলত গ্রামাঞ্চলই। ভারতের লোকসংস্কৃতির কথা যদি বলি, তাহলে অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাপেক্ষেই তা বিচারযোগ্য। লোকায়ত ভারতবর্ষ, কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক গ্রামই তো ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ। বাংলা সেই গ্রামীণ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি।

সুতরাং বাংলায় যারা উচ্চসংস্কৃতির ধারা বহন করছে, তাদের সেই উচ্চসংস্কৃতির গভীরেই গ্রামীণ অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং এই লোককথা, লোক সাহিত্য, রীতি নীতি বা ঐতিহ্য এবং প্রথা প্রভৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে এই ঐতিহ্য বা প্রথা হয়ে উঠেছে সংস্কৃতিতে। সুতরাং লোকসংস্কৃতির অস্তিত্ব বহু প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে তা বলা যেতে পারে। কিন্তু বড় বিষয় হল এই যে সব প্রথা, রীতি, নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, মানা, না মানা এই সকল বিষয় মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে। যখন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি তখন মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এই সমস্ত প্রথা বা রীতি নীতিকে ব্যবহার করা হত। এই কারণেই মানুষে মানুষে যত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম বা জাতপাতকে কেন্দ্র করে, ঠিক ততটাই মানুষের প্রথা বা রীতি নীতি বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে।

সংস্কৃতি আসলে সুরুচিপূর্ণ এক ধারাবাহিক উৎকর্ষতার চর্চা এবং এর ধর্মই হল পরিবর্তনশীলতা। তাই এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রম নয়। সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েই যায়। বর্তমানে ভারতীয় লোকসংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্রনে যে আধুনিকতার প্রবেশ ঘটেছে, যার ফলস্বরূপ এক নবজাগরণের পটভূমি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির মধ্যেও আধুনিকতার প্রবেশ ঘটেছে নবজাগরণের হাত ধরে বহুকাল আগেথেকেই। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যান। রামমোহন তাঁর ***‘বেদান্তসার’*** গ্রন্থে পুরোনো সংস্কৃতিকে নতুনভাবে বিচার করেন ভারতীয় লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করেই। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃতচর্চার পথেই হেঁটেছিলেন। মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যকে পাশ্চাত্যের আলোতে ফেলে তাঁর ***‘বীরাঙ্গনা’, ‘ব্রজাঙ্গণা’*** কাব্য নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ***‘কৃষ্ণচরিত্রে’*** কৃষ্ণকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সাজিয়ে তুলেছিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব:

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ৯০-এর দশকের গোড়ায় তথা **১৯৯১** সালে যখন ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের আগমন ঘটে, ঠিক তখন থেকেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগমন ঘটে আধুনিকতার হাত ধরে। কারণ বিশ্বায়ন হল জাতি-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান এক পারস্পরিক নির্ভরশিলতার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, ও বানিজ্যগত দিক থেকে সারা বিশ্বকে একটি বিশ্বে পরিনত করা। এর ফলে বিশ্বায়ন আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তারলাভ করেছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমুহে এর পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক প্রবনতা যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়। বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি ব্যপক ও বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক ও পশ্চিমি সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বের ভোগবাদী সংস্কৃতির দ্বারা ব্যপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশসমূহের সংস্কৃতি। দেশীয় সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্যভোগবাদী ও বেয়াব্রু সংস্কৃতি প্রবেশের ফলে সংস্কৃতির পরিচয়জনিত সংকট শুরু হয়েছে টিভি, অন্যান্য গণমাধ্যম, ইন্টারনেট, তথা তথ্য প্রযুক্তির দৌলতে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে গান, সিনেমা, ফ্যাশন, জিবনধারা, রীতি-নীতি ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতায়। আর এটি মানুষের জীবনে গুরুতরভাবে প্রবেশ করেছে, যেমন লিভ টুগেদার ও নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে বিশ্বায়নের হাত ধরে। সুকৌশলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কর্তৃস্থানীয় রাষ্ট্রসমুহ তাদের সংস্কৃতিকে তরুন প্রজন্মের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে করে এই প্রজন্মের মনে হয়, এই সংস্কৃতির কোনো বিকল্প নেই। সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের মূলে দূটি উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করা যায়—যথা (ক) মনস্তাত্বিক ও (খ) অর্থনৈতিক। ককা-কোলা, পেপ্‌সি, ম্যাক্‌ডোনাল্ডস্‌, কে.এফ.সি, ডোমিনোস্‌ প্রভৃতি পানীয় ও ফাস্ট ফুড সবই বিশ্বায়নের

দৌলতে প্রথম বিশ্বের কিছু বহুজাতিক দ্বারা সারা বিশ্বে বিক্রি হচ্ছে। এই সমস্থ আহার ও পানীয় ভারতীয় সংস্কৃতিতেও প্রবেশ করছে।[৪] ভারতে নয়া উদার-নৈতিক নীতি গৃহীত হওয়ার পরে দেশের টিভি চ্যানেলগুলোর নিয়ন্ত্রন বিদেশি মাধ্যমগুলোর হাতে চলে গিয়েছে। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী টিভি চ্যানেলের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। এই টিভির মাধ্যমেই মানুষের মননে ও চেতনায় পাশ্চাত্য রঙিন ভোগবাদী জীবন যাত্রার চলচিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের থাবা বসেছে। লোকায়ত সংস্কৃতি বিস্মৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্য গান ও সিনেমার প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে তরুণ প্রজন্মের। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, আমাদের দেশের বাউল গানের ভুবনীকরণ হয়েছে নতুন ব্যবস্থায়। বাউল, লোকগীতি, ভাটিয়ালি ও ওন্যান্য লোকসঙ্গীত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ও সমাদৃত হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির একচেটিয়া দাপটের প্রভাবে ভোগবাদী মানুষ নিজের ব্যক্তিগত, বস্তু জাগতিক সমৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়ন ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে নারাজ। দেশের দুর্দশা, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দেশীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় প্ররভৃতি নিয়ে এখন আর সাধারণ মানুষ খুব ভাবিত নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসাম্য ও অবিচারের প্রতিও তারা উদাসীন। ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহ বিভিন্ন সময়ে সেদেশে পড়া ও চাকরি করতে যাওয়ার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রদান করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। ভোগবাদী সুখী জীবনের সন্ধানে পাশ্চাত্যে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ‘ব্রেন ড্রেন’ও হচ্ছে বিপুল পরিমানে। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে একক ধরনের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি করে যা সংশ্লিষ্ট ধনী দেশের স্বার্থে প্রচার করে। এভাবেই ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর বুর্জোয়া শ্রেণীও তৃতীয় বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং একই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে সুনিশ্চিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে।

একই অর্থে সাংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান। আর ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতে বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিগত প্রভাবের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিদ্যমান ঐতিহ্য ধীরে ধীরে সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে। বিশ্বায়নের ফলে বাজার অর্থনীতিতে আজ ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিকিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি ও রীতি নীতি বা ঐতিহ্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবমূলক রাজনীতির ফলে এক ধরনের মিশ্র-সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর পশ্চাতে নানা কারণ রয়েছে—

- ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত চায় যে, তারা যেন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমুহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
- নিজেদের সংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতি রূপে বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার সৃষ্টি করা।
- সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে মুনাফা অর্জন করা।
- অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করা।
- আর নিজেদের আধিপত্যকে বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরা প্রভৃতি।

মুল্যায়ন:

সুতরাং, বিশ্বায়নের ফলে এক দেশের সংস্কৃতি যেমন অপর দেশে প্রবেশ করছে, ঠিক তেমনই অপর দেশের পোশাখ-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাত্রার মান ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে মানুষ তার নিজের দেশের সংস্কৃতি তথা নিজেদের লোকসংস্কৃতি ভুলে

বিদেশী সংস্কৃতির আদব-কায়দায় বশিভূত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি বিশ্বায়নকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দেশের লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা যায় তাহলে এটি নিজেদের দেশের ক্ষেত্রে গর্বের বিষয় হবে। তবে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ভারতে যেহেতু ভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান তাই বিশ্বায়নের ফলে কিছু কিছু লোকসংস্কৃতির বানিজ্যকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার নিজেদের দেশের অনেক লোকসংস্কৃতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে বিদেশী বানিজ্যের অঙ্কের পরিমান ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। অর্থাৎ মাঝপথে নিজেদের দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বিলুপ্ত হচ্ছে। যেমন এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, জেলা স্তরে গ্রামের মেলাগুলিতে গেলে বোঝা যেত যে, ভারতবর্ষে লোকসংস্কৃতি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু বিশ্বায়নের পরবর্তী সময় থেকে তা কিন্তু ধীরে ধীরে ভিষণভাবে পরিবর্তীত হতে থাকছে। এখন জেলাস্তরের মেলায় গেলে বোঝা যায় পশ্চিমি সংস্কৃতি যাকে কিনা উন্নত সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে তা কিন্তু ব্যাপকতরভাবে পিরামিড আকারে গ্রাস করেছে। ফলে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি যেমন ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে তেমনই মানুষের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় বিশ্বায়নকে কেন্দ্রকরে যেভাবে বেসরকারিকরণ ও বাজার অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্বের উপর বর্তাচ্ছে তার ফলে তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতির উপর এক ব্যাপক আঘাত হানছে। সুতরাং পশ্চিমি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রভাবমূলক রাজনীতির ফলে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি ভিন্ন-সংস্কৃতি ও মিশ্র-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

উপসংহার:

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চালু রাখতে ভারত সরকার যেসব আর্থিক সংস্কার প্রবর্তন করেছে সেগুলির মধ্যে ছিল সরকারি ব্যয় সংকোচন, ভর্তুকি কমিয়ে আনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিষেবায় সরকারি ব্যয় কমানো ইত্যাদি। এগুলি সাধারণভাবে জনজীবনে অশুভ প্রভাব ফেলেছে। কল্যাণকর অর্থনীতি থেকে ক্রমশ সরে যাওয়ার প্রবণতা দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে নানারূপ বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সরকারের এই সমস্থ উদ্যোগ আর্থিক মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে সক্ষম হয়নি। ঠিক তেমনই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক প্রভাবমূলক রাজনীতিতে পরিনত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, প্রথা বা রীতি-নীতি, লোকগীতি, লোকসংস্কৃতি ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের আগমনের পরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং পরিবর্তে প্রাধান্য পাচ্ছে পশ্চিমি সাংস্কৃতি। আর এক্ষেত্রে বলাযেতে পারে যে, তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব সাংস্কৃতিগত দিক থেকে এক আধিপত্য বিস্তার করেছে। পশ্চিমি বিশ্বায়ন নতুন করে ভারতবর্ষ তথা উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে ভগ্যপণ্যের বাজার নিয়ে হাজির হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে এক ভোগবাদী সংস্কৃতির। এর ফলে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি বিশেষকরে লোক সংস্কৃতি ও গ্রামীন জীবনচর্যা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্যাটেলাইট টেলিভিষণ চ্যানেলগুলি বাড়িয়ে দিচ্ছে নানাবিধ বিলাস সামগ্রীর প্রতি মানুষের আকুতিকে। ফলে তালমিলিয়ে ভেঙে পরছে মূল্যবোধ, নৈতিকতার চিরায়ত ভিত্তি; বাড়ছে হিংসা, লোভ, লালসা ও অপরাধপ্রবণতা। ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে চিরায়ত লোক গান, লোক্সংস্কৃতি, লোক ধর্মধারা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি। সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে বিশ্বায়িত ও পণ্যায়িত এক স্থূল ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতি।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী:

- Stiglitz Joseph : *Globalization and Its Discontents.,* Penguin, India, 30th July, 2012.
- Sahai Paramjit : *Indian Cultural Diplomacy.,* VIJ Books, India Pty Ltd, 28th February, 2019.

- Dattagupta Rupak : *Global Politics.,* Pearson, India, 1st October, 2019.
- চক্রবর্তী বিশ্বনাথ, নন্দী দেবাশিষ : *তত্ত্ব ধারণা ও বিষয় বিতর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক.*, প্রগ্রেসিভ পাব্লিশারস, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩।
- ড. চক্রবর্তী বরুণ কুমার : *লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ.*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা ৭০০০০৯।

মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ : একটি মূল্যায়ন

ইতিষা নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: স্বল্প পরিসরের জীবন পর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর কীর্তিকর্মের সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার ছাপ রেখে গেছেন পরবর্তী সময় ও যুগ চাহিদার কাছে। তাঁর দূরদর্শী মানসিকাতার দরুণ তিনি যেমন তাঁর কলমের ধারে একদিকে নটীর নূপুর ও মদের পেয়ালায় ডুবে যাওয়া উনিশ শতকের উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে কষাঘাত করেছিলেন হুতোম প্যাঁচার ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে; অন্যদিকে তেমন তলিয়ে যাওয়া বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে ফিরিয়ে আনতে বাংলা নাটকের সূচনাপর্বের সন্ধান দিয়েছিলেন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি অন্ধ অনুকরণের যুগে বাঙালি জাতির এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এক স্মরণীয় কীর্তিতে ছাপ রেখে গেছেন মহাভারত অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। সন্ধান চলতে থাকে অতীতকে নুতন করে ফিরে পাবার। তাঁর মহাভারতের প্রথম পর্বের প্রচারে এটির নাম দিয়েছিলেন 'পুরাণসংগ্রহ'। পরিসর বিস্তৃত ও দুরূহ হওয়ার দরুণ একাকী এই গ্রন্থের অনুবাদ করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়; একপ্রকার অসম্ভব। তাই এই সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ কর্মে তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের। এই সূত্রে পণ্ডিতমহলে প্রশ্ন উঠেছিল সত্যিই কি কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের আনুবাদ করেছেন? এর পাশাপাশি তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় বর্ধমানের রাজা মহাতাব্ চন্দ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রায় একই সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন মহাভারত অনুবাদের আয়োজনে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে মহাতাপচাঁদকে টেক্কা দেওয়ার জন্যই কি কালীপ্রসন্ন অনুবাদ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন? হয়তো না। কারণ, যে ব্যক্তি সামাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতি কল্পে নিজেকে বিস্তৃত করেছিলেন নির্দ্বিধায় তাঁর পক্ষে টেক্কা দেওয়ার মতো নগণ্য রেশারেশিতে থাকা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়; তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহধন্য ব্যক্তি। সেই হেতু তাঁর মহাভারত অনুবাদের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বিদ্যাসাগর বিরত হন তাঁর অনুবাদ কর্ম থেকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিষয় অনুয়ায়ী ভাষা প্রয়োগের দক্ষতার দরুণ তিনি অনুবাদ গ্রন্থটিকে রূপ দিয়েছিলেন আক্ষরিক আনুবাদে নয়; সাধ্যমত তংসম শব্দ বর্জিত সর্বজনবোধ্য সহজপাঠ্য বাংলা ভাষার এক অনুবাদ গ্রন্থে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি মুদির দোকান থেকে রাজপ্রসাদ পর্যন্ত পাঠ হয়ে এসেছে একই সুরে। সেই জায়গায় আন্তরিকতার সাথে সমাদরে আসন করে নিয়েছে কালীপ্রসন্নের 'পুরাণসংগ্রহ'। যা এক ডাকে সকলের কাছে 'কালীসিংহী মহাভারত' নামে পরিচিত। তাই যতদিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে; যতদিন এই মহাকাব্য দুটি বাঙালির মণিকোঠায় স্থান নিয়ে থাকবে; ততদিন আদরের সাথে স্মরণ হতে থাকবে 'কালীসিংহী মহাভারতে'র নাম।

সূচক শব্দ: যুগ চাহিদা, উচ্ছৃঙ্খল সামাজ, বাঙালি সংস্কৃতি, পুনর্জাগরণ, অনুবাদ কর্ম, ভাষা প্রয়োগ, কালীসিংহী মহাভারত।

মূল প্রবন্ধ:

১৮৪০ থেকে ১৮৭০ এই ত্রিশ বছরে স্বল্প জীবনকালীন সময়পর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর কীতিকর্মের সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার ছাপ রেখে গেছেন উনিশ শতক ও পরবর্তী

সময়ের কাছে। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একই ব্যক্তি একদিকে আমাদের উনিশ শতকের উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে দেখিয়েছেন হুতোম প্যাঁচার চোখ দিয়ে, অন্যদিকে বাংলা নাটকের সূচনাপর্বের পথটির দিশাও দেখিয়েছিলেন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণের যুগে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এক স্মরণীয় কীর্তিতে দিকে ছাপ রেখে গেছেন মহাভারত অনুবাদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন উনিশ শতকের মাঝ পরিক্রমার পৌঁছে কালীপ্রসন্ন কেন মনোনিবেশ করলেন মহাভারতে? এর উত্তরে বলা যায়, বাঙালি জাতি তখন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে। তাই, উনিশ শতকে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে আগ্রহ দেখা যায় প্রাচ্যের পুরাকীর্তি ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে। সন্ধান চলতে থাকে অতীতকে নতুন করে ফিরে পাবার। একদিকে পাশ্চাত্যের ভাবসংঘাতে বর্তমানে সচেতন হয়ে ওঠা, অন্যদিকে বর্তমানের সচেতনতায় অতীতের কীর্তি ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা-এই দুইয়ের চিন্তা-চেতনা থেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহ মনোনিবেশ করেছিলেন মহাভারত অনুবাদে। আমাদের অতীত পুরাকীর্তির মধ্যে গর্বের বিষয় ধর্ম, পুরাণ, কাব্য ও নাটক। যা দীর্ঘদিনের চর্চার অভাবে বাঙালি জাতির স্মৃতিপট থেকে প্রায় বিলুপ্ত। তখন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে একটু সরিয়ে রেখে বাঙালি জাতি যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইছিল অতীতের সাথে বর্তমানের। সেই কারণেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেখানো পথেই পা বাড়ালেন কালীপ্রসন্ন সিংহও। তিনি মহাভারত অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন-

> "এক্ষনে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানস্থানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশ হিতানুরাগী মহানুভবগণ ইংরাজি ভাষার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুবাদ করিতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থে অনুবাদ প্রসঙ্গও আমোদিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমারও মনে হইল যে, যেমন অনুবাদ দ্বারা ভিন্ন দেশের গ্রন্থান্তর্গত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত, সেইরূপ স্বদেশীয় মহানুভব পুরুষাদিগের মানসোদিত আশ্চর্য্য তত্ত্ব সকল স্থায়ী হইবার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। ... এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি।"[১]

আসলে কালীপ্রসন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ছিলেন প্রাচ্যের প্রতি অনুরাগী। স্বদেশের হিতসাধন ও মঙ্গল চিন্তায় তিনি ছিলেন অধীর।

মহাভারত অনুবাদের প্রথম পর্বের প্রচারে তিনি এটির নাম দেন 'পুরাণসংগ্রহ'। মহাভারতের পরিসর যেমন বিস্তৃত, তেমনিই এটি দুরূহ গ্রন্থও বটে। তাই একাকী এই গ্রন্থের অনুবাদ করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়; একপ্রকার অসম্ভব। তাই কালীপ্রসন্ন সিংহও সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদে ব্রতী হয়ে সাহায্য নিয়েছিলেন 'সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের'। অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারের তাঁদের নাম ও সাহায্যের প্রকৃত কথা লিপিবদ্ধ করেছেন নির্লিপ্ত চিত্তে। এই প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, কালীপ্রসন্ন মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করার পর হরচন্দ্র ঘোষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন সমগ্র মহাভারত অনুবাদের। তখন হরচন্দ্র ঘোষের উৎসাহ ও পরামর্শে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন পন্ডিতগণের

সহযোগিতায় তিনি সম্পন্ন করেন মহাভারতের অনুবাদ। কিন্তু তিনি বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মহাভারতের ভূমিকা ও উপসংহারে প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করায় পরবর্তীকালে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সত্যিই কি কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করেছেন? এমনকি সুকুমার সেনও তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে সংশয় মনে জানিয়েছেন যে, মহাভারতের অনুবাদ একদল পন্ডিতকে দিয়ে করানো। এবং মুদ্রিত গ্রন্থে অনুবাদক বলে কালীপ্রসন্ন সিংহের কোন নাম নেই। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, এই মহাভারত যে কালীপ্রসন্ন সিংহেরই রচনা তার প্রমাণস্বরূপ আমরা অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার রূপে সপ্তদশ খন্ডের শেষে কালীপ্রসন্ন অনুবাদ রচনা যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার থেকে জানা যায় - "১৭৮০ শকে সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্টান লক্ষ্য করিয়া সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারন অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।"[২]

তিনি যে সাতজন মহাত্মাগণের সাহায্যে এই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকারে নির্দ্বিধাময় চিত্তে উল্লেখ করেছেন তাঁদের নামও। তাঁরা হলেন- চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁনারা প্রত্যেকেই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হওয়ায় পূর্বেই ত্যাগ করে গেছেন ইহলোকের পাঠ। যে কারণে গভীর দুঃখ ব্যক্ত করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

তাঁর এই মহাভারত রচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের ভিড়ে আরেকটি প্রসঙ্গও হয়ে ওঠে অপরিহার্য। সেটি হলো কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের সাথে বর্ধমানের রাজা মহাতাব্ চন্দ্-র মহাভারতের অনুবাদের তুলনা। প্রায় একই সময়ে দুজনেই আয়োজন করেন মহাভারত অনুবাদের। এই প্রসঙ্গে প্রায় একই সময়ে ও একই বিষয়ে অনুবাদ হওয়ায় প্রচলিত ধারণায় উঠে আসে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের কয়েক বছর আগে থেকেই নাকি কাজ শুরু হয়েছিল বর্ধমানের মহাভারত অনুবাদের। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, বিভিন্ন তথ্যাদি সন্ধান করলে দেখা যায়, বর্ধমান মহাভারতের 'রাজবাটীর ভূমিকা' অংশে অঘোরনাথ শর্মা তারিখ দিয়েছেন, এই মহাভারতের গদ্যানুবাদ আরম্ভ হয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে। এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ কার্য আরম্ভের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে শ্রাবণ, ১২৬৫ বা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। যার প্রমাণস্বরূপ আমরা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে উল্লেখ পাই। তাই প্রচলিত ধারণাকে উপেক্ষা করেই বলা যায়, মহাতাব্ চন্দ্-র মহাভারত ও কালীপ্রসন্নের মহাভারত রচনার সময়কালের ব্যবধান কয়েক বছরের নয়, মাত্র দুই তিন মাসের। শুধু তাই নয়, এই প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন-বর্ধমান মহারাজ মহাতাপচাঁদকে টেক্কা দেওয়ার জন্যই কি কালীপ্রসন্ন ব্রতী হয়েছিলেন অনুবাদ কর্মে? হয়তো না। কারণ, বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে বলা যায়, যে তরুণ কালীপ্রসন্ন সমাজের উন্নতিকল্পে একডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে, বা যে ব্যক্তি 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশনার অপরাধে দণ্ডিত রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবের জরিমানায় আদালত কক্ষেই প্রদান করে দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা, যিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রণেতা মধুসূদন দত্তকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে উদার চিত্তে প্রদান করেছিলেন সম্বর্ধনা, সেই ব্যক্তির পক্ষে টেক্কা দেওয়া নয়; বরং সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হওয়াই

বাঞ্ছনীয়। তাছাড়াও তথ্য সন্ধান করলেই দেখা যায় মহাতাবচাঁদের প্রতি কালীপ্রসন্নের ছিল না কোন বিদ্বেষভাব। বরং, তিনি নিজমনে পোষণ করতেন তাঁর জন্য অপরিসীম শ্রদ্ধা। সেই হেতু তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণে যে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকটি রচনা করেছিলেন সেটি উৎসর্গ করেন বর্ধমানের মহারাজ বাহাদুরকে। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই প্রথম খন্ডের ভূমিকায় জানিয়েছেন -

"মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে, লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পন করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবীমধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এক অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যাক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।"[৩] তিনি স্বচ্ছ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মহাভারত রচনা উদ্দেশ্য কি। এখানে উল্লেখ নেই কোন টেক্কা বা রেশারেশির প্রসঙ্গ। তাই সকল অভিযোগকে ন্যাসাৎ করেই বলা যায়, দুই মহাভারত অনুবাদকারের মধ্যে কোন টেক্কার সম্পর্ক নয়, ছিল শ্রদ্ধামিশ্রিত সুসম্পর্কই।

কালীপ্রসন্নের এই মহাভারত রচনার পূর্বাপাটের তথ্য সন্ধান করলে দেখা যায় তাঁর পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেছিলেন মহাভারতের অনুবাদ। কিন্তু, পরম স্নেহভাজন কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তিনি বিরত হন অনুবাদ কর্ম থেকে। এমনকি মহাভারত অনুবাদ কর্মের সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা করে দেন উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বেষ্টনী। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় কালীপ্রসন্নের একটি উদ্ধতি উল্লেখ করে জানাচ্ছেন – "আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়েছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যেপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধায়ন করিয়াছেন।"[৪] এর থেকে প্রমাণিত কালিপ্রসন্ন সিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঠিক কতটা স্নেহধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের মহাভারতের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে সেটি হল বিষয়ানুযায়ী ভাষার প্রয়োগ দক্ষতা। ইতিপূর্বেও আমরা তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় সমাজ চিত্রপটকে সামনে আনতে তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেছিলাম কলকাতার কথ্য চলিত বুলি। আবার সেই ব্যক্তিই যখন মহাভারতের মহাকাব্যিক পরিবেশ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন ক্লাসিক সাধুগদ্য ভাষা। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি উৎকট পাণ্ডিত্য বিস্তারের মোহ অপেক্ষা সচেষ্ট হচ্ছেন প্রাঞ্জল ও সাবলীল গদ্য সৃষ্টিতে। এক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগে মহাতাব্ চন্দ্ ও কালীপ্রসন্ন - উভয়ের মহাভারতই একই সময়পর্বে পণ্ডিতের দ্বারা ও পণ্ডিতদের সহযোগীতায় রচিত হলেও কেন দেখা গেল এই দুই মহাভারতে ভাষার তারতম্য? কেন একটিতে আধিক্য পেল পণ্ডিতী বাংলা ও অন্যটিকে তৎসম শব্দসহ প্রাঞ্জলতা? এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ১৮২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বর্ধমানের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক

অঘোরনাথ শর্মা জানাচ্ছেন যে, এক একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল এই মহাভারত। যা হয়তো পরে সম্ভব হয়নি সহজ সাবলীল ভাষায় সংশোধন ও পরিবর্ধন করা। কিন্তু, কালীপ্রসন্নের সহযোগীতায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণের লেখা থাকলেও সেগুলি পরে বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধিত ও সাবলীল করতেন কালীপ্রসন্ন স্বয়ং। তাই বলা যায়, এই মহাভারত দক্ষ ভাষাশিল্পী কালীপ্রসন্নের হাতে সম্পাদিত হওয়ার ফলে ভাষা সাধু গদ্য হলেও অর্জন করতে পেরেছে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের মতো প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতা। এছাড়া দীপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্যে' লিখছেন -

> "মূলানুগত হয়েও সহজ সাবলীল গদ্যে মহাভারত অনুবাদ সম্ভব, তা কালীপ্রসন্ন সিংহ দেখিয়ে দিলেন। কালীপ্রসন্নের অনুবাদ অবশ্য 'আক্ষরিক' অনুবাদ নয়। তিনি দু-একটি বিশেষণ কখনো বাদ দিয়েছেন, জটিল বাক্যকে সরল এবং সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করেছেন, অপরিচিত তৎসম শব্দ সাধ্যমত বর্জন করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় কালীপ্রসন্নের লক্ষ্য, বাংলা ভাষায় সহজপাঠ্য মাহাভারত রচনা। তাঁর অনুবাদে মূলের রস বাদ পড়েনি। হয়তো ধ্বনিময়তা কিছু কম, কিন্তু গদ্য শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের প্রভাব কালীপ্রসন্ন ও তাঁর পন্ডিতগণের উপর কাজ করেছিল।"[৫]

কালীপ্রসন্নের মহাভারতে এই সাধু গদ্য ভাষায় পরিচয় প্রসঙ্গে একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থে পরলোকগত প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের সংলাপে বসানো হয়েছে কিছু কাল্পনিক ভাষা। যার মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে সাধু ভাষা বনাম ইতর ভাষার স্থান। কাহিনিটি সংক্ষেপে এইরূপ - এক সময় নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দসমূহ দেবী সরস্বতীর কাছে আর্জি জানিয়ে বলে সাধু কিম্বা নীচ ভাষা সকলেরই উৎপত্তি হয়েছে সবস্বতীর থেকেই। সকলেই তাঁরই সন্তান। এখন সাধু সমাজে তারা হয়ে পড়েছে বঞ্চিত। তাই তাদের যথাযোগ্য স্থান ফিরিয়ে না দিলে তারা বাধ্য হবে দেবীর চরণে প্রাণনাশ করতে। এই সংকট অবস্থায় দেবী তাদের পরামর্শ দেন বাঙ্গালা দেশে ভদ্র সমাজে গিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। সেই হেতু এই নীচ শব্দেরা বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে আর্জি জানালেও সাধু শব্দের প্রাবল্যে তারা বঞ্চিত হয় সেখান থেকেও। এরপর একে একে তত্ত্ববোধিনী সভা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র - সকলের কাছে গেলেও তিরস্কৃত হয়ে ফিরে আসতে হয় প্রত্যেকবারই। তখন তারা কালীপ্রসন্ন সিংহের কলমে পুরাণসংগ্রহের পাতায় ঠাঁই পায় নিজেদের দাবিতে।

এই বোধ থেকেই তিনি হয়তো হুবহু সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেননি। সাধারণের বোধগম্যতার কথা মাথায় রেখে তৎসম শব্দবহুল ভাষার মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করেছিলেন সাবলীল শব্দ ব্যবহারে। এছাড়া সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধদের বসুও তাঁর 'মহাভারতের কথা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন –

"কোনো বাঙালির মুখেই কালীপ্রসন্নর নিন্দা সাজে না, এবং আমার পক্ষে তা কৃতঘ্নতা হবে – কেন না আমি প্রায়, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই পুস্তকে প্রথম প্রবেশ করেছিলাম, আর আজ পর্যন্ত তার মায়াজাল থেকে বেরোতে পারিনি। সত্য, এখানে কোন-কোন অংশ সংক্ষেপিত বা আচ্ছাদিত ও কোনো-কোনোটি বিস্ফারিত হয়েছে, তবু এও সত্য যে, মহাগ্রন্থটি সমুদয় অঙ্গপ্রতঙ্গসমেত উপস্থিত, ভাষা ব্যবহারে তৎসম শব্দের অবিরল নিবিড়তার জন্য সংস্কৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, অথচ কোথাও নেই কৃত্রিমতা ও দুরাস্বর, প্রতিটি বাক্যের ধ্বনিকল্লোল মনোহর এবং অনেক স্থলেই

মূলের শব্দে সমৃদ্ধ; মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে একধারে সুখপাঠ্য ও মূলানুগ সমগ্র অনুবাদ হিসাবে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এখনো অদ্বিতীয়।"[৬]

কিন্তু, দুঃখের বিষয় মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর অনুবাদ কর্মের এই সৎসংকল্প আর পরিণত হতে পারেনি যথার্থ কার্যে। তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ও বিশেষভাবে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের সাহায্য নিয়ে বঙ্কিম প্রকাশ করেন 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থটি। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুও প্রধানত যুধিষ্ঠির চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে যুক্তিবদ্ধ বিশেষ অংশের সমালোচনার মাধ্যমে রচনা করেন 'মহাভারতের কথা' নামক গ্রন্থটি। মূলত এই দুই গ্রন্থই পরবর্তীকালে প্রস্তুত করে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের যুক্তিবাদী সমালোচনার পথকে।

কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প গ্রহন করেছিলেন রামায়ণ অনুবাদেও। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় সেই সংবাদ। -

> "বিজ্ঞাপন-মহাভারত ও রামায়ন অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ। - 'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ জুলাই ১৮৫৮।"[৭]

কিন্তু, তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণস্বরূপ অনুমান করা যায়, 'মহাভারত' অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে অনুবাদ কর্মের বিশালতা ও ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে 'রামায়ণ' অনুবাদ একইসঙ্গে শুরু না করে পরিকল্পনাটি হয়তো স্থগিত রাখা হয়েছিল ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু তাঁর অনুদীত 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা' (১৯০২) প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর। তিনি 'মহাভারত' ও গীতা ছাড়াও সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থ অনুবাদেও। কিন্তু তাঁর জীবনের স্বল্প পরিসর সংগতি রাখতে দেয়নি তাঁর সাধ ও সাধ্যের মধ্যে। তাই অনেক অপূর্ণ স্বপ্নকে ভবিষ্যৎ সময়ের কাছে সম্ভাবনার দায়িত্বে তুলে দিয়ে পাঠ শেষ করেছিলেন ইহলোকের কৃতকর্মের।

রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় কাব্য। রবীন্দ্রনাথের সুর টেনে বলা যায়, এই দুই মহাকাব্য ভারতবর্ষের 'হৃৎপদ্মসম্ভব' ও 'হৃৎপদ্মবাসী'। এই কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রত্যেক গ্রামের ঘরে ঘরে মুদির দোকান থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পাঠ হয়ে চলেছে সন্ধ্যা প্রদীপের সাথে এই দুই মহাকাব্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই মহাভারতকেই আরও আন্তরিকতায় সমাদরের আসন করে দিয়েছেন প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে। তার 'পুরানসংগ্রহ' এক ডাকে সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে 'কালীসিংহী মহাভারত' নামে। আমাদের বিশ্বাস এমন সুললিত ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। তাই যতদিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে, যতদিন বাঙালি জাতি মহাভারতকে নিজেদের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে চলবে ততদিন রামায়ণের পাশাপাশি বিস্তারিত হতে থাকবে 'কালীসিংহী মহাভারতে'র নাম। তিনি চিরকাল বাংলা সাহিত্যের চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর 'পুরানসংগ্রহ'-র জন্য।

তথ্যসূত্র :

১. ভূমিকা, পুরাণসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৭৮৯ শক

২. পুরাণসংগ্রহ, অষ্টাদশ পৰ্ব্ব অনুবাদের উপসংহার, সপ্তদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা – ১

৩. পুরাণসংগ্রহ, ভূমিকা, প্রথম খণ্ড

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃষ্ঠা – ৪১

৫. দীপেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা – ১২২
৬. বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, পৃষ্ঠা – ৩৩
৭. মন্মন্থনাথ ঘোষ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃষ্ঠ - ৪০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গুপ্ত, বিপিন বিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্যারাগণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২০
২. ঘোষ, মন্মথনাথ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা, ১৩২২
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩৫০
৪. বসু, দীপেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন সিংহ : জীবন ও সাহিত্য, অক্ষর প্রাকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯
৫. বসু, স্বপন, চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর, ২০০৩
৬. বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৮১
৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ভাদ্র ১৩৬৪
৮. সর, রমেনকুমার (সম্পা.), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩
৯. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, পুরাণসংগ্রহ, দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিন্ডিকেট হইতে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩০৭
১০. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৮।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ধারা : ঐতিহাসিক চেতনায় বিদ্রোহের রুপ

দেবাশীষ বেরা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়, দক্ষিন-২৪-পরগনা

সারসংক্ষেপ: ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথমদিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-পর্ব ছিল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)। ব্রিটিশ বিরোধী প্রাথমিক বিদ্রোহ গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল এই বিদ্রোহ। ১৭৫৭ - ১৮৫৭ দীর্ঘ এই ১০০ বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। আলোচ্য এই বিদ্রোহ মূলত বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৬০ সাল থেকে এই বিদ্রোহের সূচনা ঘটলেও ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এর শাসন কালের সূচনা থেকে এই বিদ্রোহ ব্যাপকতা পায়। সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপট এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। এই বিদ্রোহের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিতর্ক লক্ষনীয়। তারা শুধু বিদ্রোহের সাথে জড়িত কোন ঘটনা নিয়ে বিতর্ক করেননি, ভারতীয় ইতিহাসে বিদ্রোহের তাৎপর্য নিয়েও ভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। ঔপনিবেশিক ইতিহাস গ্রন্থে তাদের হয় 'ডাকাত', 'দস্যু' বা 'লুণ্ঠনকারী' হিসাবে চিত্রিত কয়রা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসবিদরা একে কৃষক বিদ্রোহ কিংবা উপজাতি বিদোহ কিংবা ধর্মীয় সংগ্রাম কিংবা স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। এই নিবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয়, ব্রিটিশ বিরোধী এই বিদ্রোহ নিছক কোন উপজাতি বিদ্রোহ ছিল, নতুবা ইহা কৃষক বিদ্রোহ ছিল কিংবা এই বিদ্রোহে বৃহত্তর কোন জাতীয় আদর্শ ছিল যা এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে ফেলা যায়।
সূচক শব্দ: সন্ন্যাসী, ফকির, উপজাতি, লুণ্ঠনকারী, ঔপনিবেশিক।

মূল আলোচনা:

১৭৬০ - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষত উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর, রাজশাহি, বগুড়া, রঙ্গপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি; পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ও ঢাকা; দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।[১] ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা সুবার দেওয়ানি লাভ করে। এরপর থেকে বাংলার আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতির অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়। সরকারি রাজস্ব আদায় ১.২৩ কোটি থেকে বেড়ে ২.২০ কোটি হয়।[২] কৃষি ক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়। সোনা রুপা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচামাল রপ্তানির ফলে স্থানীয় রেশম ও হস্তশিল্পের বাজার ধ্বংস হয়।[৩] ঔপনিবেশিক শোষকদের হানা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্যের দাম বৃদ্ধি, দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রভৃতির কারণে ১৭৭০ সালে নেমে আসে মন্বন্তর। কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৭৭২ সালে বোর্ড অফ ডিরেক্টর কে দেওয়া চিঠিতে ওয়ারেন হেস্টিংস উল্লেখ করেন, ১৭৬৮ সালের তুলনায় ১৭৭১ সালে তিনি বেশি রাজস্ব আদায় করেছিলেন।[৪] উইলিয়াম উইলসন হান্টারের গ্রামবাংলার হিতিহাসের উপর ভিত্তি করে 'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র তুলেধরেন মন্বন্তরের মর্মস্পর্শী কাহিনি।[৫]

সন্ন্যাসী ও ফকির কারা

ওয়ারেন হেস্টিংস সন্ন্যাসী ও ফকিরদের 'হিন্দুস্থানের জিপসি' (Gypsies of Hindustan) বলেছেন।[৬] তিনি তাদের লুণ্ঠনকারী ও মুক্তবাজ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। রজতকান্ত রায় এর 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' গ্রন্থে জানা যায়, নাটোরের সন্ত্রস্ত বাঙালির কাছে কোম্পানির কর্মকর্তা রাউজ সাহেব সন্ন্যাসীদের কথা শুনেছিলেন।[৭] রাউজ যাদের সন্ন্যাসী বলে আখ্য দিলেন তারা আসলে উত্তর ভারত থেকে আগত দুটি ভিন্ন দল। একদল মাদারী পন্থী ফকির। তারা কানপুর জেলার মাকওয়ানপুর গ্রামে অবস্থিত শাহমাদারের দরগা থেকে প্রতিবছর শীতকালে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় দরগায় আসত। এদের গায়ে ছাই, গলায় শিকল, হাতে কালো ঝান্ডা।[৮] অন্য দলটি হিন্দুস্থানী দশনামী নাগাদের গিরি সম্প্রদায়ের গোসাই। শংকরাচার্যের অনুশাসনের প্রবর্তক, এরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। ফকিরদের মতো তারা পূর্ণিয়ার পথে বাংলায় প্রবেশ করে রংপুর, দিনাজপুর, নাটোর হয়ে মহাস্থানগড়ে স্নান করতে যেত।[৯]

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকিররা নিজেদের পরিবর্তন করে। ভবঘুরে ও দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তারা মহাজনি ও রেশমের কারবারে লিপ্ত হয়।[১০] আলেপসিং, ময়মনসিংহ, শেরপুর, ঢাকা, মোহমুদশাহী, রংপুর ও কোচবিহারের জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গে কারবার ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে বরেন্দ্র ভূমির রায়ত ও জমিদাররা গোসাইদের কাছে ঋনের জালে আবদ্ধ হয়ে সুদ টানতে শুরু করেছিল।[১১] সন্ন্যাসী ব্যবসায়ীদের নেপাল, তিব্বত ও ভুটানের সঙ্গে ও যোগাযোগ ছিল। তারা সোনো, রুপা, কাপড় ইত্যাদি তিব্বতে রপ্তানি করত, পরিবর্তে তিব্বত থেকে কস্তুরী এবং নানা প্রকার খনিজ নিয়ে আসত। সন্ন্যাসী-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল এইভাবে বিত্তশালী হয়ে উঠল। তবে এরা বেশির ভাগই ছিল বেকার সৈনিক।[১২] একদা মুঘল সৈন্যের এবং জমিদারদের লেঠেল হিসেবে নিয়োজিত ছিল। কোম্পানির শাসকদের কাছে এরা ছিল 'লুণ্ঠনকারী'। সন্ন্যাসীরা বিশেষভাবে দরিদ্র ছিল না কারণ তারা নেপালের সাথে বাণিজ্য এবং সুদের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। মুঘল আমল থেকেই সন্ন্যাসীরা উত্তর ভারত, পাঞ্জাব ও গুজরাটের কিছু অংশে বেশ সক্রিয় ছিল। তারা সেইসব এলাকায় ব্যবসায়ীর পাশাপাশি মহাজন হিসাবে কাজ করেছিল।[১৩]

অন্যদিকে মাদারী ফকিররা দিওয়াঙ্গন, খাদেমান, তালেবান এবং আশিকান এ বিভক্ত ছিল। মাদারিয়াদের আদি গুরু ছিলেন বদি-উ-দিন শাহ-১ মাদার (১৩১৫-১৪৩৬)। তিনি আরব ও সিরিয়া থেকে পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে ভারতে বসতি স্থাপন করেন।[১৪] তিনি গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, কাল্পি, জৌনপুর, লখনউ এবং বাংলা ভ্রমণ করেন। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, কেউ তার ইতিহাস ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর এবং চট্টগ্রামের মাদারীবাড়ি ও মাদারশায় ফিরে পেতে পারে। তিনি অনেক হিন্দুকেও ধর্মান্তরিত করেছিলেন।[১৫]

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

সন্ন্যাসীরা মূলত কারখানা লুঠ করত। কোম্পানির রাস্তায় পরিবহণ আটক করে বাজেয়াপ্ত করত বা জমিদার এবং স্থানীয় কোম্পানি প্রতিনিধিদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিত। ১৭৬৩ সালে একদল ফকির বেকার তাঁতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢাকার ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। একই বছর রাজশাহিতে রঙ্গপুর বাওলিয়ার ফ্যাক্টরি লুঠ করে সন্ন্যাসীরা।[১৬] ১৭৬০-এ সন্ন্যাসীরা বর্ধমান রাজা এবং বীরভূমে আহমেদ খাঁর সঙ্গে কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই-এ যোগ দেয়। মজনু শাহ হয়ে ওঠে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেতা। মজনু শাহ এসেছিলেন বিহারের মাখানপুর থেকে এবং জীবনের বেশি সময় কাটিয়েছেন কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে।[১৭]

১৭৭০-৭১ মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গে। রাজস্ব বিভাগে কাউন্সিল ১৭৭৩-এ রাজশাহির কর্মকর্তা রিপোট পেশ করেন যে, ফকিরদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের সংখ্যা ১৫০০ পার হয়েছে বিশেষ করে ভবঘুরেদের যোগদানের ফলে।[১৮] সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোম্পানির মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে মহাস্থানগড়ে। ১৭৭৩ সালে সন্ন্যাসীরা ভবানীগঞ্জ কাছারি লুঠ করে। তারা আক্রমণ করে জমিদারি কর্মচারীদের চৌগঙ্গ পরগনার শেরপুর ও বগুড়া।[১৯] প্রায় ২০০০ সন্ন্যাসী একত্রিত হয়ে চৌগঙ্গের নায়েবকে আটক করে রাখে যতক্ষণ জমিদার তাদের ১২০০ টাকা প্রদান না করে। এর পর তারা দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তর ও মধ্য ময়মনসিংহ ভায়াল ও ঢাকায় পৌঁছয়। দরিয়ান গিরির অধীনে ছিল ৫০০০ সন্ন্যাসী, মতিগিরির অধীনে ছিল ৬০০০ সন্ন্যাসী ও জারওয়াল গিরির অধীনে ৭০০০ সন্ন্যাসী যোগ দেয়।[২০] সন্ন্যাসী-ফকিদের সঙ্গে যোগদান করে সৈনিক ও কৃষকেরা। এক সময় বিপ্লবীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০০। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হলেন মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, মুশা শাহ, গণেশ গিরি, দেবী চৌধুরাণী। ভবানী পাঠক ছিলেন বীরভূমের অধিবাসী এবং মজনু শাহের সহচর। ভবানী পাঠক তাঁর কৃষক শিষ্য নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়তেন এবং ইংরেজ বণিকদের নৌকার উপর হামলা চালাতেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন দেবী চৌধুরাণী।[২১]

বিদ্রোহীদের তাদের পরিচিত ব্যবসায়িক পথ-স্থল এবং জলপথের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাদের যাতায়াতের পথ ছিল উত্তর বিহার ও নেপালে তরাই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যে মহানন্দা পার করে রঙ্গপুর, তারপর রঙ্গপুর থেকে আরও দক্ষিণে অবস্থিত মহাস্থানগড়। সরকারি নথি অনুযায়ী সন্ন্যাসী-ফকির নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে কোম্পানির সৈনিকদের উপর হামলা করত না। আক্রমণে পরাস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তারা উধাও হয়ে যেত আবার মিলিত হত নির্দিষ্ট স্থানে। সন্ন্যাসী-ফকিরদের গ্রেপ্তার করা সহজসাধ্য ছিল না। সন্ন্যাসী-ফকির পশ্চিম ডুয়ার্স এবং গভীর জঙ্গলে ও তার নিকটবর্তী পাহাড়ে, ভুটান এবং নেপাল-এ গাঁ ঢাকা দিত।[২২] এই কারণে ওয়ারেন হেস্টিংস বাধ্য হন ভূটানের সঙ্গে চুক্তি করতে। একই কারণে চুক্তি হয় নেপালের রাজার সঙ্গে যাতে সন্ন্যাসী-ফকিররা গোর্খাদের দেশে আশ্রয় নিতে না পারে।[২৩] ১৭৯৩ এর পর সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের আগুন সীমিত হয় যদিও তাদের শেষ বিদ্রোহ সংঘটিত হয় দিনাজপুরে ১৮০০ সালে। ১৭৬৭ থেকে ১৮০০ এর মধ্যে কোম্পানির সঙ্গে ৫২ বার সংঘর্ষ হয়েছিল।[২৪]

বিদ্রোহের প্রকৃত

যামিনী মোহন ঘোষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে একজন প্রশাসক ছিলেন। তাঁর বইটি সন্ন্যাসী ও ফকিরের মতো ধর্মীয় দোসরদেরকে দুর্বৃত্ত হিসেবে দেখেছে।[২৫] এ.এন. চন্দ্রের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বইটি তথ্যপূর্ণ। তাঁর গবেষনার মূল বিষয় ছিল, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল কোম্পানির স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক, বেকার কারিগর এবং বিচ্ছিন্ন সৈনিকদে প্রতিবাদের একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জনপ্রিয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদিও কিছু আক্রমণ কৃষক গ্রামগুলিতে হয়েছিল, তবে বেশিরভাগ বিদ্রোহীদের অবশ্যই কোনও না কোনও জনপ্রিয় সমর্থন ছিল।[২৬] আতিস কে. দাশগুপ্ত যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় প্রতিবাদ ছিল।[২৭] সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, তার প্রবন্ধে বিদ্রোহকে একটি জনপ্রিয় কৃষক বিদ্রোহ বলে মনে করেন। তাঁর মতে "সন্ন্যাসী ও ফকিররা ডাকাত ছিল না"।[২৮] অতীশ দাশগুপ্ত এবং সুরঞ্জন চ্যাটার্জীর কাছে সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি কৃষক বিদ্রোই।

এই মতের বিরোধিতা করেন আনন্দ ভট্টাচার্য।[২৯] তার মতে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ আদপেই কৃষক বিদ্রোহ নয়। সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধের কারণ তাদের স্বার্থের সংঘাত থেকে ঘটেছিল। টাকা আদায়ের ব্যাপারে সন্ন্যাসী-ফকির দলবদ্ধ হয়ে জবরদস্তি শুরু করায় খাজনা হাসিলে বিঘ্ন ঘটছিল দেখে ইংরেজ কাউন্সিল তাদের গতি রোধ করার হুকুম দিয়েছিল। তাদের যাতায়াতের পথে নানা যাত্রীকর বসাতে শুরু করে। সেই থেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটে। ভট্টাচার্য ধর্মীয় অনুরাগীদেরকে মূলত দুর্বৃত্ত হিসেবে দেখেছিলেন যারা বাংলার গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংস করেছে। তাঁর মতে, এটি ঔপনিবেশিক বিরোধী কৃষক যুদ্ধ ছিল না। উইলিয়াম পিঞ্চ একইভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ এবং মাঝে মাঝে কৃষকদের অংশগ্রহণে কিছু অন্তর্নির্মিত শ্রেণী মাত্রা থাকতে পারে, কিন্তু এটি একটি 'সাবঅল্টার্ন' বা 'কৃষক যুদ্ধ' ছিল এই যুক্তি দেওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। ম্যাথিউ ক্লার্ক লক্ষ্য করেছিলেন যে, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সময় যে সন্ন্যাসীরা বাংলায় ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা কেবল সন্ন্যাসীর ভান করেছিল। তারা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল। ভট্টাচার্য যোগ করেছেন যে সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে কোম্পানির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ছিল না।

ডঃ আর. সি. মজুমদারের মতে, হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলিম ফকির নামে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের সূচনা ঘটিয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত কৃষক, ক্ষমতাচ্যুত জমিদার এবং বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল।[৩০] তিনি আরো বলেন, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর অর্থনৈতিক মন্দার কারনে এদের আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল। ১৭৭২ সালে তারা সিপাহীদের একটি কোম্পানিকে পরাজিত করে এবং এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন টমাসকে হত্যা করে।[৩১] ১৭৭৩ সালে, ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসও যুদ্ধে এদেরকাছে পরাজিত হয়। তবে সন্ন্যাসীরা ধীরে ধীরে বাংলা ও বিহার থেকে তাদের কার্যক্রম সরিয়ে নিয়েছিল এবং সম্ভবত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।[৩২] ডঃ মজুমদারের মতে, এদের বিদ্রোহ ছিল একটি পৃথক উওপজাতি বিদ্রোহ, যারা তাদের অভাব অভিযোগ বিদ্রোহের মধ্যিদিয়ে আদায়ের চেষ্টা করেছিল।

এ. এন. চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে ঔপনিবেশিক ইতিহাস রচনার সমালোচনা করেছেন এবং আন্দোলনকে বহিরাগত ভবঘুরে সন্ন্যাসী বা হিন্দুস্তানের ভবঘুরেদের আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৩] তিনি এই আন্দোলনকে প্রাথমিক আকারে জাতীয়তাবাদী বিস্ফোরণ হিসাবে ও বিবেচনা করেন। এই সন্ন্যাসী ও ফকিররা মুঘল শাসনকালে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিজীবী মানুষ হিসেবে বসতি স্থাপন শুরু করেছিল। ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় বসতি স্থাপন করেছিল। কৃষিকাজ ছিল এদের প্রধান জীবিকা। কোম্পানীর নানান অপশাসন তাদের জীবিকায় ব্যাঘাত ঘটালে তারা বিদ্রোহ করে।[৩৪] এই বিদ্রোহে অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় যোগদিয়েছিল। সমগ্র বাংলা ও বিহার জুড়ে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে জনগণ ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেছিল এবং এই স্বাধীনতার লড়াই ৩৮ বছর ধরে চলছিল। যদিও এটি ছিল সমন্বয়হীন তবুও এটি ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।[৩৫]

ঔপনিবেশিক লেখক কর্নেল স্লিম্যান বলেছেন, "This proto-nationalist imagining of the sadhu patriot would counter a British colonial pepresentation of the ascetic as little more than a criminaldisguised in ochre robes, quite literally a variation on the thag typologies of the early

nineteenth century".[৩৬] স্লিম্যান আরো লিখেছেন, "Sleeman writes, "Three-fourths of these religious mendicants, whether Hindoos or Muhammadans, rob and steal, and a very great portion of them murder their victims before they rob them; There is hardly any species of crime that is not throughout India perpetrated by men in the disguise of these religious mendicants, and almost all such mendicants are really men in disguise: for Hindoos of any caste can become Bairagis and Gosains: and Muhammadans of any grade can become Fakirs".[৩৭]

কেমব্রিজ ঐতিহাসিক পি. জে. মার্শাল বলেছেন, "A large body of Hindu sanyasis who travelled from North India to different parts of Bengal to visit shrines. En route to the shrines, it was customary for many of these ascetics to exact a religious tax from the headmen and zamindars or regional landlords. The Dasnami naga sanyasis who likewise visited Bengal on pilgrimage mixed with money lending opportunities"।[৩৮] ব্রিটিশদের কাছে, এই তপস্বীরা ছিলেন লুটেরা এবং তাদেরকে কোম্পানির অর্থ সংগ্রহ করা থেকে বিরত রাখা উচিত, এমনকি সম্ভবত প্রদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। মনে করা হচ্ছিল যে, অনেক মানুষের একটি বড় দল যাতায়াত করছিল, যা একটি সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই বিদ্রোহ ছিল নিছক এক উওপজাতি বিদ্রোহ।

William Pinch তার বই 'Warrior Ascetics And Indian Empires'-এ ষোড়শ শতকের শুরু থেকে সন্ন্যাসী, গোসাই, বৈরাগী এবং নাগা নামে পরিচিত যোদ্ধা তপস্বীদের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, প্রথমতঃ মুঘল শাসনের অধীনে সপ্তদশ শতকে এই তপস্বীদের সম্প্রসারণ এবং প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ আঠারো শতকে সশস্ত্র তপস্বীরা যখন পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল, তখন ছিল তাদের প্রভাবের শীর্ষ সময়; তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সন্দেহজনক তদারকির মধ্যে যোদ্ধা তপস্বীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমেছিল। তিনি আরো বলেন, মুঘল সামরিক সেবার শর্তাবলী হিসাবে নিম্নবর্গীয় ছেলেদের নিয়োগ বাড়িয়েছিল, বিশেষ করে দশনামী শৈব আচার্যদের মধ্যে লড়াইরত আখড়াগুলোর শৃঙ্খলা এবং পরিচয়কে শক্তিশালী করেছিল এবং তাদের পদাতিক বাহিনীর শক ট্রুপ হিসেবে নিয়োগকে নিয়মিত করেছিল। একই সময়, যোদ্ধা সাধুরা স্বতন্ত্রভাবে, ভ্রমণকারী এবং শিকারী দল হিসেবে কাজ করত।[৩৯]

W.R.Pinch এর মতে, "The long history of the armed ascetic reveals, then an important phase in the institutionalization of a transformative ethic, perhaps a kind of home-grown secularism, based on tapas, grounded in the akhara wherein people of widely differing origins could come together and produce a new kind of corporate identity. Hence the armed insurgency of gosains in the 18th and 19th centuries was ideologically inchoate and generally reactionary and, hence, doomed to classification as subaltern failure."[৪০]

মার্কসবাদীরা বিদ্রোহকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে দেখেন। সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহের মার্কসবাদী ইতিহাস রচনার সূত্রপাত সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' থেকে পাওয়া যায়। এই বইটি ১৮৫৭-এর আগের সমস্ত ভারতীয় অভ্যুত্থানকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী', 'সামন্ত-বিরোধী' সংগ্রাম হিসাবে চিত্রিত করেছে।[৪১]

ডেভিড এন. লোরেঞ্জেন সন্যাসী ও ফকির আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার মতে, যুদ্ধজ্ঞানী সাধুদের প্রথম উদ্ভব ভারতবর্ষে দিল্লি সুলতানাত প্রতিষ্ঠার পরে ঘটেছিল। মুসলিম শাসনাধীন এধরনের অর্থনৈতিক সংঘাত চলতে থাকে, তবে তা ধর্মীয় অনুমোদনও লাভ করেছিল। এই আন্দোলনগুলি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর, এবং বিশেষত যখন ব্রিটিশ কর্মকাণ্ড ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করে। তাদের সংঘাতের মূল ভিত্তি ছিল মূলত অর্থনৈতিক।[৪২]

বাংলায় কোম্পানির সৈন্যদের সাথে চার দশকের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সংঘর্ষে নিম্নবর্গের আন্দোলনের চরিত্র ফুটেউঠেছে বলে ঐতিহাসিক রনজিৎ গুহ মনে করেন। তাঁর মতে, "Discrete powers of the landlord, the moneylender and the official came to form, under colonial rule, a composite apparatus of dominance over the peasant. His subjection to this triumvirate-sarkari, sakukari and zamindari was primarily political in character, economic exploitation being only one, albeit the most obvious, of its several instances. For the appropriation of his surplus was brought about by the authority wielded over local societies and markets by the landlord-moneylenders and a secondary capitalism working closely with them and by the encapsulation of that authority in the power of the colonial state".[৪৩] গুহ আরও যুক্তি দেন যে, "কৃষক স্পষ্টভাবে জানত সে কী করছে। মূলত সে উচ্চশ্রেণীর কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং তা প্রতিস্থাপনের জন্য কোনো সুসংগত পরিকল্পনা তার ছিল না। তাই একে কখনোই রাজনীতির বাইরে রাখে না।[৪৪]

'The activities of the sannyasis and the fakirs in the 1770s have been left out because not enough is known at the present state of research about the volume and character of actual peasant involvement in them'[৪৫] – রনজিৎ গুহের এই উক্তি সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা বোঝালেও এই বিদ্রোহ সম্পর্কে শেষ কথা হিসাবে বলা যায়, এই আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন। এই আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের আগে ধর্মীয় কর আদায় এবং তীর্থযাত্রার স্বাধীনতার মতো সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধার করার জন্য শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষের পরে অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে কৃষক সম্প্রদায়ও এটিকে সমর্থন করেছিল। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি কৃষক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের কারণ ছিল ধর্মীয়, পাশাপাশি অর্থনৈতিক।

তথ্যসূত্র:

1. Ranajit Guha, 'The Small Voices of History' in Shahid Amin and Dipesh Chakraborty (ed), 'Subaltern Studies Writings in Social History and Society', Volume 9, Delhi, Oxford University Press, 1996, p. 3.
2. Atish Dasgupta, 'The Fakir and Sannyasi Rebellion', in Social Scientist, volume 10, January 1982, p.p. 44-45.
3. Sekhar Bandyopadhyay, 'Palashi Theke Partition', Orient Blackswan, 2008, p. 71.
4. Atish Dasgupta, 'The Fakir and Sannyasi Rebellion', p. 46.
5. 'Anandamath', Bankim Rachnavali, Volume I, Sahitya Sangsad, Calcutta, 1360.
6. M. E. Jones, Warren Hastings in Bengal, 1772-74, Oxford, Clarendon Press, 1918 p.p. 178-179.
7. Dasgupta, A K. (1982) The Fakir and Sannyasi Rebellion", Social Scientist. 10(1), pp. 44-55.
8. Rajatkanth Roy, 'Palasir Sarajantra O Sekaler Samaj' Anand Publishers, Calcutta, 1994, p. 283.
9. Ananda Bhattacharyya, 'Sannyasi-Fakir Uprising in Bengal in the Second Half of the 18th Century'. Unpublished PhD thesis, Jadavpur University, Calcutta, 1991.
10. Rajatkanth Roy, 'Palasir Sarajantra O Sekaler Samaj', p. 283.
11. Ananda Bhattacharya, 'Reconsidering the Sannyasi Rebellion', in Social Scientist, volume 40, March-April, 2012, p.p. 81-100, also see his 'Sannyasi and Fakir Rebellion in Bihar (1767-1800) in Islam and Muslim Societies', A Social Science Journal, Volume 6, No. 2, 2013, p. 28.
12. *Ibid.*
13. Atish Dasgupta, 'The Fakir and Sannyasi Rebellion', p. 46.
14. Ananda Bhattacharyya, (ed) 'Sanyasi and Fokir Rebellion in Bengal, Jamini Mohan Ghush Revisited', Delhie, Monohar, 2014, p. 11.
15. M. I. Haq, 'Bange Sufir Prabhab', Vivekananda book center, Kolkatra, 2012, p.p. 63-65.
16. Atish Dasgupta, "The Fakir and Sannyasi Rebellion', p. 47.
17. *Ibid*, p. 48.
18. *Ibid.*
19. Ananda Bhattacharyya, 'Reconsidering the Sannyasi Rebellion', p. 95.
20. Atish Dasgupta, 'The Fakir and Sannyasi Rebellion', p. 49.
21. *Ibid*, p. 50.
22. *Ibid*, p. 51.
23. Tahiti Sarkar, 'The Cooch Behar Imbroglio in the Late Eighteenth Century', 'The Sannyasi Intrigue and the British Encounter', In Journal of Humanities and Social Sciences (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 10, October, 2017, p. 49.
24. Ananda Bhattacharyya, 'Reconsidering the Sanyasi Rebellion', p. 95.
25. Jamini Mohan Ghosh, 'Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal', Calcutta, 1930, p. 71.
26. A. N. Chandra, 'The Sannyasi Rebellion' Ratna Prakashan, Calcutta, 1977, p. 125.

27. A. K. Dasgupta, 'The Fakir and Sannyasi Uprising', K.P. Bagchi, Calcutta, 1992, p. 109.
28. S. Chatterjee, 'New Reflections on the Sannyasi, Fakir, and Peasant War', Economic and Political Weekly, 19(4), January, 1984, p.p. 2-13.
29. Ananda Bhattacharyya, 'Sannyasi-Fakir Uprising in Bengal in the Second Half of the 18th Century'.
30. R. C. Majumdar, 'History of Freedom Movement In India', Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1971, P. 116.
31. *Ibid.*
32. *Ibid.* P.p. 116-117.
33. A. N. Chandra, 'The Sannyasi Rebellion' Ratna Prakashan, P. ii.
34. *Ibid.* p. i
35. *Ibid.* p. iii
36. Sleeman, 'A Report on the System of Megpunnaism or The Murder of Indigent Parents for their Young Children (who are sold as Slaves) as it prevails in the Delhi Territories, and the Native States of Rajpootana, Ulwar, and Bhurtpore, Calcutta, Serampore, 1839, p. 9.
37. *Ibid.*
38. P. J. Marshall, 'Bengal: The British Bridgehead', The New Cambridge History of India, Cambridge University Press, 1987, p. 96.
39. William R. Pinch, 'Warrior Ascetics and Indian Empires', Cambridge University Press, 2006, p. 112.
40. *Ibid.*
41. Ananda Bhattacharyya, 'Reconsidering the Sanyasi Rebellion', p. 81.
42. David N. Lorenzen, Warrior Ascetics in Indian History', Journal of American Oriental Society, Vol. 98, No.1 Jannuary – March, 1978, p.p. 61-75.
43. Ranajit Guha, 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency In colonial India, Oxford University Press, 1983, P.8.
44. *Ibid*
45. *Ibid.*

লোকসংস্কৃতি : সাম্প্রতিক স্বর ও প্রকৃতি

দেবাশিস সর্দার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে লোকসংস্কৃতির ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সময়োপযোগী পরিবর্তনগুলি লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিকে দিয়েছে বদলে। ভৌগলিক অবস্থান এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনায় লোকসংস্কৃতি রূপান্তরিত হচ্ছে অবিরত। সুতরাং, লোকসংস্কৃতির আলোচনায় পরিবেশের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যেকোনো সামাজিক ব্যবস্থায় যেকোনো ব্যক্তিকে সংস্কারের সাদৃশ্যে 'লোক' এবং তার সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বলে মান্যতা দিতে হবে। বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের গতিশীলতায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রটিও পরিবর্তিত হয়েছে। ফলস্বরূপ লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির পক্ষে গতানুগতিক ধারনায় অক্ষত থাকা আর সম্ভব নয়। তবুও, কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকবে যা অদূর ভবিষ্যতে লোকসংস্কৃতিকে পৃথকভাবে সনাক্ত করাবে। তাই লোকসংস্কৃতি কেবল অতীতের ধারক-বাহক নয়, ক্রমাগত নিত্য-নতুন বিষয়কে আত্তীকরণ করছে এবং আগামীদিনেও দিন করবে।
সূচক শব্দ: লোকসংস্কৃতি, স্বর, প্রকৃতি, রূপ ও রূপান্তর।

মূল আলোচনা:
পরিবর্তনশীল জগতে চিরাচরিত বলে কিছু থাকে না। যুগের অভিঘাতে জাগতিক যা কিছু সত্য, প্রাথমিকভাবে সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং সেই সঙ্গে সম্ভাবনাময় দিকটি ও আলোকিত হয়। প্রযুক্তির দৌলতে আজ বিশ্বের যে কোন মানুষ একই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষ এবং বিশ্বনাগরিকের পর্যায়ভুক্ত। নাগরিক সমাজকে অতিক্রম করে গ্লোবাল কালচার এখন জীবনেও স্থান দখল করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তন অভূতপূর্ব ধাক্কা দিয়েছে বাংলার চিরাচরিত লোকসংস্কৃতিকে। তার ফলে গ্লোবাল সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বদলে যাচ্ছে লোকসংস্কৃতির ফর্মটিও। কারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যদি বদলে যায় তবে লোকসংস্কৃতির 'Text' এবং 'Texture'-এই দুই বদলে যেতে বাধ্য। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতিকে নতুন সংকটের মুখোমুখি পড়ছে, এ কথা বলা বাহুল্য। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে আধুনিক সভ্যতার আকর্ষণ থেকে আত্মসংবরণ করা মুশকিল। তাই নাগরিক চেতনায় মুখর বাঙালির ‘বারো মাসে তেরো পার্বণের’ চল অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। গণমাধ্যমের সৌজন্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণের মিশ্রনে গড়ে ওঠা এক ধরনের মিশ্রসংস্কৃতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই উদারতর সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে যেকোনো জাতির কাছে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এখন লক্ষ্য করার বিষয়ে প্রযুক্তির বিস্ফোরণ কিংবা নাগরিক সভ্যতার মোহজালে লোকসংস্কৃতির গতি কি রুদ্ধ হয়ে পড়েছে? নাকি কোন নতুন সম্ভবনার ইঙ্গিত মিলছে? -আসলে এ বিষয়ে ধারণা পেতে আমাদের চলে যেতে হবে লোকসংস্কৃতির গোড়ার কথায়। যেখানে বলা হয়েছে গোষ্ঠীচেতনাই লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রভূমি। আর তার প্রকাশ থাকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন পালনীয় আচার-আচরণের সাদৃশ্যে। মানুষ তখন পুরোপুরি কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠেনি- খাদ্যসংগ্রহ, পশুশিকার ও পশুপালনকে যখন জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিল, গোষ্ঠীবদ্ধ সেই সমাজে

লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল মূলত অবসর যাপন ও বিনোদনকে কেন্দ্র করেই। ক্রমশ গোষ্ঠীজীবন ও সমাজ এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মধ্যেও রূপান্তর ঘটতে লাগল। যেকোনো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। কেননা সংস্কৃতি তো মানুষের Expression এর উপর নির্ভরশীল। আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই Expression বা অভিব্যক্তির চালিকাশক্তি রূপে কাজ করে। সেক্ষেত্রে যুগ ও সমাজ যদি পাল্টে যায় তবে গোষ্ঠী জীবনে লোকসংস্কৃতির Content আর স্থির থাকতে পারবে না। সেই কারনে গোষ্ঠী ভিত্তিক লোকসংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে হবে তার সামাজিক অবস্থানের নিরিখে। তাই লোকসংস্কৃতির ভাবনায় সমাজ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের প্রসঙ্গটি অবহেলা করা যায় না। যেমন 'শাল-পলাশ ও রুক্ষ পাহাড় ঘেরা' স্বাভাবিক পরিবেশের খোলা প্রান্তরে ঝুমুর গান কিংবা ছৌনাচ যে অনুভূতি এনে দেবে, কোনো আড়ম্বরপূর্ণ সুসজ্জিত নাগরিক পরিবেশনায় সেই স্বাদ মোটেও পাওয়া সম্ভব নয়। প্রযুক্তি, শিল্পায়ণ, বিশ্বায়ন এবং নাগরিক সভ্যতার ব্যাপক বিস্ফোরণে লোকমনের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হবেই। পরিবর্তন হবে লোসংস্কৃতির ভবিষ্যৎও -এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও এমন কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকবে যেটা আর কখনো রূপান্তর যোগ্য নয়। লোকসংস্কৃতির আলোচনায় বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, কৃষিনির্ভর জীবন আর কলকারখানা কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লোকসংস্কৃতির উপকরণগত বৈসাদৃশ্য থাকবেই। ফলে পরম্পরা বা ঐতিহ্যে অক্ষুন্ন থাকা লোকসংস্কৃতির পক্ষে সম্ভব হবে না। তবুও সমসাময়িক যুগের কাছে অকৃত্রিমতা নষ্ট হলেও লোকসংস্কৃতির 'রক্তদাগ' অক্ষত থেকে যাবে। যা দিয়ে সে সুদূর ভবিষ্যতেও তার স্বাতন্ত্র্যতাকে চিনিয়ে দেবে।

আসলে গোটা বিশ্বে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে, লোকসংস্কৃতির আলোচনার প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। এইজন্য আঠারো উনিশ শতকের লোকসংস্কৃতিবিদেরা নতুন কথা বললেন। জানালেন যে, কেবলমাত্র গ্রামীন, কৃষিজীবী, নিরক্ষর গোষ্ঠীবর্গরাই লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা নয়। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে যেকোন স্থানে লোকসংস্কৃতি জন্ম নিতে পারে। যারা কলকারখানার শ্রমিক, কুলিমজুর, খনি অঞ্চলের খেটে খাওয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাদের আচার-বিশ্বাস ও সংস্কারকে লোকসংস্কৃতির মর্যাদা দিতে হবে। কেননা সার্বিক অস্থিরতায় মানুষের জীবন ব্যবস্থার পালাবদল ঘটেছে। একসময় যে সমাজ ছিল গ্রামীন এবং কৃষিনির্ভর সময়ের ব্যবধানে সেই সমাজ হয়েছে নগরকেন্দ্রিক এবং শিল্পমুখী। জীবন অবস্থার এই পরিবর্তনে তো জাতির লোকসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবেই।এই দৃষ্টিভঙ্গি লোকসংস্কৃতির গতানুগতিক ধারণাকে নস্যাৎ করে একটা উদার ভাবনার সঙ্গে পরিচয় করে দিল। বিশ শতকে শেষের দিকে আমেরিকার বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ অ্যাল্যান ডান্ডিস বললেন, "লোক হল একটি গোষ্ঠী বা বর্গের অন্তর্গত একজন সদস্য, যার থাকবে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি, যাকে তিনি একান্ত নিজেদের বলে মানবেন। এই ঐতিহ্য যেমন পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে, তেমনি হতে পারে একান্ত সাম্প্রতিকও বটে"।[১] প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন গোষ্ঠীবদ্ধতাই লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে লক্ষ্মণ। সেটা হতে পারে ধর্ম, কর্ম কিংবা জাতির ভিত্তিতে। আজকে আর 'লোক' অর্থে যেকোন জনগোষ্ঠীর অথবা যেকোন বর্গ বা স্তরের মানুষকে গণ্য করা যেতে পারে। তার পরিচয় গ্রাম্য বা শহুরে, কৃষক বা শ্রমিক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক যে কেউ। ফলে 'লোক'এর অবস্থান আর ব্যক্তির অবস্থানগত বিষয়ের মধ্যে লোকসংস্কৃতি আবদ্ধ রইল না। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো গ্রাম-নগর নির্বিশেষে যেকোন স্থানে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠবে। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা ও বাহক সবসময় যে শুধু কৃষিজীবী অথবা শ্রমজীবী মানুষের অংশ হবে এ

ধারণা ঠিক নয়। যদি তাই হত তাহলে বিজ্ঞানমনস্ক অধিকাংশ ব্যক্তিরা তার কর্মস্থলে যাওয়ার সময় পিছুডাক, টিকটিকির হাঁচি ও বিড়ালে রাস্তাকাটা ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কারকে মেনে চলতেন না। সেক্ষেত্রে তার শিক্ষা-অশিক্ষা, শহর-নগরের অবস্থানগত কোন বাধা থাকে না। আর থাকে না বলেই লোকমনে লোকসংস্কৃতি আজও জীবন্ত এবং জীবিত বলেই চর্চার বিষয় হয়ে আছে। লোকসংস্কৃতি চর্চার গোড়ার দিকে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নগর ও কলকারখানার ধোঁয়া শব্দহীন নির্ভেজাল ভৌগোলিক অবস্থান লোকসংস্কৃতির জন্মভূমি। কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তী একবিংশ শতকে এসে এই মতবাদকে মেনে নেওয়া যায় না। যেখানে প্রযুক্তি ও যোগাযোগের কল্যাণে গ্রাম-শহর মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে বহু অন্নে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং বিদেশি রুচি-রেওয়াজে আসক্ত হচ্ছে সমাজ। একরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে লোকসংস্কৃতির বাঁধাধরা কনসেপ্ট আর থাকল না। কারণ সময় সব কিছুকেই বদলে দেয়, লোকসংস্কৃতিও অপরিবর্তিত নয়। বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়নের গতিশীলতা জনজীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রটিও পাল্টে যাচ্ছে। ফলে লোকসংস্কৃতির স্বরূপ যেকোনো পরিবেশে গড়ে উঠতে বাধা নেই। দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় রোজ ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ওঠা হকারদের মুখে বিক্রিয় বার্তাকে কেন্দ্র করে উচ্চারণ প্রকৃতি, ভাব-ভঙ্গি, কথাবলার ঢঙ, আচার-আচরণ প্রভৃতির সাদৃশ্যে তারা আজ 'লোক' বলে চিহ্নিত হচ্ছে এবং তা বাক্-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির তকমা পাচ্ছে। যেমন :

১. জলের দামে ফলের রস।
২. আগে খান পরে নিয়ে যান।
৩. দেখলে হবে খরচা আছে।

বহুপ্রচলিত বাক্যগুলির সঙ্গে আমরা হামেশাই পরিচিত। এবং বক্তব্যটির মধ্যে দিয়ে ভাবটিও বুঝতে আমদের অসুবিধে হয় না। তাদের এরূপ চিরাচরিত বাক্য, উচ্চারণ ভঙ্গির ঐক্যতার মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানগত সাংস্কৃতিক পরিচয়টিও জানতে ভুল হয় না। আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতিবিদ মহযারুল ইসলাম 'ফোকলোর পরিচিত ও পঠন-পাঠন' গ্রন্থে বললেন, বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে ব্যবহৃত হকারের মুখে ভাষা ও শৌচাগারে বা বাথরুমে, যানবাহনে গায়ে লিখিত বক্তব্য গুলিকেও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কারণ এটা তো কোন না কোন গোষ্ঠীচেতনাকে স্পষ্ট করছে। তবে আজকে নাহলেও একদিন না একদিন তা মর্যাদা পাবে :

তোমার হিংসা আমার জয়।

অথবা,

দেখবি আর জ্বলবি
লুচির মতো ফুলবি।

যানবাহনে গায়ে লেখা থাকলেও কত গভীর জীবনদর্শন লুকিয়ে আছে এখানে। বক্তব্যটিকে আজকের প্রবাদ বলে মেনে নিতে ক্ষতি নেই। স্কুল-কলেজে-কোনো কোনো অফিসের সহকর্মীরা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করে থাকে যা দিয়ে তাদের আলাদা করে চেনা যায়। যেমন- কারো ডাকনাম বা গোপন নাম, অফিস কর্মকর্তাকে নিয়ে ছড়া তৈরি এবং বিষয় অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট হাবভাবকেও লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে আজকাল ধরা হচ্ছে। এরূপ উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লোকসংস্কৃতিবিদরা ঘোষণা করলেন যে, আধুনিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও লোকসংস্কৃতিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার সময় হয়েছে। সেই সঙ্গে তারা উপলব্ধি করলেন সম্ভাব্য হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতি

বিচার করা বেশি জরুরী। কেননা সমসাময়িক যুবক প্রবাহ থেকে ঐতিহ্যে 'ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া' মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। লোকসংস্কৃতিবিদ্ তুষার চট্টোপাধ্যায় বললেন, "আর্থ সামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ গঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্ট রূপ লোকসংস্কৃতি"।[২] দীর্ঘদিন আমরা লোকসংস্কৃতিকে গ্রামীন বলে জেনে আসছি। কিন্তু বিংশ-একবিংশ শতকে জীবন যাত্রার চিত্রটি আলাদা হয়ে গেল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর শিল্পবিপ্লবের বিস্ফোরণ গ্রাম্যজীবন ও কৃষিমুখী চেতনা নষ্ট করল। অধিকাংশ মানুষ আজ জীবিকার তাগিদে বেছে নিল কলকারখানাময় শহুরে জীবনকে। দিশেহারা কেউ কেউ আবার বেছে নিল যানবাহন চালনাকে পেশা হিসেবে। এরূপ জীবন-যাপনের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে সৃষ্টি হল নতুন ছড়া :

'কুত কুত কুত কুতের মালা।
কোম্পানিতে রিক্সা চালা।।
রিক্সা হল নষ্ট।
ছেলে মেয়ের কষ্ট'।[৩]

গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ অভিব্যক্তিই যে লোকসংস্কৃতি নয়, -এই সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরে, সময়ের স্বরকে আত্মস্থ করে লোকসংস্কৃতি কলেবর বাড়িয়ে তুললো। সমসাময়িক ঘটনা, জাতীয় অসংগতি, আন্তর্জাতিক বিষয়-সমস্যার পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি প্রতিবাদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো। ভাদুগানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল :

"ভারত এখন সমস্যার মুখে
পাকিস্তান, দাঁড়ায় রুখে
ঐ কাশ্মীর লয়ে"।[৪]

একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখতে পাওয়া যাবে জনসচেতনতার কাজেও লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ বেশ ফলপ্রসূ হচ্ছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজ সচেতনতার জাগরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে আজ লোকসংস্কৃতির কদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় থাকলে চোখে পড়বে লোকসংস্কৃতির একটি প্রয়োগমূলক নমুনা। যাকে আমরা বলছি লিফলেট। যেখানে কোনো দেব-দেবী যেমন- মনসা, বাবা লোকনাথ, মা সন্তোষীর মাহাত্ম্য বর্ণনা বিষয়ক কিছু কথা থাকে যেগুলিকে ওয়াটস্যাপ, ফেসবুক, ই-মেইল প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পরকে পাঠানো হয়। বলা হয় যে, এই লিফলেট দশজন বা একশ জনকে পাঠালে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নেমে আসবে। এই নতুন ধারণাও আজ গ্রাম-শহরে লোকসংস্কৃতির অংশ বিশেষ হয়ে গেছে। অতএব লোকসংস্কৃতি আর 'ছোটলোকের' ঘরে আটকে নেই, নাগরিক সভ্যতার অভিজাত মঞ্চে যথাযথ ভাবে সম্মানিত হচ্ছে। (নাগরিক লোকসংস্কৃতি)

গতিশীলতা লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ ধর্ম। তাই সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তর স্বাভাবিক। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তনকে দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে – একটি হল স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন অন্যটি আরোপিত পরিবর্তন। যেমন- আগেকার গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে একটি আবশ্যিক উপাদান ছিল ঢেঁকি। ধান ভাঙা, চিঁড়ে কুটা, লঙ্কা-হলুদ গুড়ানো প্রভৃতি দৃশ্য চোখে পড়ত। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তা আর চোখে পড়ে না তার বদলে এসেছে হাস্কিং মেশিন। লাঙলের জায়গা নিয়েছে পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর অথবা বিভিন্ন ধরনের চায়না মেশিন। পালকি বা গরুর গাড়ির মত লোকযান রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে অটো, টোটো, রিক্সা, বাস এবং রেলগাড়িকে। তাই আধুনিক প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে আজকের লোকসংস্কৃতিও নতুন কথা বলছে :

"কলের গাড়ি বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি
হাওড়া-শিয়ালদহে রেলের আমদানি।
কত শত লোক নিয়েছে গার্ড-ড্রাইভার
কলিকাতা দপ্তর বিদেশি কারবার"।[৫]

(বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি ; পৃ-৭৫)

মানুষের জীবনযাত্রার সাপেক্ষে সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যে নতুন কথা বলছে, এই পরিবর্তন স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন বলবো।কেননা যুগের সঙ্গে তা অনিবার্যভাবে ঘটে। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিকে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিজের কাজে, নিজেদের সুবিধায় ব্যহার করা হচ্ছে তাকে আমরা আরোপিত লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভূক্ত করবো। যেমন- সরকারি সচেতনতামূলক কর্মসূচি, রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক প্রচার, মনোরঞ্জনের উপযোগী প্রয়োগের কারণে লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন হয়ে পড়ছে। তাহলে কি বলবো লোকসংস্কৃতিরর শুদ্ধতা বজায় থাকছে না? অথবা লোকসংস্কৃতি আঙ্গিকটি কি ঐতিহ্যচ্যুত হয়ে পড়ছে? এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন অধ্যাপক ড. সৌগত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, ঐতিহ্য যদি পরম্পরাগত বা ধারাবাহিক হয় তাহলে তাকে ধরে রাখারই বা প্রশ্ন ওঠে কেন? কেনই বা তার হারিয়ে যাওয়ার ভয়? তবে কি ঐতিহ্যের কোন তাৎপর্য নেই? পরিবর্তনের অভিঘাত সবটাই কী অবলুপ্তি হয়ে যায়? ঠিক যায় না বরং পুরানো ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ হয়। অর্থাৎ ঐতিহ্যের কোন কিছু হারিয়ে যায় না, বিকৃতি বা নষ্ট হয় না -সম্প্রসারিত হয় মাত্র। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে লোকসংস্কৃতির ফর্মটিও বদলাচ্ছে অহরহ। ফলে কোনটি পরিশীলিত লোকসংস্কৃতি, কোনটি অপরিশীলিত এসব প্রশ্ন না তুলে বরং পরিবর্তিত ঐতিহ্যকে বিচার করা জরুরী। কারণ আজকে 'মাছে ভাতে বাঙালি'র পরিচয় নষ্ট হয়ে প্রথাগত উপাচার ভুলে বার্থ ডে, বিবাহবার্ষিকী, ক্রিসমাস ডে, নিউ ইয়ার সেলিব্রেসনে শ্যাম্পান আর বিরিয়ানিতে মেতে উঠেছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখবো, লোকশিল্প-কারুশিল্পকে মার্কেটে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তার আঙ্গিক এবং কনটেন্টকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। যেমন- পুরুলিয়ার মুখোশ প্রাথমিক অবস্থায় কিরাত-কিরাতী, কথাকলি, পশুর মূর্তি, শিকার চিত্র প্রভৃতিকে বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হলেও আজকে আগত ট্যুরিষ্টদের চিত্তাকর্ষক করতে মিশরের ফ্যারাও, রাক্ষস বা রুদ্র মূর্তি, দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছে এবং আগামীদিনে আরো নতুন কিছু স্থান পাবে। আবার পশ্চিম মেদিনীপুরে পটশিল্পও গতানুগতিক রামায়ণ-মহাভারতের কথা, পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছেড়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা, ভূমিকম্প, সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের বিষয়, পালস্ পোলিও টিকাকরণ, লাদেনের মৃত্যুর মতো বিষয়গুলি প্রাধান্য পাচ্ছে। গ্রাম-শহরের যেকোনো ছোট-বড়ো দোকানে লেবু-লংকা ঝুলিয়ে রাখছে। রেওয়াজ মতো দিনের শুরুতে প্রথম খরিদ্দারকে খালি হাতে যেতে দেয় না। মানুষের গতানুগতিক জীবন যেমন আধুনিক হয়েছে লোকসংস্কৃতিও তেমনি আধুনিক রুচির সঙ্গে নিজেকে পরিবেশন করছে। লোকসংস্কৃতির একটি নতুন ভাবনার প্রতিফলন কলকাতার কালীঘাটের পট। যেখানে নব্যবাবু সামাজকে ব্যঙ্গ করে পট চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও সমাজ সংস্কারমূলক চিত্র, বিভিন্ন পোষ্য প্রাণীর চিত্র, মনীষীদের চিত্রের দৃশ্য মৌলিকতা এনেছে। অনলাইন গেম এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক খেলার দৌরাত্ম্যে লৌকিক খেলাগুলি পুরোপুরি আত্মগোপন করে নিয়েছে। যেখানে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিই তার পরম্পরাকেই অস্বীকার করছে সেখানে লোকসংস্কৃতিকে কী করে লোকসংস্কৃতি গ্রামীন, চিরাচরিত, ঐতিহ্যবাহী ইত্যাদি বিশেষণে ব্যাখ্যা করবো?

আধুনিক সভ্যতার চেতনাকে মানুষের মন থেকে আলাদা করা কঠিন ব্যাপার। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির কারণে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতি বিনোদন আর জীবন চর্চাকে। এককথায় লোকায়ত সংগীত-শিল্প-কর্মধারার নেমে এসেছে তথ্য-প্রযুক্তির আঘাত। প্রান্তবাসীর জনজীবন আসক্ত হয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক জীবনধারারায়। দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ মানুষের লোকায়ত সঙ্গীত-শিল্প ও কর্মধারা। পরিবর্তিত যুগের চাহিদা অনুযায়ী লোকজীবন সাজিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষা বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের লালসায় মানুষ নিজস্বতাকে হারিয়ে অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করছে। নিজেদের লোকসংস্কৃতি যে লুপ্ত হতে বসেছে সে দিকে হুঁশ নেই। আজকের শিশুরা দুপুর অথবা রাত্রি দাদু-ঠাকুমার কাছে আর আবদার করে না রুপকথা গল্প, রাজকুমার-রাজকুমারীর গল্প, পরীর গল্প, রাক্ষস-খক্ষসের গল্প শোনার জন্য। তার বদলে স্মার্ট ফোন, ইউটিউব অথবা টেলিভিশনের নানা প্রোগ্রামে তাদের শৈশব মেতে উঠেছে। মানুষের জীবন-যাপন ও বিনোদনের জায়গা থেকে কর্মজীবনেও বিবর্তন এনেছে প্রযুক্তি ও আধুনিক জীবন। প্রযুক্তির রঙিন জগতে মুগ্ধতায় বিস্মৃত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে আঁকড়ে থাকা আমাদের লোকসংস্কৃতি। পাল্টে যাচ্ছে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, লোকাচার ও সংস্কৃতি। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি যেমন পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই পরিবর্তনশীল জীবনে লোকসংস্কৃতির ধরনও নতুন মোড় নিয়েছে। যে জন্য বর্তমান যুগে লোকসংস্কৃতির ভাষা ও প্রয়োগের আঙ্গিকটিও আর স্থির নেই। বর্তমান কালের উপযোগী করে প্রয়োগের ফলে তার মৌলিক চরিত্র ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তবে আক্ষেপ করা কিছু নেই সমাজের গতিধারায় এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।তাই আজকে লোকসংস্কৃতি কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আবদ্ধ নেই। হঠাৎ করে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি কিংবা জীবনযাত্রার রদ বদল ঘটে লোকসংস্কৃতিও তার ধর্ম পরিবর্তন করে। ঐতিহ্য নির্ভর হলেও ঐতিহ্যের সীমিত ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি আর থেমে নেই।

সুতরাং একথা ঠিক লোকসংস্কৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় না ববং বিবর্তিত হয়। লৌকিক সমাজ থাকবে আর সংস্কৃতি থাকবে না তা কখনো হয়? সামাজিক বিকাশের নিয়মে লোকসংস্কৃতির কিছু অংশ হারিয়ে যায় বা লোপ পায়, তাই লোকসমাজে সেগুলো বেঁচে থাকে না। কিন্তু ঐতিহ্য বাহিত লোকসংস্কৃতির মূলরূপ একেবারে অবলুপ্ত হয় না। বরং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতি এগিয়ে চলছে। সুতরাং লোকসংস্কৃতি শুধু অতীত-চর্চার বিষয় নয় রূপান্তরিত সময়ের ধাক্কাকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। আসলে সবদেশের লোকসংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছে সমসাময়িক ঘটনাকে আত্মস্থ করে। লোকসংস্কৃতিবিদ্ সি. এফ পটারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় – “Folklore is a lively fossil which refuses to die”. সময় ও সমাজের কোনোরূপ জটিলতা লোকসংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ততাকে স্তব্ধ করে দেয় না। লোকসাহিত্যের পুরানো অনেক কিছু বিবর্তনের মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে খাপ খেয়ে বেঁচে থাকে। এমনকি মূলপাঠকে ভিত্তি করে একটি টেক্সটের অনেকরকম পাঠান্তর হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও গ্লোবালাইজেশন, অর্থনীতি, প্রযুক্তির শত আঘাতেও লোকজীবন বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে তার চিরাচরিত সংস্কৃতিকে। আমাদের দেশের লোকসাধারনের মধ্যে সংস্কৃতির পরম্পরাকে বয়ে নিয়ে চলার একটা আবেগ আছে। তাই লোকসংস্কৃতি শুধু অতীতের ধারক-বাহক নয়, তার ধারণ ক্ষমতার গুণে নতুন বিষয়কে প্রতিনিয়ত আত্মস্থ করছে এবং আগামী দিনেও করবে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত : লোকসংস্কৃতি : আজকের ভাবনায়, এপ্রিল,২০২২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১৭
২. চট্টোপাধ্যায়, তুষার : লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, এপ্রিল,২০১১,কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৫৮
৩. দাস, বেলা (সম্পা) : বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি, এপ্রিল,২০১৩,কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, পৃষ্ঠা-৬৭
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত (সম্পা) : নাগরিক লোকসংস্কৃতি, মে,২০২১,বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৭
৫. দাস, বেলা (সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।

অনুসৃজনে রামকথা : প্রসঙ্গ চন্দ্রাবতী রামায়ণ

ধনঞ্জয় দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অনুবাদকর্মের মূল উদ্দেশ্যই হল একটি ভাষার ভাব ও রূপকে অন্য একটি ভাষায় বহন ক'রে আনা। একটি অনুবাদকর্ম তখনই অনুসৃজনে পরিণত হয়, যখন তার সঙ্গে মেশে অনুবাদকের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা। মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণে যেসব কবি বাংলায় অনুবাদকর্ম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কৃত্তিবাস। তবে মধ্যযুগে বাংলা রামায়ণের অনুবাদের ধারায় ব্যতিক্রমী কাব্য 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ'। রামের শৌর্য-বীর্য, গুণপনা ও দেবত্বকে সেখানে বড়ো ক'রে দেখানোর জন্য তিনি এই কাব্য রচনা করেননি। বিষ্ণুর অবতার 'আর্যবীর রাম'-এর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনও তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য সীতা। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে বসে চন্দ্রাবতী প্রচলিত রামকথার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা ক'রে সীতার আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ ও নীরব প্রতিবাদকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে চন্দ্রাবতী রূপ দিয়েছেন তাঁর রামায়ণে। চন্দ্রাবতী রামায়ণ কীভাবে মূল রামকথার অনুসৃজন হয়ে উঠেছে তা এই প্রবন্ধে তুলা ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: অনুসৃজন, রামকথা, চন্দ্রাবতী রামায়ণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, সীতা।

মূল আলোচনা:

তুর্কী আক্রমন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাঙনের প্রতিরোধ কল্পে বাংলা সাহিত্যে যে দু'টি বিশেষ সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারা তার মধ্যে অন্যতম। বাঙালি জাতির সংকটময় মুহূর্তে অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, গার্হস্থ্যজীবন ধর্ম থেকে বিচ্যুত বাঙালিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ও ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিকে অটল রাখা – মূলত এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মূল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুসরণে অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি পৃথক ধারা বাংলা সাহিত্যে পরিপুষ্টি লাভ করে। অনুবাদকর্মের জন্য এই তিনটি ধর্মগ্রন্থকে নির্বাচন করার অন্যতম কারণ ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতির কাছে এই ধর্মগ্রন্থগুলির গ্রহণযোগ্যতা। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুসরণে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের যে তিনটি ধারা বিস্তার লাভ করে, তার মধ্যে রামায়ণের অনুবাদ বাকি দুই ধারা অপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রামায়ণের আদিকবি বাল্মীকি। তাঁর রচিত রামায়ণের মূল আধার রামকথা। রামের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বকে তিনি রামায়ণে বড়ো ক'রে দেখিয়েছেন। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণের প্রভূত অনুবাদ হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতাকে অতিক্রম করে রামায়ণের রস আস্বাদন করতে অপারগ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের নিমিত্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিরা রামায়ণের অনুবাদ করেছেন। মধ্যযুগে বাংলা রামায়ণ অনুবাদের ধারায় কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, শঙ্কর চক্রবর্তী, জগৎরাম রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় রচিত কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরামপাঁচালী' সবচেয়ে জনপ্রিয় রামায়ণ সন্দেহ নেই। তবে বাংলা ভাষায় রচিত ব্যতিক্রমী

রামায়ণের কথা প্রসঙ্গে চন্দ্রাবতী রামায়ণের কথা উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর রামায়ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

> “চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কবিত্বই ইহার প্রধান গুণ নহে। এই রামায়ণে আমরা এমন অনেক জিনিষ পাইতেছি যাহাতে রামায়ণ-সাহিত্যের কতকগুলি আঁধার দিক্ আলোকিত হইয়া যাইতেছে।”[১]

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে চন্দ্রাবতী রামায়ণের অনুবাদ করলেও তাঁর রচিত রামায়ণ ঠিক অনুবাদ নয়, অনুসৃজন। চন্দ্রাবতীর কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার গুণে তাঁর রামায়ণ হয়ে উঠেছে রামকথার অনুসৃজন। পরবর্তীকালে রামায়ণ অনুসরণে রচিত মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ও মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘সীতায়ন’ হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য অনুসৃজনের দৃষ্টান্ত।

দুই

“মধ্যযুগে বঙ্গভূমির কবিগণ সীতা-চরিত্রের অনন্য-সাধারণ রূপায়ণে লেখনী ধারণ করেছেন একাধিক বার। সকলের অগ্রগণ্য অবশ্যই চন্দ্রাবতী।”[২] কে এই চন্দ্রাবতী? তিনি সপ্তদশ শতকের কবি। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সৌরভ পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে-র ‘মহিলা কবি চন্দ্রাবতী’ প্রবন্ধটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর প্রথম পরিচয় ঘটে। চন্দ্রাবতীর জীবন সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের গীতিকা ও জনশ্রুতির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। চন্দ্রাবতীর জন্ম বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের পাটোয়ারি গ্রামে। পিতা বংশীদাস ভট্টাচার্য ছিলেন পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্য ধারার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ববঙ্গ গীতিকার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে নয়ানচাঁদ ঘোষের ‘চন্দ্রাবতী’ নামে একটি পালা স্থান পেয়েছিল। এই পালা থেকে চন্দ্রাবতী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে জানা যায়, চন্দ্রাবতী জয়ানন্দ নামে এক যুবককে ভালোবেসে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পিতার নির্দেশে শিবপূজায় মনোনিবেশ করেন এবং ‘রামায়ণ’ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন–

> “অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
> শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।।”[৩]

‘চন্দ্রাবতী রামায়ণ’ ছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত ‘মলুয়া’, ‘দস্যু কেনারামের পালা’গুলিকেও চন্দ্রাবতীর রচনা বলে মনে করা হয়।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত চন্দ্রাবতী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। তিনি নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও বিরহ ভারাক্রান্ত জীবনের সঙ্গে সীতার দুঃখ বিজড়িত জীবনকে সম্পৃক্ত করে সীতার দুঃখকে বুঝতে চেয়েছেন। নামে রামায়ণ হলেও রাম চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সীতার দুঃখকথাকেই চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণে মুখ্য করে তুলেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

> “চন্দ্রাবতীর প্রনয়ঘটিত ব্যর্থতা তাঁর জীবনে এক অন্যতর মতাদর্শ নির্মাণ করে। সেই মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়েই তিনি সমগ্র রামায়ণটি রচনা করেন। রামায়ণের রচয়িতা যেমন চন্দ্রাবতী তেমনি এই রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচকও চন্দ্রাবতী। এই রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণ ও কাহিনি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জটিল কোনো দার্শনিক মত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাননি।”[৪]

মধ্যযুগে নারীদের সামাজিক অবস্থান সহজেই অনুমেয়। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব ও উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কারকের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে

থাকে। পরবর্তী সময়ে এই ছবি আরো বদলেছে। অনেক নারী 'আত্মকথা'য় 'নৈঃশব্দের প্রাচীর ভেঙে' নিজেদের কথা লিখেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় নারীর অধিকার, নারী আন্দোলন, নারীর শ্রম ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে। তবে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বসে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনা একদিকে যেমন অভিনব বিষয়, অন্যদিকে রামকথার প্রচলিত স্রোতে গা না ভাসিয়ে সীতা চরিত্রকে অধিক গুরুত্বদান ও সীতার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ স্পর্ধিত উচ্চারণও বটে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চন্দ্রাবতী রামকথাকে দেখছেন।

তিন

আদি রামায়ণে কবির লক্ষ্যই ছিল রামের বীরত্ব ও দৈবমহিমাকে প্রাধান্য দেওয়া। রাম সেখানে একজন আদর্শ পুরুষ। সীতার অবস্থান সেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীল এক 'আদর্শ নারী' হিসেবে। তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখ বুজে সহ্য করেছেন এবং দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহমদ শরীফ বলেছেন-

> "...রাম আদর্শ আর্য পুরুষের প্রতীক। বাল্মীকি সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রাচীন গল্পভিত্তিক একটি জীবনদর্শন, সমাজনীতি ও ধর্মদর্শন রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যে তাই আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ভাই, আদর্শ মাতা, আদর্শ ভাই, আদর্শ মাতা, আদর্শ শাসক ও শাসনপ্রণালী, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ বীর, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ অনুচর-সহচর ও আদর্শ শত্রুর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার প্রকট প্রয়াস।"[৫]

কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাম অঙ্কিত হয়েছেন আদর্শ পুরুষ হিসেবে। আয়তনের দিক থেকে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের কাব্যের মতো মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি চন্দ্রাবতী রামায়ণে নেই। রামায়ণ রচনার ক্ষেত্রে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসকেও খুব বেশি অনুসরণ চন্দ্রাবতী করেননি। তাঁর জন্মভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে যে রামকথা বিষয়ক কাহিনি প্রচলিত ছিল তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। দীনেশচন্দ্র সেন এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "মোট কথা চন্দ্রাবতী রামায়ণ পাঠ করিলেও তাঁহার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রামসীতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে অধিকতর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।"[৬]

তবে তাঁর রামায়ণের কাহিনির কোনো কোনো স্থানে কাশ্মীরী রামায়ণ, তিব্বতী রামায়ণ, কম্বোজ রামায়ণ ও জাভা রামায়ণের প্রভাব প্রতীয়মান হয়। আদি রামকথায় রাম লক্ষ্য। কিন্তু চন্দ্রাবতী এই জায়গা থেকে সরে এসে সীতাকেই তাঁর কাব্যের লক্ষ্যে পরিণত করেছেন। রাম সেখানে উপলক্ষ মাত্র। পুরুষতান্ত্রিক যুগে বসে পুরুষকেন্দ্রিকতা থেকে নারীকেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকেছেন বলেই চন্দ্রাবতী রামের কর্মকাণ্ডকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। সীতার স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে রামের বীরত্বের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। রামের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেও বাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাম চরিত্রে কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশও ঘটিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি রাম চরিত্রটিকে তাঁর অবতারত্বের জায়গা থেকে অবনমন ঘটিয়েছেন। এটি যে কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যিক কৌশল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কাব্যকৌশলের ওপর ভর ক'রে রামের তুলনায় সীতার মাহাত্ম্যকেই কবি বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। নবনীতা দেব সেন 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন-

> "এক নারীরচিত অপরিচিত 'রামায়ণে' স্বয়ং রামকেই এক কোণে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেখানে সীতার প্রসঙ্গে ভিন্ন তিনি একা কদাচিৎ দৃশ্যমান। আখ্যানের গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত সীতারই জীবনের কাহিনি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাম কথার আবরণের অন্তরালে এটি সম্পূর্ণই সীতা-কথা।"[৭]

সীতা চরিত্রটিকে গুরুত্ব দান ও প্রচলিত রামায়ণকে নতুন রূপ দান করতেই কবি সুপরিকল্পিতভাবে কাব্যের কাহিনি, চরিত্র ও কাব্যকায়াকে বিন্যস্ত করেছেন। কবির এই পরিকল্পনা আমাদের তাঁর মননকে বুঝতে সাহায্য করে। চন্দ্রাবতীর কাব্যের গঠনবিন্যাস খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথক কবি স্বয়ং। শুধুমাত্র দ্বিতীয় খণ্ডের কথক সীতা। পরিচ্ছেদ অনুযায়ী কথকের বদলও কবির পরিকল্পনার অংশ।

চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণকে মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে চন্দ্রাবতী শুনিয়েছেন সীতার জন্মকথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আদি রামায়ণের বালকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কবি বারোমাসির ছন্দের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। লঙ্কা-প্রত্যাগত সখী পরিবৃতা সীতা তাঁর সখীদের নিজের জীবন কাহিনি শুনিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি কৌশলে সীতার শৈশব, রামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, বনবাস ও লঙ্কায় অপহৃত অবস্থার দিনগুলির কথা বলেছেন। লঙ্কা থেকে ফিরে আসার পর সীতার জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। সীতার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া, স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা ও বনবাস, সন্তান জন্ম দেওয়া, সভায় অবমাননা ও স্বেচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

চার

চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণে প্রচলিত রামকথার মূল কাঠামোটি স্থির রেখে কাব্যের কাহিনির মধ্যে নতুনত্ব এনেছেন। আমদানি করেছেন নতুন কিছু চরিত্রেরও। এই মধ্যে দিয়ে কবি চন্দ্রাবতী নারীর অন্দরমহল ও মনোলোকের চিত্রকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রচলিত প্রথার লঙ্ঘন করে রামের জন্মকথা বর্ণনার পূর্বে তিনি সীতার জন্মকথা বর্ণনা করেছেন। কাব্যের সূচনা স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা দিয়ে-

> "সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন।
> তাহাতে রাজত্বি করে গো লঙ্কার রাবণ।।"[৮]

লঙ্কার অতল ঐশ্বর্যের বর্ণনার পাশাপাশি রাবণের স্বর্গজয়, দেবতাদের অসহায়ত্ব, ঋষিদের ওপর রাবণের অত্যাচার, রাবণের ভোগবিলাস ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি সীতার জন্মের প্রেক্ষিতটি নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। লঙ্কাপুরীর অতল ঐশ্বর্যের পাশে মাধব জেলের দরিদ্র জীবনের চিত্রকে স্থান দিয়েছেন কবি। প্রথম পরিচ্ছেদে মন্দোদরীর জটিল প্রসব কাহিনি ও সীতার জন্মকথা তুলে ধরতে মাত্র ছয়টি অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন তিনি। বাল্মীকি রামায়ণের সীতার জন্মকাহিনিকে কবি এখানে ব্যবহার করেননি। সীতার জন্মবিষয়ক একটি নতুন কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এই কাহিনি চন্দ্রাবতীর মৌলিক সৃষ্টি নয়। বাল্মীকি রামায়ণে সীতার জন্ম হয়েছে জনক রাজার হাল চাষের সময়ে। চন্দ্রাবতী রামায়ণে সীতার জন্ম হয়েছে ডিম থেকে। এখানে জনক রাজার কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে রাবণ পত্নী মন্দোদরী, সতা ও জনকপত্নীর অর্থাৎ সীতার জন্মের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই এখানে প্রধান। কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদে যে অলৌকিক কাহিনি কবি পরিবেশন করেছেন, সেখানে দেখা যায় রাবণের দ্বারা নিগৃহীত তপস্বীদের বুকের রক্ত ও উপেক্ষিতা মন্দোদরীর বুকের কান্নায় মৃত্যু কামনার সংমিশ্রণে সীতার জন্ম হয়েছে। মন্দোদরী তাঁর

মা, যিনি তাঁর সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে ব্যাকুল। কিন্তু গণকের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে সেই ডিম নষ্ট করে দিতে চেয়েছেন রাবণ। মন্দোদরীর কাতর আবেদনে সেই ডিম নষ্ট না ক'রে রাবণ সেটিকে সোনার কৌটায় ভরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলে তা শেষপর্যন্ত মাধব জেলের জালে উঠে আসে। স্বপাদেশ পেয়ে মাধব জেলের স্ত্রী জনক-পত্নীর কাছে তা পৌঁছে দেন। জনকপত্নীর যত্নে কৌটায় ভরা ডিম থেকে জন্ম হয় সীতার। মাধব জেলে ও সতার যে দাম্পত্য জীবন কবি এখানে বর্ণনা করেছেন তা যেন রাম-সীতার দাম্পত্যের থেকেও উজ্জ্বল। সীতার নামকরণের পিছনেও কবি সতা চরিত্রটিকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। সীতার নামকরণে সতা চরিত্রটিকে গুরত্বদান মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্যকেই সূচিত করে না কি?

চন্দ্রাবতী রামায়ণে অঙ্কিত সীতা চরিত্রের কঠিনতম মুহূর্তেও রামের প্রতি ভালোবাসা ও প্রত্যয়ের সুরই প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছে। এই বিশ্বাস, ভালোবাসা ও রামের স্মৃতিতেই সীতার বনবাস জীবন রমণীয় হয়ে উঠেছে। আসলে রাম সীতার জীবনসর্বস্ব-

"কি করিব রাইজ্য সুখ গো, রাজসিংহাসনে।
শত রাজ্য পাটের সুখ গো, আমার প্রভুর চরণে।।"[৯]

যদিও রাম সীতার প্রতি সে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই সহজেই কুকুয়ার কথার বিচার বিশ্লেষণ না করেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছেন। এর ফলস্বরূপ রাম তপোবনে সীতাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছেন। রামের এই ব্যবহার মানুষেরই পরিচয়বাহী। চন্দ্রাবতী রামায়ণে রামের দৈব মহিমার পরিচয় নেই। আদর্শ পুরুষ হিসেবেও তাঁকে কবি অঙ্কন করেননি। তিনি ধীরস্থির নন। তাঁর রিপুদমনের ক্ষমতাও নেই। মোহ, ক্রোধ, মাৎসর্য তাঁর আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে অত্যন্ত প্রকটিত হয়েছে।[১০] তাই তিনি সীতার প্রতি সন্দেহে ক্রোধে ফেটে পরতে পারেন-

"বনেতে আগুন জ্বলে গো সায়রে ছোটে বান।
উন্মত্ত পাগলপ্রায় গো বসিলেন রাম।।
রাঙ্গা জবা আঁখি রামের গো শিরে রক্ত উঠে।
নাসিকায় অগ্নিশ্বাস ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে।।""[১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাল্মীকি রামায়ণে কাহিনির নিয়ন্তা শক্তি কৈকয়ীর পরিচারিকা মন্থরা। চন্দ্রাবতী রামায়ণে কুকুয়া হয়ে উঠেছেন কাহিনির অন্তিম পর্বের নিয়ন্ত্রক। কাহিনির অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য এই চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন কবি।

সীতা নির্বাসনের পাশাপাশি সীতার পাতাল প্রবেশ অংশেও চন্দ্রাবতী নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে রাম জনতার চাপে সতীত্ব পরীক্ষার আয়োজন করেছেন। কবি আসলে রামকে প্রজাহিতৈষী হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন বলেই এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্রবতী রামায়ণে আমরা দেখি এক ভিন্ন ছবি। সীতার অবর্তমানে অযোধ্যার অবস্থা দেখে প্রজারা সীতার মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন কিন্তু রাম বুঝতে পারেন না। সীতার অবর্তমানে অযোধ্যার চিত্রকে কবি লিপিবদ্ধ করছেন এইভাবে-

"ক্ষেতে নাইসে হয় ফসল গো, নদীতে না হয় পানি।
রোগ-ব্যাধির জ্বালায় প্রজার গো, অকুল পরানি।।
বৃক্ষে না হয় ফল-ফলান্তি গো, লতায় নাই সে ফুল।

... ...

দিনে দিনে হইল রাইজ্য গো, যেমন লক্ষ্মীছাড়া।
রাজার দোষে প্রজার দুঃখ গো কয় বুড়ী-বুড়া।।"[১২]

কবি এখানে অযোধ্যা রাজ্যের এই পরিস্থিতির জন্য সীতার প্রতি হওয়া অন্যায়কে তুলে ধরেছেন। সীতাকে অগ্নি পরীক্ষার নির্দেশ দিলে সীতার দৃপ্ত উচ্চারণ -

> "অনলে পরবেশিলে সীতা গো যদি তোমার দুখ যায়।
> হাসিমুখে পরবেশিব আমি গো তোমার নাহি কোনো ভয়।।"[১৩]

এখানেই মনে হয় রাম সীতার কাছে পরাভূত হয়ে যান। রামের ব্যক্তিত্বহীনতা, বিবেকহীনতা ও মূর্খামির বিরুদ্ধে ভালোবাসা আর ব্যক্তিত্বের জোরে সীতা জয়লাভ করেন। সীতার এই জয় চন্দ্রাবতীর মনোভাবনাগত। রাম সীতার জন্য অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেছেন ঠিকই কিন্তু সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়নি। আসলে একজন নারী হয়ে অন্য এক নারীর লজ্জাজনক ও অপমানজনক পরিস্থিতিকে দর্শকদের সামনে আনতে চাননি বলেই হয়তো চন্দ্রাবতী সীতার অগ্নিপরীক্ষার বিষয়টি বর্জন করেছেন। কবি চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণে সীতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সীতার দুঃখে সমব্যথী হয়েছেন। এমনকি রামকে ভৎসনা করতেও ছাড়েননি-

> "পরের কথা কাণে লইলে গো নিজের সর্ব্বনাশ।
> চন্দ্রবতী কহে রামের গো বুদ্ধি হইল নাশ।।"[১৪]

আসলে চন্দ্রাবতী সীতা চরিত্রটিকে গুরুত্বদানের মধ্য দিয়ে নারীর অন্দরমহলের চিত্রকে উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর স্পর্ধিত স্বরকেও রূপ দিতে চেয়েছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

> "ষোড়শ–সপ্তদশ শতকে কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুগামী না হলেও চন্দ্রাবতী চির-আর্যসত্যের পরম্পরাস্বরূপ রামকেন্দ্রিক রামায়ণের ঐতিহ্য অবহেলা করে, অসমসাহসিকতার সঙ্গে সীতাকেন্দ্রিক রামায়ণের কাহিনি তথা 'সীতায়ন' রচনা করলেন। যে সময়ে বাংলা সাহিত্য ও সমাজ নারীজাগরণ, নারী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, সেখানে অবস্থান করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীজাতির সপক্ষে জয়ধ্বজা স্থাপন করা—বিপ্লবেরই অপর নাম।"[১৫]

প্রচলিত রামকথা অনুসরণে চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ রচনা করলেও স্বকীয় চিন্তাভাবনার বিস্তারে তা হয়ে উঠেছে অভিনব রামায়ণ, রামায়ণের উল্লেখযোগ্য অনুসৃজন। তাঁর এই সাহিত্যকর্ম মধ্যযুগের বাংলা রামায়ণের অনুবাদের ধারায় ব্যতিক্রমী রামায়ণ হিসেবেই পাঠকমনে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বরকত, হিমেল সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০১২, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৯০।
২। সাঁতরা, অনুপ কুমার সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, চন্দ্রাবতী রামায়ণ, কলকাতা-৩৬, পুরুষোত্তম পাবলিশার্স, পৃ. ১৪।
৩। সেন, দীনেশচন্দ্র সংকলিত, ১৯৫৮, মৈমনসিংহ গীতিকা (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা), কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১৪।
৪। চক্রবর্তী, কোয়েল, জানুয়ারি ২০১৮, চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, পৃ. ১২৬।
৫। শরীফ, আহমদ, ডিসেম্বর ১৯৭১, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, বর্ণমিছিল, পৃ. ৩৭২।
৬। বরকত, হিমেল সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০১২, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৯১।

৭। দেব সেন, নবনীতা, নভেম্বর ২০১৯, চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৪৩-৪৪।
৮। বরকত, হিমেল সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০১২, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১৭।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।
১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।
১৫। কর্মকার, সপ্তদীপা, জানুয়ারি ২০২২, প্রসঙ্গ বাংলা রামায়ণ কৃত্তিবাসি, চন্দ্রাবতী, বিষ্ণুপুরি, জগদ্রামি রামায়ণের তুলনামূলক পর্যালোচনা, কলকাতা-৯২, দোসর পাবলিকেশন, পৃ-২০৬।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১। সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৩১০, রামায়ণী কথা, বিশ্বভারতী, ১৩১০।
২। ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ২০০২, বাল্মীকির রাম : ফিরে দেখা, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ।
৩। দাস, বাণী, ২০০০, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী।
৪। ঘোষাল, শান্তিময়, ১৯৮৪, বাংলা সাহিত্যে রাম ও ভারত কথা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।
৫। মাইতি, প্রসাদকুমার, ১৩৫৯, রামকথার বিকাশের ধারা, ১ম পর্ব, কলকাতা, ভূর্জপত্র।
৬। সুলতানা, সারমিন, ২০২৪, চন্দ্রাবতীর অভিনব রামায়ণ, কলকাতা, কাউন্টার এরা।

ভারতে আধুনিক ইতিহাস লিখনপদ্ধতি; রাজেন্দ্রলাল মিত্র : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

দীপঙ্কর রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কালনা কলেজ

সারসংক্ষেপ: ১৭৮৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সারস্বত চর্চার অনন্য প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি, যার মাধ্যমে ভারতে ইতিহাসচর্চার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। এরপর প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী ধারার সংস্কমিশ্রণ ঘটিয়ে যিনি আধুনিক ইতিহাস লিখনপদ্ধতির অঙ্কুর তৈরি করেছিলেন তিনি হলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি না থাকলে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অনেককিছুই অন্ধকারে থেকে যেত। তিনি প্রথম লিপি, মুদ্রার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কীভাবে পান্ডুলিপি সংরক্ষণ করে একে ইতিহাস চর্চায় কাজে লাগানো যায় সেই পথও দেখান। সারনাথ শিলালিপি, আম্রগাছি তাম্রশাসন, কেশব সেনের তাম্রশাসন, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার প্রস্তর লিপি বিশ্লেষণ করে তিনি পাল ও সেন যুগের অনেক অন্ধকারময় দিককে আলোকিত করেন। বিখ্যাত দুই প্রবন্ধ সংকলন 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভে' তিনি প্রাচীন ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটিয়ে তোলেন। কুষান, শক ও গুপ্ত যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে। তিনি ভারতীয় ইতিহাসের এক নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তিনি আধুনিক ভারতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন

সূচক শব্দ: এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রাচ্যবাদী, পাশ্চাত্যবাদী, ইতিহাস চর্চা, শিলালিপি, তাম্রশাসন।

মূল আলোচনা:

প্রাচ্য অধ্যয়নের বিকাশ এবং ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির বিবর্তনে ১৭৮৪ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৮৪ সালে শুরু হওয়া এশিয়াটিক সোসাইটি ইতিহাস গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং ইতিহাস লিখন পদ্ধতির নতুন ধারণাগুলি নিয়ে সর্বোত্তম উপলব্ধ তথ্য থেকে যুক্তির উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক লিখন শুরু করেছিল। শতাব্দীর শুরুর সাথে সাথে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল তখন নতুন ধারণার প্রভাবে, প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্মের ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাচ্য গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে জোন্সের দ্বারা সূচিত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন এবং পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া গতি পেয়েছিল। বাংলার কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী এই আলোকে অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক ইতিহাস অনুসন্ধানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র[১] ১৯ শতকের মাঝামাঝি সেই কয়েকজন পণ্ডিতদের মধ্যে একজন যিনি জোন্সের ধারণা এবং মনোভাব দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং যার উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর ধারণার বিকাশে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছিলেন। একইসাথে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাত ধরে আধুনিক ঐতিহাসিক লিখন পদ্ধতির অঙ্কুর তৈরি হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে সেই অগ্রগামী যুবক যিনি আধুনিক ভারতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই বুদ্ধিমান ছাত্র হিসাবে তার প্রতিভা ফুটে উঠেছিল এবং ফারসি, সংস্কৃত এবং বাংলা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন[২]। ডাঃ শিশির কুমার মিত্র বলেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে হটাৎ করেই এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে জড়িত হয়েছিলেন বা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রভাব তাঁর উপরে অকস্মাৎ পড়েছিল তা কিন্তু নয়, ইউরোপীয় শিক্ষক ও আধুনিকতার প্রভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে প্রভাবিত হতে লক্ষ্য করা যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার জোরে তিনি অধ্যয়নের এই নতুন শাখায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত যে দশ বছর রাজেন্দ্র সোসাইটিতে কাজ করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যত পাশ্চাত্যবাদী জীবনে একটি গঠনমূলক সময় ছিল, যখন তিনি পুরাকীর্তি গবেষণার পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাহায্য, প্রেরণা এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন[৩]। ১৮৪৭ সালে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তার মাত্র একবছর পরেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংসে 'উম্ফা লিপি'র ইংরেজী অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর গবেষণা-জীবন শুরু হয়[৪]। রাজেন্দ্রলাল যে-সময়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজবৃত্তের কোনো ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন ঐতিহাসিকদের হাতে সেই পরিমাণ তথ্য ছিল না, যাতে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা যায়। ফলে সে-যুগের ঐতিহাসিকদের তথ্য সংগ্রহেই অধিক মনোযোগ দিতে হয়েছিল এবং শিলালিপি-মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আবিষ্কার এবং লেখমালার দিকে যা নিয়ে পরবর্তীকালে অর্থোদ্ধারে নানা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। এই সময় থেকে রাজেন্দ্রলাল একাধিক লেখমালার অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর কোনো অনুবাদের যাথার্থ্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও, সেগুলির মূল্য আজও কোন অংশে কমেনি। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিনায়ক পাল দেবের বংশতালিকা সংযুক্ত একটি তাম্রলিপির অনুবাদকালেই পালরাজাদের সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রথম আগ্রহ প্রকাশ পেতে দেখা যায়[৫]। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির বিভাগে রাজেন্দ্রলাল উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত একটি দানপত্রের ইংরেজী অনুবাদকালে নিজস্ব মতামতসহ সেটি প্রকাশ করেন[৬]। এর পর তিনি পর্যায়ক্রমে মহম্মদপুরে (যশোহর) প্রাপ্ত তিনটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ও আনুমানিক কালনির্ণয়, থানেশ্বরে প্রাপ্ত সংস্কৃতলিপির অনুবাদ ও আলোচনা, এরান, গোয়ালিয়র, এবং কাশ্মীরের তোরমান নামে রাজার কাল এবং পরিচয় নির্দেশ, আফগানিস্তানে প্রাপ্ত ব্যাকট্রিয়ান লিপির অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৬]

লিপির অনুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে লেখমালার অর্থোদ্ধার এবং কালনির্ণয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথমযুগের ঐতিহাসিক রচনা প্রধানত লেখমালার অর্থোদ্ধার এবং কালনির্ণয় সংক্রান্ত বিতর্কে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমশ নানা তথ্য সংগ্রহের সাহায্যে এবং আলোচনাদির ফলে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনাতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিষয়ে জেমস প্রিন্সেপ, ম্যাসন এবং কানিংহামের মতামত তখনও পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। রাজেন্দ্রলাল মথুরায়-প্রাপ্ত শিলালিপির দীর্ঘ আলোচনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেন, 'The character, style, language, the princes named, and the circumstances detailed, all point to the first two centuries after the birth of Christ, and by reading the dates as belonging to Saka era, we bring the documents exactly to that epoch: the earliest 44 being equal to 120 A. D. and the latest 140. 10 216 A. D. (Notices

on Sanskrit Inscriptions from Mathura"[৭]। শ্রীহট্ট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ভাটেরাতে দুটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় যেগুলির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন রাজেন্দ্রলাল। এ-থেকে যে-রাজাদের বংশতালিকা পাওয়া যায় তার প্রথম নাম থরবাণ (নবগীরবাণ)। পরবর্তীকালে ডঃ কে. এম. গুপ্ত প্রথম লিপিটি সম্পাদনাকালে 'থরবাণ' শব্দটি ব্যক্তিনাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন[৮]। রাজেন্দ্রলাল অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, 'The words Navagirvāṇa and Kharavāṇa are so placed that either may pass for a proper name, or both of them may be epithets'[৯]। তাম্রলিপিটির পাঠোদ্ধার এবং কালনির্ণয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে বিতর্ক চলেছিল। রাজেন্দ্রলালের একটি লেখা থেকে জানা যায় যে, "The date of the record has been read by Pandit Srinivasa Sastri to be the year 2928 of the era of the first Pandava King: Pandavakulädipaläbda sain 2928. But in the original the first figure is very unlike the third, and has been morever scratched over and is abundantly doubtful. The second is also open to question. I am disposed to take the first for a 4 and the second for 3, which would make the date 4328 A. D. 1245.'[১০] ডঃ কে. এম. গুপ্ত মনে করেছেন তারিখটি হবে (১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে)'। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছিল, রাজেন্দ্রলালের পাঠটি সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকলেও, ডঃ গুয়ের পাঠ অপেক্ষা সেটি অনেক বেশি নির্ভুল। যে-টিলায় লিপিটি পাওয়া গেছে প্রবচন অনুসারে রাজা গৌরগোবিন্দ (গোবিন্দ সিংহ) সেই স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ জেলাল কর্তৃক যিনি রাজ্যচ্যুত হন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'Dr. R. L. Mitra, held that the Govinda of tilä is the same with that of the record (no IV), and the date proposed by him fits in well with the story of Shah Jellal's invasion[১১]'

১৮৬৪ সাল ছিল রাজেন্দ্রলালের জীবনে একটি বিশেষ সময়, কেননা তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত হন, সহকারী সচিব এবং গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগদান করার পর বই, পাণ্ডুলিপি এবং পুরাকীর্তিগুলির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এবং একনিষ্ঠ পণ্ডিতদের অনুপ্রেরণামূলক সংস্থার সাথে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তরুণ রাজেন্দ্রকে উন্মুক্ত ও উৎসাহিত করে তুলেছিল। তাঁর কাজের মধ্যে বহুবিধ বই ও পুরাকীর্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও পণ্ডিতদের তাদের গবেষণায় সাহায্য করা, সেইসাথে সোসাইটির সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন শাখার বিভাগে রাখা এবং সঠিক নথির জন্য এর বিভিন্ন বিভাগে যোগাযোগ করা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মিনিট এবং জার্নালে এই সমস্ত কাজ রাজেন্দ্র বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দীপনার সাথে সম্পাদন করেছিলেন। রাজেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির বিষয়ে একটি প্রাণবন্ত আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন এবং এর সবচেয়ে উদ্যমী সদস্য হিসাবে, বিবলিওথেকা ইন্ডিকা[১২] পংক্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করে বর্ণনামূলক প্রকাশের মাধ্যমে এই শিক্ষিত সংস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সোসাইটির মহাফেজখানায় পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য কৌতূহলের সুবিন্যস্ত তালিকা, এর জার্নালে অসংখ্য আলোকিত কাগজপত্র এবং প্রবন্ধগুলিতে নতুন ধারণা প্রদান করে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সবচেয়ে দরকারী অংশ নেওয়ার মাধ্যমে নিজ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতি আধুনিক মনোভাব তুলে ধরেছিলেন। সম্ভবত, এই কাজ চলাকালীন শুধুমাত্র সংগৃহীত পুরানো পান্ডুলিপির প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মেছিল এবং সোসাইটির মহাফেজখানায় সংরক্ষিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলোকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আধুনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ১৮৫৬ সালে বই এবং মানচিত্রের একটি সুবিন্যস্ত তালিকা

ও ১৮৭৭ সালে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সুবিন্যস্ত তালিকার কাজ তৈরি করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে, মিত্রা মিউজিয়ামে 'কৌতূহল' নামে পরিচিত তার প্রথম সুবিন্যস্ত তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন। এটি মুদ্রা এবং শিলালিপি সহ এশিয়াটিক সোসাইটির দখলে থাকা বস্তুর সম্পূর্ণ পরিসীমা তালিকাভুক্ত হয়েছিল[১৩]। ১৮৭৩-৭৮ সালে অযোধ্যা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির একটি সুবিন্যস্ত তালিকা[১৪], ১৮৭৫ সালে নেটিভ গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির একটি প্রতিবেদন এবং ১৮৮০ সালে বিকানীরের এইচ.এইচ. মহারাজের গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলির একটি সুবিন্যস্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল[১৫]। এইভাবে, পুরানো পাণ্ডুলিপিগুলি অন্বেষণ এবং পদ্ধতিগতভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, তিনি ভারতবিদ্যার জন্য প্রচুর অবর্ণনীয় পরিষেবা প্রদান করেছিলেন। তিনি গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, যার কোন গুরুত্বই এই সময় ভারতে ছিল না। অর্থাৎ তিনি ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ও সুবিন্যস্ত তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের ক্রিয়াকলাপগুলি এবং মূল্যবান নথি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারী মহলে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি চেতনার অনুভূতি জাগিয়েছিল এবং তাঁর অভিজ্ঞতাকে তৎকালীন সরকার এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদরা ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা প্রদেশে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার ও সংরক্ষণের ওপর তিনি একটি প্রতিবেদন লেখেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করার সময়, রাজেন্দ্রলাল বিজয়া মন্দির, উদয়পুরে পাওয়া একটি শিলালিপি সম্পাদনা করেন। এই শিলালিপিটি অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে মহোদয় (কনৌজ) রাজবংশের শাসনের উপর আলোকপাত করে যা ঐতিহাসিক উপাদানের তা প্রকাশের পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রে তাঁকে তার সময়ের একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কনৌজের গাহড়বালদের বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লদের ও গোয়ালিয়রের কচ্ছপঘাতদের বিভিন্ন শিলালিপির সম্পাদনায় তিনি এই রাজবংশগুলির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করে তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন।[১৬]

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের মধ্যে পাল ও সেন-যুগের রাজবৃত্ত সর্বাধিক ছিল মূল্যবান। উনবিংশ শতাব্দীতে সেনরাজাদের সম্বন্ধে যে-প্রস্তরলিপি এবং তাম্রলিপিগুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বাখরগঞ্জ জেলায় এদিলপুর পরগণায় প্রাপ্ত কেশবসেনের তাম্রশাসন এবং মালদহ জেলায় দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের আজ্ঞায় ক্ষোদিত প্রস্তরফলক। এ ছাড়া দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় আরও কয়েকটি সেনরাজাদের তাম্র ও প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল এইগুলির উপর নির্ভর ক'রে সেনরাজাদের বংশলতিকা রচনা করেছেন, এবং লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী রাজাদের নাম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত লক্ষণসেন পর্যন্ত সেনরাজাদের বৃত্তান্ত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। সেনরাজাদের বংশতালিকও রাজেন্দ্রলালের সময়ে যে-ভাবে নির্ধারিত করেছিল, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তা বহুলাংশে সত্য ব'লে অনুমোদন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সেনরাজাদের নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে Indo- Aryans (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধটি ছাড়া "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রকাশিত''[১৭] সেন রাজাদিগের বংশাবলী' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেনরাজাদের সম্বন্ধে, বিশেষত বল্লালসেনকে অবলম্বন ক'রে বাংলাদেশে বহু প্রবচন- কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল কিন্তু এই কুলপঞ্জিকাগুলির উপর রাজেন্দ্রলাল নির্ভর করেননি। বরং প্রাচীন তাম্রশাসন, পূর্বকালের অট্টালিকাদির উপর ক্ষোদিত

প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি বিষয় ইতিহাসের প্রকাশক বলে গণ্য হয়েছিল। বিশেষতঃ ঐ সকল বিষয়, গ্রন্থ থেকে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য ছিল কারণ গ্রন্থের পাঠ অনায়াসে লুপ্ত হলে হতে পারে, কিন্তু তাম্রশাসন বা মুদ্রায় সে আশঙ্কা কখনই হয় না।[১৮] সেন রাজবংশের ইতিহাসের পুরো বিষয়টি তিনি ১৮৬৫ এবং ১৮৭৮ সালে জার্নালে দুটি গবেষণাপত্রে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করেছিলেন। তবে আদিশূরকে নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছুটা বিব্রত বোধ করেছেন, তিনি অনুমান করেছেন সেনরাজবংশের অন্যতম আদি পুরুষ বীরসেন এবং আদিশূর অভিন্ন হতে পারে এছাড়াও আদিশূর কিংবদন্তীমূলক চরিত্র হওয়ায় তাঁকে তিনি সেনরাজবংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। এরপর রাজেন্দ্রলাল অশোকসেন নামে আর একজন রাজার উল্লেখ করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্মণসেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজেন্দ্রলাল এইভাবে সেনরাজাদের বংশতালিকা রচনা করেছেন। মীনহাজ-উদ্দীনের বিবরণ অনুসারে বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশ জয় করেন। তবে এই বিবরণ অনুসারে লক্ষ্মণসেনের আশি বৎসর রাজত্ব করা উচিত, সুতরাং তাঁর রাজত্বকাল ১১২৩ থেকে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। আধুনিক গবেষণায় লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলাভের কাল ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দ ব'লে ধার্য হয়েছে এবং ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছেন। এর ফলে লক্ষণসেনের নামে যে-বর্ষ প্রচলিত, তার সূচনা-কাল নির্দেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের কারণে, লক্ষাণ-বর্ষের আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই প্রমাণ করেছিলেন, লক্ষণ বর্ষের সূচনা ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে। (রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এ-ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন)। পরবর্তীকালে লক্ষাণ-বর্ষের সূচনাকাল ১১০৭ থেকে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। লক্ষাণ সেনের রাজত্বকাল নির্দেশে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত, শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থের পুষ্পিকার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, "সদুক্তিকর্ণামৃত" এর এই পুথি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল প্রথম সংগ্রহ করেন এবং সংস্কৃত পুথির তালিকায়'[১৯] তার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু পুস্তিকায় প্রদত্ত কাল-নির্দেশক পদ 'রসৈক-বিংশ'-এর অর্থোদ্ধার করতে পারেননি রাজেন্দ্রলাল। তা সত্ত্বেও তিনি বাখরগঞ্জ ও রাজশাহী-লিপির সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে সেনরাজাদের বংশপরিচয় নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখান সেন রাজারা ছিলেন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়। সে-যুগে এই সত্যটি প্রমাণ করতে তাঁকে অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কৌতুককর ঘটনা বিবৃত করেছেন। সেনরাজাদের জাতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত দেখে সেই সময়ে বহু বৈদ্য, যাঁরা নিজেদের সেনরাজবংশের উত্তরপুরুষ বিবেচনা করতেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদকল্পে অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ লেখেন। তাঁদের ধারণা ছিল রাজেন্দ্রলাল নিজে সম্ভবত ক্ষত্রিয় ব'লেই সেনরাজাদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাঁর এত আগ্রহ ছিল। রাজেন্দ্রলাল নিজেকে কখনোই ক্ষত্রিয় ব'লে দাবী করেননি। কিন্তু সে-যুগে ঐতিহাসিক গবেষণা কী জাতীয় বাধার সম্মুখিন হতো, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটনাটি তুলে ধরেছিলেন।

কুষাণ-রাজবংশের কথা আমরা প্রথম জানতে পারি কতকগুলি মুদ্রা এবং শিলালিপির সাহায্যে। কিন্তু ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকীর সময়েও ডঃ হর্নলে জানিয়েছেন, এ-বিষয়ে 'in not a few points, is still a matter of doubt and difference, even at the present day.[২০] শুধু কুষাণ যুগ নয় শক ও গুপ্তযুগের কিছু সন, ঘটনা নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।প্রিন্সেপ ও ম্যাসন এর মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে যা নানা সমস্যা তৈরি করেছিল। মথুরায় প্রাপ্ত

শিলালিপির বিস্তারিত বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, চরিত্র, শৈলী, ভাষা, রাজকুমারদের নাম এবং বর্ণিত পরিস্থিতি সবই খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী দুই শতককে নির্দেশ করে।[২১] কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ ৭৮ খ্রিস্টাব্দে একথাও রাজেন্দ্রলাল এবং তাঁর সমসাময়িক গবেষকেরা প্রথম নির্দেশ করেন। কণিষ্ক এবং পরবর্তী কুষাণ- রাজাদের বৃত্তান্ত রচনায় এই তারিখ পরবর্তীকালে মোটামুটি গৃহীত হয়েছে। শক যুগ এবং গুপ্ত যুগের প্রাথমিক বছরগুলি নির্ধারণ করা উভয় ক্ষেত্রেই রাজেন্দ্র শিলালিপির গ্রন্থের শব্দগুচ্ছের সত্য পাঠ প্রদান করে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।[২২] গুপ্তযুগের সূচনাকাল নিয়েও সে-সময়ে মতানৈক্য প্রবল ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সেপ কর্তৃক সাঁচীস্তূপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি কালনির্দেশক লিপি আবিষ্কৃত হয় কিন্তু তিনি তাঁর অর্থোদ্ধার করতে পারেননি। পরবর্তীকালে কুহাওন স্তম্ভে ক্ষোদিত কালনির্দেশক লিপিও নানা সমস্যা উপস্থিত করে, এবং, "it remained for Dr. R. Mitra, in 1874, to point out the true reading, that it was the year 141, dating in the Gupta era itself. At the same time he published a newly found inscription of the same Skanda Gupta, dated in the year 146 of the Gupta era"[২৩] অবশ্য সে-সময়ে গুপ্তযুগের সূচনাকাল তথা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভ ১৬৬ খ্রিস্টাব্দ ব'লে সকলে বিশ্বাস করতেন (কানিংহামের সিদ্ধান্ত), কিন্তু অধুনা ঐতিহাসিকেরা ৩২০ খ্রিস্টাব্দকে গুপ্তযুগের সূচনাকাল ব'লে নির্দেশ করেছিলেন।

এরপর তিনি পাল রাজবংশ ইতিহাস উন্মোচনে ব্রতী হন। সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি, আম্রগাছি তাম্র শাসন, নালন্দায় আবিষ্কৃত দানলিপিতে উৎকীর্ণ পাল রাজাদের নাম নানারকম বিভ্রান্তি ও সমস্যা তৈরি করেছিল। রাজেন্দ্রলাল তাঁর সমসাময়িককালে প্রাপ্ত উপযুক্ত তাম্রলিপি-শিলালিপিগুলির সাহায্যে পালরাজাদের বংশতালিকা এবং কালনির্দেশ করার প্রয়াস করেছেন। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন লিপির শুদ্ধতর পাঠ নির্ধারিত না হওয়ায়, অধিকাংশ সময়ে রাজেন্দ্রলালকে তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।[২৪] তিনি পালরাজাদের যে কালানুক্রমিক বিবরণ দেন[২৫] তাতে আধুনিক গবেষণায় মোটের উপর সমর্থিত হয়েছিল। সপ্তম পালরাজের নাম রাজেন্দ্রলাল অনুল্লেখিত রেখেছেন। দশম পালরাজের নাম নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে, অনেকে তাঁর নাম 'জয়পাল' ব'লে নির্দেশ করেছেন।[২৬] কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার 'নয়পাল' নামই রেখেছেন।[২৭] অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পালরাজাদের একটি তাম্রলিপি অনুবাদকালে চার্লস উইলকিন্স Asiatic Researches পত্রিকায় গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের উল্লেখ করেন। এর কিছুকাল পরে দিনাজপুর জেলায় বাদলে একটি প্রস্তর স্তম্ভে পালরাজাদের যে আদেশ- লিপি আবিষ্কৃত হয়, সেটিও চার্লস উইলকিন্স অনুবাদ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধর্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম, হর্ণলি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মত অসার প্রতিপন্ন হয়েছিল। কতগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হলে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবের প্রকৃত কালনির্ণয় সম্ভব হয়েছিল।[২৮] ঐতিহাসিক বিবরণ রচনায় এইজাতীয় সীমাবদ্ধতা কিছুটা অনিবার্য। কিন্তু তবু দেখি, রাজেন্দ্রলালের কতকগুলি ধারণা এবং লিপির পাঠোদ্ধার শুধু পরবর্তীকালে অপরিবর্তিত থাকেনি, দীর্ঘকাল পরে তার প্রকৃত মূল্য পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল দিনাজপুর জেলার বাণগড়-লিপির যে-অনুবাদ করেন।[২৯] তা সে-সময়ে প্রভূত বাদপ্রতিবাদ সৃষ্টি করলেও, পরবর্তীকালে তা গৃহীত হয়েছে। রমাপ্রসাদ চন্দ রাজেন্দ্রলালের কালনির্দেশ মেনে নিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে লিখেছেন, "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

'কুজরঘটাবর্ষেণ' শব্দের ৮৮৮ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্যার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অর্থ স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার না হলে এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব ছিল।[৩০]

পালরাজাদের বিভিন্ন দানপত্র, মুদ্রা ও লেখমালা নিয়ে রাজেন্দ্রলাল একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, সম্ভবত শেষ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের পংক্তি।[৩১] তিনি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আবিষ্কার করেন, যেগুলির তথ্য ১৮৭০-৮৮ সাল পর্যন্ত নয়টি খণ্ডে প্রকাশিত করে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৩২] প্রবন্ধগুলির একটি নির্বাচন সংকলিত হয়েছিল এবং ১৮৮১ সালে দ্য ইন্দো-আরিয়ানস শিরোনামে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটির কার্যপ্রণালী ও জার্নালের বিভিন্ন পুস্তক খণ্ডে তাঁর অসংখ্য নিবন্ধগুলিতে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষন অসামান্য দক্ষতার যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়, রাজশাহীতে প্রাপ্ত লিপি থেকে সেনরাজাদের পরিচয় বিষয়ক।[৩৩] এই জাতীয় অধিকাংশ রচনা আজ বিশ্বৃত, যদিও আধুনিককালে ভারতবর্ষের যে-পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীর এই বিক্ষিপ্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির মূল্য ছিল অপরিসীম। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাজেন্দ্রলালের এই জাতীয় প্রবন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'Vestiges of the Kings of Gwalior প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের সূচনীয় রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় শিলালিপি-স্তূপ-স্তম্ভের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, 'Ordinarily, monumental history rectifies or completes written history. But in India, where oblivion has gloriously triumphed over all ancient records, making puzzles of Cyclopian erections, and turning old glories into dreams; where most of her sovereigns and greatmen live not in the pages of Xenophon or a Thucydides, but in a fe fanciful fables, rude coins, mouldering ruins, and blotted inscriptions, it has to establish a history and not to rectify it.'[৩৪]

তিনি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মীয় বহু গ্রন্থের সংস্করণে একই চেতনা তাঁকে পরিচালিত করেছিল। আমরা আবারও তাঁর কামন্দকের নীতিসার, পতঞ্জলির যোগসূত্র, অগ্নিপুরাণ, ললিতা বিস্তার, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদির সংস্করণগুলি উল্লেখ করতে পারি, যার প্রতিটিই তাঁর বিশাল বুদ্ধি এবং বিস্তৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ বহন করে।[৩৫] তাঁর প্রচেষ্টার কারণে, পরবর্তী ইতিহাসবিদরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেন। রাজেন্দ্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট অবদান ছিল উপযুক্ত ভূমিকা সহ অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষ্যের সংস্করণ। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার বিস্তৃত অধ্যয়ন তাঁকে এক ধরণের বহুমুখী প্রতিভা দিয়েছিল যা তাকে বৈদিক এবং বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে সমান আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম করেছিল। রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃতের গভীর জ্ঞান নিয়ে ১৮৫৪ সালে নিজেই সাম বেদের ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮০ সালে ভাষ্য সহ প্রকাশিত পতঞ্জলির যোগসূত্র সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ব্যাস, জ্ঞান ভিক্ষু এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতো বিখ্যাত দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক অধ্যয়নের চেষ্টা করেছিলেন।[৩৬] রাজেন্দ্রর প্রতিভা তাকে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের দিকেও তাঁর অনুসন্ধানের মনোযোগ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বি এইচ হজসন নেপালে উত্তর বৌদ্ধধর্মের উপর প্রচুর

সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এগুলি একটি সংকর ভাষায় লেখা হয়েছিল, সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের মিশ্র রূপ। তাঁর ঐতিহাসিক সচেতনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর তিনি মনোযোগ দেন। এই সময় রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল উইলিয়াম জোন্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। জোন্স ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর একক উৎস আবিষ্কার করেন, যা তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করতে ব্যবহার করেন।[৩৭]

রাজেন্দ্রলাল, যদিও একজন ভাষাবিদ, তবুও তিনি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি বিরল ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করেছিলেন এবং গবেষণায় তিনি ইতিহাসে ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের প্রাচীন পান্ডুলিপি, মুদ্রা ও শিলালিপির গুরুত্ব এগুলির সংযোগে ইতিহাস রচনায় প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। এমনকি তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি করেছেন তিনি প্রথম "মাঠ জরিপ" পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং "জীবন্ত ইতিহাস" নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেন। ১৮৮০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় লিখেছিলেন যে বাংলার একটি ইতিহাসের নিদারুণ প্রয়োজন ছিল এবং এই ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালিকে লিখতে হবে। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাংলার প্রত্নতত্ত্ব পুনরুদ্ধারে নিজেকে নিয়োজিত না করার জন্যও সমালোচনা করেছিলেন।[৩৮] মুসলমানযুগের রাজবৃত্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু লিখলেও, হিন্দু-বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী বলে ঐতিহাসিকরা সমালোচনা করেছিলেন।

তিনি বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়কে উচ্চমার্গে তুলে ধরেছেন বা খানিকটা গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার জাতীয় গর্ববোধের মধ্যে কোন ভাবাবেগের বা গোঁড়ামির ছিটে ফোটাও পাওয়া যায়নি। তিনি ঐতিহাসিক ধর্ম থেকে কখনোই বিচ্যুত হননি। তার লেখনীতে যে ভারতীয়ত্ব ছিল তাতে সমকালীন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব থাকলেও আত্ম পরিচিতির নিজস্বতা ছিল অনন্য[৩৯] এই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার পদ্ধতির জন্য পরবর্তীকালে সকল ভারতীয় ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল এর কাছে ঋণী।[৪০]এই কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন ব্যতিক্রমী। এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতে আধুনিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উইলিয়াম জোনস,জেমস প্রিন্সেপ আলেকজান্ডার ক্যানিংহোম এবং বিভিন্ন লেখতাত্ত্বিক যেমন ব্রিটিশ লেখতাত্ত্বিক জন ফেথফুল ফ্লিট, লেখতাত্ত্বিক লোরেঞ্জ ফ্রাঞ্চ কিলহর্ন, ভারতের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লেখনির "ইস্পাত কাঠামো" বা "Steel Frame" তৈরি করেছিলেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লেখনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি এই ধারার অন্ধ অনুকরণ করেননি এই ধারায় প্রবেশ করে তিনি ইতিহাসচর্চার এক নতুন ছাঁচ তৈরি করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কলকাতার একটি কাস্টন শহরতলি, পশ্চিমবঙ্গের একটি পুরানো এবং সম্মানিত কায়স্থ পরিবারে ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮২২, শনিবার পৈতৃক বাসভবনে জন্মেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন সাহিত্য সাধনার একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি জনমেজয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র হিসাবে। জনমেজয়া প্রাচীনকালের ঐতিহ্যগত গর্ব এবং মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সমস্ত

সন্তানদের জন্য উচ্চ জীবনযাপন এবং সুশিক্ষা প্রদানের জন্য যথেষ্ট উপায় ছিল না। তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে, রাজেন্দ্র শৈশব থেকেই প্রতিশ্রুতির লক্ষণ দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা-মা তাঁকে কলকাতায় তাঁর নিঃসন্তান বিধবা খালার যত্নে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেখানে পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমা চন্দ্র বসুর প্রাইভেট স্কুলে এবং গোবিন্দচন্দ্র বাইস্যাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে ইংরেজিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

২. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১-৫।
৩. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯।
৪. Catalogue of Sanskrit mss.edisting in Oudh / edited by Rajendralal Mitra, Ganesha Press, 1847.
৫. Proceeding of the Asiatic society of Bengal, Jan-1848, p-70
৬. তদেব, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৮৫০, পৃঃ ৪৭৫-৮০।
৭. Proceedings of A. S. B., Vol XXXIX, ১৮৭০, পৃঃ ২২৬।)
৮. Epigraphica Indica, Vol XXX, পৃঃ ২৭৭।
৯. Proceedings of A. S. B., ১৮৮০, পৃঃ ১৪৫।)
১০. তদেব,
১১. R. C. Majumdar- The History of Bengal. Vol I, (১৯৪৩) পৃঃ ২৫৬।)
১২. Bibliotheca Indica : Collection of oriental works / Edited by-Rajendralal Mitra, The Asiatic society of Bengal, 1876.
১৩. Sanjukta Datta, Artefacts and antiquities in Bengal (some perspectives with in an Emerging non official Archaeological sphere.
১৪. Catalogue of Sanskrit mss.edisting in Oudh / edited by Rajendralal Mitra, Ganesha Press, 1847.
১৫. Sanjukta Datta, Artefacts and antiquities in Bengal (some perspectives with in an Emerging non official Archaeological sphere,
১৬. J.A.S.B. ১৮৬৫, ১৮৭৩, ১৮৭৮
১৭. ৩য় পর্ব, ২৮খণ্ড, পৃঃ৫৮-৬৪
১৮. সেন রাজাদিগের বংশাবলি, "রহস্য সন্দর্ভ", ৩য় পর্ব, ২৮খন্ড, পৃঃ৫৯
১৯. Notice of Sanskrit mss., Vol iii, পৃ ১৩৪-৪৯
২০. A.F.R HHoeml- "Histroy", Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, দ্বিতীয় খন্ড (১৮৮৪) পৃ. ৯।
২১. Notice on Sanskrit inscription from Mathura J.A.S.B.vol. -xxxiv, 1870, p-226
২২. Archaeology in India, with especial reference to the works of Babu Rajendralal Mitra / James Fergusson, K.B. Publication, 1974.
২৩. A. F. R. Hoernle- পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৯২-৩।
২৪. On the Pala and the Sena Dynasties of Bengal', Indo-Aryans, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৮৮১) পৃঃ ২৩২
২৫. তদেব,
২৬. নীহাররঞ্জন রায়- "বাঙ্গালীর ইতিহাস", আদি পর্ব (১৩৫৬) পৃঃ ৪৮৬।),
২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার "বাংলা দেশের ইতিহাস" (১৩৫৬) পৃঃ ৬২।
২৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালার ইতিহাস", প্রথম ভাগ, (১৩৩০) পৃঃ ১৭৯।)
২৯. Indian Antiquary, Vol 1, পৃঃ ১২৭-৮।
৩০. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৩।

৩১. Proceedings of A. S. B. জুলাই ১৮৮৬।
৩২. Sanjukta Datta, Artefacts and antiquities in Bengal (some perspectives with in an Emerging nom official Archaeological sphere.
৩৩. On the Sena Räjäs of Bengal', J. A. S. B. Vol EXIV, ১৮৫৫, পৃঃ ১২৮।)
৩৪. J. A. S. B., Vol XXXI, ১৮৬২, পৃঃ ৩৯১।
৩৫. A descriptive Catalogue of the Bengali manuscripts, In the collections of the Asiatic society, Jatindra Mohon Bhattacharjee, The Asiatic Society, Kolkata, page-6-10.
৩৬. তদেব,
৩৭. Mukherjee S.N, sir William Jones: A study in Eighteenth century British attitudes to India, Cambridge, 1968, p-98)
৩৮. Sanjukta Dutta...
৩৯. R.C Majumdar, Rajendra Lala Mitra, 150th anniversary lecture, the Asiatic society, Calcutta, 1978, P.17) 1
৪০. S.K.Saraswati, Raja Rajendra Lal Mitra in R.C Majumdar.op.cit, P.41.

ইবসেনের নাটক : মঞ্চ ও শিল্প ভাবনা

কুন্তল বড়ুয়া
অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রায় দু'শত বছরের দ্বার প্রান্তে বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন। উনিশ শতকের এক বিপ্লবী নাট্যকার বা দার্শনিক সমকালেও যিনি দীপ্যমান। শেক্সপীয়রের পরে সম্ভবত কোন নাট্যকারই সারা পৃথিবীতে এতটা সমাদৃত হননি। ইবসেনের নাট্য ভাবনা, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ পাঠককে সমকালেও ভাবিত করে তোলেন এবং দর্শককে উন্নত জীবন বোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর নাটকে সামগ্রিকভাবে বিচিত্র মানব জীবনের অন্তর্নিহিত গভীর চরিত্রের আভাস যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি অতীত ইতিহাস, সামাজিক বৈষম্য, সমাজ বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রথানুগত্য ধর্মীয় প্রথা ও কুসংস্কার বিরুদ্ধে তিনি যেমন রুখে দাঁড়িয়েছেন, আবার পারিবারিক জীবন-প্রণালি, নারীর অধিকার, সবকিছুই তাঁর রচনায় ভিন্ন ভিন্ন গাঢ় অনুভূতিতে প্রত্যক্ষতায় আবার কখনও প্রতীকতায় ধরা দেয়। সমাজ, দেশ ও মানুষের অধিকারের স্বার্থে তিনি গোটা জীবনটায় উৎসর্গ করেছেন বলা যায়। তাঁর প্রতিটি রচনায় বিশ্ব মানবজাতিকে চিন্তা মননে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে দাঁড় করিয়ে দেন আত্মা ও বিবেকের মুখোমুখি। যতই বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁর সমকালে এবং বর্তমানকালে ততই তিনি নতুন রূপে আবির্ভূত হন, নতুন রূপে আবিষ্কৃত হন। এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইবসেনের নাটকে 'মঞ্চ ও শিল্প-ভাবনা' এবং 'প্রপস্' নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ নাটকে বাস্তবিক গৃহস্থের নানা উপকরণের সমাহার যেমন দৃশ্যমান। আবার নৈসর্গিক পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে লক্ষণীয়, তাঁর শেষ দিককার নাটকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রকৃতি ও নৈসর্গিক পরিবেশ। যা মানব চরিত্রকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। ইবসেন খুব ভালো ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রকৃতি ও নৈসর্গিক পরিবেশ মানব চরিত্রকে একাত্ম করা যায়। ইবসেনের বহু নাটকে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে। যেখানে মানব চরিত্র, মানবকর্ম এবং নিসর্গ একে অপরের পরিপূরক। তাঁর প্রতিটি নাটকে প্রকৃতি ও নৈসর্গিক পরিবেশ যেন 'দৃশ্য' ও 'চিত্রে'র অপূর্ব মিলন মেলা।
মূল শব্দ: ইবসেন, প্রপস্, মঞ্চ, নৈসর্গিকতা, শিল্প ভাবনা ইত্যাদি।

মূল আলোচনা:

বাংলাদেশে ইবসেনের গৃহপ্রবেশ ১৯৯৬ সালে। স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নব নাট্যচর্চায় ইবসেন অনুচ্চকিত বাংলাদেশের মঞ্চ-আঙ্গিনায়। দু'শ বছর আগে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারে যে সমস্যাগুলি তিনি চিহ্নিত করে গেছেন সময়ের কালক্রমে তার চেহারা ও রূপ বদল হলেও সমস্যাগুলো এখনও বর্তমান। অর্ধশতাব্দীর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার খতিয়ান নিলে দেখা যায়, বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ইবসেন একেবারে দীর্ঘসময় ধরে অনুপস্থিত। অর্ধশতাব্দীর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় বিদেশি এমন কোন নাট্যকার নেই যাঁদের নাটক অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা রূপান্তর করে মঞ্চস্থ হয়নি। অথচ পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবাংলায় ইবসেন চর্চার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, সলিল সরকার থেকে অনেক বিখ্যাত নাট্যকার-নির্দেশক ইবসেনের নাটককে অনুবাদ, রূপান্তর, ভাবানুবাদ করে

নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। ইবসেনকে আপন করে নিতে আমাদের বড্ড সময় নিতে হয়েছিল। যদিও এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে ইবসেনের নাটকে 'মঞ্চ ও শিল্প ভাবনা' এবং নাটকে 'প্রপস্'। প্রখ্যাত কবি, গবেষক শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

> চারদিকের নাটক সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র ধারণা আছে তাঁরাও জানেন হেনরিক ইবসেন একজন খুবই উঁচু মাপের নাট্যকার... জগৎ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। রসজ্ঞ সমালোচক বলেন, Ibsen's Drama is the Rome of modern theatre: all roads lead to it- from it. চারদিকের নাটক সম্পর্কে যাঁদের কিছুমাত্র ধারণা আছে তাঁরাও জানেন হেনরিক ইবসেন একজন খুবই উঁচু মাপের নাট্যকার... জগৎ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। রসজ্ঞ সমালোচক বলেন, যাঁরাই থিয়েটারের কাছাকাছি আসেন- প্রায় দু'শ বছর ধরে এভাবেই সকলেই ইবসেনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন। কেবল শ্রদ্ধা-স্বীকৃতি নয়, তাঁকে আপন করে নিতেও চেয়েছেন পৃথিবীর সব দেশের মানুষ। এমন কোন দেশ নেই যেখানে ইবসেনের নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। শেক্সপীয়রের পরে আর কোনও নাট্যকার সারা পৃথিবীতে এতটা সমাদৃত হননি। জন্ম যদিও নরওয়েতে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা তাঁকে বিশ্ব নাগরিক করে তুলল; তাঁর সৃষ্টির দ্যুতিতে আলোকিত হল থিয়েটারের ইতিহাস। তাঁর সময়ের যশস্বী নাট্যকার স্ট্রিনবার্গ, চেকভ, বার্নাড শ, ইবসেনের নাটকের সুখ্যাতি করেছেন। জেমস জয়েস ইবসেনের নাটকে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, ইবসেনের original play পড়ার জন্য নরওয়েজিও ভাষাও নাকি শিক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, It must be questioned wheather any man as held so farm an ampire over the thinking world of modern times.[১]

ইবসেন তাঁর প্রতিটি নাটকে মঞ্চ বা শিল্প ভাবনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই শিল্প নির্দেশনার মধ্যে নাট্যকার ইবসেনকে নির্দেশক ইবসেন হিসেবেও আবিষ্কার করা যায়। প্রতিটি নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্যে অনুপঙ্ক বর্ণনার পাশাপাশি ইবসেন তাঁর দৃশ্যপট বা মঞ্চ পরিকল্পনার ভাষ্যও নির্দেশ করে গেছেন। বস্তুত, ইবসেন তাঁর দৃশ্যপট বা মঞ্চ পরিকল্পনার (সেট-ডিজাইন) বর্ণনার কারণে একজন মঞ্চ-পরিকল্পককে পরিকল্পনার ভাবনার কাজটা সহজ করে দিয়ে গেছেন। আবার কোন কোন নাটকে তিনি অভিনেতাদের অভিনয় কীরকম হবে তারও দিকনির্দেশনা চোখে পড়ে। প্রতিটি নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্যে নাট্য ঘটনার পরম্পরায় পটভূমির যে চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন তা দৃশ্য ও চিত্রের অপূর্ব মিলনমেলা। তাঁর নাটকে নিসর্গ বা ল্যান্ডস্কেপের যে চিত্রমালার সমাহার দেখি এর উত্তরে তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন:

> যে কেউ আমাকে ভালো করে বুঝতে চান, তাঁকে নরওয়ে সম্বন্ধে জানতে হবে। এ দেশের লোকে তাদের উত্তর দিকে তাকালে দেখতে পায় কঠিন অথচ দৃশ্য বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপে (বিস্তৃত নিসর্গ রূপ), এবং আরো দেখতে পায় আবদ্ধ জীবনের সৌন্দর্য আবাস গৃহগুলি যেন একে অন্যের থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত- এবং এই দৃশ্যের ফলে তারা অন্য অধিবাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না, কেবল নিজের কথা ভাবে। ফলে তারা চিন্তামগ্ন ও গম্ভীর চরিত্র

> হয়ে পড়ে, তারা নিজেদের মধ্যে ডুবে থাকে এবং প্রায় সময়ই নিরাশায় মগ্ন থাকে। নরওয়েতে প্রতি দুজন মানুষের মধ্যে একজন যেন দার্শনিক। আর ভেবে দেখুন সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতকাল, বাহিরের জগৎটা ঘন-কুয়াশায় ডাকা! হায়, লোকেরা আকুল হয়ে ওঠে সূর্যের আবির্ভাবের জন্য।[২]

ইবসেনকে নরওয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের জীবন-যাপন এবং নিসর্গ বা ল্যান্ডস্কেপে তাঁর শিল্পী চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলেছে। যেহেতু তিনি নিজেও চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইবসেনের ইচ্ছা ছিল তিনি চিত্রশিল্পী হবেন। মার কাছে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল। প্রতি রোববার ইজেল, রংতুলি নিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন; নিসর্গ- চিত্রের জন্য পাহাড়ে চলে যেতেন অথবা বন্দরের ধারে। কিছুদিনের মধ্যে এ্যাপোথেকারীর দেওয়াল ভরে উঠেছিল তাঁর আঁকা ছবিতে। যেহেতু চিত্রশিল্পী ছিলেন প্রাকৃতিক পরিবেশ, নিসর্গ বা ল্যান্ডস্কেপে ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর রচিত কবিতা ও নাটকে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর নাটকে বার বার প্রকৃতি, বনশ্রেণি, পাহাড়, পর্বত, আকাশ, সূর্য, উপত্যকা, নদী, সমুদ্র, লতাগুল্ম, পুষ্প এসব বর্ণনা চোখে পড়ে। ইবসেন তাঁর প্রতিটি নাটকে মঞ্চ ভাবনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই শিল্প নির্দেশনার মধ্যে নাট্যকার ইবসেনকে নির্দেশক, সেট পরিকল্পক হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। এই পর্বে ইবসেনের নির্বাচিত কয়েকটি নাটকের 'শিল্প নির্দেশনা বা মঞ্চভাবনা' ও নাটকে 'প্রপস্'র ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরার একমাত্র উদ্দেশ্য তিনি যে নাটক লিখতে লিখতে নির্দেশকের ও ভূমিকা পালন করেছেন। আগেই উল্লেখ করেছি, এমনকি কোন কোন নাটকে অভিনয়রীতি কি রকম হবে তাঁর প্রতিটি 'অঙ্ক' ও 'দৃশ্য'-এ তিনি অনুপঙ্ক নির্দেশনামা দিয়ে গেছেন। ইবসেন তাঁর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "...শুধুই ঘটনা ঘটছে না, শুধুই কিছু মানব মানবীর কথাবার্তা আচরণ প্রকাশিত হচ্ছে না রঙ্গমঞ্চে, আসলে ইবসেনের নাটকে মানব চরিত্র এবং নিসর্গ মিলেছে অন্তরঙ্গভাবে।"[৩] দু'শত বছর হতে চলল এখনও তাঁর মঞ্চ ও শিল্প ভাবনা সমকালীন নির্দেশকদের ভাবনা বা চিন্তার উদ্রেক করে। নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে তাঁর মঞ্চ-সজ্জার যে বিন্যাস লক্ষ্য করি, তার মধ্যে নাটকের মঞ্চ-স্থাপত্যের পরিকল্পনা একের মধ্যে বহুকে ধরে দেবার ইঙ্গিত বহন করে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলনের মধ্য দিয়ে অভিনেতারা ইবসেনকে শুধু একজন নাট্যকার হিসাবে নয় একই সঙ্গে নেপথ্য একজন নাট্য পরিচালককেও খুঁজে পান।

ইবসেনের নাটকে প্রপস্ ও মঞ্চ: রোসমার-এর বসত-ঘর, মঞ্চের পেছনে বার্চ গাছের সাদা ডাল আর বুনো ফুল দিয়ে সাজানো। আরো পেছনে একটা দরজা, হল ঘরে যাবার জন্য ভাঁজ করা দরজা। একটা জানালা। চৌকির ওপর ফুল, আর লতানো গাছ, বাইরের বড় বড় গাছের বাগান, সেই বাগান বাড়ির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব জিনিস প্রথম-প্রথম মনে হয় বাড়ির স্বাভাবিক অনুষঙ্গ, পরে এই দৃশ্যসজ্জাগুলো নাট্য ঘটনার সাথে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। এগুলো কখনও প্রতীকী বা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ইবসেনের নাটকের প্রপস্ এর বিশেষ ভূমিকা থাকে, নাট্যঘটনায়। এই প্রপসগুলো সাধারণত শিথিল ভঙ্গিতে ঘরের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরে এই প্রপসগুলোই নাট্যঘটনার চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁর রূপ বদল করে অভিনেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়ে, বহুমাত্রিক করে তোলে ঘটনা প্রবাহকে। ইবসেনের নাটকে সাধারণত প্রপস্ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়- ফুলদানি, লতানো গাছ, ফুলের টব, ঘণ্টা, পেইন্টিংস, পোর্ট্রেট, পুরানো আসবাবপত্র, ছড়ি, ছাতা, টুপি, কোর্ট, ওভারকোট, উনুন, মোমবাতি, সিগারেট, ঝাড় লণ্ঠন, লাঠি, শাল, জলের বোতল, কাচের গ্লাস, বই, কলম পত্রিকা, পুরানো দলিলপত্র, পাহাড়, পর্বত- চূড়া, সূর্য এই প্রতীকগুলো ইবসেনের সবচেয়ে ক্ষমতা ও শক্তিশালী

প্রতীক। ক্যাটিলিনা, ব্রান্ড, এ্যাপপিয়ার জুলিয়ান, ও সভ্যান্ত, সোলন্সে, বর্কম্যান, এইসব নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলো সব সূর্য পর্বতারোহণ, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অজানাকে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে পাহাড়ে উঁচুতে, সূর্যকে দেখার একান্ত বাসনা থেকে ইবসেনের উল্লিখিত পুরুষ চরিত্রসমূহ ট্র্যাজিক মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

তাছাড়া ইবসেনের নাটকে মঞ্চসজ্জায় আরো যে সব বস্তু সম্ভার দেখতে পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলংকৃত পর্দা (জন গ্যাব্রিয়েল বোর্কম্যন নাটকে পর্দার মধ্যে শিকার করার ছবি, মেষপালক-পালিকাদের ছবি, বিভিন্ন রঙে অলংকৃত করা, পর্দাগুলো আবার বিবর্ণ) আরো দেখা যায়- পোড়া মাটির ছবি, মরা গাছ, বিভিন্ন ধরনের চেয়ার-টেবিল, সোফা, ডাইনিং টেবিল, উঁচু চৌকি, ইজিচেয়ার, বিভিন্ন সাইজের টুল, অভিনেতার কাঁধে বিভিন্ন অলংকৃত ব্যাগ, একটি টেবিল ল্যাম্প, ঝোলানো ঝাড়বাতি, দেয়ালে বই রাখার থাক, ভাঁজ করা দরজা, শার্শি দেয়া দরজা-জানালা, স্টোভ, পিয়ানো। এই ধরনের বহুমাত্রিক দৃশ্য সম্ভার ও প্রপস্ এর ব্যবহার তাঁর নাটকে দেখা যায়। সময়ে সময়ে এই দৃশ্য সম্ভার ও প্রপসগুলো বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। যেমন উদাহরণ হিসেবে রোসমারশোম নাটকে প্রথম অঙ্কে, আমরা দেখি রেবেকা ওয়েস্ট ইজিচেয়ারে বসে কুরুশ কাঠি দিয়ে পশমের শাল বুনছে, রং সাদা। এই শালের ব্যবহার আমরা জন গ্যাব্রিয়েল বোর্কম্যান, গোস্টস, হেডডা গ্যাবলার নাটকেও দেখতে পাই। নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তে এই শাল-এর ব্যবহার অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করে নাট্য মুহূর্তের মর্জি মেজাজের যোগ্য আবহ সৃষ্টি করে। এই আবহ দর্শকের মনে ভিন্ন অনুভূতিতে আত্মপ্রকাশ করে অভিনেতার সামর্থ্য ব্যবহারে।

শালে'র অসাধারণ প্রতীকী ব্যবহার দেখতে পাই রোসমারশোম নাটকে চতুর্থ দৃশ্যে অর্থাৎ শেষ অঙ্কে। এই দৃশ্যে রেবেকা রোসমারের বাড়ি থেকে চলে যাবার জন্য তাঁর ট্র্যাভেল ব্যাগে, কোর্ট, টুপি, তাঁর ব্যবহার্য সব জিনিস ভরছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, যে শালটা বোনা প্রায় শেষ, সেই শালটা সোফার পিটে ঝুলে আছে। সেই শালটা কিন্তু সে তাঁর ট্র্যাভেল ব্যাগে ভরলো না। ইবসেনের এক বিশারদ বললেন: শাল বোনাটা প্রায় মাকড়সার জালে মতো। যে শালটা প্রথম দৃশ্যে রেবেকা বুনছে- সেটা তাঁর প্রতীকী মৃত্যুর আভাস। মাকড়সা যেমন ধীরে ধীরে তাঁর জালকে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত করে তার বুনন শেষ করে, এখানে রেবেকা ও তার পরিণতির জাল বুনছে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকে রচনা করছেন। চূড়ান্ত মুহূর্তে রেবেকা আর রোসমারের অন্তর্দাহ ও আত্মকলহের পর তাঁদের অপরাধগুলো একে একে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। রেবেকা আদর্শের জন্য হোক বা অপরাধী বিবেক বা আত্মার অনুশোচনায় হোক যখন বুঝতে পারল রোসমারের প্রয়াত স্ত্রী বীটির আত্মহত্যার জন্য সেই দায়ী। সে দায় মোচন ও পাপমুক্ত হতে যখন রেবেকা শেষমেশ নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত, তখনই সে মাকড়সা জালটা মাথায় তুলে নিয়ে জড়িয়ে দেয়। প্রথম অঙ্কের নিছক শালটা এখানে 'প্রতীক' আকারে আত্মপ্রকাশ করে। শালটা যখন মাথাসহ তাঁর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, তখন দর্শকের মনে হয়, এই জাল থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় ইচ্ছামৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। আর কোনো পথ নেই।

আবার অ্যা ডলস হাউস নাটকে চিঠির বাক্সটা চূড়ান্ত মুহূর্তে নোরা আর টোরভাল্ড-এর প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতীক বা প্রচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ এই টুকরো টুকরো প্রপসগুলো নাট্যমুহূর্তের মর্জি মেজাজের সঙ্গে অর্থময়তা প্রকাশ করে চলে। এখানেই নাট্যকার ইবসেন প্রায়োগিক ইবসেন হয়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করেছি আপাত দৃষ্টিতে দর্শকের মনে হতে পারে

ইবসেনের দৃশ্য-সজ্জা বা দৃশ্য-সম্ভারগুলো নিছক মঞ্চের অনুষঙ্গ, কিন্তু ধীরে ধীরে এই নিছক দৃশ্যসজ্জা ও প্রপসগুলো হয়ে ওঠে এক-একটা বিষয় বা ঘটনার অন্তর্গত অনুষঙ্গ। বলা যেতে পারে, ইবসেনের এই প্রসসগুলো নাট্য ঘটনাকে আরো নাটকীয়তা করে তোলে। তাঁর প্রায় নাটকে দরজা এবং জানালার প্রত্যক্ষ বা প্রতীকী ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন 'রোসমারশোম' ও 'হেড্ডা গ্যাবলার' নাটকের মঞ্চসজ্জার কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি:

> রোসমার এর বসতঘর, বেশ বড় পুরানো, মঞ্চের পেছনে একটা উনুন, বার্চ গাছের সাদা ডালে ফুল দেখা যাচ্ছে, পেছনে একটা দরজা। পেছনের দেয়ালে হল ঘরে যাওয়ার জন্য আরো একটা ভাঁজ করা দরজা। বাঁ দিকে দেয়ালের গায়ে একটা জানালা'। 'হেড্ডা গ্যাবলার' নাটকের মঞ্চসজ্জা 'সুন্দরভাবে সাজানো বড় বসার ঘর। দেয়ালগুলো কালো রং দিয়ে চিত্রিত। পেছনের দেয়ালে বেশ চওড়া দরজা। এই দরজার ওপরে যে পর্দা ছিল সেটিকে একপাশে টেনে দেয়া হয়েছে। এরই ভেতর দিয়ে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। বাইরের ঘরের ডানদিকের দেয়ালে আরো একটি ভাঁজ করা দরজা। সেখান দিয়েও আবার হল ঘরে যাওয়া যায়। উল্টোদিকের দেয়ালের বাঁ দিকে একটা কাচের দরজা। পর্দাগুলো এমনভাবে তোলা, কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের বারান্দার কিছুটা অংশ, আর বাইরের শরৎকালের গাছগুলো দেখা যাচ্ছে।[৪]

ইবসেনের প্রায় নাটকের 'মঞ্চ-সজ্জায়' চিত্রধর্মিতা প্রাধান্য পায়। দরজা-জানালা, বারান্দা, হল ঘরের ব্যবহার এগুলো নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাট্যক্রিয়ার সাথে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। নির্দেশক বা অভিনেতার যুগলবন্দিতে এর ব্যবহার ও প্রয়োগ কৌশলের কারণে নাটক অন্তর্গত চরিত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। তাছাড়া দরজা ও জানালা দিয়ে অদেখা দৃশ্যাবলির বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকের সাথে সংযোগ সূত্রতা রক্ষা করতে ভূমিকা রাখে। যেমন বৃক্ষরাজি, পাহাড়, সূর্য, সময়-এর বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো অনেক সময় অভিনেতারা বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। আবার কোনো কোনো নাটকে দরজা-জানালা-বারান্দা দিয়ে সরাসরি বৃক্ষরাজি, পাহাড়, গাছের ফুল দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ছাড়া দরজা বা জানালা দিয়ে যদি কোনো বাইরের শব্দরাশি ভেসে আসে, অভিনেতা দরজা বা জানালার দিকে তাকিয়ে শব্দরাশির উৎসের বর্ণনা সংলাপের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। বাতাস, সমুদ্র বা নদীর স্রোতের শব্দ, দ্রুত গাড়ির আওয়াজ, জনতার হর্ষধ্বনি, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, বিচিত্র ধরনের বহু নেপথ্য শব্দরাশি নাট্যঘটনার সাথে মিলেমিশে একটা অর্থবহ 'আইরনী' তৈরি করে।

যেমন ধরা যাক 'দ্য মাস্টার বিল্ডার' নাটকের শেষ অঙ্কে নেপথ্য থেকে ভেসে আসে 'নির্মাণ বিশারদ জয় হোক, জয় হোক, নির্মাণ বিশারদের, জয় হোক, জয় হোক।' আবার 'লিটল ইয়োলফ' নাটকে যখন ইয়োলফ জলে ডুবে মারা যায়, তখন দূর থেকে মানুষের আর্তনাদ, হট্টগোল, চিৎকার ভেসে আসে। 'এনিমি অব দ্য পিপলস্' নাটকেও বিভিন্ন দৃশ্যে জনতার প্রতিবাদ, চিৎকার, হট্টগোল শোনা যায়। আবার রোসমারশোম নাটকে, নেপথ্য থেকে ভেসে আসে দলবদ্ধ সাদা ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি, যে ঘোড়ার দল দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে। নেপথ্যের শব্দগুলো দর্শকের কাছে কখনও আসে প্রত্যক্ষভাবে নতুবা প্রতীক হিসেবে। এই শব্দ রাশিগুলো এতো শক্তিশালী আকার ধারণ করে নাট্যঘটনার অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। ইবসেন বর্ণনাত্মক কৌশলের মাধ্যমে অভিনেতাদের সংলাপের মাধ্যমে দর্শকের চিত্তপটে, চিত্রটা তুলে ধরেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে

আমরা 'রোসমারশোম' নাটকের 'শেষ অঙ্কের' 'শেষ দৃশ্য' ও জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান-এর 'তৃতীয় অঙ্কের' কথা উল্লেখ করতে পারি। রোশমারশোম নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন রেবেকা ও রোশমার ইচ্ছামৃত্যু বরণ করার জন্য মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যান, ঠিক সেই সময় ফাঁকা মঞ্চে ঢুকে পড়েন পরিচারিকা হেলসেথ। শূন্য ঘরে খুঁজে না পেয়ে বাগান, হল ঘর, শোবার ঘর, সব তন্ন-তন্ন করেও যখন তাঁদের সন্ধান পেলেন না, সেই সময় নেপথ্য থেকে ভেসে আসে দ্রুতগামী ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ক্ষুরের শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন হেলসেথ। কারণ নরওয়েবাসীদের বিশ্বাস বা সংস্কার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেলে দেশে অমঙ্গল অবধারিত। হেলসেথের আতঙ্কিত মন আরো আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে, গেল কোথায় ওরা দু'জন? হঠাৎ কী ভেবে হেলসেথ দৌড়ে জানালার কাছে যায়। জানালার দিকে তাকিয়ে হেলসেথ ক্রমশ কাঁপতে থাকে। আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে-হেলসেথের নিরবতা, ভয়ার্ত মুখমণ্ডল, গোঙানির শব্দ শুনে হেলসেথের মত দর্শকও উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। হেলসেথের বর্ণনা থেকে দর্শক জানতে পারেন:

> হেলসেথ : হায় ঈশ্বর। ওই একটা সাদা জিনিস ওখানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ...! হ্যাঁ...। তাঁরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। [চিৎকার করে ওঠেন হেলসেথ] হায়! হায়! পোলের ওপর দু'জন। মিলরেশের ওপর থেকে [মিলরেশ একটি নদীর নাম] ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কে আছ! কে আছ! রক্ষা কর... রক্ষা কর। [তার হাঁটু দুটি কাঁপতে লাগল] কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে কোনো রকমের নিজের দেহটাকে সে পতনের হাত থেকে বাঁচাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল] না না। কেউ সাহায্য করার নেই। মৃতা গৃহস্বামিনী, তাদের লুফে নিয়েছেন।[৫]

রেবেকা আর রোসমার মৃত্যুবরণ করার জন্য বেরিয়ে যান। তাতে দর্শকের মনে তাঁদের মৃত্যুবরণের দৃশ্যটা এক ধরনের শ্বাসরোধকারী গাঢ় অনুভূতি তৈরি হয়। তাঁদের মৃত্যুবরণ করার ছবিটা, শেষ পরিণতির জন্য দর্শক অপেক্ষা করেন। কীভাবে তাঁরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দেবেন? তাঁরা কি রোসমারের প্রয়াত স্ত্রী বিটির মতো মিলরেশের নদীর ওপর সাঁকো থেকে ঝাঁপ দেবেন? এই ধরনের উৎকণ্ঠা নিয়ে দর্শক তাদের শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষমাণ। সেই পরিণতির ছবিটা নাট্যকার ইবসেন মিসেস হেলসেথের 'বর্ণনার' মাধ্যমে দর্শককে জানিয়ে দিয়ে ঘটনার সংযোগসূত্রতা রক্ষা করেন। রোসমারশোম নাটকের শেষ দৃশ্যটা এখানেই তুলে ধরেছি। আবার জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান-এ 'তৃতীয় অঙ্কে' আমরা দেখি, মিস্ এলা বর্কম্যানের ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে বর্কম্যান স্বেচ্ছায় নির্জনবাসের জন্য তিরস্কৃতও হলেন, সাথে সাথে বর্কম্যানের পুত্র এরহার্টের ভার নিতে চাইলেন, দাবি করে বসলেন এরহার্ট মিস্ এলার পদবি গ্রহণ করবে। যদিও বর্কম্যানের এই পদবির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ বা আপত্তি না থাকলেও বর্কম্যানে স্ত্রী গানহিল্ড (মিস্ এলা এবং গানহিল্ড যমজ বোন) সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এই নিয়ে দু'বোনের তুমুল ঝগড়া। ঠিক এই চূড়ান্ত মুহূর্তে বর্কম্যানের পুত্র এরহার্ট এসে বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, আমার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এক মহিলাকে আমি বিয়ে করব। এই কথা শুনে মিসেস গানহিল্ড আর্তনাদ করে বলে উঠলেন- 'আমি পুত্রহীনা হলাম'। নাট্যঘটনার চূড়ান্ত মুহূর্তে ইবসেন প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করলেন 'প্রকৃতির ঝড়ো হওয়া' এবং 'ঘণ্টার ধ্বনি'। এই দু'র ব্যবহার সন্তানহারা পিতামাতার অন্তরীণ দুঃখ, যন্ত্রণা ও একাকিত্ব চমৎকার উপমায় ফুটে ওঠে দর্শকদের কাছে। 'জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান' নাটকের কিছু নির্বাচিত সংলাপ তুলে ধরছি। যেখানে

সংলাপ, আবহ, প্রপস্ মিলে এক অনবদ্য গাঢ় বেদনার সৃষ্টি করে, তেমনি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে অনবদ্য দৃশ্যকাব্য যা দর্শকের অন্তর ছুঁয়ে যায়:

বর্কম্যান : (মনে হলো, নিজের সংকল্পে তিনি জেগে উঠেছেন) তাহলে এই ঝড়ের মধ্যে আমাকে একাই যেতে হবে। আমার টুপি, আমার ওভার কোর্ট।

এলা : [ভয় পেয়ে, তাকে থামিয়ে] কোথায় যাচ্ছ?

বর্কম্যান : বাইরে। জীবন ঝঞ্ঝার মধ্যে। এলা আমাকে বাধা দিও না, যেতে দাও।

এলা : [বাধা দিয়ে] না-না! আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি অসুস্থ, তোমার চোখ-মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারছি।

বর্কম্যান : ছেড়ে দাও; বলছি ছেড়ে দাও।

[জোর করে ছাড়িয়ে, হল ঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়]

এলা : [দরজার কাছে গিয়ে] গানহিল্ড। এস, ওকে ধরি, এস।

[এই বলে এলা নিথর-নিস্তব্ধ-তারপর বলে ওঠেন-]

মিসেস বর্কম্যান : [নিরুত্তাপ কণ্ঠে তীব্রভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।] বিশ্বে কাউকে ধরার জন্য আমি কোনো চেষ্টা করব না। ওরা আমার কাছ থেকে চলে যাক, ছেলে আর বাবা। যতদূর তাদের খুশি। [নিস্তব্ধ নিথর এক পাথর প্রতিমা যেন-হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে আর্তচিৎকার করে বলে ওঠেন] এরহার্ট আমাকে ছেড়ে যাসনে। [এরপর দুটো হাত প্রসারিত করে তিনি দরজার দিকে ছুটে যান এলা বাধা দেন তাকে।][৬]

ইবসেনের নাট্যরচনায় ঋতু, সময়, স্থান এই ত্রিবিধ বিষয়গুলো ছাড়াও আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সমুদ্র। তাঁর নাটকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন 'রোসমারশোম' নাটকে শেষ দৃশ্যে পোলের উপর থেকে রোসমার আর মিসেস রেবেকা ওয়েস্ট মিল-রেশের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা, লিটল ইয়োলফ নাটকে ইয়োলফের মৃত্যু সমুদ্রে ডুবে। আবার 'লেডি ফরস দ্য সি' নাটকের কাহিনি গড়ে ওঠে সমুদ্র তীরবর্তীকে ঘিরে। ইবসেন সারা জীবন নৈসর্গিক, প্রকৃতি সমুদ্রের আকর্ষণ অনুভব করেছেন। সময়ে সময়ে নৈসর্গিক পরিবেশ, প্রকৃতি, সমুদ্র চরিত্র ও ঘটনার অংশীদার হয়ে ওঠে।

> ইবসেন সারা জীবন সমুদ্রের আকর্ষণ অনুভব করছেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মিউনিখে পউলসেনকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি কোন দিন নরওয়েতে ফেরেন তবে একটি ছোট সমুদ্র উপকূলীয় শহরে থাকবেন যেখানে ফিয়র্ডে অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ দেখা যাবে, যেখানে পাওয়া যাবে সামুদ্রিক শৈবালের গন্ধ। (মেয়ার পৃ: ৪৭৫) ফ্রেডরিকস হাভেন যখন ছিলেন তখন শিপইয়ার্ডে চলে যেতেন খালাসীদের সাথে গল্প করতেন এবং বাকি সময়টা কেটে যেত সমুদ্রের ধারে সমুদ্র-অধ্যাসনে। মোল্ডেতে ছিলেন দু'বছর আগে, তখনো ইবসেনকে দেখা গেছে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সমুদ্র যেন সম্মোহিত করে ফেলতো তাকে। ১৮৮৫র ২৫ এপ্রিল মিউনিখ থেকে হেগেলকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন যার উল্লেখ আগেই করেছি, তাতে লিখেছিলেন : 'এখানে একটা জিনিসের অভাব থেকেই যায়, সে হল সমুদ্র, এবং সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা। এই অভাববোধটা প্রত্যেক বছরই বাড়ছে।' এই একই আকুতি প্রকাশ পেয়েছে হেগেলকে লেখা দু'বছরের পরের চিঠিতে। ১৮৮৭-র ১২ জুন লিখলেন 'Both my wife and I look

forward immensely to seeing the sea again.' সুইডেন থেকে ফেরার পথে ডেনমার্কে হেগেল ৫ অক্টোবর যে ডিনার দিয়েছিলেন তাতে সংবর্ধনার উত্তরে ইবসেন বলেছিলেন যে, ডেনমার্কে এবার তিনি সমুদ্র সান্নিধ্যে খুব আনন্দ পেয়েছেন। বস্তুত তিনি সমুদ্রকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। 'ডেনমার্ক সৈকতে সমুদ্র খুব শান্ত বন্ধুর মতো, সমুদ্রের খুব কাছে যাওয়া যায়, পাথুরের খাড়া পাড় সমুদ্রকে প্রতিহত করে নি। সমুদ্র তাকে দিয়েছে শান্তি ও বিশ্রাম।' (চিঠিপত্র, পৃ. ২৬৮) এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী লেখাকেও প্রভাহিত করবে।[৭]

অভিনেতা ও নাট্যক্রিয়ার ঘটনার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে নাটক যত চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছে, ততই এগুলো বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে নাট্যঘটনাকে বাস্তব থেকে বাস্তবোত্তরে উদ্ভাসিত করে তোলে। নাট্যমুহূর্তে চূড়ান্ত মুহূর্তে যদি 'প্রতীকী' ব্যবহার থাকে সেই পরিণতি (বিশেষ করে ট্র্যাজিক চরিত্রের বেলায়) ইবসেন সরাসরি দেখান না। পরিণতির মেজাজটা দর্শককে কল্পনা করার সুযোগ করে দেন। মঞ্চের বাইরে অন্তরালের ঘটনাগুলো ইবসেন বর্ণনাত্মক সংলাপের মাধ্যমে নাট্যঘটনার সংযোগসূত্রতা রক্ষা করে চলেন। এই কৌশলের কারণে দর্শক অবাধ স্বাধীনতায় নিজেই চিত্তপটে একটা চিত্র তৈরি করে নেয়ার সুযোগ ঘটে। ইবসেনের এই প্রয়োগ কৌশল বা তাঁর অভিপ্রায়গুলোকে সঠিক মাত্রায় পৌঁছাতে নির্দেশকের বোধ ও বুদ্ধিকে সর্বদা সতর্ক পাহাড়ায় রাখতে হয়।

ইবসেন সমাজ ও জীবনকে যেভাবে দার্শনিক ভঙ্গিতে গড়ে তুলেছেন তাতে ক্রম বিবর্তনশীল ও সমকালও এড়িয়ে যেতে পারে না। ইবসেনের চিত্রধর্মিতা অভিনেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে যেমন জড়িত, তেমনি অভিনয়, সেট, আলো এবং প্রপস্-এর 'চতুষ্টয়'-এর সঠিক সমন্বয় অবশ্যম্ভাবী। যেকোনো শিল্পের বেলায় সবকিছুর সঠিক সমন্বয় বা কোনো শিল্প মাধ্যমকে সর্বায়ত করে তোলে। ইবসেনের 'মঞ্চসজ্জা' ও 'প্রপস্'-এর ভাবনার ভেতরে একের মধ্যে বহু সম্ভাবনা উঁকি মারে। ইবসেনের ভাবনাগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে মঞ্চসজ্জা বা প্রপসগুলো হয়ে পড়বে নিছক আসবাবপত্র বা শৌখিন মুজদারি। তাই ইবসেনের প্রয়োগ ভাবনাগুলো নির্দেশককে নাট্যঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অভিনেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যখন পরিবর্তিত হয়ে নাট্যঘটনার চূড়ান্তের দিকে ধাবিত হয়, তখন অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে এগুলোর সম্পর্ক-সূত্র খুঁজে বের করে স্পষ্ট করে তুলতে না পারলে ইবসেনের সামগ্রিক নাট্যভাবনা পূর্ণতা অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তখন দর্শকের মনে হতে পারে ইবসেনের নির্দেশিত 'মঞ্চসজ্জা' বা বিভিন্ন রকমের 'প্রপস্'-এর ব্যবহার সজ্জিত বা শৌখিন মুজদারি। ইবসেনের 'মঞ্চসজ্জা' ও 'প্রপস্'-এর সঠিক সমন্বিত ব্যবহারে চরিত্র, ঘটনার সাথে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একটা প্রগাঢ় অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। বলা যেতে পারে : Has a moredirect effect in contribution to the atmosphere. তাই প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষণকে নির্দেশক বা অভিনেতা শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে-দৃশ্যান্তরে প্রতিটি স্তর বা ক্রমিকতা ব্যর্থ হয়ে নাট্যকারের নাট্যঘটনা ও নির্দেশনা উভয়ে বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। কারণ ইবসেনের মঞ্চসজ্জা, প্রপস্, ঋতু, সময়, স্থান এমনকি নেপথ্যের শব্দ সবকিছুর সমন্বয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যন্তরের বিচিত্রতায় যে নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়, এগুলো কখনও 'প্রতীকতায়' বা কখনও 'প্রত্যক্ষতা'র ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে। তাই ইবসেনের প্রয়োগ ভাবনায় নির্দেশককে নিখুঁতভাবে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে প্রয়োগস্তরে সামর্থতার সঙ্গে মঞ্চে আনতে না পারলে,

ইবসেনের নাটকের চরিত্রের বহুমাত্রিক প্রকাশময়তা বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইবসেনের নাটক সামগ্রিকভাবে ঐক্য ও সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে চিত্রিত করে তুলতে হয়।

উপসংহার: সমকালে কোন নির্দেশক ইবসেনের মঞ্চ নির্দেশগুলো সমকালীন ভাবনায় বা প্রেক্ষাপটে রূপান্তর করে মঞ্চায়িত করলে ইবসেনের নাটকের রূপ-রস ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। তাঁর নাটকের যে দার্শনিক ভঙ্গি আছে তা ক্ষুণ্ন হওয়ার নয়। কেননা ইবসেন বিশ্বে মহানতম নাট্যকারদের একজন। তবে এটা স্মরণে রাখা দরকার- ইবসেনের নাটকের বিষয়-আঙ্গিক-দর্শন বা তাঁর অভিপ্রায়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে সামর্থ্যবান প্রকাশক্ষম করে তুলতে পারলেই সমকালেও ইবসেনের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে যাবে নাটক। এখানেই নাট্যকার ইবসেন সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত; ইবসেন বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক, (নাট্যচিন্তা, হেনরিক ইবসেন, সম্পাদক. রথীন চক্রবর্তী), পৃ. ২৮
২. বসু, ডক্টর অমলেন্দু; ভূমিকা, ইবসেন প্রসঙ্গ, ইবসেন নাট্য- সম্ভর (চুতুর্থ খন্ড), পৃ.১২
৩. উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪
৪. ঘোষ, সুনীলকুমার; রোসমারশোলম, ইবসেন নাট্যসম্ভার (দ্বিতীয় খন্ড), জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৯১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৪
৬. ঘোষ, সুনীলকুমার; জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান, ইবসেন নাট্যসম্ভার (তৃতীয় খন্ড), অক্টোবর ১৯৮২
৭. আনোয়ার, আলী; দি লেডি ফ্রম দি সী, ইবসেন, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার, পৃ. ৫০৩।

বাংলা ছোটগল্পে অবহেলিত চরিত্রের অবস্থান

ননীগোপাল মালো
সহকারী অধ্যাপক, হাজী এ কে খান কলেজ
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: টালত্ মোর ঘর নাহি পড়বেষি'-ব্রাত্যজনের কণ্ঠে অবহেলিত মানুষ এইভাবে আখ্যাত হয়েছিল প্রথম বাংলা সাহিত্যে। নগর নয় শুধু, এই উপেক্ষিত গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষজন আবহমান কাল ধরে থেকে গেছে উচ্চকিত শিক্ষিত মননের বাইরে। দৈবীপ্রভাব কখনও স্বভাবভীরু লোকসাধারণের জীবনকথাকে ম্লান করেছে; কখনও বা যুগনায়ক আচ্ছন্ন করেছেন সমসাময়িক কথকতাকে। প্রয়োজনতাড়িত গদ্যের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে বদল শুরু হলেও উনিশশতকে সাধারণ মানুষ প্রায়শই থেকে গেছে উপেক্ষার অন্তরালে। বিশেষতঃ বাংলা কথাসাহিত্যে অহরহ যে প্রধান চরিত্রদের আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁরা হয় অতিমানবীয় স্বভাবগুণে উজ্জ্বল, বিপর্যয়ের অতলখাতে দাঁড়ানো মানুষ, নয়ত আদর্শের গুরুঠাকুর। সাধারণ, অতিসাধারণ মানুষেরা হয় লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, নতুবা চরিত্ররূপে তাঁদের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারেননি উনিশ শতকের লেখকেরা। বিশ শতকের, বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই চালচিত্রের ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অবহেলিত ও উপেক্ষিত চরিত্ররা ক্রমশ লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে।
সূচক শব্দ: ছোটোগল্প, অবহেলিত চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ, বিশ শতক, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মূল প্রবন্ধ:

বিশশতকের বাংলা কথাসাহিত্যে সাধারণ মানুষের এই উল্লেখযোগ্য উত্তরণের সূচনা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে, ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র রচনায়। মূলতঃ তাঁদের সচেতন প্রয়াশেই তুচ্ছ সাধারণ মানুষের বহুকোণিক সম্ভবনাময় উপস্থিতি বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয়ান্তর ঘটিয়েছে। বিশশতকের সাহিত্যে সাধারণ মানুষ ও বিষয় প্রাধান্য পেল মূলতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে। বদলে যাওয় গল্পে আশ্চর্যভাবে সংক্রামিত হল অর্থনৈতিক মন্দা, ক্ষুধা, দারিদ্র, কালোবাজারী, শঠতা, নষ্ট দাম্পত্য, যৌনতা। বিপন্ন অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিনের চরিত্রমিথের ইউটোপিয়া গর্ত থেকে সরীসৃপ হয়ে বেরিয়ে এল বাংলা ছোটগল্পের চরিত্ররা। অবশ্য তাঁদের প্রতিষ্ঠার পিছনে সক্রিয় থেকেছে রাশিয়ার অপ্রতিহত বলশেভিকদের কৃতিত্বের দুর্বার আকর্ষণ।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পরে সারা পৃথিবী শোষিত, বঞ্চিত-নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষ বুঝতে শিখল যে, মানব সভ্যতার কারিগর তারাই। সভ্যতার পরিচালিকা শক্তি হিসেবে তারাই মূল স্তম্ভ, এই ভাবনা বাস্তবায়িত হল রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা অবলুপ্তির পর সভ্যতার ক্রমঅগ্রগতিতে ক্রমশঃ প্রকট হয়েছে দুটি শ্রেণী। শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব সংঘাতে গড়ে উঠেছে শ্রেণীসংগ্রাম মুখর সমাজ। শোষিতের উপর নির্ভর করে শোষকরা শাসন ব্যবস্থা এবং সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরী করেছে। অথচ যাদের শ্রমে এই সভ্যতার

বুনিয়াদ, তারাই এই সভ্যতার নীচের দিকে অবস্থান করছে। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে এই শোষিত প্রান্তিক মানুষেরাই উঠে এলেন গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় রূপে।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব সারা পৃথিবীর বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শুধু সাহায্যই করেনি তার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর লেখক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেণীচেতনার জাগরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে। সারা পৃথিবীর শিল্পী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে আমাদের দেশের শিল্পী বুদ্ধিজীবীও রয়েছেন। এই শ্রেণীচেতনার প্রভাব শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই শ্রেণীচেতনা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই দুটি শ্রেণীতে আমরা কথাশিল্পীদের বিভক্ত করতে পারি।

(ক) অসংগঠিত শ্রেণী চেতনার প্রভাব

(খ) সংগঠিত শ্রেণী চেতনার প্রভাব

বাস্তবের কঠিন রূপকে কেউ কেউ ছোটগল্পে কল্পনাশ্রিত পর্যায়ে পরিবেশন করেছেন। কেউবা ছোটগল্পের মধ্যে কঠিন বাস্তব নির্মম চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে খোলস ভেঙে স্ব-প্রকাশ ঘটেছে নিতান্ত সাধারণ প্রায় অবহেলিত মানুষজনের। তবে যেহেতু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তুল্যমূল্য বিচারের পর আত্মপ্রকাশের দৈবী সুযোগ মেলে চরিত্রদের, তাই তাঁদের অনেকের উপরেই নেমে আসে লেখকের খড়্গ। কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথা বলারও অধিকার নেই শৈলী সচেতন লেখকের। পাঠকের মনে অতৃপ্তি থেকে যায় বলে, লেখক ও গল্পের বিরুদ্ধে চরিত্রের প্রতি অবহেলার অভিযোগ ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে এই অবহেলিত চরিত্ররাই আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষিত নারীদের কথা বলেছিলেন তাঁর ছোটগল্পে। নিরুপমা, কাদম্বিনী, মৃণালিনী, শোষিত নারীর আত্মকথা নিবেদন করেছে বাঙালি পাঠকের কাছে। রবীন্দ্রনাথের পর গ্রাম বাংলার শোষিত ও অবহেলিত মানুষের কথা উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের গল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটিতে অবহেলিত চরিত্র হিসেবে গফুর, আমিনা কাঙালীর মা, কাঙালী, অবহেলিত চরিত্র রূপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্প দুটিতে কঠিন সমাজ বাস্তবতার চিত্র প্রকটিত। শ্রেণী শোষণে বিপর্যস্ত ও অবহেলিত এই নিম্নবর্গের মানুষের কঠিন নির্মম বাস্তবতাকে লেখক তুলে ধরেছেন গল্পগুলিতে। নারীর পাশাপাশি রাতা পুরুষ চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ, মানিক, প্রেমেন্দ্র, সুবোধ, নরেন্দ্রনাথ চরিত্রের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বাংলা ছোট গল্পে। বলিষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রদের পাশে প্রায় অলক্ষো কুণ্ঠিত চিত্তে অথচ সদর্পে আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ অবহেলিত মানুষের। কেরানী, ঘুষখোর, চাকরশ্রেণী, বারাঙ্গনা, চোর, লম্পট, খুনী, ধর্ষক, বেকার, বেদেনী, লোকসমাজের প্রান্তে অবস্থিত প্রায় অকিঞ্চিৎকর মানুষজনেরা উঠে এসেছে গল্পের কেন্দ্রে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই অবহেলিত চরিত্র।

ইতিপূর্বে সাহিত্যে এই অবহেলিত চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও তা ছিল শ্রেণীচেতনাহীন লোকদের রচনার ফসল। কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর শ্রেণীচেতনায় প্রভাবিত হয়ে একাধিক লেখক অবহেলিত চরিত্রকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। আবার কোথাও কোথাও অবচেতন মনে অবহেলিত চরিত্রকে অবহেলা করা হয়েছে। মুখ্য বিষয় হিসেবে সাহিত্যে তুলে ধরা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরতেও আমরা দেখি না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অনেক লেখকের মধ্যে এই অবহেলিত চরিত্রকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আমরা নির্বাচিত কয়েকজন ছোটগল্পকারের ছোটগল্পের অবহেলিত চরিত্রের, অবস্থান এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রামবাংলার মানুষজন, তাঁদের স্বপ্নভঙ্গের, সামাজিক বিপর্যয়ের, ভালোবাসা এবং ভালোবাসার বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর ছোটগল্পে অবহেলিত ও অনাদৃত চরিত্রদের তুলে এনেছেন। চরিত্রদের প্রতি তিনি অবহেলা করেননি, বরং পরম মমতায় তিনি তুলে ধরেছেন সেই সামাজিক ব্রাত্যজীবনের কথকতাকে। দরিদ্র কৃষক মানেই হিন্দু কৃষক, এই মিথ শরৎচন্দ্র ভেঙে দিয়েছেন। হিন্দু লেখকদের লেখায় অভিজাত মুসলিম সমাজ উঠে এলেও শরৎচন্দ্র প্রথম অবহেলিত দরিদ্র মুসলিম কৃষকেরা জীবনযন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলা গল্পে। 'মহেশ' গল্পে এই অবহেলিত মুসলিম শ্রেণীচরিত্ররূপে উঠে এসেছে গফুর মিঞা। গফুরের জীবনের জীবন যন্ত্রণা সেদিনের সাহিত্যে শুধু অভিনব নয়, তা বাঙালীর কাছে অবহেলিতও ছিল বটে। অবিভক্ত বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ নিম্নবর্গীয় মুসলিম জনসাধারণের প্রতি সেদিনের এলিট সিভিল সোসাইটি ছিল উন্নাসিক। গফুরের আবির্ভাব তাদের সুখ তন্দ্রা ভেঙে দিয়েছে। পোষ্য মহেশ ষাঁড়টির সঙ্গে গফুরের যেন কোন পার্থক্য নেই সমাজপতিদের কাছে। লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত গফুর নিম্নবর্গের একক মানুষ বলেই তাঁর উপরে এই অবহেলা ও শোষণের উৎপীড়ন চলতে থাকে। আসলে শরৎচন্দ্র জানেন সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত এই মানুষেরাই গ্রামবাংলার প্রকৃত মুখ। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিতেও গ্রামীণ সমাজে জাতপাতকেন্দ্রিক অবহেলার নিদর্শন মেলে। কাঙালীর মা এবং ঠাকুর গিন্নীর সৎকার গাথার মধ্যদিয়ে শরৎচন্দ্র সেই অবহেলিত মানুষদের কথাই নিবেদন করেছেন। কাঙালী, তার বাবা রসিকবাগ্-এরা সবাই শোষিত ও অবহেলিত। মায়ের মৃতদেহ দাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে আসলে শরৎচন্দ্র প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকেই জ্বলন্ত চিতার উপরেই দাঁড় করিয়েছেন। তিনি জানেন পরিবর্তন আসন্ন, অবহেলিত মানুষ সংগঠিত হবে, প্রতিবাদ করবে নিজেদের মতো করেই। এ কারণে 'মহেশ' গল্পের শেষে গফুর মিঞা তাঁর শোষণযন্ত্র গ্রামকে উপেক্ষা করে শহরের পথে পা বাড়ায়। শ্রমিকের সংগঠিত জীবন ও সংগ্রামই যে এই অবহেলিত মানুষদের একদিন মুক্তি দেবে, তারই সন্ধান পাওয়া যায় এই গল্পে।

২. জগদীশ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে বিষয়ান্তর ঘটেছে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপলব্ধি করেছেন- "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে, কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।" জগদীশ গুপ্ত গল্প লিখতে এলেন এই সাধারণ মানুষদের নিয়ে। শরৎচন্দ্রের বাস্তবতার প্রবল প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গেছে জগদীশ গুপ্তের গল্পে। 'পয়োমুখম্', 'হাড়, 'দিবসের শেষে', 'কলঙ্কিত সম্পর্ক', 'শঙ্কিতা অভয়া' প্রভৃতি গল্পে যে চরিত্রদের আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাদের অনেকেই অবহেলার পাত্র। 'পয়োমুখম্' গল্পে কবিরাজবৃত্তির একজন মানুষ উঠে এলেন গল্পের প্রধান চরিত্র হিসেবে। ধুরন্ধর কৃষ্ণকান্ত শুধুমাত্র যে হিসেবি তাই নয়, তাঁর কাছে উনিশ শতকীয় প্রীতি, প্রেম ইত্যাদি মানবিক সম্পর্ক অর্থহীন। কৃষ্ণকান্তের কাছে পুত্র উপেক্ষার পাত্র। শুধু তাই নয় কোন সম্পর্কই তাঁর কাছে প্রধান নয়; নিজের স্ত্রী ও পুত্রবধূর মৃত্যু সে কথা প্রমাণ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে এই বিশশতকীয় চারিত্রিক অবমূল্যায়ণের রূপকার জগদীশ গুপ্ত। 'হাড়' গল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবদমিত রূপ ফুটে উঠেছে। গ্রাম সমাজে বৃদ্ধা নারীদের অনেক সময় ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক ঘরে করে রাখা হয়।

অবহেলার সঙ্গে সেক্ষেত্রে প্রবল ঘৃণাও থাকে তাদের প্রতি। এখানে রসির প্রতিও সেই অবহেলা, ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিরল প্রতিভার অধিকারী প্রেমেন্দ্র মিত্র বঞ্চিত, উপেক্ষিত মানুষদের নিয়েই তাঁর অধিকাংশ গল্প নির্মাণ করেছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষের জীবন বৃত্তান্তে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেছেন। তাঁর গল্পে কেরানী, চোর, গণিকা, মধ্যবিত্ত, বিপর্যস্ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে লেখক চরিত্রের সন্ধানে পৌঁছে গেছেন অবহেলিত ও উপেক্ষিত মানুষের অন্তঃপুরে। যামিনী, নিরঞ্জন হারিয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতিনিধি। বিপর্যয়ের অতল গহ্বর থেকে যতই লেখক মনে মনে উদ্ধারের সংকল্প করুক না কেন, যামিনীর মত উপেক্ষিত চরিত্ররা থেকে যায় অনাদর ও অবহেলার নিকষ কালো অন্ধকারে। 'পাশাপাশি' গল্পে শুধু উপেক্ষিত চরিত্র নয়, অবহেলিত পরিবারই যেন চরিত্র হয়ে উঠেছে। সমাজের শ্রেণীচরিত্র হিসাবে বিধুভূষণ, কাননবালা প্রভৃতি চরিত্র উঠে এসেছে। লেখক সমকালীন অর্থনৈতিক মন্দাকে গল্পে মূর্ত করেছেন-'ছোট একটি বাড়ির মধ্যে শুধু দারিদ্রের প্রয়োজনে দুইটি পরিবার এমনি করিয়া জোড়াতালি দিয়া বাস করে। গরমিল যথেষ্ট আছে কিন্তু মিলও একেবারে নাই বলা যায় না।' সমকালীন বারোয়ারি উপন্যাসগুলিতে এই যূথবদ্ধ পরিবার জীবনের মানুষদেরই সন্ধান মেলে। 'মোট বারো' গল্পে মানুষ ও পশু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সর্বহারা মানুষদের জীবনযন্ত্রণার পথিক বঞ্চিত অবহেলিত ঘমণ্ডী। শোন নদীর বন্যায় সর্বহারা ঘমন্ডী বেঁচে থাকে ঘোড়া, ছাগল, বেওয়ারিশ 'লেডি কুত্তার' সঙ্গে। ঘমন্ডী শুধু নয়, এই পশুরাও যে সামাজিক দিক থেকে ব্রাত্য সে কথা লেখক উল্লেখ করতে ভোলেন না। অবশ্য প্রান্তিক মানুষের বিনোদনের মতোই তাদের জৈবিক প্রবৃত্তি যে উচ্চবর্গের মানুষের কাছে অবহেলার বিষয়, প্রেমেন্দ্রের লেখায় তা ফুটে ওঠে। সমাজের প্রতি তীর শ্লেষের পাশাপাশি লেখক আত্মমূল্যায়ণ করেছেন। 'হয়তো' এবং 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে লেখকও যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতোই স্মৃতি-দৌর্বল্যে ভুগে গতানুগতিক গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাবেন, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণ করাতে চেয়েছেন, এই গতানুগতিকতার বশবর্তী হয়েও অধিকাংশ লেখক চরিত্র ও বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা ছুঁড়ে দেন।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করলেও লেখকজীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি আস্থা রেখেছিলেন মার্কসের ব্যাখ্যাত সাধারণ মানুষের উপর। জীবনের পঙ্কিল-কর্দম অন্ধকারে নেমে তিনি সযত্নে তুলে এসেছেন ব্রাত্য অথচ বিচিত্র মানুষদের। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'হারাণের নাতজামাই', 'অসহযোগ' গল্পগুলিতে সেই অনাদৃত মানুষদের রোমহর্ষক জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের একদা দুর্ধষ ডাকাতের যে রূপান্তর, সেখানেও ব্রাত্য জীবনের ছোঁয়া। 'হারাণের নাতজামাই' গল্পে গ্রামের অতিসাধারণ গৃহবধূও অসাধারণ হয়ে উঠেছে তার উপস্থিত বুদ্ধিতে। অবহেলিত ও ব্রাত্য মানুষ যে শেষ পর্যন্ত ব্রাত্য থাকে না, বাংলা ছোটগল্পে বারবার সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ় বাংলার অবহেলিত উপেক্ষিত মানুষ তাদের বিচিত্র জীবনঅভিজ্ঞতা নিয়ে তারাশঙ্করের ছোটগল্প। 'রসকলি', 'তারিনীমাঝি', 'ডাইনী', গল্পে ব্রাত্য ও অবহেলিত মানুষেরই গল্প। প্রান্তিক বৈষ্ণব, মাঝি, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, কাহার, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উপেক্ষিত চরিত্র তারাশঙ্করের মরমী লেখায় বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

৬. বনফুল

বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বনফুল ছদ্মনামধারী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অগ্রপথিক। শুধুমাত্র গল্পের স্বল্পায়াতনের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর বিচিত্র বিষয় ও চরিত্রের কারণেও বনফুল স্মরণীয়। নিমগাছ, তাজমহল, ক্যানভাসার, বুধী, ছোটলোক ইত্যাদি গল্পে অবহেলিত, অনাদৃত চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সংসারের জাঁতাকলে নিষ্পেশিত গৃহবধূ, ভিখারী দম্পতি, হকার, রিক্সা চালক প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় বিত্তধারী মানুষজনের বিচিত্র জীবন কাহিনী ফুটে উঠেছে বনফুলের ছোটগল্পে। 'নিমগাছ' গল্পটি অসাধারণ এই জন্য যে গল্পে একটি নিম গাছের বর্ণনা করা হলেও, সেখানে উপেক্ষিত গৃহবধূদের জীবন চিত্র ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই গল্পে তথাকথিত কোনো চরিত্র নেই অথচ সামগ্রিকভাবে অবহেলিত নারী সমাজকেই লেখক অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে এটি বিরট ব্যতিক্রম। ভিক্ষাজীবীদের নিয়ে অনেক বাংলা ছোটগল্প লেখা হয়েছে। অবহেলা ও বিরক্তির উদ্রেককারী এই ভিখারীরা যে মানুষ, তাদের প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা যে অনাবিল মাধুর্যমণ্ডিত হতে পারে 'তাজমহল' গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আগ্রার তাজমহলের পিছনে পঙ্গু অথর্ব স্ত্রীর জন্য বৃদ্ধ ভিখারী ইঁটের তাজমহল তৈরী কয়েছে। বিত্ত ও বৈভব না থাকলেও শুদ্ধ আন্তরিকতা দিয়েও যে প্রেমের তাজমহল তৈরী করা যায়, এই ব্রাত্যপ্রান্তিক মানুষটি তার অনন্য নিদর্শন। অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষ মানেই যে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্র তা নয়, আত্মগর্বী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের তাদের উদ্দেশে অযাচিত করুণা বর্ষণ করে। 'ছোটলোক' গল্পে এই করুণা ও উপেক্ষার বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আত্মমর্যাদায় বলীয়ান ছোটলোক রিক্সাওয়ালা তাই অস্বীকার করতে পারেন দয়ার দান। এই নতুন প্রতীতি, এই আত্মমর্যাদাবোধ নতুন যুগের অবহেলিত মানুষের একমাত্র পাথেয়, বনফুলের লেখায় তারই সোচ্চার প্রকাশ ঘটেছে।

৭. সুবোধ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। 'অযান্ত্রিক' গল্পের বিমল এবং তাঁর জগদ্দল (গাড়ি) দুজনেই সকলের কাছে চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞাপাত্র অথচ যন্ত্র ও মানুষের এই অনাবিল সখ্যতা লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না। মানুষ ও গাড়ির প্রায় সমার্থক যে জীবন, তারাই সূত্রে বাংলার পাঠক নতুন স্বাদের গল্প উপহার পেল বাংলা সাহিত্যে। সুবোধ ঘোষের জীবন অভিজ্ঞতা বিচিত্র। কোলিয়ারি থেকে পুলিশ থানা, আদিবাসি বস্তি থেকে প্রস্তরময় মন্দিরে তাঁর অনায়াস যাতায়াত। ফলে তাঁর গল্পে বিচিত্র চরিত্রের স্রোত লক্ষ্য করা যায়। 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে প্রান্তিক আদিবাসী সমাজের এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। উপেক্ষিত স্টিফেন হেরো খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। লক্ষণীয় যে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের বিপ্লব ও বিদ্রোহ মেকি হলেও প্রান্তিক মানুষের বিদ্রোহ কিন্তু অকপট। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' গল্পেও নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষই প্রধান হয়েছে।

৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত জীবনের গলিঘুঁজিতে নেমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপেক্ষিত অবহেলিত মানুষদের তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী টালমাটাল বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজ এক অদ্ভুত আত্মিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ফ্যাসিস্ট রায়বাহাদুর তাই বাঘ শিকারে অনায়াসে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেন আদিবাসী শিশুদের, মাস্টারমশায়ের ভাঙ্গা চশমা সমকালীন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বিপন্ন শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'দুঃশাসন' এবং 'হাড়' গল্পে শ্রেণী শোষণে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের কথা পাঠককে সচেতন করে।

৯. সমরেশ বসু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নবীন লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। শুধুমাত্র বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য নয়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক মননের জন্য তিনি স্মরণীয়। চটকলের কুলিবস্তির শ্রমিক, নিষিদ্ধপল্লীর বারবনিতা, অসুস্থ দলীয় রাজনীতির বলি শহীদের মা তাঁর গল্পে অনায়াসে জায়গা করে নেয়। 'কিমলিস' গল্পে এক ব্রাত্য শ্রমিক কথা রয়েছে। 'শহীদের মা' গল্পে দলীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিহত এক যুবকের মায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে শতশত সন্তান নিহত হয়েছে, অথচ তাদের মায়েরা থেকে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। 'শহীদের মা' গল্পে সেই অবহেলিত চরিত্রই উঠে এল কেন্দ্রিয় বিষয় রূপে। পুত্রের মৃত্যুবার্ষিকীতে যে গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করে শহীদের মা, যন্ত্রণা তো আসলে সমাজের রূপ দেখে শিহরে ওঠা সাধারণ মানুষেরই যন্ত্রণা। সমরেশ বসু সেই যন্ত্রণারই সার্থক রূপকার।

১০. নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথের গল্পে ব্যতিক্রমী জীবনচিত্র লক্ষ করা যায়। সুস্থিত জীবন ও বিষয়কেন্দ্রিক হলেও তাঁর গল্পে অবহেলিত মানুষের সংক্যা নেহাত ও কম নয়। 'রস' গল্পে মুসলিম গুড়বিক্রেতা মোতালেফ এবং তার দুই স্ত্রী মাজুখাতুন ও ফুলবাণু অবহেলিত মুসলিম সমাজের শ্রেণী প্রতিনিধি, চোর, ঘুম, পালঙ্ক গল্পেও নিম্নবিত্তশ্রেণীর লোকেদের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

আমরা যে নির্দিষ্ট গল্পকারদের অন্ত্যজ জীবন অনুসন্ধানের সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করলাম তাঁদের উত্তরাধিকার পরবর্তীকালের গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী, তপোবিজয় ঘোষ, শৈবাল মৈত্র, ভগরীর মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে পাই।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। তারাশঙ্কর রচনাবলী-৭ম খণ্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স
২। পদ্মানদীর মাঝি-বেঙ্গল পাবলিশার্স
৩। তিতাস একটি নদীর নাম-বেঙ্গল পাবলিশার্স
৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি
৫। তারাশঙ্করের শিল্পিমানস-ড. নিতাই বসু, দেজ পাবলিশিং
৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-সম্পাদনা ড. সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী
৭। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ-ড. রামেশ্বর শ. পুস্তক বিপণি
৮। তিতাস একটি নদীর নাম: উপন্যাসেরও, সম্পাদনা-হীরেন চ্যাটার্জী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৯। ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে বঙ্গজীবন-সম্পাদনা বরুণ চক্রবর্তী, সত্যবতী গিরি, তারাপদ চক্রবর্তী, অঞ্জলি লাহিড়ী, পুস্তক বিপণি
১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি-গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দেজ পাবলিশিং
১১। অদ্বৈত মল্লবর্মন: একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত-সম্পাদনা মনোহর বিশ্বাস কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর চতুর্থ দুনিয়া।

‘মিথিলার গোপাল ভাঁড় গণুঝা’ : একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস

পায়েল সিংহ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

সংক্ষিপ্তসার: ‘মিথিলার গোপালভাঁড় গণুঝা’ উপন্যাসটি লেখক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং শান্ত রক্ষিত যৌথভাবে লিখেছিলেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনাকালে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে, ঐতিহাসিক- রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেই উপন্যাসে রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন লেখকরা। প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগ কিংবা তার নিজের সময় পর্যন্ত বঙ্গ-বহির্বঙ্গ, এমনকি বহির্ভারতের রাজনীতির ধারা, ভারত ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, তার ইতিবাচক-নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক। বিশ্বব্যাপী দুই যুদ্ধের পরিণাম, জাতীয়তাবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত, স্বাধীনতা পরবর্তী আন্দোলন, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতন- কার্যধারা - এই সমস্ত বিষয়কে ঘিরেই লেখকের ঐতিহাসিক ভাবনার বিস্তার। উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মিথিলার ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। ঐতিহাসিক চরিত্র মিথিলাধীশ, তার স্ত্রী, গণু ও নানান ঘটনার মেলবন্ধনে উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠেছে।
সূচক শব্দ: গণু ঝা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজা-রাজতন্ত্র, মিথিলা, অধিপতি, পরিবার, রাজনীতি, স্ত্রী, দ্বন্দ্ব, বাস্তব, রাজবাড়ি, রাজমহিষী, বিষয়, অভ্যন্তরীণ, বীরবল, ক্ষমতা।

মূল আলোচনা:
অতীতকে সঙ্গে নিয়েই অনুভূতির পসরা সাজিয়ে তোলা সাহিত্যিকের কাজ। সে কারণেই সাহিত্যিক ঐতিহাসিক চরিত্রে জীবন ঢালতে পারেন। একটি বিশেষ সময়কে জানতে হলে, সেই সময়ের সাহিত্য পাঠ ও অনুধাবন করতে গেলে ঐ সময়ের মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী, ঘটনাপ্রবাহ, শুভাশুভের দ্বন্দ্ব এই সমস্ত কিছুই জানা দরকার। ইতিহাস মানুষের অভিজ্ঞতার বস্তুগত দলিল। সাহিত্য সেই অভিজ্ঞতারই আলোকোজ্বল প্রকাশ। সাহিত্য গড়ে ওঠে সমাজ ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। যেখানে ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতের ঘটনার কথা বলে সেখানে সাহিত্যিক কিন্তু ইতিহাসের তথ্যকে নির্বাচন করে তার অভ্যন্তরীণ সত্যকে জায়গা দেয়। ইতিহাসের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে ঐতিহাসিক কারবার করেন, সাহিত্যিক সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে নির্বাচন করে সেই সকল মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। ইতিহাস তাই সাহিত্যের মাধ্যমে আরো জীবন্ত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে সাহিত্যিক আঁকতে পারেন পারিবারিক চিত্র। কপালকুণ্ডলা, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, রাজর্ষি প্রভৃতি উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। যেখানে চরিত্র কিংবা ঐতিহাসিক তথ্য সবটাই সত্য। সাহিত্যিকের চোখে তারা মানবিক হয়ে উঠেছে। লেখক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কোন কোন উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা স্পষ্ট তা আলোচনা করব। ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপন্যাসের কোনো ঘটনা অথবা চরিত্র, স্থান ইতিহাসের সাথে মিলে যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাসে কতখানি সত্যতা উঠে এসেছে তা বিচার করব। ঐতিহাসিক চরিত্রে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা অথবা নিষ্ঠুর মনের আত্মপ্রকাশ কতখানি সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাময়িক সমাজচেতনার মতো অতীত ইতিহাসবোধ প্রবল। তার ভিত্তিতে ইতিহাস-সংস্কৃতির অচ্ছেদ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই। দেশীয় ইতিহাস, সমাজ আদর্শ, সমাজ-ভাবনা সবটাই একাত্ম হয়ে আছে। ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের হাতে ভারতীয় রাজদণ্ডের অধিকার যখন ছিল, তখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যোগসাধনে দেশীয় অর্থনীতির রূপান্তর ঘটে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 'অন্ধকারের নরনারী', 'পূর্বাভাস' প্রভৃতি উপন্যাস তার সাক্ষ্য বহন করে। এদেশীয় শিল্পের ধ্বংসের সাথে অর্থনৈতিক সমস্যা, জাত্যাভিমান, জাতিরবুদ্ধি এই সবটাই চরম বিপর্যয়ের মুখে চালিত হয়।

ক্ষমতার সূত্র ধরেই সুদূর প্রাচীন থেকে আধুনিক সময়ে রাজা-রাজতন্ত্র, সরকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে। ক্ষমতা বারেবারে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা, জনগণ নির্বাচিত কোনো সংগঠন দ্বারা, যারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার দখল-বিস্তার, শাসনকার্য পরিচালনা, প্রভাব-পত্তিপত্তি বিষয়গুলি প্রাচীন-মধ্য বা আধুনিক সময়ে দেখা যায়। রাজা বা সরকার এদের ক্ষমতাদখল, রাজতন্ত্র-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ষড়যন্ত্র। যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

'মিথিলার গোপাল ভাঁড় গণুঝা' উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক চরিত্র মিথিলা রাজ্যের 'গণুঝা' কে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। কাহিনি সম্পূর্ণভাবে মিথিলার রাজদরবারে বিদগ্ধ বিদূষক গণুঝা-কেন্দ্রিক। লেখক এক্ষেত্রে ইতিহাসের অন্তর্লোকে উঁকি দিয়েছেন। লেখক অনুমান করেছেন ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে হয়তো ত্রয়োদশ শতকের শেষাংশে গণু ঝার জন্ম হতে পারে। কারণ মহামহোপাধ্যায় পদবী গণু ঝা ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই পেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন - "সময়ের হিসেবে বীরবল গণূ ঝার উত্তরপুরুষ, ব্যবধান দু'শতকেরও অধিক। তবু এমন কিছু গল্প আছে ,যা গণু ঝা এবং বীরবল উভয়ের নামেই প্রচলিত" ।[১]

এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে গণুঝার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং শান্ত রক্ষিত। গণুর উপলব্ধির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন তারা - "ইদানীং গণু ঝার নিজের খেয়ালখুশি মতো হাতে-কলমে শিক্ষা-দীক্ষা। উপরন্তু মানুষের সঙ্গেই যখন সারাজীবনের কারবার, জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সে সমাজটাকেও তাকে নিজের প্রয়োজনেই চিনে নিতে হবে" ।[২]

এই সমাজকে চেনার লক্ষ্যেই নিজের পরিবারকে বার বার পরীক্ষা করেছে সে। এই উপন্যাসটিতে সমাজে তিন ধরনের মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এক, মহারাজা। ইনি নিজেদের অধিকার কায়েম করার শর্তে প্রজাদের ওপর যা খুশি চাপিয়ে দেয়। এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে। নিজেকে সবসময় সমাজের উপরের তলার মানুষ ভেবে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন। এমনকি রাণীর খেয়ালখুশির ভারও তিনি রাখেন না। শুধু বিলাসী দিন কাটায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হলেন গণু ঝার মা, প্রতিবেশিনীর মতো মানুষ। যারা শাস্ত্র পড়েনি অথচ সম্পদ সঞ্চয় এবং নিয়মের মাধ্যমে অধিকার কেড়ে নেবার ক্ষমতা রাখে। এরা শাস্ত্রীয় বিধান জানে না। সমাজে এরা নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম চালু করে অন্যকে বশে রাখার জন্য। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ গণু ঝার মতো মানুষ। যারা প্রথাগতভাবে তৈরী করা নিয়মের মাঝে একঘেয়েমি বোধ করে। এরা একই বৃত্তিতে মগ্ন থাকতে পারে না। তাই রাজার আদেশ সবসময় গণু মানতে চায়নি। সে চেয়েছে বিভিন্ন রকম কাজের মধ্য দিয়ে তার মৈথিলী ভাষাকে আরও রপ্ত করতে। কিন্তু রাজা তা চায়নি। রাজা চায় তার ঈশারায় যেমন সবকিছু চলে, তেমন গণু ঝার প্রতিভাও রাজার কথা মতো চলবে। কিন্তু তা হবার নয়।

সব দ্বন্দ্ব যেন এক লহমায় তার কাছে পরিষ্কার। যাদের পুঁথিগত বিদ্যে নেই, তারা যা জানে যাদের পুঁথিগত বিদ্যে আছে তারা তা জানে না। গণুর এই উপলব্ধি অনেক ছোটো বয়স থেকেই। তাই গণুর বিদ্যা শিক্ষায় অনিহা। সে দেখেছে যারা বই পড়েনা, কখনো পড়েনি তারা যে নিয়ম বলে, সংসারের যে কল্যাণের কথা তারা বলে সম্পূর্ণ যুক্তিবুদ্ধিহীন। পরিবার থেকেই সে সমাজের শিক্ষা নেয়। সে তার পিতার বড়ো পুত্র। তার ছোটো ভাইয়ের কাছ থেকে বড়ো আঘাত পায় সে। বিশ্বাস করতে পারে নি নিজের রক্তকে। পিতার মৃত্যুর পর তার ভাই সানু ঝা মাতব্বর হয়। কিন্তু সব বিষয়ে তার ভাই তাকে ঠকাতে থাকে। মহিলাদের সম্পর্কেও তার অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। নিজের মা, পাশের বাড়ির মহিলা সবাই যেন মনগড়া একটা নিয়মে জীবনের ছক কষে চলেছে। খারাপলাগা চরমে ওঠে যখন তার মায়ের সাথে সহমত হয়ে প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা জানায় - "ছেলে মরলে ছেলে জন্ম দিলে তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু সোনার গয়না কেউ দেবে না"।[৩]

সন্তান স্নেহের এই নমুনা গণুকে আহত করে। আশ্চর্য হয় সেদিন গণুর পিতাও। বিস্ময়ে সে হাঁ হয়ে যায়। কোন সমাজকে সে দেখছে! যেখানে সন্তানের মূল্য সোনার থেকে দামী নয়। লেখক বাস্তব ইতিহাসের পটভূমির সাথে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং সেই জীবনের সূক্ষ্ম রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে জীবনকে এভাবে তুলে ধরা মুশকিল। লেখক তা করে দেখিয়েছেন। মিথিলাধীশের সাথে সাথে গণুর বর্ণনা করেছেন তিনি। ঊষালগ্নে মিথিলাধীশের পত্নী প্রাতঃভ্রমণে বের হন। তার পত্নী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত ব্যাভিচারী হয়ে যান। গণু সাবধান করলেও রাজা কিন্তু শোনেননি। গণুর আতঙ্ক "পেটের আগুন কিংবা বুকের মধ্যে জমে থাকা ভোগবাসনার জ্বালা মেটাতে জন্ম জন্মান্তরের কয়েদ ভোগ, তা আর যে কেউ পারুক, গণুঝা'র পোষায় না। হোক না কেন রাজবাড়ির সোনার খাঁচায় বিদূষক নামের চিঁড়িয়া হয়ে থাকা, অথবা জগৎশেঠের মতো সোনাচাঁদি, হীরে জহরতের তেজারতি।এখানে সে একান্তভাবেই সন্ত তুলসীদাসপন্থী। গণুঝা'র প্রাণের ভাষা, মুখের বয়েৎ একটাই -

"অজগর করে না চাকরি,
পনছী করে না কাম,
দিন দুনিয়ামে যো কোই ভি হ্যায়,
সবকে দাতা রাম!"[৪]

একঘেয়ে কাজ গণুর পছন্দ নয়। তার অপরাধ সে রাজমহিষীর কথা রাজাকে বলেছে। রাজার মনে হয়েছে গণু রাজাকে ব্যঙ্গ করেছে। কিন্তু গণু মিথ্যে বলেনি। সে নিজে স্ত্রীর সাধ পূরণ করেছে। কিন্তু রাজা তা করে নি। রানী তাই আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গণু সভাকক্ষ ত্যাগ করে। এরপর "এ দাস চীরদিনের মতো বিদায় হল মহারাজ"।[৫] উপন্যাসটি একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েছে।

এক্ষেত্রে,- ক। উপন্যাসকার বেছে নিয়েছেন গোপাল ভাঁড় এবং বীরবলের সমগোত্রীয় বিদূষক গণু ঝা'কে। যে বীরবল গণু ঝা'র উত্তরপুরুষ। ব্যবধান দু শতকেরও অধিক। তবুও এমন কিছু গল্প আছে যা গণু ঝা এবং বীরবল উভয়ের নামেই প্রচলিত। মোগল বাদশা আকবরের দরবারে বীববল যেমন বিদূষক ছিলেন, বাংলায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রঙ্গরসের জন্য যেমন গোপালভাঁড়কে স্মরণ করায়, তেমন মিথিলার রাজসভায় বাঁধা বিদূষক ছিলেন গণু ঝা। এই গণু ঝা'র উল্লেখ পাই -

> "Mithila is also proud of its very wise son named Gonu Jha. He is a household name famous for his wit and humour, much like Birbal or Tenali Raman or Gopal Bhar of Bengal."[৬]

খ। উপন্যাসে ইতিহাসের দ্বন্দ্ব রয়েছে। মিথিলার রাজা এবং বিদূষক গণু ঝা'র দ্বন্দ্বকে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। চরিত্রগুলি ইতিহাস কেন্দ্রিক। মিথিলার রাজা, রাণী, মন্ত্রী, গণু প্রমুখ চরিত্র ইতিহাসে বর্তমান। উপন্যাসটি ইতিহাসের সময়কে সাক্ষ্য দেয়। এখানে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে বলা যায় এটি একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

গণুর অন্যতম উত্তর পুরুষ ভাগলপুর মাড়োয়ারি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিত ভবনাথ ঝা। গণু ঝার কাহিনিতে জীবনে চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন গণুর লক্ষ্য। সে জীবন দর্শন পেতে চায় নানাভাবে। তাই জীবিকা পরিবর্তন করেছে বার বার। গণুর মা ও প্রতিবেশিনীর চরিত্রে বাস্তব সমাজচিত্র দেখা যায়। তাদের জীবন চেতনায় মনগড়া কিছু শুদ্ধ অশুদ্ধের সংস্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়টির প্রতিফলন উপন্যাস জুড়ে। এমনকি গণুর স্ত্রী সেই জীবন দর্শন থেকে বাদ পড়েনি। উপন্যাসটিতে তৎকালীন মেয়েদের জীবনচেতনা ধরা পড়ে। গণু মান-মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে চায়। তাই আত্মচেতনাকে, জীবনকে আরো মুক্ত করতে রাজসভা ত্যাগ করে। তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুভূতি আরও গভীর হয়। যা জীবন চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

উপসংহার: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালচেতনার সঙ্গে স্থানভিত্তিক চেতনাও দৃষ্টান্তযোগ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রবল। এই ঐতিহাসিক জ্ঞান বা ইতিহাসচেতনার দরুণ ভারতীয় ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়ে। এর সুবাদে অতীতের বিভিন্ন মানুষের সংস্কৃতি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিথিলার রাজসভা কিংবা সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কালের নাগরিক জীবনচর্চার মধ্যে রিপুর প্রাবল্য, বিলাসীজীবন, ব্যাভিচার ইত্যাদি লেখক দেখিয়েছেন গভীরভাবে। প্রাচীন বহির্বঙ্গ বা বহির্ভারতের নগরের ইতিহাস লেখক উন্মোচিত করেছেন। মিথিলায় রাজতন্ত্রের আধারে শাসক বা রাজা-রাজপরিবারের অন্দরমহল, তাদের রাজনীতি অর্থাৎ রাজতন্ত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গ- অনুষঙ্গ, তাতে প্রতিপন্ন হয় নগরকাঠামোয় 'রাজতন্ত্র' নামক এক সামাজিক- রাজনৈতিক কাঠামো বা এক বিশেষ সংগঠন। বিশেষত নৃপতিস্থানীয়, অভিজাত এক শ্রেণীর অস্তিত্বে রাজার অবস্থানেই রাজ্য পরিচালিত হত। এর অস্তিত্ব ইতিহাস বহন করে চলেছে। সেখানে রাজপুরুষ- কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার, অভিজাত চেতনায় লালসা-ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রমাণ, আরাম-আয়েস-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন, রাজকীয় সাজ, আধিপত্য-একনায়কতন্ত্রের বাসনা লক্ষ করা যায়। ক্ষমতালিপ্সা- সম্পদলিপ্সা, রাজার জাত্যাভিমান, প্রভুত্ববোধ, সাম্রাজ্যভিলাষে যুদ্ধবিগ্রহ, গণুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজকার্যের অন্যতম অঙ্গ। রাজ্যবিস্তার-রাজরক্ষার পরিকল্পনা, রাজ্যপরিচালনার নানা কৌশল সবটাই দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ।

তথ্যপঞ্জী:

১। মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, রক্ষিত শান্ত, 'মিথিলার গোপাল ভাঁড় গণুঝা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯১, পৃষ্ঠা - ১১
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৭
৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১
৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৫
৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৫
৬। Dr. Yogendra Pathak Viyogi, GONU JHA OF MITHILA.

নন্দিতা বাগচীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব

প্রশান্ত শীল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ইংরেজি 'Globalization' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক নাম করা হয় 'বিশ্বায়ন'। বর্তমান যুগে এই বিশ্বায়ন আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে এবং বিশ্বায়নের প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন। বিশ্বায়ন হল একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যা জাতি রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং সমগ্র জগতের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে যে কোন জিনিসের সচলতার মধ্যেই বিশ্বায়নের ধারণা নিহিত আছে। ১৬শ শতাব্দীতে উপনিবেশীকরণের যুগে বিশ্বায়নের উৎপত্তি চিহ্নিত করা হলেও সমগ্র পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ে নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ও তৃতীয় বিশ্বের উদারনীতি গ্রহণের পর। মূলত ব্যাবসা বাণিজ্য তথা পুঁজির বিনা বাধায় বিশ্বব্যাপী প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বিশ্বায়নের উদ্ভব হয় কিন্তু একুশ শতকে এসে তা শুধু অর্থনৈতিক ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, উন্নত প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বায়ন আজ বহুমাত্রিক। একুশ শতকের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবেশ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন তার প্রভাব ফেলে চলেছে। একুশ শতকের সমাজজীবনকে বিশ্বায়ন দ্রুত পরিবর্তন করে চলেছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ও সেই স্থানে অণু পরিবারের সৃষ্টি, ফ্ল্যাটবাড়িকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, প্রাচ্য সংস্কৃতির ধ্বংস, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, পণ্য-ভোগ্য সংস্কৃতির বিকাশ, যৌনতা ও হিংস্রতা, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, ভোট সর্বস্ব রাজনীতি প্রভৃতি বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের সমাজে অহরহ ঘটেই চলেছে যা আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে দ্রুত পরিবর্তন করে চলেছে। সমাজ সংস্কৃতির এই পরিবর্তন সাহিত্যিকেরাও উপলব্ধি করেছেন আর তাই তাঁদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বায়নের বিভিন্ন প্রভাবগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নন্দিতা বাগচী একুশ শতকের একজন অন্যতম কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পগুলিতেও বিশ্বায়নের নানা প্রভাব আমরা ফুটে উঠতে দেখি। একুশ শতকের সমাজ সংস্কৃতির এই দ্রুত পরিবর্তনের ছবি নন্দিতা বাগচীর নন্দিতা বাগচীর গল্পগুলিতে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: 'বিশ্বায়ন', 'তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ', 'উদারনীতি', 'পুঁজির বিশ্বব্যাপী প্রবাহ', 'একুশ শতক', 'সমাজ সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন', 'ভোগ্য সংস্কৃতি', 'নন্দিতা বাগচী'।

মূল আলোচনা:

কাল প্রবহমান। এই প্রবহমানতার মধ্য দিয়েই সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে চলেছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যন্ত্রশক্তির বিকাশ ও শিল্পায়নের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত আশির দশকের সময় থেকে এই পরিবর্তন আরও যেন বেশি করে অনুভূত হয়। একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে গিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িকেন্দ্রিক অণু পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির বয়স্কদের স্থান হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে। শিশুরা

প্রায়ই প্রতিপালিত হচ্ছে পরিচারিকার কাছে। দাদু দিদার কাছে রূপকথা শোনার সময় তাদের কাছে নেই, সেই স্থানে দখল নিয়েছে ভিডিও গেম, মোবাইল, কম্পিউটার। ফলে শিশুরা বড়ো হয়ে একদিকে যেমন হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক তেমনই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। একবিংশ শতাব্দীর এই বস্তুবাদী ভোগসর্বস্ব জীবনে মানুষ নিঃসঙ্গ, একা। উদার অর্থনীতি, মিডিয়ার অত্যাধিক প্রচার, ভোট সর্বস্ব রাজনীতি, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বাজার দখলের লড়াই প্রভৃতির ফলে মধ্যবিত্ত জীবনেও আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যে মধ্যবিত্ত জীবনের অলঙ্কার হিসেবে ছিল নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শবোধ তা আজ ভূলুণ্ঠিত। বর্তমানে প্রত্যেকেই চায় জীবন উপভোগ করতে, আনন্দ করতে যার দরুণ আমাদের সংস্কৃতির রূপও পাল্টে গেছে। বর্তমানে ভারত তথা বাঙালি জীবনে দেখা যায় মিশ্র সংস্কৃতির আধিক্য। দ্রুত পরিবর্তমান এই সময়কে সাহিত্যিকেরা তাঁদের সৃষ্টিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন, নন্দিতা বাগচীও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্বায়ন কিভাবে সমাজ সংস্কৃতির রূপ দ্রুত বদলে দিচ্ছে এবং তা কথাকার নন্দিতা বাগচীর গল্পগুলিতে কতটা ফুটে উঠেছে সেটা আলোচনা করা হবে।

বিশ্বায়ন হল একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যা ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় ; তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বকে ক্রমশ হাতের মুঠোয় এনে ফেলে, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম সমাজ- সংস্কৃতির সমরূপকরণ ও বিষমরূপকরণের মাধ্যমে সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তিত করে। বিশ্বায়নের প্রথম বিস্তৃত তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন রোল্যান্ড রবার্টসন। ১৯৮৫ সালে রোল্যান্ড রবার্টসনের প্রথম সমাজতত্ত্বভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯৯২ সালে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'Globalization: social theory and global culture' শিরোনামে। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বায়নকে 'বিশ্বের সঙ্কোচন ও পারস্পরিক আদান-প্রদান'[১] অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে বিশ্ব ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আর এই সংকোচন সম্ভব হচ্ছে বিশ্বের মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার ফলে। এই পারস্পরিক নির্ভরতা বিশ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বকে সঙ্কুচিত করে ক্রমাগত এককেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করছে। রবার্টসনের পাশাপাশি অ্যান্থনি গিডেন্স তাঁর 'The Consequences of Modernity' ও 'Modernity and self Identity' গ্রন্থে বিশ্বায়নকে 'আধুনিকতার পরিবর্ধিত রূপ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ফলেই বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আবার অর্জুন আপাদুরাই-এর মতো তাত্ত্বিকরা বিশ্বায়নকে সাংস্কৃতিক 'সমরূপকরণ' ও 'বিষমরূপকরণ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কোনও কোনও তাত্ত্বিক বিশ্বায়নকে সাংস্কৃতিক 'সাম্রাজ্যবাদ', 'স্থান ও কালের সংকোচন' অর্থেও ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক সীমার মধ্যেই সীমিত নয় তা সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকেও প্রভাবিত করেছে। এবারে আমরা নন্দিতা বাগচীর ছোটোগল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব কতটা ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করব।

একবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম কথাশিল্পী নন্দিতা বাগচী (জন্ম-১৯৪৯)। নন্দিতা বাগচীর জন্ম উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে। প্রথম জীবনের দীর্ঘ উনিশ বছর তিনি চা-বাগান ঘেরা ডুয়ার্স-এ কাটিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ায় দীর্ঘকাল বসবাস করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি। নাইজেরিয়া থেকে ভারতে ফিরে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ', 'সানন্দা', 'এবেলা', 'নবকল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল- 'ইতি তোমার মণি' (২০০৩),

'স্কাইলাইট'(২০০৭), 'বৃষ্টির পুত্রকন্যারা' (২০০৫)। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা নন্দিতা বাগচীর পাঁচটি ছোটোগল্প যেমন **'বৃদ্ধি'**, **'অস্তিত্ব'**, **'ত্রিধা'**, **'অবর্জ্য'**, বিশ্লেষণ করে আলোচনায় অগ্রসর হব।

নন্দিতা বাগচীর **'বৃদ্ধি'** গল্পটি প্রকাশিত হয় সানন্দা পত্রিকায় ২০০৭ সালে। গল্পটিতে দেখা যায় অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে পুত্র ও পুত্রবধূ (রুদ্র ও প্রাচী) কর্মসূত্রে আমেরিকায় চলে যায়। যদিও রুদ্র ও প্রাচী তার মা মূর্ছনাকে যথেষ্ট ভালবাসে। প্রতিদিন খোঁজখবর নেয়। গল্পটিতে তাঁদের আমেরিকায় যাওয়া, সেখানকার নানা খবর মূর্ছনাকে দেওয়া, মূর্ছনার স্মৃতি রোমন্থন, মূর্ছনার স্বাস্থের বিষয়ে খবর নেওয়া প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে কাহিনি এগিয়ে গেছে। গল্প শেষ হয়েছে জীবনের জয়ধ্বনি দিয়ে। একদিকে মূর্ছনা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে, ক্রিসমাস ট্রির কচি ডাল-পাতা গজানো অন্যদিকে রুদ্র ও প্রাচীর জীবনে সন্তানের আবির্ভাব জীবনের জয়ধ্বনি শোনায়। গল্পে আমরা দেখি প্রতিটি পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে 'হ্যালো মা' শব্দটি ব্যবহার করে রুদ্রের তার মায়ের খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে। সম্পূর্ণ গল্পে মায়ের সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূর কথোপকথন ফোনের মাধ্যমে। মূর্ছনা যখন আমেরিকায় থাকত সেই সময়ের ক্রিসমাস ট্রির খবর, সেখানকার পরিবেশের খবর, প্রাচীর কলেজে ভর্তি হওয়া, প্রাচী যে মা হতে চলেছে তার খবর, মূর্ছনার অসুস্থতা, পা ভেঙে যাওয়ার ঘটনাগুলি আমরা তাদের ফোনালাপের মাধ্যমেই জানতে পারি। অর্থাৎ প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন যে কতটা অপরিহার্য তা গল্পটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমেরিকা ও ভারত দুই দূরতম স্থান নিজেদের কত কাছাকাছি এসে গেছে। আমেরিকায় থাকা রুদ্র ও প্রাচী ভারতে থাকা মূর্ছনার সঙ্গে খুব কম সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, কথা বলেছে। পৃথিবী সত্যিই যেন আজ হাতের মুঠোয়। রবার্টসন একেই 'স্থান ও কালের সংকোচন' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে স্থানীয় ও বিশ্বসমাজ একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলেই স্থান ও দূরত্বের সীমা এখানে অবলুপ্ত।

গল্পটিতে মূর্ছনার স্মৃতি রোমন্থন সূত্রে আমরা জানতে পাই মূর্ছনা একসময় আমেরিকায় বসবাস করেছে। রুদ্রও জন্মসূত্রে আমেরিকান। গল্পে আমরা দেখি আমেরিকা থাকাকালীন প্রতিবেশী মেরি অ্যান মূর্ছনাকে স্মার্টনেস শিখিয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যে আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে তা লক্ষ করা যায়।

> "মেরি অ্যানই ওকে একটু একটু করে স্মার্টনেস শিখিয়েছিল। শাড়ি ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট, বিনুনি ছেড়ে বয়কাট, শাঁখা-সিঁদুরের বন্ধন মুক্তি, সবই ওই মেরি অ্যানের সহায়তায়।"[২]

মূর্ছনা অতি সহজেই এই পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। মূর্ছনার মতোই বহু মানুষ প্রতিদিনকার জীবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে চলেছে। জন টমলিনসন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় মার্কিন সংস্কৃতির এই প্রভাবকে 'deterritorialization' এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। 'deterritorialization' হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দূরবর্তী ঘটনা, প্রক্রিয়া ও সম্পর্কের একীকরণ যার ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি বিশ্বায়নের চাপে দ্রুত পরিবর্তমান সময়ের, সভ্যতার ছবি। নগরায়ণের ফলে আমাদের পরিচিত সমাজ দ্রুত পালটে যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির তৈরি করা গাড়ি, শপিং মল, বড়োবড়ো বিল্ডিং শহরের অলিগলিতে ঢুকে গেছে। সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের ছবি দেখাতে গিয়ে নন্দিতা বাগচী লিখেছেন-

> "শপিং মল কাকে বলে, ফুডকোর্ট কী জানত না মূর্ছনারা। কানে হাত দিয়েও পথ চলতেন না মানুষজন। উদ্ভট ভাষায় এস-এম-এসের মজার খেলাও খেলতে জানত না ওরা। পর্নো ছবি তো ছিল সহবাসের সমতুল। প্রথমবার পর্নো ছবি দেখে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল মূর্ছনার। তখন সে বিবাহিত। সাতাশ বছর বয়েস"[৩]।

'অস্তিত্ব' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'সানন্দা' পত্রিকায় ২০১১ সালে। গল্পে দেখা যায় বিশ্বায়নের চাপে একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙন আর অণু পরিবারের সৃষ্টি। এই অণু পরিবারের ফলে বৃদ্ধ রুদ্রপ্রসাদের জীবনে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব বেশি করে আঁকড়ে ধরে। রুদ্রপ্রসাদের চার ছেলের মধ্যে রঙ্গন থাকে লন্ডনে, রঞ্জন থাকে দুবাইয়ে, রবীন থাকে সিঙ্গাপুরে এবং ছোটো ছেলে রোহন থাকে আমেরিকায়। রুদ্রপ্রসাদের বড় তিন ছেলে তাঁদের কর্মস্থানেই সংসার পেতেছে শুধুমাত্র রোহণ বিবাহ করেনি। রুদ্রপ্রসাদের সন্তানেরা বাইরে থাকায় বৃদ্ধ রুদ্রপ্রসাদকে সারা বছরই ঘুরে-ফিরে থাকতে হয়। বছরের বার মাস ভাগ করে নিয়ে মোট তিন মাস করে প্রত্যেক সন্তানের কাছে গিয়ে থাকতে হয়। ফলে বৃদ্ধ রুদ্রপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় হতাশা, অসহায়ত্ব। রুদ্রপ্রসাদের জীবনে বুঝি আর কিছু করারই নেই। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সে পারে না সন্তানদের রক্তচক্ষুর ভয়ে। তাঁর নিজের যেন কোনও ইচ্ছে থাকতে নেই। চার সন্তানের পিতা হয়েও সে যেন নিজেকে একা বোধ করে। গল্পকার রুদ্রপ্রসাদের হতাশার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> "পরিযায়ী পাখিরা নিজেরা স্থির করে কোন দেশে যাবে। কিন্তু রুদ্রপ্রসাদের বেলায় সে নির্ধারণক্ষমতা তাঁর ছেলেদের হাতে। তাঁর নিজের ইচ্ছে করে তাঁদের বকুলবাগানের বাড়ির ছাদে বসে চা-সহযোগে চানাচুর খেতে।"[৪]

আবার লেখক অন্যস্থানে লিখেছেন-

> "বড় বেশি শাসন করে ওরা। উন্নত দেশগুলোতে কত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা। অথচ রুদ্রপ্রসাদের ছেলেদের সংসারে তাঁর কোনও স্বাধীনতা নেই। কেমন যেন ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনার মনে হয় নিজেকে। 'ভাল-ভাল খাবার খাও, সুন্দর-সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যাও, কিন্তু নিজের মুখটি খুলো না বাপু!"[৫]।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের ভাবনা শুধুমাত্র নিজেদের হিত সাধনের জন্য। বিশ্বায়নের ফলে মানুষ এতটাই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে যে স্নেহ ভালবাসার মূল্য যেন আজ ফিকে। সবাই চায় জীবনে আরও উন্নতি করুক কিন্তু এই উন্নতির পেছনে ছুটতে ছুটতে সে অতীতকে ভুলে যায়। এই যান্ত্রিক জীবনের কারণেই রুদ্রপ্রসাদের মতো বৃদ্ধরা শেষ বয়সে অসহায়, একা হয়ে পড়ে। বিশ্বায়ন আজ যেভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে তাতে এই অসহায়ত্ব, নিঃসঙ্গতা হয়ত আরও বাড়বে।অন্যদিকে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে যে কতটা প্রভাবিত করে তার প্রমাণ পাই রুদ্রপ্রসাদের জীবনের আর্থিক ক্ষতি দিয়ে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে একদিকে আমরা যেমন অত্যাধুনিক এক জীবন উপভোগ করছি তেমনই অন্যদিকে প্রচুর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। রুদ্রপ্রসাদের জীবনে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব-

> "অমন রমরম করে চলা পৈত্রিক ব্যাবসাটা কেমন লাট হয়ে গেল। হাজরা পার্কের পাশে ফোটো স্টুডিয়ো। পাশেই কো-এডুকেশন কলেজ। নিত্যি জোড়ে ফটো তুলতে আসত কলেজের ছেলেমেয়েগুলো। কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা আর মোবাইল ফোন- এই তিনে মিলে ষড়যন্ত্র করে ফকির করে দিল তাঁকে।"[৬]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও বিশ্বব্যাপী প্রসার আধুনিক জীবনকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোনও স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হচ্ছে। বিশেষভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থার প্রসারের পর একদিকে যেমন সমাজের দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তেমনই এই ইন্টারনেট দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সমাজমাধ্যম যেমন ফেসবুক, ই-মেইল প্রভৃতি সাহিত্যের আঙিনায় উঠে এসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও করছে। নন্দিতা বাগচীর বেশ কিছু ছোটোগল্পে এই প্রযুক্তি ও সমাজমাধ্যমের ব্যবহার গল্পগুলিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। যেমন, 'ভিশন' (২০০৭) গল্পে দেখা যায় ডাক্তার কিংশুক দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ না হওয়া বন্ধু কল্লোলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় 'গুগল' এর মাধ্যমে।

> "কুহুই ওকে নেট-এ কানেক্ট করে দিল। মডেম আর প্রসেসর অনেক ধস্তাধস্তি করে, অনেক পাখির ডাক ডেকে অবশেষে গুগল-এ পৌঁছল। কুহুর কথামত কল্লোল টাইপ করতেই কয়েক শো কল্লোলের কলকলানিতে ভরে উঠল মনিটরের স্ক্রিন।"[৭]

কল্লোল থাকে 'ম্যাডিসন'-এ। সে কম্পিউটার ভিশন নিয়ে গবেষণা করছে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ভারতে না আসা কল্লোলের সঙ্গে ই-মেইল এর মাধ্যমে যখন কিংশুকের কথা হয় তখন কিংশুক স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ইমেইল এখানে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে এবং আরেক বন্ধু শোণিতলালের দেওয়া খবরের মধ্যে কিংশুকের সন্দেহ প্রকাশে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয় গল্পের নামকরণ 'ভিশন'-কে যথাযথ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

'অবর্জ্য' (২০০৭) গল্পে দেখা যায় দিগন্তের ইন্টারনেট, কম্পিউটারের প্রতি আসক্তি তাঁকে কিভাবে যান্ত্রিক করে তুলেছে। উচ্চ ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে ছুটতে সে শুধুমাত্র কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে। ইন্টারনেট সার্ফ করে, কেরিয়ার অপশন দেখে। অণু পরিবারের সন্তান খেলাধুলা পছন্দ করে না, নাটক, গানেও আসক্তি নেই। সে এতটাই যান্ত্রিক হয়ে পড়ে যে বড়দের প্রণাম করার সৌজন্যতাটুকু হারিয়ে ফেলে, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। আবেগ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে সে, তাঁর লক্ষ্য আমেরিকার সিটিজেনশিপ পাওয়া। এমনকি বিয়েও করে ওয়েবসাইটে অ্যাড দিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বহু পরিবারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রযুক্তি যে প্রভাব ফেলছে তা স্বীকার করতেই হবে। সাম্প্রতিক সময়ের অনেক মায়েদের মতই দিগন্তের আচরণ দেখে তাঁর মা মোহিনীর চিন্তা হয়-

> "মোহিনী কেমন যেন ভয় পায়। ছেলেটার কি তবে মন নেই? শুধুই মেধা? কিন্তু মন আসলে কী? তার তো কোনও অবয়ব নেই। অস্তিত্বও আছে কি? শুধুই যেন একটা অনুভূতি সে। সেনস পারসেপশন। তার মানে মনও কি তবে ইন্দ্রিয়ের দাস? ইন্দ্রিয় মানেই তো সেই জটিল নার্ভাস সিস্টেমের খেলা। আবেগ-অনুভূতির যে দোলায় দোলে মানুষ তার মূলেও কি তবে সে মস্তিষ্কই? এ যুগের ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কে কি কিছু স্নায়ুর অভাব আছে, যে স্নায়ুমণ্ডলে ঢিল পড়লে আবেগ সঞ্চারিত হয়?"[৮]

বিশ্বায়ন নানাভাবে একবিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন করে চলেছে দ্রুত, বদলাচ্ছে চিন্তাভাবনাও। মানুষ হয়ে পড়ছে পাশ্চাত্যমুখী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ভোগবিলাসকে গ্রহণ করছে দ্রুত। সাহিত্যেও এই পরিবর্তমান সময় সমাজ তাই বিষয় হিসেবে উঠে আসছে।

'ত্রিধা' (২০০৪) গল্পে গল্পকার চরিত্রের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। গল্পকার দেখিয়েছেন কিভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সত্তর ছাড়িয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকেও মডেল বানিয়ে ফেলে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সৌন্দর্যকে মূলধন করে নাতনি হিয়া তাঁকে এই মডেলের জগতে নিয়ে এসেছে। অ্যাড কোম্পানিগুলি দেশি শ্যাম্পুর অ্যাডের জন্য তাঁর চুলে বিদেশি শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার লাগিয়ে দেয়। তাঁর চুলগুলো তখন আরও সিল্কি ও চকচকে হয়ে ওঠে আর ক্রেতারাও আকর্ষিত হয় সেই পণ্যের প্রতি। বৃদ্ধা জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবনে এই মোড় নিয়ে আসে বিশ্বায়ন। আর তাই তিনি বিশ্বায়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন-

> "বিশ্বায়নের নিন্দে করেন আমার বয়েসি মানুষেরা। আমি তো বাবা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই যে আমি এই বুড়ো বয়সে এত কাজ করছি, হাজার হাজার টাকা রোজগার করছি তা কি পারতাম ওই পচা ডোবায় থাকলে? আজ সেই ডোবা থেকে খাল কাটা হয়েছে, জোয়ার এসেছে জলে। সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে চিতকে পড়েছি আমিও। এখন আর চারদিক ঘেরা নয়। আমার রঙ্গশালাটি এখন উন্মুক্ত।"[৯]

আর এই রঙ্গমঞ্চে তিনিও যেন পণ্যে পরিণত হয়েছেন। বিশ্বায়ন তাঁর জীবনটাকে সমূলে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর জ্যোতির্ময়ী দেবীর পুত্রবধূ মঞ্জরীকেও এই মডেলিং জগত হাতছানি দেয়, তাঁরও ইচ্ছে করে মডেলিং করতে কিন্তু সমাজের বাধ্যবাধকতায় সে করতে পারে না আর তাই সে জ্যোতির্ময়ী ও হিয়াকে মনে মনে হিংসে করে। তাঁরও মনে হয় সেও তো এযুগে জন্মাতে পারত, যে যুগে দাঁড়িয়ে তাঁর মেয়ে হিয়া টাইট জিনস পরে, গলায় মোবাইল ফোন ঝোলায়, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করে। আবার এ যুগের মেয়ে হিয়া চায় জীবনে নতুন কিছু করতে, জীবনে নতুন উত্তেজনা তৈরি করতে আর তাই সে মডেলিং- কেই তাঁর পেশা নির্বাচন করে। সে জানে কিভাবে নতুন প্রোডাক্টকে আকর্ষণীয় করতে হয়। মডেলিং জীবনকে বর্ণনা করতে সে বলেছে-

> "স্কুলে থাকতেই মডেলিং শুরু করেছিলাম। তাই এই অ্যাটমসফেয়ারটার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিন আগে থেকেই। মা ও ঠাম্মার জিন তো ছিলই। সঙ্গে বাবার হাইট। লুফে নিয়েছিলেন মিডিয়া ডিস্ট্রিবিউটাররা। ডিস্ট্রিবিউটারকে বাংলায় কী বলে যেন! হ্যাঁ, পরিবেশক। ওয়ান, হু লেইস ফুদ অ্যাট দ্য টেবল। তা খেয়েছিল। ভিউয়াররা চেটেপুটে খেয়েছিল আমার শরীর।"[১০]।

বিশ্বায়ন এই তিনজনের জীবনকে গতি দিয়েছে। মেয়ে বড় হয়ে গেলে তার বিয়ে দেওয়া এবং সংসার ধর্ম পালন করাই যেখানে পূর্বে রীতি ছিল সেখানে বিশ্বায়নের প্রভাবে হিয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও মডেলিং নিয়ে ব্যস্ত, অর্থ উপার্জন করে নিজের জীবনকে উপভোগ করছে। আর তাই জ্যোতির্ময়ী দেবী নতুন প্রজন্মের জয়গান গেয়েছেন, মুক্ত বাণিজ্যের জয়গান করেছেন। গল্পের শেষে তাই তাঁর প্রশ্ন-

> "সব মেয়েকেই কি পতিব্রত পালন করতে হবে? নাকি সন্তান- সন্ততি লালন? ও থাক না ওর মোবাইলে, কম্পিউটারে, জিন্স-এ, জিন-এ, জেন-এ..."[১১]

উপরিউক্ত গল্পগুলির পাশাপাশি নন্দিতা বাগচীর 'স্বর্ণহংসী' গল্পে বিজ্ঞাপনের জয়যাত্রা, মেয়েটা গল্পে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতিও লক্ষ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখি বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশের প্রতি আকর্ষণ, দূরত্ব ও সময়ের মধ্যে ব্যবধান কমে যাওয়া, একাকিত্ব আবার পাশাপাশি জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো চরিত্রের কাছে বিশ্বায়নের জয়গান।

বিশ্বায়নের সুফল ও কুফল দুইই আছে তবে আমাদের সুচেতনাকে জাগ্রত করে বিশ্বায়নের সুফলগুলি গ্রহণ করাই সমীচীন।

তথ্যসূত্র:

১. Robertson, Roland, 1998. Globalization: social theory and global culture. London, Sage Publication, p-8
২. বাগচী, নন্দিতা, ২০১৬, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-৬৬
৩. তদেব, পৃ- ৬৭
৪. তদেব, পৃ- ১৮১
৫. তদেব, পৃ-১৭৮
৬. তদেব, পৃ- ১৭৪
৭. তদেব, পৃ- ২৫৪
৮. তদেব, পৃ-৩৭৬
৯. তদেব, পৃ- ২৩৩
১০. তদেব, পৃ- ২৩৬
১১. তদেব, পৃ-২৩৯

সহায়ক গ্রন্থ:

- ঘোষ, রতনতনু (সম্পা.), ২০০৯, বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন, ঢাকা, কথাপ্রকাশ।
- ঘোষ, মুরারি, ২০১১, বিশ্বায়ন ও বিকল্প বিশ্বের সন্ধানে, কলকাতা, গ্রন্থমিত্র।
- বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.), ২০০২, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা খণ্ড-১, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
- Robertson, Roland, 1998. Globalization: social theory and global culture. London, Sage Publication
- Steger, B Manfred, 2013, Globalization: A very short introduction, UK, Oxford University Press.
- Waters, Malcom, 2001, Globalization, London, Routledge.

সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের দেশভাগের বাংলা ছোটগল্প

সৌমেন গিরি
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাকে প্রধান দায়ী করা হয় দেশভাগের কারণ হিসাবে। যদিও ১৯৪৬ এর আগেও অনেক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। আর সেগুলির এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে কলকাতা দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতারা মনে করেছিলেন যে দেশভাগ হয়ে গেলে হয়ত আর দাঙ্গা বাঁধবে না। কিন্তু তা তাদের ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করে। '৪৭ এর দেশভাগের পরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকে। এক স্থানের দাঙ্গা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে অন্য স্থানে। এক পাশে যদি মুসলিমরা তো অন্য পাশে হিন্দুরা দাঙ্গায় মেতে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘুদেরকে নিরাপত্তার জন্য মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বহু মানুষকে ভিটেমাটি হারা হতে হয়েছে। তবে দাঙ্গায় বা দেশভাগের সময়ে কিম্বা দেশভাগের পরবর্তী দাঙ্গাগুলিতে যে শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছিল তা শুধু নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। বহু সাধারণ লোক মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন আবার বহু মুসলিম ওপার বাংলার হিন্দু পরিবারগুলিকে আশ্রয় দিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন আবার কেউ কেউ নিরাপত্তা দিয়ে এপার ওপার পার করে দিয়েছেন। অর্থাৎ দেশত্যাগে এখানেই দুই সাম্প্রদায়ের ভূমিকা কেমন ছিল তা দেখা যায়। দাঙ্গার প্রকোপ গ্রামাঞ্চলেও যেমন দেখা গেছে শহরাঞ্চলেও তেমনি দেখা গেছে। এতকিছুর মধ্যেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি সম্প্রীতির ভাবও দেখতে পাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশের দুটি বাংলা ছোটগল্পকে নির্বাচিত করে আলোচনা করেছি। যেখানে দাঙ্গা দেশভাগ ও দেশভাগের পরবর্তী দাঙ্গার প্রভাব পড়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব অপরদিকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মেলবন্ধন কোথায় কোথায় ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। দেশভাগের ৭৭ বছর পর আজকের দিনেও সেই সাম্প্রদায়িকতার আগুণ আজও জ্বলছে, তা চলতে থাকবে। তবু এর মধ্যেও আগামী দিনে সাম্প্রদায়িক হানাহানি মুছে ফেলে সম্প্রীতির একমানব বন্ধন গড়ে উঠুক তার প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সূচক শব্দ: দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, সংখ্যালঘু সংকট, সম্প্রীতি।

মূল আলোচনা:

ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলতে বিশেষত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে উচ্চবর্ণের মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ব্রিটিশ শাসকের বিভেদনীতিকে দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন উমরের মতে- হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পার্থক্যের একটা অস্বাস্থ্যকর চেতনা বর্তমান ছিল। তাই এই ভেদজ্ঞানকে পুরোপুরি ইংরেজদের সৃষ্ট বলতে চান না। তবে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উভয়ের মনুষ্যত্বকে বহুলাংশে খর্ব

করেছে, একথা অনস্বীকার্য। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক বিরোধে। এ পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।[১] তাই শুধু ব্রিটিশদেরকে দায়ী করা যায় না। বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের আসাম, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার দায় এই ভেদনীতিকে দেওয়া যায় না। শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, “যে শিখ সম্প্রদায় জিন্নার দেওয়া অনেক প্রলোভনকে উপেক্ষা এবং প্রভূত রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে পাকিস্তানের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে ভারতের অঙ্গ হয়েছিল... তাঁরা এমনভাবে হঠাৎ পাকিস্তানের প্ররোচনায় পড়বে কেন? এই প্রশ্নের জবাব অন্যান্য ভারতবাসীদের দিতেই হবে।”[২] মুসলিমদের ক্ষেত্রেও অনেকটা একথা বলা যেতে পারে।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির চুড়ান্ত পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।[৩] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতি দেশভাগ। মিথ্যা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই অখণ্ডিত দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব চুড়ান্ত করার ফলে পূর্ববাংলা এবং অসম এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হল। পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে অন্য একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। ১৯০৫ -এর ১৬ অক্টোবর অবশেষে বঙ্গভঙ্গ ঘটে। এরপর শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু জাতীয়তাবাদী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের বিরোধিতার আরেকটি কারণ ছিল তা হল সমসাময়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পেছনে যে ধর্ম ও সম্প্রদায়বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা মুসলমানদের এই আন্দোলনের বিরোধী করে তোলার পথে সহায়তা করে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িকতা কুৎসিতভাবে রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিল। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক চাপকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়া পড়েছে ধর্মীয় মনোভাবে এবং সামাজিক আচরণে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতিতে।

হিন্দু জমিদারের কাছে বাংলা ভাগের পরিণাম ছিল পূর্ববঙ্গে তাদের আধিপত্য চলে যাওয়া; অন্যদিকে মুসলমান উচ্চ-মধ্যবিত্তের কাছে বঙ্গভঙ্গ মানে পূর্ববঙ্গে মুসলমান-প্রধান একটি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সব হিন্দু-মুসলিমরা একজোট হননি। অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণেই পৃথকভাবে থেকেছে এই আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্যেও দু’একটি জায়গায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। মুসলমান চাষিও যোগ দিয়েছে সেই দাঙ্গায়; দাঙ্গা তাদের কাছে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটা প্রকাশ।[৪]

অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাময়িক মিলন থাকলেও তার ভিত শক্ত ছিল না। তাই কয়েক বছরের মধ্যেই আবার কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গে কয়েকটি অঞ্চলে দাঙ্গা বাঁধে। কংগ্রেস এবং লীগের সম্পর্ক যত তিক্ত হতে থাকে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ততই বাড়তে থাকে। ১৯৪০, মার্চে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলে লীগ পাকিস্তানের দাবি এমনভাবে প্রচার করতে থাকে গ্রামের সাধারণ মুসলমানরাও অনুভব করে পাকিস্তান ছাড়া কোন মুক্তির উপায় নেই। দুই সম্প্রদায়ের নেতারা গ্রামে এবং শহরে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালায়। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান দাবীর আন্দোলন যেমন প্রবল হয়, তেমনি জঙ্গি-উগ্র হিন্দু আন্দোলনের প্রক্রিয়াও প্রবলভাবে চলতে থাকে। ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা প্রবল হয়ে পড়ে। ১৯৪৬ কলকাতা দাঙ্গা তা প্রমাণ করল।

১৬ আগস্ট কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে শুরু হয় বীভৎস ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমানরা নিজস্ব সাম্প্রদায়িকতার হিংসা নিয়ে দাঙ্গায় মেতে ওঠে। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে টানা

দাঙ্গা চলতে থাকে কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-গড়মুক্তেশ্বর-পাঞ্জাবে। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা চলে। দাঙ্গার পরিণাম স্বরূপ ঘটে দেশভাগ। কারণ কোন সম্প্রদায়ই চায়নি অন্য সম্প্রদায়ের অধীনে থাকতে। ফলে দেশভাগের জন্য সরব দাবি হয়ে পড়ে সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। অর্থাৎ দেশভাগের দাবির পেছনে জনসমর্থন যেমন ছিল তেমনি তাদের মনকে সেইভাবে তৈরি করে দেবার কাজেই হাতিয়ার ছিল দাঙ্গা। শুধু শহরের মানুষদের মধ্যে নয় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মনও ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়েছিল দেশভাগের জন্য। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বার্থে দেশভাগ ঘটে। রাজনৈতিক নেতারা ভেবেছিলেন দেশভাগ হয়ে গেলে আপাতত দাঙ্গা-খুনোখুনি বন্ধ হবে। কিন্তু সেই স্বস্তিবোধ বেশিদিন টেকেনি।

১৯৫০ জানুয়ারি থেকে পূর্ববঙ্গের খুলনা-ঢাকা-বরিশাল-রাজশাহী-ফরিদপুরে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় তার প্রতিক্রিয়া ঘটে মুসলিমদের আক্রমণের ওপর দিয়ে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ খুব একটা বড় দাঙ্গা ঘটেনি। কিন্তু ১৯৬৪ পূর্ববঙ্গে আবার এক ব্যাপক দাঙ্গার শিকার হতে হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে। দেশভাগ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ছোটখাটো দাঙ্গা ঘটে। প্রত্যেকটি দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষকে এপার-ওপার দেশত্যাগ করতে হয়েছে, বা বাধ্য করা হয়েছে। কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও জোর করে নারীদের উপর অত্যাচার, ধর্ম স্থানের উপর আঘাত, লুটপাট, কোথাও খুনও করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অ-মুসলমানদের প্রতি ইসলামিক নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। আনসার বাহিনী ও পুলিশ ব্যাপক ভাবে অত্যাচার চালায়। নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, সম্পত্তি ধ্বংস করতে থাকে। এপারে যখন দাঙ্গা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেমন হাজার হাজার মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, বা বাধ্য করা হয়েছেন। তেমনি ওপারের দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে সারা জীবনের বন্ধু, সাথী এবং পাড়া-প্রতিবেশী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তাঁরা। খানদানি পরিবারগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাই- ভাইয়ের থেকে পৃথক হল, যাদের গৃহ ছিল তারা গৃহহীন হল এবং লাখপতি ভিখিরি হয়ে গেল।

দেশভাগের প্রধান কারণ ধর্ম। গান্ধীজির যে আশঙ্কা ছিল তা সত্যি হল। অর্থাৎ দেশভাগের পরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলে ছিল। তবুও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অসহিষ্ণুতা পার হয়ে সম্প্রীতির আবহ রচনায় অনেকেই কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটাতে এগিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল কার্যকরী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যেও সম্প্রীতি স্থাপনে নিরত ছিল হিন্দু-মুসলিম। কোনো কোনো অঞ্চলে তখন অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ মানুষ। কোথাও দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে গঠন করেছিল প্রতিরোধ কমিটি, দাঙ্গাবিরোধী সমিতি। যুবকরা সারারাত ধরে নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত। অনেকে নিজের জীবন দিয়ে দাঙ্গার বিরোধিতা করেছেন। হিন্দুপাড়ায় মুসলমান পরিবারকে যেমন সেনাবাহিনীর নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দানের কাহিনী আছে তেমনি মুসলমান পাড়ায় হিন্দুদের আশ্রয়দানের কাহিনীও আছে।[৫] দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল শ্রমিকরাও। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি মিছিল এবং শান্তি আবেদন প্রচারের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পর সংখ্যালঘুরা নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নিরাপত্তার অভাবে কেউ ভারতে এসেছে আবার কেউ ওপারে বর্তমান বাংলাদেশে চলে গেছে। এই

জনপ্রব্রজনের সময় তাদেরকে নিরাপদ ভাবে পারাপার করে দিতেও দেখা গেছে উভয় দেশের সংখ্যাগুরুদের।

দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য বাংলার পশ্চিমে যতটা পরিমাণ সৃষ্টি হয়েছে পূর্বে কিন্তু এতটা হয়নি। বাংলাদেশের মানুষদের কাছে দেশভাগ দাঙ্গার থেকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হতে হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই। তাই যেসব দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে দাঙ্গার প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে গল্পকারদের লেখায়। বাংলাদেশের ছোটগল্পকার আব্দুল হক, শাজেদ আলী, মিন্নাত আলী, হাসান হাফিজুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, ইব্রাহীম খাঁ, আশরফ সিদ্দিকী, আশরাফ-উদ-জামান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সুচরিত চৌধুরী, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, পূরবী বসু, হায়াৎ মামুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কায়েস আহমেদ, সেলিনা হোসেন প্রমুখদের রচনায় দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গল্পকার সাম্প্রদায়িকতাকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে দুজন গল্পকারের দুটি গল্প আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত গল্পগুলি হল, – হায়াৎ মামুদের ‘অবিনাশের মৃত্যু’, আব্দুল মান্নান সৈয়দের ‘দাঙ্গা ১৯৬৪’। এবার নির্বাচিত গল্পগুলিতে দাঙ্গা, দেশভাগ ও দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গার প্রসঙ্গ কীভাবে উঠেছে এবং গল্পগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির ছবি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করা হল।

দেশভাগ দাঙ্গার কারণে বহু সংখ্যালঘুরা দেশ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও অনেকের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়নি। কারণ তারা বিশ্বাস করে থেকেছিল যে হয়তো একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যাদেরকে বিশ্বাস করে রয়ে গেলেন সেই তারাই একসময় অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে।

হায়াৎ মামুদের ‘অবিনাশের মৃত্যু’ গল্পে দেখি অবিনাশ বিশ্বাস করে দেশে থেকে ছিল। আত্মীয়-সজন-বন্ধু-বান্ধব কেউই তার বিশ্বাসকে নড়াতে পারেনি। তার মনে সব সময় প্রশ্ন ছিল কেন অবিশ্বাস করব? অবিনাশ তার মৃত্যুর কথা কখনো মাথায় আনে না। সে মনে করে এখনও মানবতা আছে, মনুষ্যত্ব আছে, বিবেক আছে।

অবিনাশ তার প্রেমিকা সর্বাণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার দেখা পায় না। সর্বাণীরা সেখান থেকে নিরাপত্তার অভাবে কলকাতায় চলে গেছে। অবিনাশ তার বন্ধু রহমতের বাড়ি আসে বিমূঢ় অবস্থায়। সর্বাণীকে পাওয়ার জন্য রহমত অবিনাশকে কতবার এখানে না থেকে কলকাতায় চলে যাওয়ার কথা বলেছে। রহমত জানে অবিনাশের বিশ্বাসের মুল্য কেউই দেবে না। তাই অবিনাশকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। রহমত নিজের বন্ধুর প্রাণ নিয়ে বড়ই সংশয়ে থাকে। মাস্টার মশাই সুখদারঞ্জন অবিনাশকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চান। সুখদারঞ্জনের বিশ্বাস ‘এখানে মানুষ থাকে?’ মানুষ থাকে না। কিন্তু অবিনাশ রহমতের হৃদয় বেদনা সবকিছু দেখতে পেয়েও কেবলমাত্র নাঃ উচ্চারণ করে। বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় উচ্চারণ তার অনীহা ও নির্বেদ, হতাশা ও যন্ত্রণা প্রচার করে।

রহমত কিংবা মাস্টারমশাই সুখদারঞ্জন মনে করেন অবিনাশ কেন মৃত্যুর আশঙ্কায় এখানে থাকবে? কিন্তু অবিনাশ মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না । তার মনে হয় জীবনকে ভয় না করে বিশ্বাস নিয়ে পড়ে থাকা প্রাথমিক কাজ। তাই মন্ত্রোচ্চারণের মতো রহমতকে বলে -

"অবিশ্বাসী হয়ে বেঁচে থেকে কি হবে রহমত?"[৬]

দাঙ্গায় বন্ধু গৌতম মারা যায়। গৌতমের কোন শত্রু না থাকা সত্ত্বেও তাকে মরতে হয়েছে। দীপক বেঁচে আছে শুধু মিজানের বুড়ো বাপ কোরান ছুয়ে মিথ্যে কথা বলেছেন বলে। দাঙ্গায় অবিনাশ ও রহমতের বন্ধু গৌতমকে মরতে হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছে অবিনাশের পাড়ার বাড়িগুলি। গল্পে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও লক্ষ করা গেছে। যেমন অবিনাশকে রহমত তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। বেলা বেড়ে গেলে রহমতরা অবিনাশকে একা আসতে দিতে চায় না। বাড়িতে ফেরার সময় রহমত অবিনাশকে রিক্সায় তুলে দিয়েছে। অবিনাশ রহমতের বন্ধু দীপকদেরকে আশ্রয় দিয়েছে মিজানরা। অবিনাশ বলল –

> "আসার পথে দেখলাম মিজান বাজার করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের জন্য। পরশু রাত্রে মিজানের বুড়ো বাপ কোরান ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। ফলে দীপকরা বেঁচে আছে।"[৭]

এতকিছুর পরেও অবিনাশের বিশ্বাস ভেঙে যায়নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ জারি হয়ে যায়।

অবিনাশ রহমতের বাড়ি থেকে নিজের ঘরে চলে যেতে চেয়েছে, কারণ তার ভেতরের বিশ্বাসী সত্তা তাকে কোথাও অবিশ্বাসী থাকতে দেয়নি। তাই রহমত যখন অবিনাশকে থেকে যেতে বলে তখন অবিনাশের সত্তা বলে ওঠে –

> "কিন্তু অবিনাশ, কার ভয়ে, কেন, কী জন্য, তুমি বাড়ির বাইরে থাকবে আজ? কখনো তো এমন হয়নি অতীতে।"[৮]

অবিনাশ চারপাশের মৃত্যুর হত্যালীলা দেখে সাময়িকভাবে সে ভীতু হলেও পরক্ষণে আবার তার বিশ্বাসের সত্ত্বা তাকে অটুট রেখেছে। শিক্ষক মহাশয় অবিনাশকে এত রাত্রে একাকে হাঁটতে দেখে মনে মনে আতঙ্কিত হলেন। অবিনাশকে শিক্ষক মহাশয় তার বাড়িতে থেকে যেতে বললেও অবিনাশ অটল থেকেছে তার সিদ্ধান্তে। সাইরেন বাজলেও অবিনাশ না থেমে দ্রুত পা ফেলে। কিন্তু পুলের কাছে আসতেই এক বীভৎস অন্ধকার তাকে ঘিরে ফেলে। অবিনাশকে কারও হাতে খুন হতে হয়। বিশ্বাসই তাকে আজ খুন করেছে। অবিনাশের চতুর্গুণ বিশ্বাস সবকিছু শেষ করে দেয়। যে অবিনাশ মৃত্যুকে মানেনি, যে অবিনাশ নাস্তিকে বিশ্বাস করে না, যে অবিনাশ এতদিন সভ্যতা, প্রেম, বিবেককে পাশে থাকতে বলেছে সেই অবিনাশকে বিশ্বাস ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হল। দাঙ্গার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে যে অবিনাশের মৃত্যু ঘটল তা শুধু একটা প্রাণের মৃত্যু নয়। এই মৃত্যু সভ্যতার মৃত্যু, এই মৃত্যু, প্রেমের মৃত্যু, বিবেক আর বিশ্বাসের মৃত্যু।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'দাঙ্গা ১৯৬৪' গল্পটি দেশভাগ পরবর্তী ৬৪ -এর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত। গল্পটিতে একদিকে দাঙ্গার বীভৎস রূপ, আদিম প্রবৃত্তি যেমন আছে তেমনি দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। সংখ্যালঘু ভয়ার্ত নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করতে দেখা গেছে। গল্পে আত্মকথনরীতির প্রয়োগ করেছেন লেখক। কেন্দ্রীয় চরিত্র কবির সে মূল বক্তা; শ্রোতা গৌণ চরিত্র। কবিরের স্মৃতিচারণায় ফাঁকে ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে পাঠককে অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে আসে। গল্পের কথক কবির ও অমল দুই বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে অমলের বোন শোভাও একসঙ্গে খেলাধুলা, পড়াশোনা করেছে। তারা একে অপরের বাড়ি যাতায়াত করত। কবির মুসলিম বলে অমলের জ্যেঠিমা গ্লাসে জল দিতে উঠোনে। উঠোনে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিত। তবুও করিমের এক একবার মনে হতো

> "আমরা মুসলমান, অমলরা হিন্দু, খুব ছোটো হলেও সেদিন নিজেকে আমার খুব অপমানিত মনে হয়েছিল।"[৯]

কিন্তু কবির অমলের মাকে খুব ভালোবাসত। একটি স্নিগ্ধ পবিত্রতা তাঁকে ঘিরে থাকত। এমন ভাবেই তাদের দিন কাটত। এক সময় হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হয়। ঢাকা থেকে মফস্বল শহর পর্যন্ত দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিক কালো হাওয়ায় ভরে যায়। বাসে চড়তে ভয় পেতে থাকে লোকজন। হঠাৎ একদিন হিন্দুপাড়ায় আগুন লাগে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সবাই। স্কুল-কলেজ অনিয়মিত হয়ে যায়, রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় মানুষের লাশ। দাঙ্গায় আগুন লাগানো বাড়িগুলোকে নেভানোর ব্যবস্থা করে পাড়ার মুসলিম যুবকরা।

> "আমরা, পাড়ার যুবকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দল বেঁধে এগোলাম।"[১০]

বেশ কয়েকদিন সচেতনতা দেখা যায় জেলার কমিশনার সাহেব, পুলিশদের মধ্যে। শহরের যুবকরা মিলে লোকজনদের বোঝাতে থাকে। রাত জেগে পাহারা দেয়। কবিরের উদ্যোগে সমিতিও গড়ে ওঠে।

> "আমরা, যুবকেরা মিলে, একটি দাঙ্গাবিরোধী সমিতি করলাম; আমাকে নির্বাচন করা হল সাধারণ সম্পাদক।"[১১]

সেই দাঙ্গার ধিকিধিকি আগুন ভিতরে জ্বলতে থাকে। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে যেতে থাকে সীমান্তপার। একে একে হিন্দু পরিবারগুলি যেন পাচার হয়ে যায়। কবির অমলদের বাড়ি পাহারাও দিয়েছে। কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। অমলরাও একদিন মা মাসিদের নিয়ে কলকাতায় রেখে আসার কথা বলে। বোন শোভাকে কবিরের আশ্রয় রেখে যায়। কবির তাদের সাহায্য করে,

> "ওরা চলে যাচ্ছে, আমি অন্তত যতটা পারি সাহায্য করব। সে রাতে শোভাকে আমার ঘরে থাকতে বলে আমি ওদের এগিয়ে দিতে বেরোলাম।"[১২]

কবির আর শোভা দুজন একটা ঘরে থাকে। শোভা অনেকটা মানিয়ে নিতে পেরেছিল অবস্থাটা। কিন্তু কবিরের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। সে নিজেকে সংযত করতে পারেনি। শোভাও ভয়ে বাধা দিতে পারেনি। সুযোগসন্ধানী হয়ে শোভাকে নষ্ট করে। শেষে কবির নিজেকে অপরাধী হিসেবে দেখতে থাকে। তার মধ্যে অনুশোচনা জাগে। আশ্রয়প্রার্থীর উপর সুযোগ নেওয়ার জন্য তাই কবিরকে শেষে বলতে শুনি,- 'আমার সমস্ত বুক খালি হয়ে গিয়েছিল'।[১৩]

গল্পের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকলেও কবিরের অপরাধের সঙ্গে তার যোগ বহিরঙ্গে, এ স্খলন তার ব্যক্তিগত রিরংসাপ্রসূত। আপত দৃষ্টিতে কবির অসাম্প্রদায়িক। আত্মদ্বন্দ্বে আর অপরাধবোধে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার প্রমাণ, তার শোভার দিকে তাকাতে না পারা, তাকে কিছু বলতে না পারায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এ কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত্যা করে মানবিকতার সার্বজনিক মূল্যবোধকে, সর্বোপরি মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত করে। স্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধগুলির নিধন ঘটে অবলীলায়। 'মানুষ' শব্দটির সত্যতা হারায়। দেশকে সমাজকে নিয়ে যায় এক সর্বনাশা ধ্বংসের পথে। সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি মুছে ফেলে সৌহার্দ্যের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হবে। তা না হলে এই মানসিক বিভাজন আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। জাতি হিসাবে অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে হবে উভয় সম্প্রদায়কে। কতজন মুসলিম আর কতজন হিন্দু দাঙ্গায় মারা গেছে একথা না বলে কতজন মানুষ মারা গেছে এটা দেখা জরুরী। বর্তমানে দেশে বা

সমাজে ধর্মের জিগির তুলে মানুষকে যেভাবে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে তা সত্যিই খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের সবাইকে একে অপরের পাশে থাকতে হবে। আমাদের এই প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে, তবেই সম্প্রীতি আরো অটুট থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। উমর, বদরুদ্দিন, নবম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, সাম্প্রদায়িকতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ- ১২।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫, দাঙ্গার ইতিহাস, অম্লান দত্ত (ভূমিকা অংশ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ- পাঁচ।
৩। উমর, বদরুদ্দিন, নবম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, সাম্প্রদায়িকতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ- ৩০।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, কলকাতা, পৃ- ২১।
৫। পূর্বোক্ত, পৃ- ৫১।
৬। মামুদ, হায়াৎ, *'অবিনাশের মৃত্যু',* দেশভাগের গল্প বাংলাদেশ, (সম্পাদনা – সুশীল সাহা), গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১৭, পৃ- ১১৫।
৭। পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৬।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৬।
৯। সৈয়দ, আবদুল মান্নান, *'গল্প ১৯৬৪',* দেশভাগের গল্প বাংলাদেশ, (সম্পাদনা – সুশীল সাহা), গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ২০১৭, পৃ- ২০২।
১০। পূর্বোক্ত, পৃ- ২০৫।
১১। পূর্বোক্ত, পৃ- ২০৫।
১২। পূর্বোক্ত, পৃ – ২০৭।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃ – ২০৮।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। সাহা, সুশীল (সম্পাঃ), প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭, দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ, কলকাতা, গাঙচিল।
২। উমর, বদরুদ্দিন, নবম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫, দাঙ্গার ইতিহাস, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯, ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ।
৫। গোস্বামী, অর্জুন (সম্পাঃ), প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭, দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলকাতা, গাঙচিল।
৬। রায়, রাহুল (সম্পাঃ), দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশ বদলের স্মৃতি, কলকাতা, গাঙচিল।
৭। গোস্বামী, অর্জুন (সম্পাঃ), জানুয়ারি ২০১৯, বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভাগ, কলকাতা, গাঙচিল।
৮। আখতার, সানজিদা, প্রথম প্রকাশ - জুন ২০০২, বাংলা ছোটোগল্পে দেশবিভাগ (১৯৪৭ - ১৯৭০), ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'সময়, আমার সময়' : প্রেক্ষিত নকশালবাড়ি আন্দোলন

সুব্রত পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

সারসংক্ষেপ: ১৯৭১ সালে 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' কলকাতা শহরের সাধারণ জনমানসে ও সমাজে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা ও সমাজের দ্বন্দ্বকেই লেখক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা আলেখ্যের সমন্বয়ে তুলে এনেছেন 'সময়, আমার সময়' উপন্যাসের পাতায়। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রয়েছে ভয়ের আবহ। উপন্যাসের নায়ক নিজেও একজন শ্রেণিশত্রু রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের সেই সময়ের অন্য নাম তার কাছে 'ভয়' বলেই মনে হয়েছে। এই ভয় মৃত্যুভয়। মৃত্যু যন্ত্রণার মাত্রাভেদ বিচার করে যমদূতের হাতে পাইপগানকেই নায়কের বেশি পছন্দ ছিল। বিনীতার সঙ্গে নায়কের একটা ভালোলাগা বা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ঠিকই, তবে সেই সম্পর্ককে সম্মান জানানো অসম্ভব ছিল। কারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল মূল্যহীন। আততায়ীরা যে কোনও মুহূর্তেই জীবন কেড়ে নিতে পারে। খবরের কাগজে শুধুই হত্যার ফর্দ। নকশাল আন্দোলনের 'খতম' অভিযানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, শ্রেণিশত্রুর নামে যে ব্যক্তিহত্যা চলছিল সেখানে সমাজসেবক, ডাক্তার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, লেখক, শিক্ষক, রিকশাওয়ালা, আভিধানিক, অনুবাদক কোনও বাছবিচার ছিল না। মানুষের জীবনের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। চরম মানসিক সংকট ও দোটানায় মানুষ ছিল নিষ্পেষিত। লেখক মনে করেছেন, শুধু হত্যার রাজনীতি কখনই একটা সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি শেষপর্যন্ত ১৯৭১ সালের ভয়মিশ্রিত শহর কলকাতার জীবনধারাকে মেনে নিতে পারেনি, সেই ভয়ার্ত সময় ও সমাজকে অতিক্রম করে সে প্রত্যাশা করেছে এক সুন্দর সময় ও নতুন সমাজের। এখানেই উপন্যাসটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
মূল শব্দ: নকশালবাড়ি আন্দোলন, কলকাতা, ভয়, শ্রেণিশত্রু, ব্যক্তিহত্যা, সমাজ, সময়, রাজনীতি।

মূল আলোচনা:

"আমরা, লেখকেরা, এই ১৯৭১-এ কীভাবে আছি, কীরকম বেঁচে আছি, তার একটা দলিল, একটা আলেখ্য রচিত হবে না?...সম-সময়, তার প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য নেই, তার ব্যাখ্যাই যদি না-করি, তবে আমরা লেখক কীসে, শিল্পী হিসেবে কীসের অভিমান?"[১] এই অভিমান থেকেই ১৯৭১ সালে সন্তোষকুমার ঘোষ 'সময়, আমার সময়' (১৯৭২) উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৭১ সালের কলকাতা শহর। অর্থাৎ ১৯৭১ সালে কলকাতা শহরের বুকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার ওপর একটা বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই বিষয়টিকে লেখক যেভাবে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাকেই তিনি উপন্যাসে রূপদান করেছেন। ১৯৬৭ সালে ২৫শে মে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে কৃষকদের অধিকারের দাবিতে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলন, যা 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' নামে পরিচিত। অতি দ্রুত এই আন্দোলন একটা বৃহত্তর রূপ লাভ

করে। উত্তরবঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে এই আন্দোলন কলকাতাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্মল ঘোষ 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "কৃষককে বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৭-র মার্চ মাসে নকশালবাড়ী এলাকায় যে আন্দোলনের সূত্রপাত তা অচিরাৎ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের এই রাজনীতি কার্যত এতাবৎকালের লালিত সমাজ সম্পর্কিত সমস্তপ্রকার চিন্তাচর্চার মূল ধবে নাড়া দিল।"[২]

নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাহিত্যিক নিজেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যকর্মে ব্যক্ত করেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষও এ বিষয়ে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নকশালবাড়ি আন্দোলন কীভাবে, কেন সংঘটিত হয়, নকশালপন্থিদের রাজনৈতিক জীবন এবং আন্দোলন কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছে সেসব আলোচনায় লেখক মনোনিবেশ করেননি, এই আন্দোলন কলকাতার সাধারণ জনমানসে ও সমাজে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা ও সমাজের দ্বন্দ্বকেই লেখক তুলে এনেছেন উপন্যাসের পাতায়। তবে লেখক কোনও একটি নির্দিষ্ট আখ্যান বা কাহিনিকে অবলম্বন করেননি, কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা আলেখ্যের সমন্বয়ে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন— "'সময়, আমার সময়' লেখাটি আখ্যায়িকা ততটা নয়, যতটা আলেখ্য।"[৩]

উপন্যাসের শুরু থেকেই রয়েছে ভয়ের আবহ। ভয় উপন্যাসে বর্ণিত বিপর্যস্ত জীবনের ইঙ্গিত বহন করছে। নকশালবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিশত্রুদের খতম করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। উপন্যাসের নায়ক নিজেও একজন শ্রেণিশত্রু রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তার নামে পোস্টার পড়েছে, হুলিয়া বেরিয়েছে। সেই কারণেই সে একটা বারোয়ারি বাড়ির চিলেকোঠায় আত্মগোপন করেছিল। ১৯৭১-এর সেই সময়কে সে না পারছিল সহ্য করতে, না পারছিল আঁকড়ে ধরতে। সময়ের অন্য নাম তার কাছে 'ভয়' বলেই মনে হয়েছে—

> "সে শুয়ে আছে একটা ব্যারাক-বাড়ির চোরা-কুঠুরিতে— এখানে তার অস্তিত্বের কথা কেউ জানে না। জানে, অন্তত একজন। তার ভয়। ছায়ার মতো, গোয়েন্দার মতো, তার পিছু নিয়ে এখানে এসেছে, ঢুকে গেছে খাটের তলায়, তোশকের নীচেও ছারপোকার মতো ছেয়ে গেছে। কোথাও খট করে শব্দ হলেই সে চমকায়, মনে হয়, তারা এসেছে, কারা এসেছে। নামহীন কায়া কতকগুলি, সে চেনে না, কিন্তু তারা চিহ্নিত করে রেখেছে তাকে, হিংসার ছুরি দিয়ে ছুঁচলো করা তিরে।"[৪]

এই ভয় মৃত্যুভয়। জীবনকে ভালোবেসে মানুষ দীর্ঘজীবী হতে চায়, পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রাণ' কবিতায় বলেছেন—

> "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"[৫]

অন্যদিকে মধুসূদন দত্ত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় বলেছেন—

> "জন্মিলে মরিতে হবে,
> অমর কে কোথা কবে,
> চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?"[৬]

মধু কবির মতো ক'জন মানুষ এই নির্মম সত্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন? মৃত্যু অনিবার্য। আবার সব মৃত্যুই যে "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।"[৭] —তা নয়। মৃত্যুর রকমফেরের মধ্যেও রয়েছে বাছবিচার। যেমন, কলেরায় মৃত্যুর বদলে স্ট্রোক কিংবা হার্টফেল উত্তম— যন্ত্রণার পরিমাণ কিছুটা কম। যমদূতের হাতে পাইপগানকেই নায়কের বেশি পছন্দ ছিল, তবে কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু বিধাতার বিধানের ওপরই নির্ভরশীল—

> "বলা বাহুল্য, পাইপগানকেই সবচেয়ে প্রিয়তম ঠেকেছে, কিন্তু বলা যায় না, পাবই যে। এ-বিষয়ে বিধাতার বিধান বড়ই কঠিন। এমনকী পুণ্যাত্মা হলেও তিনি ইচ্ছামৃত্যু অথবা বাঞ্ছিত মৃত্যু দেন না, পুণ্যাত্মাদের মধ্যেও পক্ষপাত ঘটান মরণের প্রকরণে। গান্ধীজী প্রস্থান করলেন, 'হায় রাম' মুখে নিয়ে, তিনটি মাত্র গুলিতে। কিন্তু যিশু— ঈশ্বরের পুত্র— তিনিও বলেছিলেন 'ও পিতঃ', কিন্তু তবু তাঁর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। তাঁর জন্য তিলে তিলে মৃত্যু, ক্রুশ-কাষ্ঠ আর পেরেক ছিল নির্ধারিত।"[৮]

সুতরাং মৃত্যু চিন্তার বিষয় নয়, মৃত্যু যন্ত্রণার মাত্রাভেদই বিচার্য। নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে কতটা দাগ কেটেছিল, তা এখানে স্পষ্ট।

বিনীতার সঙ্গে নায়কের একটা ভালোলাগা বা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে নায়ক মনে করেছে, যে দুঃসময়ের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে, তাতে কোনওপ্রকার ভালোলাগা-ভালোবাসাকে সম্মান জানানো অসম্ভব। কারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে মূল্যহীন। আততায়ীরা যে কোনও মুহূর্তেই জীবন কেড়ে নিতে পারে। সেই সময়টাকে লেখক 'লম্পট এক দস্যু' মনে করেছেন। খবরের কাগজে শুধুই হত্যার ফর্দ। বিনীতা ও নায়কের কথোপকথনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে—

> "সে বলল, 'কালকের টোটাল কত?'
> 'টোটাল, কীসের?'
> সে হাসল।— 'বাজার খরচের কথা বলছি না। ডেথ কত?'
> 'কাগজে তো কুড়ি দিয়েছে। সব নাকি শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ বলছে খুঁজেও পাওয়া যায়নি সব।'"[৯]

বিনীতার দাদা সুব্রতেশ একজন সমাজসেবক। নকশাল আন্দোলনের সময় ঘটনাচক্রে একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সে। কী দেখেছে আর কাকে দেখেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই পুলিশ তার ওপর নির্মম অত্যাচার করেছে। আবার আন্দোলনকারীদের ধারণা সে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানিয়েছে। এই সন্দেহ থেকেই সে হয়ে উঠেছে শ্রেণিশত্রু এবং আন্দোলনকারীরা তাকে হত্যা করেছে। নায়ক জানায়—

> "পর পর দুটো গুলি, বিনীতা, আমি শুনতে পাচ্ছি। পুলিশও মারল, ওরাও মারল। পুলিশ, আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছিল, ওরা সেটা পুরো করে দিল। ব্যস, আর কী। এক নিমেষে সুব্রতেশ শ্রেণি-শত্রুর দলে প্রোমোশন পেয়ে গেল।"[১০]

সময় ও সমাজের বীভৎস রূপকে লেখক এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাইতো নায়কের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে মানুষের মৃত্যুর রোমহর্ষক কাহিনি— রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে থাকে মৃতদেহ,

কোথাও আলকাতরা মাখিয়ে ফেলে রাখা হয় মড়াদের, আবার কোথাও ধড় মাথা আলাদা করে ফেলে দেয় ম্যানহোলে বা ভাসিয়ে দেয় গঙ্গার জলে—

> "ঠিক এইরকমই আলকাতরা মাখিয়ে ওরা অনেক সময় ফেলে রাখে মড়াদের, না? কিংবা ধড় মুন্ডু আলাদা করে ফেলে দেয় ম্যালহোলে— ...সবাইকে নয়। ম্যানহোলে সবাইকে ফেলে না। কাউকে কাউকে গঙ্গাতেও ভাসিয়ে দেয়।"[১১]

উপন্যাসের নায়ক একজন লেখক। নকশাল আন্দোলনের 'খতম' অভিযান তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। প্রভাব পড়েছে তার সাহিত্যচর্চায়। সমাজের ক্ষতকে সে অস্বীকার করতে পারেনি, তাই রসঘন উপাদানের পরিবর্তে সময়কে ধরতে চেয়েছে নিজের সাহিত্যকর্মে। বিনীতাকে সে জানিয়েছে—

> "কিন্তু সেরকম লেখা আর পাবে না বিনীতা, তোমরা দশজন মেয়ে কখনও চিত কখনও বালিশে বুক চেপে উপুড় হয়ে পড়ে যা গিলতে আর শ্বাস ফেলতে ঘনঘন। পায়ের তলায় সুড়সুড়ির মতো মজা— আমার লেখায়, আর পাবে না। ...আমি এবার সময়, আমার সময়কে ধরতে চাইছি।"[১২]

ঔপন্যাসিকের ভাবনাই এখানে নায়কের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 'ভয়' থেকে মুক্তি পেতে সুযোগ পেলেই স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতে বিচরণ করেছে উপন্যাসের নায়ক। স্বপ্নের মাধ্যমে সে কখনও চলে গেছে মর্গে, আবার কখনও আদালতে। বর্তমানকে উপেক্ষা করে স্বপ্নে বিচরণ করলেও সমসময়ের ওপরই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এই সমসময়ের বিশ্লেষণই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। সময়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ স্বয়ং এখানে নায়ক হয়ে উঠেছেন।

প্রথমে নায়ক স্বপ্নে চলে যায় একটি মর্গে—"ঠান্ডা ঘর, ঠান্ডা ঘর এই মর্গ, লাশকাটা কুঠিটা। স্ট্রেচারে-বেডে-টেবিলে মড়ারা ছড়ানো। কোনওটা কাটা-ছেঁড়া, কোনওটা আস্ত, ডাক্তারেরা সবগুলো শবের সমীক্ষা কাল সন্ধ্যায় সারতে পারেননি, তাই দরজায় কুলুপ এঁটে মড়া-ছড়ানো ঘরটা ছেড়ে গেছেন।"[১৩]

মর্গে এক পূর্বপরিচিতা রমণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। রমণীর নাম এলাচ, সে মৃত। উভয়ের কথোপকথনে জানা যায়, এলাচের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, এক চোর-ছিনতাইকারী গয়নার লোভে তাকে খুন করেছে। নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক ভয়াবহতার সুযোগে শহর কলকাতা জুড়ে চোরছ্যাঁচড়, লুটেরা, ছিনতাইকারীদের উৎপাত যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এলাচের মৃত্যু সেই বিষয়কেই নির্দেশ করে।

এরপর নায়ক আসে আদালতে, ভাবীকালের এক বিচারসভায়—"এটা ভাবীকাল। বিচারসভা বসেছে ভাবীকালে।"[১৪] সেখানে ১৯৭১-এর কলকাতা শহরের মানুষের জীবনযাত্রার বিচার করা হয়েছে। কাঠগড়ায় আগত সকলেই মৃত এবং নকশাল আন্দোলন কীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে তাই আদালতের বিচার্য। নায়ক একজন উকিলের ভূমিকা পালন করেছে। জেরায় উঠে এসেছে, চাঁদা না দেওয়া ও প্রতিবাদ করার অপরাধে প্রথম ব্যক্তি আন্দোলনকারীদের হাতে নিহত হয়েছে। মাসিক পাঁচশো টাকা উপার্জন করা ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা দিতে না পারায় খুন হয়েছে। আবার একজন ব্যবসায়ী খুন হয়েছে চাঁদা দেওয়ার অপরাধে— "চাঁদা দিয়েছিলাম আমি। দেওয়াটাই কাল হল। যাদের দিলাম, তাদের বিপক্ষ দল আমাকে মারল। আমি একজন ব্যবসায়ী।"[১৫] অর্থাৎ উভয় সংকট। চাঁদা দিলেও বিপদ না দিলেও

বিপদ। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। চরম মানসিক সংকট ও দোটানায় মানুষ ছিল নিষ্পেষিত।

বোমা বানাতে গিয়ে আন্দোলনকারী একটা ছেলের মুখ উড়ে গিয়েছিল, তার চিকিৎসার জন্য না যাওয়ার কারণে এবং ঘটনাটা জানার জন্য এক ডাক্তার খুন হয়। এক রিকশাওয়ালা একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজনৈতিক কর্মীরা তাকে মেরে ফেলে। একজন আভিধানিক সন্ত্রাস শব্দের অর্থ ভীরুতা ও শ্রেণিসংগ্রামের অর্থ গুপ্তহত্যা লেখায় খুন হয়। মহাভারতের একটা সংশোধিত রূপান্তর বের করার অপরাধে একজন অনুবাদককে গণ আদালতে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ শ্রেণিশত্রুর নামে যে ব্যক্তিহত্যা চলছিল সেখানে ডাক্তার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, লেখক, শিক্ষক, রিকশাওয়ালা কোনও বাছবিচার ছিল না। তবে মহাজনিরা বহাল তবিয়তেই ছিল। কলকাতা ছেড়ে গুজরাট, কচ্ছ, মাড়বারে গিয়ে স্বচ্ছন্দে নিজেদের ব্যাবসা চালিয়েছে—

> "যারা ছিল পাইকার তাদের কিছু লোকসান গেছে যদিও, তবু কারবার গুটিয়ে সব্বাই চলে গেছে যার যার মুলুকে— গুজরাট, কচ্ছ, মাড়বার। সেখানে ব্যাবসা চালাচ্ছে ফের মনের সুখে।"[১৬]

নকশালপন্থি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছেলেটি শ্রেণিশত্রু হত্যার প্রসঙ্গে পিতাকে বলেছে— যারা দালাল, ব্যাবসাদার, সরকারের ইজারাদার, শ্রেণিস্বার্থের বাহক ও উপস্বত্বভোগী তাদেরই হত্যা করা হয়। পিতার মনে হয়েছে, সে নিজেও একজন উপস্বত্বভোগী এবং পুত্রের দৃষ্টিতে একই অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধবোধ থেকে এবং পুত্রকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে— "ওর কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না, তাই কষ্ট থেকে ওকে মুক্তি দিলাম, আমিই আমাকে মেরে ওকে বাঁচালাম।"[১৭] আবার শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী পুত্র নীলেশের মৃত্যুতে নকশালপন্থিদের ভয়ে কাঁদতে পর্যন্ত পারেনি। একদিকে পিতার আত্মহত্যা অন্যদিকে সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের কান্নার অধিকার হরণ— সমাজের চরম অসহায় অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

উপন্যাসের শুরুতে যেমন রয়েছে ভয়ের আবহ ঠিক তেমনই শেষেও রয়েছে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের জীবনচিত্র। এই ভয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। লেখক-শিল্পী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। তাইতো উপন্যাসের নায়কের সতীর্থ লেখক সর্বেশও ওয়ান্টেড ক্রিমিনালের মতো আত্মগোপন করে আছে। কারণ, লোকালয়ে ভয় আবার নিরিবিলিতেও রয়েছে জীবন-সংশয়। সর্বেশ মনে করে আততায়ীর হাতে খুন হওয়ার চেয়ে আত্মঘাতী হওয়া ঢের ভালো এবং আত্মঘাতী হলে চিরকুটে তার শেষ লেখা হবে—

> "আমার মৃত্যুর জন্য স্ব-সময়ই দায়ী, দায়ী এই কালের প্রত্যেকে।"[১৮]

শুধু হত্যার রাজনীতি কখনই একটা সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। লেখক জানিয়েছেন—

> "একটা মহৎ লক্ষ্যের পথ আর পদ্ধতি অসহিষ্ণু ঘৃণ্য হতে পারে না...। সেই রাস্তা হনন, প্রতি-হননের। সেই রক্তাক্ত রাস্তাটা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না কিন্তু! বরং ঘড়ির কাঁটার মতো আবৃত্ত হতে থাকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ে মানুষ— সাধারণ মানুষ। কোনওদিকেই যারা সায় দিতে পারে না, শামিল হতে চায় না, সেই উলুখাগড়ারা।"[১৯]

অর্থাৎ আন্দোলনকারী ও সরকারের সংঘাতের মাঝে অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, সে কথাই লেখক স্পষ্ট করেছেন। তাই লেখক মনে করেন— "উদার মানবিকতার চেয়ে মহত্তর কোনও মত ও পথের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।"[২০]

লেখক **১৯৭১** সালের কলকাতা শহরের ভয়মিশ্রিত জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাননি, বরং সেই সময়কে, সেই ভয়কে অতিক্রম করে এক নতুন সমাজ ও নতুন সময়ের প্রত্যাশা করেছেন। নায়ক চরিত্রটি মনে করে, প্রতিটি মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো আত্মপর, আত্মগত ও আত্মরক্ষায় বিড়ম্বিত হয়ে আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মানুষগুলি পরস্পর একত্রিত হয়ে যদি একটি সাহসের মহাদেশ রচনা করতে পারে তবে সেই ভয়ার্ত সময় ও সমাজকে অতিক্রম করা সম্ভব। নায়ক শেষপর্যন্ত সাহস অর্জন করেছে এবং ভয়কে দূর করে বলতে পেরেছে— "তোমাকে আর ভয় নেই, সময়, তোমার আর-একটা নাম মৃত্যুও যদি হয়!"[২১] তাইতো সে বিনীতাকে অপেক্ষা করতে বলেছে সুন্দর এক সময়ের, যেখানে ভয় থাকবে না, উভয়ে রচনা করবে ভালোবাসার অমরাবতী, এই আশা নিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে—

> "আমি ফিরে আসছি, আমি আসছিই, শুধু তুমি যেন আশা ছেড়ে দিয়ে বোসো না। তুমি বেঁচে থেকো, বিনীতা, তুমি অপেক্ষা করে থেকো।"[২২]

'সময়, আমার সময়' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি শেষপর্যন্ত **১৯৭১** সালের ভয়মিশ্রিত শহর কলকাতার জীবনধারাকে মেনে নিতে পারেনি, সেই ভয়ার্ত সময় ও সমাজকে অতিক্রম করে সে প্রত্যাশা করেছে এক সুন্দর সময় ও নতুন সমাজের। এখানেই উপন্যাসটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, উপন্যাস সমগ্র (২য় খণ্ড), কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স,পৃ. ৩৪৩

২. ঘোষ, নির্মল, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১৬, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা-০৯, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ১

৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১,উপন্যাস সমগ্র (২য় খণ্ড), কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৪৪

৪. তদেব, পৃ. ২৯৯

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০২,সঞ্চয়িতা, কলিকাতা-৭৩, পাত্র'জ পাবলিকেশন, পৃ.২৬

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত), দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর **১৯৫৭**, মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা-৯, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮৬

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০২, সঞ্চয়িতা, কলিকাতা-৭৩, পাত্র'জ পাবলিকেশন, পৃ. ১৭

৮. ঘোষ, সন্তোষকুমার, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, উপন্যাস সমগ্র (২য় খণ্ড), কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩২০

৯. তদেব, পৃ. ৩০২

১০. তদেব, পৃ. ৩১৯

১১. তদেব, পৃ. ৩০২

১২. তদেব, পৃ. ৩০৩

১৩. তদেব, পৃ. ৩০২

১৪. তদেব, পৃ. ৩২৩
১৫. তদেব, পৃ. ৩২৫
১৬. তদেব, পৃ. ৩২৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩৪০
১৯. তদেব, পৃ. ৩৩০-৩৩১
২০. তদেব, পৃ. ৩৩১
২১. তদেব, পৃ. ৩৪৯
২২. তদেব, পৃ. ৩৫০।

মহাভারতে দণ্ডনীতি : প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র ভাবনার আঙ্গিকে একটি অধ্যয়ণ

শিপ্রা মাইতি
অতিথি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ (Abstract): মহাভারতের দণ্ডনীতি প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি ন্যায়বিচার, শাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি আদর্শ মডেল প্রদান করে। দণ্ডনীতিতে রাজাকে "দণ্ডধারী" বা শাসনকার্য পরিচালনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার দায়িত্ব সমাজের শান্তি ও স্থিতি রক্ষা করা। শাস্তি এবং পুরস্কারের ভারসাম্য বজায় রেখে দণ্ডনীতি অপরাধ দমন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রবন্ধটি মহাভারতের শান্তি পর্বের ভিত্তিতে দণ্ডনীতির দার্শনিক ও ব্যবহারিক দিকগুলোর বিশ্লেষণ প্রদান করা হবে।
মূল শব্দ (Keywords): দণ্ডনীতি, মহাভারত, রাজধর্ম, ন্যায়বিচার, রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা, ধর্ম, রাষ্ট্রচিন্তা।

১. ভূমিকা:

মহাভারত, যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন, শুধু একটি ধর্মীয় মহাকাব্য নয়, বরং ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর তত্ত্বের একটি জীবনদর্শনও উপস্থাপন করে। মহাভারতের অন্তর্নিহিত দার্শনিক চিন্তা ও মূল্যবোধ সমাজের নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে দণ্ডনীতি, এটি রাষ্ট্রের শাসন এবং ন্যায়বিচারের মূলনীতি। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায়, বিশেষ করে মহাভারতে, দণ্ডনীতির বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা সমাজের শৃঙ্খলা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

দণ্ডনীতি শুধু অপরাধের শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি নয়, বরং এটি এক ধরনের নৈতিক শৃঙ্খলা যা রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের মধ্যে ভারসাম্য এবং শান্তি রক্ষা করে। এই শাস্তি এবং শাসনের পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে সমাজের শান্তি, আইন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারের বোধ জাগ্রত হয়। মহাভারতের দণ্ডনীতি শুধুমাত্র শাস্তি প্রদান বা দমনমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি সঠিক পথে পরিচালনা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং নৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে, আমি মহাভারতের দণ্ডনীতির তত্ত্ব ও তার গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করব এবং দেখব কীভাবে দন্ডনীতি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার অঙ্গ হিসেবে সমাজের শৃঙ্খলা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিল। এখানে কেবল মহাভারতের ধর্মীয় এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে না, বরং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসননীতি এবং দণ্ডনীতির গুরুত্বও আলোচনার মধ্যমে তুলে ধরা হবে।

২. দণ্ডনীতির সংজ্ঞা এবং তাৎপর্য:

দণ্ডনীতির উৎপত্তি এবং তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে 'দণ্ড' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দণ্ড শব্দটি শাস্তির সঙ্গে যুক্ত হলেও, এর আরও অনেক তাৎপর্যমূলক ব্যবহার দেখা যায়। একদল বলেন, যজ্ঞকালে অসুর বা যজ্ঞবিঘ্নকারীকে তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত লাঠিই প্রথম দণ্ড। অন্যেরা মনে করেন, গবাদি পশু চরানোর সময় ব্যবহৃত লাঠি থেকেই দণ্ড শব্দের উৎপত্তি। যাস্ক লিখেছেন যে, 'দণ্ড্যঃ পুরুষঃ' বলার মাধ্যমে দণ্ডের অর্থ শারীরিক শাস্তি বা অর্থদণ্ড বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'দণ্ড' শব্দের উৎপত্তি 'দম' ধাতু থেকে, যার অর্থ দমন। যাস্কের টীকাকার দুর্গসিংহের মতে, যারা অবিনীত ও অজিতেন্দ্রিয় তাদের দমন করেন রাজা।

যাস্কের যুগ থেকে মহাভারত ও কৌটিল্যের যুগে দণ্ডের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। দণ্ড তখন কেবল শাস্তি নয়, বরং সমাজের শৃঙ্খলা ও কল্যাণের উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়। ভীষ্ম বলেছেন, ন্যায়বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত দণ্ড পুরো পৃথিবীকে রক্ষা করে। কৌটিল্যের মতে, দণ্ড হচ্ছে যোগক্ষেমের সাধন, 'যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ' অর্থাৎ যা নেই তা অর্জন এবং যা আছে তা রক্ষা করার পদ্ধতি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যা নেই তা যুক্ত করা, যা আছে তা রক্ষা করা, যা সুরক্ষিত সেটাকে বাড়ানো এবং যা বেড়েছে সেটাকে উপযুক্ত উন্নয়নের কাজে লাগানোর ভারটা দণ্ডনীতির দায় এবং সেটা সর্বত্রই সাধারণ নীতি।

মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ডনীতির প্রশস্তি রয়েছে। এখানে রাজা, মন্ত্রী, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ রাজ্যশাসনের প্রতিটি বিষয়ই দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত। এর মূল উদ্দেশ্য শাস্তি নয়, বরং মানুষের সার্বিক কল্যাণ। ভীষ্ম দণ্ডের পাঁচটি রূপ বর্ণনা করেছেন—ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী, এবং জগদ্ধাত্রী। দণ্ডনীতি সৎ প্রবৃত্তির জন্ম দেয় বলে দন্ডকে ব্রহ্মকন্যা বলা হয়। দন্ড সমাজে স্থায়িত্ব আনায়, তাই দন্ডকে বৃত্তি বলা হয়। অপরাধমোচনের সুযোগ দিয়ে মানুষকে আত্মবিশ্বাস দেয় বলে দন্ডকে সরস্বতী বলা হয়। সর্বশেষে, দন্ড গোটা বিশ্বকে ধারণ করে, তাই দন্ডকে জগদ্ধাত্রী বলা হয়েছে।

দণ্ডনীতির তাৎপর্য:

মহাভারতের দণ্ডনীতির গুরুত্ব বহুস্তরীয়। এটি সামাজিক, নৈতিক, এবং রাজনৈতিক জীবনকে সুশৃঙ্খল এবং সুষম রাখার জন্য একটি মৌলিক হাতিয়ার।

i. ন্যায়বিচারের ভিত্তি:

দণ্ডনীতি ন্যায়বিচারের ভিত্তি গঠন করে। এটি সুশাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান, যা সমাজে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করে।

ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:

মহাভারতে দণ্ডনীতিকে রাজ্যের অস্তিত্ব এবং সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। শাসক যদি সঠিকভাবে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন, তবে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

iii. ধর্মীয়মূল্যবোধ সংরক্ষণ:

ধর্ম এবং দণ্ডনীতি একে অপরের পরিপূরক। ধর্মের মাধ্যমে নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, আর দণ্ডনীতির মাধ্যমে সেই মানদণ্ড সমাজে কার্যকর হয়।

iv. সমাজে নৈতিকতার উন্নতি:

দণ্ডনীতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

৩. দণ্ডনীতির মূল উপাদান:
মহাভারতে দণ্ডনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতত্ত্ব যা সামাজিক শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করে। এটি শাসনব্যবস্থার এমন কিছু মৌলিক উপাদানকে চিহ্নিত করে, যা শক্তি এবং ন্যায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। দণ্ডনীতির মূল উপাদানগুলো রাজ্য পরিচালনার কাঠামোতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে এর বিভিন্ন উপাদান বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

৩.১. শাসকের ভূমিকা:
দণ্ডনীতিতে শাসককে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রাখা হয়েছে। শাসককে "দণ্ডধারী" বলা হয়, যার কাজ হলো সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। একটি আদর্শ রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে হলে শাসককে কিছু আবশ্যক পালনীয় কর্তব্য থাকে, এখন সেগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো। **প্রথমত,** 'ন্যায়পরায়ণতা' শাসককে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় হতে হবে। একটি রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে, তাই শাসককে অতি অবশ্যই ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে দৃঢ় হতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, 'ধর্মের রক্ষক' শাসককে ধর্ম, নীতি এবং ন্যায় বজায় রাখতে হবে। শাসক যদি ধর্মের পথে, ন্যায়ের পথে না থাকে তাহলে, সকল প্রজাদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারবে না। তাই শাসককে অবশ্যই ধর্মের পথে থাকতে হবে, ন্যায়ের পথে থাকতে হবে এবং এই ধর্ম ও ন্যায়ের পথে থেকেই রাজ্যকে পরিচালনা করতে হবে যা মহাভারতের দন্ডনীতির একটু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। **তৃতীয়ত,** 'অন্যায় দমন' অন্যায়কারী ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ মহাভারতের দন্ডনীতিতে বলা হয়েছে, যে অন্যায়কারী, যে অপরাধী তাকে শাস্তি দিতে হবে এবং তার শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের আইন শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে হবে। আর যারা সমাজের জন্য মঙ্গলকারী তাদেরকেও পুরস্কৃত করতে হবে।

এর পাশাপাশি মহাভারতের দণ্ডনীতিতে আদর্শ শাসকের কিছু গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। শাসককে জ্ঞানী হতে হবে কারণ শাসক যদি জ্ঞানী না হয় এবং বিচক্ষণ না হয় তাহলে তার পক্ষে ন্যায়ের পথে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। একজন জ্ঞানী শাসক তার রাষ্ট্রকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারে। মহাভারতে তাই রাষ্ট্রশাসককে জ্ঞানী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, শাসকের জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ হওয়া আবশ্যক। শাসককে জ্ঞানী হওয়া ও বিচক্ষণ হওয়ার পাশাপাশি সহানুভূতিশীল এবং প্রজাদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। কেননা শাসক যদি সহানুভূতিশীল ও প্রজাদের প্রতি সহৃদয় না হয় তাহলে সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হবে না যা রাজ্যের জন্য অমঙ্গল। তাই মহাভারতে শাসকের সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও শাসককে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। কারণ একজন শাসক যদি সাহসী না হয় তাহলে সে কখনোই তার রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে না। শাসককে অবশ্যই প্রজাদের প্রতি কঠোর এবং কোমলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

৩.২. ধর্ম এবং দণ্ডনীতির সংযোগ:
দণ্ডনীতি ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। ধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দণ্ডনীতির সফল প্রয়োগ সম্ভব।ধর্ম হলো ন্যায় এবং নৈতিকতার আদর্শ। দণ্ডনীতির মাধ্যমে ধর্ম এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। ধর্মের বিচ্যুতি হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা দণ্ডনীতির মাধ্যমে দমন করা হয়। দণ্ডনীতি যদি উপযুক্তভাবে প্রয়োগ না করা হয় তবে বেদ এবং ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্ষত্রিয় রাজা যদি চিরন্তন রাজধর্ম ঠিকমতো পালন না করেন তবে বর্ণাশ্রমধর্মের বিনাশ ঘটবে।

৩.৩. শাস্তির ধরণ:

মহাভারতের দণ্ডনীতি অনুসারে, শাস্তির বিভিন্ন ধরন এবং তাদের প্রয়োগের ভিত্তিতে সমাজের ন্যায় ও শান্তি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। এই শাস্তির ধরনগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অপরাধীদের শাস্তি দিতে ব্যবহৃত হত, যা সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক ছিল। শাস্তির ধরনগুলি নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

শারীরিক শাস্তি (শরীরবেদনা):

শারীরিক শাস্তি মহাভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ধরনের শাস্তিতে, অপরাধীকে শারীরিক আঘাত দেওয়া হত, যেমন মারধর, শূলদণ্ডে পীড়িত করা বা শারীরিকভাবে আঘাত দেওয়া। শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে ভয় দেখানো হত, যাতে সে ভবিষ্যতে আইন ভঙ্গ করার সাহস না পায়। মহাভারতে শারীরিক শাস্তির উদাহরণ পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে। সেখানে শাস্তির প্রয়োগের সময়, কিছু অপরাধীকে শারীরিক আঘাতের শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের শাস্তি সাধারণত গুরুতর অপরাধ যেমন চুরি বা ধর্মের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। শারীরিক শাস্তির উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য কর্তৃক বিভিন্ন যোদ্ধাদের শাস্তি, যেখানে শত্রুদের শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়েছিল।

অসামাজিক আচরণ বা সামাজিক অভিসম্পাত (বৈষম্য):

অপরাধীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা তার প্রতি সামাজিক অভিসম্পাত আরোপ করা একটি প্রচলিত শাস্তি ছিল। এ ধরনের শাস্তি সমাজের কাছে অপরাধীর মর্যাদা হ্রাস করে এবং তাকে সামাজিকভাবে অসম্মানিত করে। এটি মূলত মানসিক শাস্তি হিসেবে কাজ করত এবং অপরাধীর আচরণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হত। সমাজের মধ্যে এমন শাস্তি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ছিল অপরিহার্য। মহাভারতে সামাজিক অভিসম্পাতের একটি বড় উদাহরণ হল দ্রৌপদী-এর অপমান। দুর্যোধনের অশুভ আচরণে শাস্তি হিসাবে তাকে সামাজিকভাবে অসম্মানিত করা হয়। দুর্যোধন, পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীকে শত্রু হিসেবে ধরে তার বিরুদ্ধে একটি অশান্তি সৃষ্টি করেন। তাকে এর ফলস্বরূপ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ করে দেওয়া হয়।

অর্থদণ্ড:

অর্থদণ্ড, অর্থাৎ টাকা বা সম্পদ কেড়ে নেওয়া, মহাভারতে একটি প্রচলিত শাস্তি ছিল। এটি বিশেষত অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। এই ধরনের শাস্তি অপরাধীর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে, এবং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। অর্থদণ্ডের মাধ্যমে অন্যদেরও সতর্ক করা হত, যাতে তারা অপরাধ না করে। অর্থদণ্ডের একটি উদাহরণ পাওয়া যায় মহাভারতের শকুনির প্রসঙ্গে, যেখানে শকুনি অনেকবার বিভিন্ন অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড প্রাপ্ত হয়। তার বিভিন্ন প্রতারণা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপব্যবহারের জন্য তাকে অর্থদণ্ড দিয়ে তার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

বনবাস (নির্বাসন):

বনবাস বা নির্বাসন মহাভারতে উল্লেখযোগ্য শাস্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এতে অপরাধীকে তার নিজ ভূমি বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হত এবং তাকে নির্জন স্থানে বা বনে পাঠানো হত। এটি সামাজিকভাবে অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল, যাতে সে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক না হয়ে ওঠে। বনবাস বা নির্বাসনের শাস্তি মহাভারতে সবচেয়ে চিহ্নিত উদাহরণ পাণ্ডবদের বনবাস। পাণ্ডবরা ১২ বছর বনবাস এবং ১ বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তারা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

মৃত্যুদণ্ড:
মহাভারতে বিশেষ কিছু গুরুতর অপরাধ যেমন, দেশদ্রোহিতা, চুরি বা হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। এই শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এর মাধ্যমে অপরাধীকে চিরতরে সমাজ থেকে নির্মূল করা হত। মৃত্যুদণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে অপরাধীর প্রভাব কমানো এবং সতর্কতার মাধ্যমে অন্যদের অপরাধে লিপ্ত হতে বাধা দেওয়া। মহাভারতে মৃত্যুদণ্ডের উদাহরণ পাওয়া যায় কর্ণ এবং দুর্যোধনের ক্ষেত্রে। কর্ণের ক্ষেত্রে, যে কৌশল ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে অসংখ্য অনৈতিক কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দুর্যোধন, যিনি মহাভারতের যুদ্ধে প্রচুর অত্যাচার ও অন্যায় করেছেন, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
পুনঃসামাজিকীকরণ (সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্তি):
মহাভারতে শুধু শাস্তির কথা বলা হয়নি, বরং অপরাধীর সংশোধন এবং তাকে সমাজে পুনঃসংযোগ করার ধারণা ছিল। বিশেষ কিছু শাস্তির পর অপরাধীকে সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হত। সমাজে তার ক্ষমা এবং সম্মান পুনরুদ্ধার করা হত, যাতে সে তার পূর্বের ভুল থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এই ধরনের শাস্তির উদাহরণ পাওয়া যায় অশ্বত্থামার ক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর অশ্বত্থামাকে একধরনের পুনঃসামাজিকীকরণের শাস্তি দেওয়া হয়, যেখানে তাকে তার অপরাধের জন্য সংশোধনমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে সমাজে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।
অভিশাপ বা দেবতার শাস্তি:
মহাভারতে বলা হয়েছে, কিছু অপরাধীকে দেবতাদের অভিশাপে শাস্তি দেওয়া হত। এটি ছিল আধ্যাত্মিক শাস্তির একটি রূপ। অভিশাপ বা দেবতাদের অভিসম্পাতের মাধ্যমে অপরাধীকে আধ্যাত্মিকভাবে শাস্তি দেওয়া হত, যা তাদের মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে ছিল। অভিশাপের উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায় কর্ণ এর ক্ষেত্রে, যিনি একসময় ব্রাহ্মণের অভিশাপে তার অস্ত্রের ব্যবহার হারান। এই অভিশাপের কারণে, তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাকে মারাত্মক শাস্তি প্রদান করা হয়। দেবতাদের অভিশাপও শাস্তি হিসেবে প্রভাব ফেলেছিল, যা তার অস্তিত্বের ক্ষতি করেছিল।
মহাভারতের দণ্ডনীতি বিভিন্ন শাস্তির ধরন এবং তাদের প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। এই শাস্তির ধরনগুলি কেবল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যম নয়, বরং একটি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করত, যা সমাজে আইন, শৃঙ্খলা এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে সহায়ক ছিল। মহাভারতের দণ্ডনীতি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় অপরাধ দমন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকরী দর্শন ছিল, যা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়ও প্রাসঙ্গিক।
৪. দণ্ডনীতির প্রাসঙ্গিকতা:
মহাভারত, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, শুধু ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক মহাকাব্য নয়, বরং এটি সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের একটি অসাধারণ মিশ্রণ। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দণ্ডনীতি বা শাসনব্যবস্থার নীতি, যা সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। মহাভারতের দণ্ডনীতি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি শুধু প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি নয়, বরং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত। এখানে দণ্ডনীতির প্রাসঙ্গিকতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো।

সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা:

দণ্ডনীতির মূল লক্ষ্য হলো সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। মহাভারতে বলা হয়েছে, দণ্ডই শাসন করতে সক্ষম। এটি বোঝায় যে সমাজের শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষার জন্য শাসনব্যবস্থার কঠোরতা অপরিহার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং তাদের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দণ্ডনীতি একটি কার্যকর উপায় ছিল। আধুনিক সমাজেও আইন ও শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে একইভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়, যা মহাভারতের দণ্ডনীতির মৌলিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

মহাভারতের দণ্ডনীতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। এটি অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে তাদের অপরাধের মূল্য দিতে বাধ্য করে এবং অন্যদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা হিসেবে কাজ করে। আজকের বিচারব্যবস্থায়ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহাভারতের দণ্ডনীতির এই নীতিগত দিকটি এখনও কার্যকর।

অপরাধ দমন এবং প্রতিরোধ:

মহাভারতের দণ্ডনীতিতে শাস্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ দমন এবং ভবিষ্যতে অপরাধ প্রতিরোধ করা। উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বা বনবাস দেওয়া হত, যা অপরাধীদের জন্য একটি শিক্ষা এবং সমাজের জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করত। আধুনিক আইনব্যবস্থাতেও কঠোর শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধ করা হয়, যা মহাভারতের দণ্ডনীতির ধারাকে প্রতিফলিত করে।

নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা:

মহাভারতের দণ্ডনীতি নৈতিকতা এবং ধর্মকে রক্ষার জন্য কাজ করত। দণ্ডনীতির মাধ্যমে মানুষকে তাদের কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হত। এই আদর্শ আজকের সমাজে মূল্যবোধ শিক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা:

মহাভারতের দণ্ডনীতি অপরাধীদের শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাদের সংশোধনের ওপরও জোর দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অশ্বত্থামাকে একটি অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল, যা তার ভবিষ্যতের কাজগুলোকে প্রভাবিত করে। এটি বোঝায় যে দণ্ডনীতির একটি উদ্দেশ্য অপরাধীর শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধন। আজকের পুনর্বাসনমূলক শাস্তির ধারণাও মহাভারতের এই চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. উপসংহার:

মহাভারতের দণ্ডনীতি শাসনব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের একটি আদর্শ মডেল। এটি রাজাকে শক্তি এবং ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করার নির্দেশ দেয়। এটি কেবলমাত্র প্রাচীন রাষ্ট্রচিন্তার একটি অংশ নয়, বরং এটি একটি চিরন্তন নীতি যা মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি গঠনে যুগ যুগ ধরে অবদান রেখে চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় দণ্ডনীতির মূল ধারণাগুলি যেমন আইনের শাসন, ন্যায়পরায়ণ শাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা এখনও প্রাসঙ্গিক। এর মানবিক দিক এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আজকের জটিল সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

তথ্যসূত্র (References):

১. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ; দণ্ডনীতি, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লি: (২০১৯), কলকাতা। পৃষ্ঠা-৭-১৩, ১৭০, ১৭৩
২. বাগছি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ; প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৫৬বঙ্গাব্দ), কলকাতা। পৃষ্ঠা-১৪-২২, ৪১-৪৮
৩. মহামুনি বেদব্যাস প্রনীত মূল সংস্কৃত হইতে, দাস, কাশীরাম; মহাভারত, শ্রীপূর্নচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), কলকাতা।
৪. বসু, বুদ্ধদেব; মহাভারত: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৪
৫. Pandey, Priyanka; Rajadharma in Mahabharata with Special Reference to Santi-Parva. D.K. Printworld Pvt. Ltd., 2018.
৬. Rajagopalachari, C; Mahabharata. Bharatiya Vidya Bhavan, 1958.
৭. Smith, D. John; The Mahābhārata. Penguin Classics, 2009.

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের রূপ ও রূপান্তর

মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার

সারসংক্ষেপ : অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্ধারণ করেছে ধনী আর গরীব। কিন্তু বুদ্ধি, বিদ্যা আর প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে উদ্ভব হয়েছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। বিশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, অর্থনৈতিক পালাবদলে চাপ-তাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাদের ওপর সব চেয়ে বেশি করে পরে ছিল তারা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মধ্যবিত্তরা তাদের অবস্থা ও অবস্থানের রথবদল করেছে। নীতিবোধের অবক্ষয় ও স্খলন ঘটেছে। কিন্তু মনন-চিন্তন ও জীবনদৃষ্টির রূপ ও রূপান্তর ঘটেছে— তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানীয় ঔপন্যাসিকেরা বাস্তব অভিজ্ঞতা, সময়-কালের অভিঘাত, বহুবিধ দৃষ্টি ও জীবনাদর্শ দিয়েই তাঁরা তাঁদের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিবর্তনের চেনামহল ও অচেনা চোরাবালিকে তুলে এনেছেন। ফলত, বিশ শতকের একাধিক বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠেছে রাজন্য বহির্ভূত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন-জীবিকা, পেশা, শিক্ষা ও দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলের ধারাবাহিক ইতিহাস।
সূচকশব্দ : মধ্যবিত্ত, পালাবদল, অবক্ষয়, মনন-চিন্তন, অস্তিত্ব, উত্তরণ।

মূল আলোচনা :

বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে অর্থনৈতিক মাপকাটিতে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যবর্তী শ্রেণিই হল 'মধ্যবিত্ত'। যারা মেধা-মনন, আদর্শ ও সচেতনতায় উচ্চবিত্তের সম্মান ও মর্যাদা পেতে চায়, আবার প্রয়োজনে নিম্নবিত্তের ঘরে বসে খেতে দ্বিধাবোধ করে না— অন্তত এই একুশ শতকে, তারা বিজ্ঞানের গুণগ্রাহী আবার কুসংস্কার ও তাবিজ-কবজে বিশ্বাসী ভক্ত, মানসিকতায় বাবু— এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চাতেও ভারতীয় উপমহাদেশ বাঙালিরাই প্রথম আধুনিকতার প্রদীপ জ্বালায়। 'বাঙালীই যে প্রথম সাগ্রহে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্যদর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা তো ঐতিহাসিক ঘটনা।'[১] সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের পৌরোহিত্য করেছেন রাজা রামমোহন রায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখর হাত ধরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি 'বিত্ত'-এর সীমা ছাড়িয়ে যুক্তি ও বুদ্ধিকে ভিত্তি করে 'বুদ্ধিজীবী' স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিশ শতকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল পরিস্থিতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মাষ্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ দেশ নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছিল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা কিংবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানীয় ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আখ্যানে সময়-সমাজের গতিশীল প্রবাহে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশা-অবস্থার ভাঙন, আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্বকে বহু ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন।

ভারতীয় রাজনৈতিক ও শাসন-ক্ষমতার আলোচনায় বিশ শতক দুটি পর্বে বিভক্ত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী। দুই পর্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি ভিন্ন হওয়ায় বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে— একাধিক ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যময় আখ্যানে। জমিদার হলেও

রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক আখ্যানে। বিশ শতকে রচিত 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে তিনি সুবিধাবাদী ভণ্ড দেশ নেতা সন্দীপের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে নব্যধনতন্ত্রের প্রতিনিধি মধুসূদনের হাত থেকে কুমুদিনীর বাঁচা ও মুক্তির লড়াই জারী রেখেছেন। 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদের বধ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানবতাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'আরণ্যক' (১৯৩৮) ও 'ইছামতী' (১৯৫০); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫), 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১৯৪৭); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'সহরতলী (১৯৪০), 'চিহ্ন' (১৯৪৭); জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫); নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' (১৯৫৩); রমাপদ চৌধুরীর 'বনপালাশির পদাবলী (১৯৬২), সমরেশ বসুর 'শ্রীমতি কাফে' (১৯৫৩), 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭); মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪); মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৮), নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯); শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান' 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭), 'পারাবার' (১৯৭১), 'উজান' (১৯৭১); দেবেশ রায়ের 'যযাতি' (১৯৬৪), মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৩), 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' (১৯৭৩); প্রমুখ বিশ শতকের মধ্যবিত্ত প্রতিনিধি স্থানীয় অন্যতম আখ্যানকার। উল্লেখিত আখ্যানগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দেশ-কাল সময়, পরিবর্তন ও রূপান্তরের নানা দিক পরিস্ফুট হয়েছে।

ক) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের :

স্বাধীনতার পূর্বে বিশ শতকের গোড়াতেই বাংলাভাগের পরিকল্পনাকে রুখে দিয়েছিল মধ্যবিত্তরাই। স্বদেশী আন্দোলন শেষ হবার কয়েক বছর পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)-এর কারণে পরাধীন ভারতবাসীর ঘরে-বাইরে আর্থিক সংকট ও সমস্যা যমের মতো গ্রাস করেছিল। এই পর্বে 'কল্লোল' পত্রিকাকে হাতিয়ার করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক প্রমুখ অভিজাত শ্রেণির পরিবর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন সমস্যা ও সংকটকে কেন্দ্র করে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। কল্লোলের সমকালেই মধ্যবিত্ত উপন্যাসকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) আবির্ভাব। ভাগলপুর সার্কেলের সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন এবং বিভিন্ন স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) উপন্যাসে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শৈশব, পেশা-নেশা, আর্থিক অবস্থা ও বন্ধন-সম্পর্ক এবং তার ভাঙনের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে। উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন— 'ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের।...হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প বয়সে-প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পর ... এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, ... রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পর শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।'[২] হরিহর সোনালি দিনের স্বপ্ন নিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কাশীতে পাড়ি দিয়েছে, ইন্দির ঠাকুরণ মারা গেছে, অপু-দুর্গা কাশবনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিস্ময়ে দেখেছে রেলগাড়িকে। কিন্তু বাংলার সবুজ শ্যামলা প্রকৃতি কখনো কখনো রুষ্ট হয়ে ঘরের চাল ভেদ করে দুর্গার জীবনকে কেড়ে নিয়েছে। বিদেশ-বিভূঁইয়ে ঘুরে দীর্ঘকাল পরে হলেও হরিহর—অপু নিশ্চিন্দিপুরে ফিরেছে মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের টানাপোড়েন থেকেই। একই রকমভাবে ভাগলপুরের সার্কেল ম্যানেজার হিসেবে অরণ্যকে উচ্ছেদ করার দায়িত্ব পালন করে বিবেকের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন বিভূতিভূষণ। 'আরণ্যক' (১৯৩৮) উপন্যাসে সত্যচরণকে

প্রতিনিধি করে উত্তর বিহারের অরণ্য-প্রান্তের একদিকে অরণ্যের সৌন্দর্য ও রুক্ষতা, অপরদিকে মানুষের সরলতা-বিশ্বাসের পাশে দারিদ্র্য ও বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরেছেন তিনি। আধুনিক সভ্যতা অরণ্যকে ধ্বংস করেছে, বিভূতিভূষণ নিজেও সেই কাজ করেছেন। তাই ভানুমতীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখলেও ঘর বাঁধতে পারেননি। উপন্যাসের শেষে সত্যচরণ বলেছে—'দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশ্যে দূর হইতে নমস্কার করিলাম। হে অরণ্যনীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!...'[৩] ফিরে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু নাগরিক জীবনের মধ্যে বিভূতিভূষণ আত্মতৃপ্তি পাননি। তাই তিনি পুনরায় ইছামতীর তীরে স্বপ্নের নীড় বাঁধার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইছামতী মহাকাল প্রবাহ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর অসংখ্য নরনারীর জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের সাক্ষী। ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশা এই ইছামতীর তীরে নীলু-বিলু-তিলু ও ভবানীর প্রেম খোকা থেকে যুগযুগান্ত প্রবাহিত হবে। 'অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর, কখনো বৃদ্ধের কাছে ... তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে ... প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল ঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ ... কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখনো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি—কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো।'[৪] পরিবর্তনশীল সমাজ ও জীবন উভয়কে বিভূতিভূষণ প্রকৃতির অনন্তসত্তার সঙ্গে যোগ করে মুক্তির কথা বলেছেন— মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোমান্টিক বিলাসিতায়। কিন্তু তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর আখ্যানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোমান্টিক বিলাসিতা নয়— ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতায় হাল হকিতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জমিদার বংশের সন্তান হলেও তিনি কিছুদিন চাকরি করেছেন। এবং গান্ধীবাদী আদর্শে সাহিত্য সেবার মধ্যদিয়ে দেশ-দশের সেবা করতে চেয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতন, নিম্নবিত্ত শ্রেণির সময়ের স্রোতে ভেসে চলার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মিশে আছেন। তাই তাঁর কথাভুবন বিচিত্র মানুষের জীবন-যাপনের, রীতি-নীতির, বেড়ে ওঠার মণিমালা হয়ে উঠেছে। 'ধাত্রীদেবতা'উপন্যাসে শিবনাথ পিসিমা শৈলজার অনুপ্রেরণায় জমিদার নয়, মা জ্যোতির্ময়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। পড়াশুনা আর গান্ধীজীর আদর্শ তার ধারণ-ব্রত। প্রথমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও পরে গান্ধীজীর অহিংস আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। পরাধীন ভারতের মুক্তির কাজ করেছে। জমিদার থেকে কৃষকে পরিণত হয়েছে। 'চরের ওই কৃষিক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একে একে পাঁচ-সাতখানি তাহার প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।'[৫] 'গণদেবতা' (১৯৪০) উপন্যাসে নব্যধনী ও সম্পদশালী ছিরু তথা শ্রীহরি পাল ও অন্যান্য মাতব্বররা চণ্ডীমণ্ডপের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর বিমুখ অনিরুদ্ধ ও গিরিশকে নিয়ে বিচার বসিয়েছে। তাঁদের বিচার যে পক্ষপাতমূলক তা শিক্ষিত পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ তা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারে। তাই সে জমিদার, ধনী মহাজনদের ঘৃণা করে। 'তাহাদের অতি-উদার দান-ধ্যান-ধর্ম-কর্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গোবধের স্বেচ্ছাকৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া।'[৬] মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী দেবু ঘোষকে জমিদার ও মহাজনের প্রতিস্পর্ধী করে নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন তারাশঙ্কর। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে বনোয়ারী সেকাল এবং করালী আধুনিকতার প্রতীক। প্রাচীন রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কৃতি, পেশা ও নেশাকে ধরে রাখার জন্য বনোয়ারী কঠিন লড়াই করেছে কিন্তু ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিশ্বযুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে কাহার গোষ্ঠীর মতো বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবর্তন কালের নিয়মেই যেন অনিবার্য। আর সেই পরিবর্তনকে অনেক দ্বন্দ্ব-সংকট ও সংশয়

কাটিয়ে জাত-পাত, বংশ-কৌলীন্যের দোহাই ভুলে মানিয়ে নিতেই তৎপর হয়েছে সুচাঁদ, কঙ্কণ চাটুজ্যে ও সীতারাম পণ্ডিত। তাই 'গণদেবতা'-য় অলিপুরের রহমত শেখ আর কঙ্কণ চাটুজ্যে এক সঙ্গে মিলে 'ভাগাড়' দখল করে 'চামড়ার' ব্যবসা ফাঁদে। 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫)-য় সীতারাম পণ্ডিত বর্ণ বা বংশের আভিজাত্যে নয়, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গর্ববোধ করেছে। এইভাবে তারাশঙ্কর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বংশ-কৌলীন্য, পেশা ও সমাজের ভাঙা-গড়ার যোগসূত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। সেকালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং গতিশীলজীবন প্রবাহের প্রতি সমর্থন তারাশঙ্করকে করে তুলেছে মধ্যবিত্ত প্রতিনিধি স্থানীয় আখ্যানকার। এবং তাঁর আখ্যান হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগত ভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাঁর সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘাত বারবার এসেছে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক ও গবেষক বলেছেন—'মানিকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরি থেকে এমন সব তথ্য জানা যায় যার ফলে মনে হতে পারে তাঁর জীবনে একটি মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী লেখকের পরিবর্তে খেয়ালী, অর্ধ-অসংযমী অথচ নীতির ক্ষেত্রে পর্বতের মত অবিচল চরিত্রের প্রতিফলন। তিনি সংসার থেকে, পুত্র-কন্যার পিতা হয়েও সংসার-অনাসক্ত; ... সংসারের হাঁড়ির খবর সম্পর্কে তিনি উদাসীন। সুতরাং তাঁর ডায়েরির মধ্যেও স্বতোবিরোধ রয়েছে এবং তাকেই তাঁর সাহিত্য-কার্যের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে ধরলে ভুল করা হবে।'[৭] শোষণ-শাসন, ভণ্ডামি, দ্বিচারিতা, সংকীর্ণতা ও যৌনতা নিয়ে তাঁর মনের বরাবরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। তাই তিনি শোষণ মুক্ত সমাজ, মানুষের সেবা করার বাসনা এবং মানুষের যৌন-প্রেম-মনের রহস্য সন্ধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' গাওদিয়া গ্রামের জীবনের জটিলতাকে মানিক অন্তর ও বাইর দুই দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। শশীর দৃষ্টি দিয়ে গাওদিয়া গ্রামকে, বাইরের দৃষ্টি দিয়ে শশীর মনের দ্বন্দ্ব ও হতাশাকে। গ্রামের ছেলে শশী শহর কলকাতায় গিয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে হয়ে উঠেছে ডাক্তার ও যুক্তিবাদী। তাই মহাজন পিতা গোপালের বারবার সংঘাততে জড়িয়ে পড়েছে শশী কিন্তু পিতাকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করতে পারেনি। সাত বছর ধরে কুসুমকে উপেক্ষা করে নিজের মনের উন্মাদনাকে চেপে রেখেছে। বারবার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ নিয়েও যেতে পারেনি কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব টানাপড়েনে তার সমস্ত স্বপ্ন মাঠে মারা গেছে। থেকে গেছে মনের চোরা গলির অতৃপ্তির বেদনা আর চোখে দেখা রহস্যময় জীবন জিজ্ঞাসা— 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম।'[৮] 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হোসেন মিয়ার মাধ্যমে ময়নাদ্বীপ নামক কল্পভূমিতে শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। 'অহিংসা' (১৯৪১) রচনার পর মানিকের মধ্যবিত্ত মনন-মানসিক দ্বন্দ্বের সাময়িক বিরতি ঘটেছে। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করার পর তিনি সাহিত্য সাধনার হয়ে উঠেছেন মানুষের সেবা ব্রতী, দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

খ) স্বাধীনতা পরবর্তীবাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত :

দেশভাগের মধ্যদিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে বাঙালি তথা ভারতবাসীর রঙিন স্বপ্ন ফিকে হতে শুরু করে। উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, বেকারত্ব, নগরমুখী চিন্তা-চেতনা প্রভৃতি বাঙালি বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়। ফলে পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক আনুকূল্য অনুসারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫) দেখালে, পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ থাকলেও দারিদ্র্যের তাড়নায় বারোটি পরিবার একটি বাস্তুবাড়িতে

বসবাস করেছে এবং নিজেদের রীতিনীতি ভুলে বারোয়ারী ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বিধুমাস্টার, পারিজাত, বলাই, সন্তোষ, শিশির, চারু, শিবনাথ প্রভৃতি চরিত্রের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে ক্রমে টিকে থাকা, বেঁচে থাকা। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে স্ত্রীকে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে শিবনাথ বারান্দায় উঠেছে। বলেছে 'পাগল, কিচ্ছু না, কি আবার ভাবব আমি, আমার অত শত ভাবলে চলে? এসো, ঘরে এসো।'[৯] ক্রমে ভেঙে গেছে একান্নবর্তী পরিবার, পারিবারিক সম্পর্ক ও বিশ্বাস। 'চেনামহল' (১৯৫৩) উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তুলে ধরেছেন তারই নির্মম নিষ্ঠুর চিত্র। গ্রাম থেকে উঠে আসা চাকরি নির্ভর মধ্যবিত্ত পরিবারটির অরুণ ও বিধবা করবী প্রেমে অপরিণীতই থেকে গেছে। বেকারত্বই হয়ে উঠেছে জীবন সংকটের মূল বিষবৃক্ষ। রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গিরিজাপ্রসাদের চোখ দিয়ে গ্রাম বাংলার মূল্যবোধের পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন 'বনপলাশির পদাবলী' (১৯৬২) উপন্যাসে। শিক্ষিত মানুষ আদর-কদর হারিয়েছে, মধ্যবিত্তের কাছে বড় হয়ে উঠেছে টাকা। যেনতেন ভাবে টাকা উপার্জন করতে গিয়ে তারা মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। আদর্শকে করেছে ধুলোয় মাখামাখি। কিন্তু ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী 'একা এক জীবন' ও 'সুখ দুঃখ' উপন্যাসে জানিয়ে দিয়েছেন— অর্থই সব নয়।

বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে নকশাল আন্দোলন, শাসকের হাত বদল ও বিশ্বায়নের আধিপত্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হলেন শুধু তাই নয়, ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকতে থাকেন। উদ্ভট জীবনের আখ্যান নির্মাণের মধ্যদিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি স্থানীয় আখ্যানকার সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, দেবেশ রায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশ শতকের সাত ও আটের দশকের উপন্যাস প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'এই শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের সঙ্গে আমরা যদি গত শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলা উপন্যাসের তুলনা করি তাহলে আমাদের তর্কপ্রস্থানটা জমবে ভালো। সেদিন ছিল মধ্যবিত্ত স্বপ্নের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিমান। সেদিন ছিল অর্জনের পর অর্জন, আজ বিসর্জনের পর বিসর্জন। এমন কি বিসর্জনও বুঝি নয়। কেননা বিসর্জনেও একটা সমারোহ থাকে। এখন বুঝি বিসর্জনের পরের রাত্রি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা বিমর্ষ নির্জনতা।'[১০] রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও পরিবার দ্বারা পীড়িত হওয়ার পর, কিংবা চিন্তন-মননের প্রতিবন্ধকতা থেকে সচেতন বুদ্ধিবাদী ব্যক্তির যথার্থ অস্তিত্বকে উপন্যাসের আখ্যানে তুলে ধরেন এই পর্বের সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৩) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ভজন দাদা নারায়ণ ও তার পথকে অনুসরণ করে সুখে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু বৈষম্য, শোষণ ও স্বার্থপরতা ঘরে-বাইরে সর্বত্র তার আনুগত্য ও পরনির্ভরশীলতা চেতনায় আঘাত করে। সে তার আনুগত্যের জগৎ থেকে নিজস্ব জগৎ খোঁজে। প্রশ্ন তোলে— 'এ সমাজের বুকে তাই সে ব্যতিক্রমী নয়, একটা বিভ্রাট। যত অশ্রদ্ধা, তত তার দম্ভ। বিনয় হল ধাষ্টামো। ঘরে-বাইরের দুর্বুদ্ধিতা তাকে যেন নিয়ত পোড়াচ্ছে।...'[১১] 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭) উপন্যাসের নায়ক স্বাধীন দেশ-দশের প্রতি বিশ্বাস রেখে পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল কিন্তু সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বুঝতে পারে এ সমাজ জরাগ্রস্ত, দুর্নীতির আখড়া। তার চেতনা দ্বন্দ্বক্ষত হয়। সে প্রশ্ন তোলে—'নৈতিক ধস নেমেছে, আর তার মাঝখানে সর্বার্থে ধাপ্পাবাজ এক সমাজে মেগালোম্যানিয়ায় আক্রান্ত তার প্রহত আহত চরিত্র পাত্র। ... সে কেরিয়ারবাদের দ্বারা তাড়িত, প্রতিযোগীতার দ্বারা পীড়িত। সে অবস্থার দাস, লোভের দাস— যৌনতায় তার চারপাশে? ভয়াবহ শঠতা—।'[১২] 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) উপন্যাসে সুখেন সমাজের চোখে মাস্তান কিন্তু সমাজেই তাকে মাস্তান বানিয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬--) তাঁর

'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই উপন্যাসে সুবিধাবাদী, স্বার্থপর দিব্যনাথে মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা বুর্জোয়ারাই হয়ে উঠেছে ব্রতীর মতো বিপ্লবীদের ঘাতক। নারীদের স্বাধীনতা ঘোষণার নাম করে সুকৌশলে তারাই হয়ে উঠেছে অর্থ আদায়ের মহাজন। পুত্রের হত্যাকারীর সঙ্গে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব করতে তাদের বিবেকে প্রশ্ন জাগে না। বরং তারা সুজাতার মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে হত্যা করে ঘোষণা করে—'সুজাতার শরীরটা আছড়ে পড়ল। দিব্যনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, তবে অ্যাপেন্ডিকস ফেটে গেছে।'[১৩] মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০)-র 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৮) উপন্যাসে নায়ক দিনেশ দেশ-কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও স্বার্থপরতা দেখে হতাশ ও দিশাহারা। দিশাহারা দিনেশ বিচ্ছিন্ন স্ত্রী মাধবীর ছবি দেখে, স্বপ্নগুলো তার মধ্যে ঘুরপাক খায়, আর সে ধীরে ধীরেশূন্যতার মধ্যে ডুবে যায়। 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯) উপন্যাসে হিরণ্ময় শ্যালিকা আভার যৌনতায় ডুবে থাকে, ক্রমে বিবেক-সামাজিকবোধ, নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সচেতনবোধে নিজ অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে যৌনতা নামক বাঁধাকে সরিয়ে ফেলতে চায়। খুন করে আভাকে। 'কারণ আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বদল চাইছিলাম এই নিত্যদিনের একঘেঁমি থেকে।...'[১৪] এভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি অস্তিত্বের সংকট মানুষ কখন কখন হয়ে ওঠে খুনি। দেবেশ রায় 'মানুষ খুন করে কেন' উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'যযাতি' উপন্যাসে পারিবারিক বিচ্ছেদ থেকেই নায়কের বিবেক-চেতনার জাগরণ ঘটেছে। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট'-এর হারবার্ট; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একা এবং কয়েকজন'-এর সূর্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা'-র শ্যাম প্রমুখ চরিত্রগুলিও দেশ-দশের প্রতি আনুগত্য রেখেই সুস্থ-সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু শাসক-শোষক, স্বার্থপরতা, যৌনতার দাস, লোলুপ দৃষ্টি ঘুণপোকার মতো প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে খাচ্ছে। আর স্বপ্ন দেখা শিক্ষিত-সচেতন, বিবেকবান মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভ্রান্তের মতো অজান্তে খুন হয়ে যাচ্ছে। তবুও আর পাঁচটা মানুষের মতো ঘুণপোকার নায়ক স্বপ্ন দেখে— 'হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সময় কে জানে! ... কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।'[১৫]

উপসংহার : বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব, একাধিক আন্দোলন, দাঙ্গা-হত্যা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও অস্তিত্বের সংকট— দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ শতকের প্রথমার্ধে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরিবেশ তৈরী করে। দেশের স্বাধীনতা জন্য হাজার হাজার মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে ভারতবাসী তথা বাঙালীর স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসে। গান্ধীজী হত্যা (১৯৪৮), বামপন্থী আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫০) উদ্বাস্তু মানুষ অপমানিত হয়, খাদ্য সংকট, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি, ছাত্র-ধর্মঘট, বেকার সমস্যা, ক্ষমতা দখল, বুথ দখল, সন্ত্রাস প্রভৃতির কারণে যুব সমাজ নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়। কমিউনিস্টদের শ্লোগানের সঙ্গে বলে উঠে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত-পাক্ (১৯৬৫)। ১৯৬৬ সালে বাংলা কংগ্রেস গঠিত হয়, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ দুটি নির্বাচনে বামপন্থী দল জয়ী হয়। নকশাল আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে, এই সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা (১৯৭৫), সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সরকারের ফ্যাসিস্ট নীতি এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠন (১৯৭৭) কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালেও বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান হয়নি। ক্রমে মানুষ ভোটারে পরিণত হয়েছে। শাসক শ্রেণি ক্ষমতায়ন, রক্ত-চক্ষু, আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্বায়ন, বাণিজ্যায়ন এবং আর্থিক সংকটে ক্রমে যারা উৎকণ্ঠিত, দিশাহীন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে, তার বেশির ভাগ

সংখ্যাটাই মধ্যবিত্ত। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা স্রোতে গা ভাসায়, আবার কখনো কখনো ঘুরে দাঁড়ায়। সমালোচনা করে, বিপ্লবের ডাক দেয়। নির্মাণ করতে চায় স্বপ্নের দেশ-দশ। কিন্তু সব অধরাই থেকে যায় শাসন ভয়ে, আর বেতনের পাওয়ার প্রত্যাশায়।

তথ্যসূত্র :

১) রুদ্র, অশোক, ২০০৫, 'বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও উৎস', হাওড়া, প্রাচী প্রকাশনা, পৃ. ১৭৮
২) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ২০১৪, 'পথের পাঁচালী', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, পৃ. ১
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ২০১৪, 'আরণ্যক', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ১৬৭
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ২০১১, 'ইছামতী' কলকাতা, আদিত্য পুস্তকালয়, পৃ. ২৩৯
৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৯৮৪, 'ধাত্রীদেবতা', 'তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খন্ড)', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৩০৬
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৯৯৮, 'গণদেবতা', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, পৃ. ২৫
৭) চৌধুরী, নারায়ণ(সম্পা.), ১৯৮১, 'মানিক সাহিত্য সমীক্ষা', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৪৭
৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, ১৯৫৯, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', কলকাতা, প্রকাশ ভবন, পৃ.৯৪
৯) নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, ২০২২,'বারো ঘর এক উঠোন', কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, পৃ. ৩৪৩
১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ২০১২, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন,পৃ. ৩৩৯
১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ(সম্পা.), ১৯৯৮, 'সমরেশ বসুর রচনাবলী(১ম খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ২৯৪
১২) তদেব, পৃ. ৪৫১
১৩) দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, ২০২০,'হাজার চুরাশির মা', কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, পৃ. ১১২
১৪) নন্দী, মতি, ২০০১, পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশন, পৃ. ৯৩
১৫) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ২০১২, 'ঘুণপোকা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিকেশন, পৃ. ৭১।

সুন্দরবনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রভাকর বিশ্বাস
গবেষক, মিউজিওলজি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: গুপ্ত যুগ থেকে পাল-সেন যুগে সুন্দরবনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাল যুগে বিষ্ণু, গণেশ, শিব, এবং শক্তি দেবীসহ নানা ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর উপাসনা প্রবল ছিল। বিশেষভাবে বিষ্ণুমূর্তি, যা 'ত্রিবিক্রম বিষ্ণু' রূপে চিহ্নিত, এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পাওয়া গেছে। এছাড়া সূর্য দেবতা, মহিষমর্দিনী এবং বারাহী দেবীর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে, যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈচিত্র্যময় উপাসনা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। পাথরের তৈরি বিষ্ণু, গণেশ, শিব, এবং শক্তি দেবীদের মূর্তির পাশাপাশি মন্দির ও মূর্তির নিদর্শনগুলি প্রাচীন সুন্দরবনের ধর্মীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। সেন বংশের রাজারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে সহায়তা করেন, তবে শৈব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য উপাসনাও প্রবল ছিল। এই সময়কালের মূর্তিগুলি, বিশেষত বিষ্ণু এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল, যা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মূলশব্দ: গুপ্ত যুগ, পাল-সেন যুগ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ধর্মীয় ইতিহাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য।

মূল আলোচনা:

গুপ্ত যুগ থেকেই সুন্দরবন অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে পাল ও সেন যুগে এই ধর্মের প্রচার ও প্রসার এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। লক্ষ্মণসেন নিজেকে "পরম নরসিংহ" হিসেবে পরিচিত করতেন। আবার বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন তাঁদের রাজপট্টের সূচনা করেছিলেন নারায়ণের নাম আহ্বান করে। তবে শুধু বৈষ্ণব ধর্মই নয়, এই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর উপাসনাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে এই মূর্তিগুলোর বেশিরভাগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগ্রহশালা এবং স্থানীয় ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। এই প্রত্নসম্পদগুলি প্রাচীন সুন্দরবনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

পাল যুগে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তির আলোচনায় সর্বাগ্রে উঠে আসে বিষ্ণুমূর্তির প্রসঙ্গ। উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তিগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই 'ত্রিবিক্রম বিষ্ণু'। এই ত্রিবিক্রম বিষ্ণু বিষ্ণুর আদিরূপগুলির অন্যতম এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপের কাছ থেকে একটি অতি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। এছাড়াও ধবলাটের বর্তমান প্রসাদপুরের কাছারীবাড়ির বিশালক্ষীমন্দিরে দুটি বিষ্ণুমূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল;সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য, ২০১০,পৃঃ- ১০৬-৭)। এই মূর্তিগুলি শুধু শিল্পকলার নিদর্শন নয়, বরং পাল যুগে সুন্দরবন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারের এক অনন্য সাক্ষ্য।

সুন্দরবনের পশ্চিম সুরেন্দ্রনগরে বারোশ বিঘের পাড়ায় শ্রীপতি জানার পুকুর খননের সময় ব্যাসাল্ট পাথরের ১১৮ সেমি দৈর্ঘ্য এবং ৫২ সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট একটি বড় আকারের

বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটির নীচে তিনটি কমলদলের বেসমেন্ট রয়েছে, এই কমলদলের ওপরে মধ্যস্থলে সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় বিষ্ণুমূর্তিটি রয়েছে। এই মূর্তিটির পাদপীঠে মূল বিগ্রহের দুই পার্শ্বে একই রকম ভাবে খোদিত অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির দুটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মান দুই সহচরী রয়েছে। বামদিকে বীণা হস্তে দেবী সরস্বতী এবং ডানদিকে ঝাঁপি হস্তে লক্ষ্মী। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পিছন দিকে গরুড় মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। দেবী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মাথার উপরে উৎকীর্ণ রয়েছে লতাপাতার সমারোহ, সিংহ ও হস্তী সহ দুটি গজব্যাল মূর্তি। তার উপরে রয়েছে দুই পার্শ্বে দুটি উড়ন্ত অপ্সরা। মূল বিষ্ণুমূর্তির মুকুটের ঠিক উপরে রয়েছে একটি বড় মাপের কীর্তিমুখ। শিল্প-বৈশিষ্ট্যে এই মূর্তিটি দশম-একাদশ শতাব্দির বলে অনুমান করা হয় (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য, ২০১০, পৃঃ-১০৭-৯)। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে প্রসাদপুরের বিশালাক্ষী মন্দিরে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান আরও একটি বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। এক্ষেত্রেও মূল দেবতার দুই পাশে অর্থাৎ ডানদিকে বীণা হস্তে দেবী সরস্বতী এবং বামদিকে শ্রীফল হস্তে দেবী লক্ষ্মী রয়েছেন, উভয়েই ত্রিভঙ্গে দণ্ডায়মান। এই বিষ্ণুমূর্তির চার হস্তে যথাক্রমে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ রয়েছে। অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এই বিষ্ণু হলেন ত্রিবিক্রম বিষ্ণু। মূলদেবতার উভয়পাশে দুটি গজব্যাল মূর্তি রয়েছে। মূলমূর্তির উপরে রয়েছে কীর্তিমুখ। এই মূর্তিটিকেও দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। সাগরদ্বীপের প্রশাদপুরের কাছাড়ী বাড়ির বিশালক্ষী মন্দিরে অন্য এক কক্ষে বেশ কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তির সঙ্গে ধূসর লাল বেলেপাথরের প্রায় তিনফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বিষ্ণুর সমপদ স্থানক মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিটি বিষ্ণুর 'ত্রিবিক্রম' রূপ। মূর্তিটি অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু হলেও এক্ষেত্রে মূর্তিটির উভয় পাশে মালাধারী মূর্তি কিছুটা পরিদৃশ্য হচ্ছে। উপরে কীর্তিমুখ রয়েছে। এই মূর্তিটিও একাদশ শতাব্দীর বলে অনুমীত হয় (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১০৯-১৬)। বারুইপুর খানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের শ্রীভোলানাথ নস্কর মহাশয় তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত থানে কালো পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তিকে ধর্মঠাকুর বলে পূজা করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে, জানা যায় প্রায় ২০০-২৫০ বছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষ শাঁখারীপুকুর গ্রামের শাঁখারীপুকুর সংস্কার করার সময় এই মূর্তিটিকে উদ্ধার করেছেন। এই মূর্তিটিও বিষ্ণুর সমপদ-স্থানক মূর্তি। এটিও 'ত্রিবিক্রম' রূপের বিষ্ণু। এই মূর্তিরও উভয়পাশে দুটি গজব্যাল, দুটি উড়ন্ত অপ্সরা, শীর্ষভাগে একটি বড় আকৃতির কীর্তিমুখ রয়েছে। এই মূর্তিটিকেও আগের মতো একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের বলে মনে করা হয় (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০,পৃঃ-১১১-১২)।

সোনারপুরের একটি জলাশয় সংস্কারের সময় একটি পুকুর থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে, এটি বর্তমানে রাজ্যপ্রত্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। এখানেও চতুর্ভুজ বিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্তিটিকে সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় দেখা যায়। এখানে মূর্তিটির দুইপাশে দুটি গজব্যাল চিহ্ন, মালাধারী এবং উপরে কীর্তিমুখ রয়েছে। দেবতার দুই পাশে আগের মূর্তিগুলির মতোই বীণাবাদনরত সরস্বতী এবং শ্রীফল হস্তে লক্ষীর মূর্তি রয়েছে। এটিও বিষ্ণুর 'ত্রিবিক্রম' রূপ। মূর্তিটি আনুমানিক দশম একাদশ শতাব্দীর (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ- ২১৪-১৫)। সুন্দরবনের কাশীপুর থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এটিতে চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তিটিকে একটি গরুর পৃষ্ঠে নৃত্যরত অবস্থায় দেখা গেছে। এই রূপ নৃত্যরত বিষ্ণুমূর্তি সমগ্র সুন্দরবনে খুবই বিরল। এই মূর্তিটি রয়েছে আশুতোষ সংগ্রহশালায়। এই মূর্তিটির সময়কাল আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দী (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১১৫)।

সুন্দরবনের কাকদ্বীপ থানার কাছে নৃসিংহ আশ্রমে একটি সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় নীলাভ শক্ত প্রস্তরে গভীরভাবে ক্ষোদাই করা 'ত্রিবিক্রম বিষ্ণু' মূর্তি রক্ষিত আছে। দেবতার চারটি হাত রয়েছে। প্রতি হস্তে যথাক্রমে পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ রয়েছে। তাই শাস্ত্র অনুসারে এক্ষেত্রেও তিনি 'ত্রিবিক্রম বিষ্ণু'। এই মূর্তির নীম্নে পাদপীঠে করজোড়ে গরুড় এবং অন্যদিকে ভক্তরা রয়েছেন। মূর্তির দুইপার্শ্বে শ্রীদেবী (লক্ষ্মী) এবং সরস্বতী রয়েছেন। শিলাপটের দুইপার্শ্বে দুইটি গজব্যাল রয়েছে। উপরের দিকে উড়ন্ত মালাধর-মালাধারী মূর্তি এবং শীর্ষে কীর্তিমুখ রয়েছে। এই মূর্তিটি আনুমানিক দশম শতাব্দীর (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য, ২০১০, পৃঃ-১১৬-১৭)।

সুন্দরবনের নলগোড়ার কয়ালবাড়ীতে একটি বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এটি নিকটবর্তী একটি পুকুর খননের সময় পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। এখানে মূর্তিটি একটি শক্ত কালো পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিটির চতুর্হস্তে যথাক্রমে পদ্ম-চক্র-গদা ও শঙ্খ রয়েছে। এখানে দেবতাকে সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় দেখা গেছে। মূর্তির পাদপীঠে রয়েছে গরুর। শীর্ষে রয়েছে কীর্তিমুখ। মূর্তিটি আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর। বারুইপুর খানার অন্তর্গত আটঘরা গ্রামের একটি পুকুর খনন করার সময় একটি কালো পাথরের তৈরি আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার হয়েছে বর্তমানে এই মূর্তিটি বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এক্ষেত্রেও বিষ্ণুর পাশে শ্রীদেবী দণ্ডায়মান রয়েছেন, তাঁর এক হস্তে চামর ও অন্য হস্তে সনাল পদ্ম রয়েছে। বিষ্ণুদেবতার চার হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম রয়েছে। মূর্তিটির দক্ষিণদিকে ভক্তদম্পতিকে করজোড়ে দণ্ডায়মান দেখা যায়। মূর্তির বামদিকে পক্ষযুক্ত গরুড়ের উপস্থিতি রয়েছে। বারুইপুর থানার অন্তর্গত আটঘরা সীতাকুণ্ডে আরও একটি পুকুর থেকে কালো পাথরের তৈরি আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর চতুর্ভুজ বিশিষ্ট সমপদ-স্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তির উভয়পাশে দ্বি-ভুজা দুই দেবী তথা-শ্রীদেবী ও ভূদেবী দণ্ডায়মান। এখানে ভূদেবী তথা সরস্বতী দেবীকে বিনাবাদনরত দেখা গেছে। এছাড়া মূর্তির বামদিকে করজোড়ে পক্ষযুক্ত গরুড় এবং শিলাপটের শীর্ষে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এই মূর্তিটিও বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য ২০১০, পৃঃ-১১৯-২৩)। আটঘরা থেকে আরো বেশ কয়েকটি সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান চতুর্হস্ত বিশিষ্ট পাল-সেন সময়কার বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে; এগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়ায় কালো পাথরের তৈরি আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় চতুর্ভূজ বিষ্ণুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পাওয়া গেছে। বিষ্ণু দেবতার মূর্তির দক্ষিণ হস্তের নিচে শ্রীদেবীকে চামর ও সনাল পদ্ম হস্তে ধারণ করে দণ্ডায়মান দেখা যায় এবং বিষ্ণু দেবতার বামে ভূদেবী (সরস্বতী) কে বীণাবাদনরতা দেখা যায়। মূর্তির পাদপিঠে করজোড়ে পক্ষযুক্ত গরুড় মূর্তি রয়েছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১২৩-২৪)। মূর্তিটি বর্তমানে বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। হাড়োয়া থেকে উদ্ধার হওয়া একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই ধরনের আরো একটি বিষ্ণুমূর্তি বারুইপুর সংগ্রহশালাতে রক্ষিত আছে। এই একই ধরনের একটি বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া গেছে। আনুমানিক একাদশ শতকের এই ভগ্নমূর্তিটি বর্তমানে এই বারুইপুর সংগ্রহশালাতেই রক্ষিত আছে। বারুইপুর থানার মধ্য কল্যাণপুর থেকে একটি কালো ব্যাসাল্ট

পাথরের আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বিষ্ণুর পাদপীঠ উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে এটি বারুইপুর সংগ্রহশালাতে রক্ষিত আছে। মূল পাদপীঠের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিষ্ণুমূর্তির সমপদে দন্ডায়মান থাকার পদযুগল এবং মূর্তির এই পদযুগলের উভয়পাশে শ্রীদেবী ও ভূদেবীর ভগ্নপদযুগল দৃশ্যমান। দেব-পদের নিচের দিকে পক্ষযুক্ত গরুড়কে করজোড়ে উপবিষ্ট দেখাযায়। কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া অপর একটি কালো পাথরের আনুমানিক দশম-একাদশ শতকে নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি এই বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত রয়েছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০,পৃঃ- ২৩১-৩২)।

জয়নগর খানার অন্তর্গত মজিলপুরে কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালায় বেশ কয়েকটি পাল-সেন সময়কালের বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। এগুলি সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এখানে রক্ষিত আছে আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর নীলাভ বড় দানার বেলে পাথরের তৈরি চতুর্ভুজ বিশিষ্ট সমপদ স্থানক ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি। এছাড়া খাড়ি-ছত্রভোগ সংগ্রহশালার পাল-সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তির অবয়ব, অনেকগুলি ভাঙা বিষ্ণুমূর্তির দেহাংশ, পাদপীঠ সংরক্ষিত আছে। এগুলির বেশিরভাগই রায়দিঘি থানার অন্তর্গত কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া গেছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১২৬, ১৩৩-৩৫)।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে ডাঃ তুলসীচরণ ভট্টাচার্য প্রত্ন-সংগ্রহশালায় পাল-সেন সময়কার কালো প্রস্তর নির্মিত বেশকিছু ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি, ভগ্ন বিষ্ণুপাদপীঠ ও ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির অন্যান্য অংশ রক্ষিত আছে। এগুলির বেশিরভাগই কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া গেছে। এই সংগ্রহশালাতে রক্ষিত বিষ্ণুমূর্তিগুলিতে বিষ্ণুদেবতাকে সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে দন্ডায়মান দেখা গেছে, মূলদেবতার দুই পাশে পার্শ্বদেবী সরস্বতী ও শ্রীদেবীর ভগ্ন মূর্তি রয়েছে। মূর্তির পাদপীঠে করজোড়ে পক্ষযুক্ত গরুড় উপবিষ্ট রয়েছেন। এছাড়া সাগরদ্বীপের বামনখালি সংগ্রহশালায় কয়েকটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে, এর মধ্যে একটি বড় আকারের দশম একাদশ শতকের ব্যাসাল্ট পাথরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত রয়েছ। বারুইপুরের রামনগর সংগ্রহশালাতেও পাল-সেন সময়কালের কিছু ভগ্নবিষ্ণুমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠসহ অন্যান্য ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১৩৫-১৪০)। এগুলি ছাড়া বারুইপুরের জগতিঘাটা, ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত আশুরালী, মগরাহাট থানার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে বিষ্ণুমূর্তির অসংখ্য ভগ্ন খন্ডাংশ গ্রামেরই কয়েকটি স্থানে এবং মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই বিষ্ণুমূর্তির ভগ্ন খন্ডাংশগুলো গ্রামবাসীদের দ্বারা পুজিতও হয়ে থাকে। এই বিষ্ণুমূর্তির খন্ড অংশগুলি পাল ও সেন যুগে নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার হওয়া পাল- সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তিগুলিতে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেবতাকে চতুর্ভুজ বিশিষ্ট সমপদ-স্থানক ভঙ্গিমায় পদ্মের উপর দন্ডায়মান দেখা গেছে। তাঁর চারহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অধিকাংশ মূর্তির ক্ষেত্রেই মূলদেবতার (বিষ্ণুর) পার্শ্বদেবী শ্রীদেবী ও ভূদেবী (সরস্বতী) কে দেখা যায়। অধিকাংশ মূর্তির পাদপীঠে করজোড়ে পক্ষবিশিষ্ঠ গরুড়কে উপবিষ্ট দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে পাদপীঠে ভক্তদম্পতিকেও দেখা গেছে। সুন্দরবনে পাল-সেন পর্বের প্রায় সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিতেই দেবতাকে তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মী এবং সরস্বতী; এবং বাহন গরুড় সহ স-পরিবারে উপস্থাপনা করার যে প্রয়াশ শিল্পী এখানে করেছেন তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর উপাসনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষ্ণুমূর্তি গুলি ছাড়াও বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি অবতার মূর্তি সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে। আশুতোষ সংগ্রহশালায় সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত একটি ধূসর কালো পাথরের আনুমানিক দশম-

একাদশ শতাব্দীর নরসিংহের মূর্তি রক্ষিত আছে। এছাড়া উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জের শ্রী শরৎ মণ্ডলের বাড়িতে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের একটি বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিটি খুবই ভগ্ন অবস্থায় রক্ষিত আছে। তবে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে এই ধরনের বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্তি আর একটিও পাওয়া যায়নি। সমগ্র সুন্দরবনের ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর যে সমস্ত মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্বাধিক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। তবে এই বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা পাল ও সেন যুগেই সর্বাধিক ছিল। তাই একথা বলাই যায় পাল-সেন সময়কালে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল।

গুপ্তপূর্ব যুগ থেকেই প্রাচীন বঙ্গদেশে সূর্য দেবতার উপাসনার প্রচলন ছিল। পাল-সেন আমলে এই সূর্য দেবতার পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সূর্য দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে; "বিশ্বরূপ সেন এবং কেশবসেন 'পরম সৌর' ছিলেন" (সুনীল চট্টোপাধ্যায়; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ২০১২, পৃঃ- ৪১৮)। এই সময় সূর্য দেবভার উপাসনারও কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরে সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা পাল যুগের দুটি সূর্য মূর্তি রক্ষিত আছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১৮২)।

এই সময়কালের গণপতি অর্থাৎ গণেশ মূর্তি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে। নরোত্তম হালদার মহাশয়ের সংগ্রহে পাকুরতলা থেকে সংগৃহীত আনুমানিক নবম-দশম শতকের একটি ছোট্ট আকৃতির গণেশ মূর্তি রক্ষিত আছে। এখানে গণপতিকে চতুর্ভুজ বিশিষ্ট এবং পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেখা গেছে, অর্থাৎ এটি গণেশের আসন মূর্তি। গণেশের চার হস্তে যথাক্রমে অক্ষমালা, কুঠার, পাশ ও মোদকপাত্র ধৃত রয়েছে। পায়ের কাছে তাঁর বাহন মুষিককে লক্ষ্যকরা যায়। এই পাকুরতলাতেই একটি পুকুর খননের সময় ধূসর রঙের পাথরের প্রায় ২.৫ ফুট আকৃতির নবম-দশম শতকে নির্মিত একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্তমানে এই মূর্তি পাকুরতলারই এক স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে রক্ষিত আছে। এখানে গণেশ চতুর্ভুজ বিশিষ্ট এবং রাজাসনে উপবিষ্ট। এখানে এই মূর্তিটি অনেকটাই ভগ্ন, বিশেষ করে দেবতার হস্তাদি ও মুখমন্ডল অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত। তবে সুন্দরবনের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আনুমানিক দশম শতকের একটি কালো পাথরের তৈরি ষড়ভুর্জ নৃত্যরত গণেশ মূর্তি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে গণপতিকে একটি পদ্মের উপর নৃত্যরত দেখা যায়। দেবতার ছয় হাতেই প্রতীক ধৃত রয়েছে। তাঁর বাম নিম্নহস্তে একটি মোদক ভান্ড রয়েছে। দেবতা শুঁর দিয়ে মোদক পান করছেন। সুন্দরবনের কঙ্কনদিঘি থেকে উদ্ধার হওয়া আনুমানিক নবম-দশম শতাব্দীর একটি চতুর্ভুজ বিশিষ্ট গণেশ মূর্তি দক্ষিণ বিষ্ণুপুর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। মূর্তিটি অনেকটাই ভঙ্গুর। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর কালো ব্যাসাল্ট পাথরের দ্বিভুজ বিশিষ্ট একটি গণপতি মূর্তি বর্তমানে রাজীব বনুর বেহালার সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-১৮৭-১৯২)। এই মূর্তিগুলি ছাড়াও সুন্দরবনের অন্যান্য স্থান থেকে পাল-সেন যুগে নির্মিত গণেশ মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। অর্থাৎ পাল-সেন যুগে গণেশ উপাসনার প্রভাব সুন্দরবনে ছিল। তবে এই সমস্ত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের উপাসনার পাশাপাশি সুন্দরবনের পাল-সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য শক্তিদেবীর উপাসনাও প্রচলিত ছিল। এই সময়কালে যে শক্তিদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল তার বড় স্থান অধিকার করেছিল মহিষমর্দিনীর উপাসনা। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে পাল-সেন যুগের মহিষমর্দিনীর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। সাগরদ্বীপের প্রখ্যাত প্রত্নস্থল হলো মন্দিরতলা, এখানে মন্দিরতলার দক্ষিণে চকফুলডুবি গ্রামের নদীর তীর থেকে স্তরীভূত ভঙ্গিল

মাইকা পাথরে নির্মিত দ্বাদশভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য মহাশয় চকফুলডুবি গ্রামের এই মহিষমর্দিনীর মূর্তির সময়কাল নির্ধারন করেছেন নবম-দশম শতক (কৃষ্ণকালী মন্ডল; সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য; ২০১০, পৃঃ-২০৫-১১)।

মগরাহাট খানার মহেশপুরে একটি মনসা মন্দিরে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত অষ্টভুজ বিশিষ্ঠ মহিষাসুরমর্দিনীর একটি মূর্তি রয়েছে। বারুইপুর খানার অন্তর্গত বড়দুর্গা গ্রামের একটি ভগ্ন মন্দিরে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মহিষমর্দিনীর একটি ভগ্নমূর্তি রয়েছে। তবে পাল-সেন যুগে নির্মিত শক্তির দেবী বারাহীর একটি মূর্তি কঙ্কনদিঘি থেকে পাওয়া গেছে। বর্তমানে এই মূর্তিটি বারুইপুর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সুন্দরবনে পাল-সেন যুগে নির্মিত সপ্তমাতৃকার এক রূপ বারাহীর মূর্তি অবশ্যই এই সময়কালে শক্তির উপাসনায় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

পালপর্বের বেশকয়েকটি লেখতে শিবপূজার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ধর্মপালের খালিমপুর লেখতে একটি চতুর্মুখ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। আবার দেখা গেছে রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; ভাগলপুর লেখা থেকে জানা যায় নারায়ণপাল কর্তৃক শিবভট্টারক এবং তাঁর সেবকদের জন্য ভূমিদানের বিষয়টি উল্লেখ আছে (সুনীল চট্টোপাধ্যায়; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ২০১২, পৃঃ-৪১৬)। এই সমস্ত তথ্য থেকে এটা অনুমান করা যায় যে পাল যুগের শৈবপূজা কিছুটা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তবে এই সময়ে সমগ্র সুন্দরবনের লিঙ্গরুপী শিবের পূজা বেশি প্রচলিত ছিল। তবে শিবের অন্যান্য মূর্তি তথা চন্দ্রশেখর, নৃত্যরতশিব, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর ইত্যাদি মূর্তির পূজাও বহুল প্রচলিত ছিল। আবার সেন বংশের সম্ভবত পারিবারিক দেবতা ছিলেন সদাশিব। সেন বংশের রাজারা প্রথমদিকে শৈব ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তারা বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, বিজয়সেন শিবের আহ্বান করেছিলেন শম্ভু নামে। লক্ষনসেন এবং তাঁর দুই পুত্র তাঁদের বিভিন্ন লেখতে নারায়ণের আহ্বান করলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন (সুনীল চট্টোপাধ্যায়; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ২০১২, পৃঃ-১১৭)।

দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় সমগ্র সুন্দরবনে অন্যান্য ব্রাক্ষণ্য দেবতা যেমন- কার্তিক, অগ্নি, কুবের ও অন্যান্য দেবতাদের মূর্তি পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে। অর্থাৎ বিষ্ণু, গণেশ, শিব ও কয়েকটি মাতৃকা দেবী তথা মহিষমর্দিনী ও বারাহী মূর্তির উপাসনার পাশাপাশি উক্ত দেবতাদেরও কেন্দ্রকরে স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস সুন্দরবনে গড়ে উঠেছিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ, ১৯৬০, পঞ্চোপাসনা, কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড।
- মণ্ডল, কৃষ্ণকালী, ২০১০, সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য, কলকাতা, নব চলন্তিকা।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীল, ২০১২, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (দ্বিতীয়খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটোগল্পে হা-অন্ন জীবনের লড়াই, দাম্পত্য এবং নারী

উজ্জ্বল গরাই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বন্ধুর মালভূমিতে জীবন-জীবিকার নিত্যদিনের সংগ্রাম। অভাব-অনটন-খরা-জলকষ্টে কোণঠাসা প্রান্তিক জীবন। সৈকত রক্ষিত কলম ধরেছিলেন তাদের হয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে তাই নিবন্ধিত হয়েছে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার এই প্রান্তিক নারীর জীবন-যন্ত্রণা। জীবন ও সংগ্রামের কথা। আশাহত-বঞ্চিত-অবহেলিত নারীর অসহায়তা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর কথা। তাদের সুখী-অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা। 'আঁকশি' গল্পে দেখি, শিমুল তুলো কুড়িয়ে সংসার চলে মাগারামের। ভুকুর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী সন্তানের দু-একদিনের অন্ন সংস্থানের জোগাড় হওয়ার আনন্দে আঁকশি দুলিয়ে মাগারাম এগিয়ে চলে লৌকিক গান গাইতে গাইতে। 'মূলুন' গল্পে পুকুরের পাঁক থেকে পদ্মমূল তুলে এনে তাই বিক্রি করে দিনপাত। তা থেকেই স্বপ্ন দেখে আগামীর। হতাশা নয়, প্রত্যাশার পদ্ম ফুটে ওঠার। গ্রাম্য রমণীয় মুহূর্তের থেকে দূরে সরে যেতে যেতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্লান্তি—অনীহা এবং হা-পিত্যেশ করে ওঠা দীর্ঘশ্বাস, খরাপীড়িত গ্রামীণ জীবনের কারুণ্য এবং অসহায়তার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে চঞ্চলার কথার মধ্যে দিয়ে। এইভাবে লেখক দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত জীবনের নিত্যদিনের লড়াই, দাম্পত্য এবং সবকিছুকে ঘিরে সীমান্ত-নারীর ছবিটিকে এঁকেছেন দক্ষ শিল্পীর মতো।

মূল শব্দ: সীমান্তবঙ্গ, দাম্পত্য, নারী, গ্রামীণ, বিশ্বায়ন, জীবিকা।

মূল প্রবন্ধ:

সৈকত রক্ষিতের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব আটের দশকের কাছাকাছি। বলা যায়, সমগ্র বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রাম্যজীবনের, যাপনের চিত্র নির্মাণে অপ্রতিরোধ্য প্রতিনিধি তিনি। সৈকত রক্ষিতের কথাভূমিতে সময় এবং সময়ের হাত ধরে উঠে এসেছে গ্রামীণ জীবনের নিজস্ব নিভৃত যাপন, যাপনের আদল। মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব কখনও নেয়নি—সৈকত রক্ষিত সেই অশ্রু-শব্দ দিয়ে তাঁর কথন-প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। প্রেমে, বাৎসল্যে, অবজ্ঞায়, অবহেলায়, অত্যাচারে, নিপীড়নে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, অসহায়তায়, সংগ্রামে, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিস্পর্ধিতায়, বর্ণময় নারীজীবনের বহুমাত্রিক রূপচিত্র, বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। সুদূর শাল অরণ্যের জীবনে নগরায়নের আঁচ লাগা এখনও বাকি। বন্ধুর মালভূমিতে জীবন-জীবিকার নিত্যদিনের সংগ্রাম। অভাব-অনটন-খরা-জলকষ্টে কোণঠাসা প্রান্তিক জীবন। সৈকত রক্ষিত তাদের হয়ে কলম ধরেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে তাই নিবন্ধিত হয়েছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার এই প্রান্তিক নারীর জীবন-যন্ত্রণা। জীবন ও সংগ্রামের কথা। আশাহত-বঞ্চিত-অবহেলিত নারীর অসহায়তা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর কথা। তাদের অসংযত, অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা।

তাঁর গল্প সংকলন 'উত্তরকথা'-র প্রথম গল্প 'আঁকশি'। গল্পে দেখি, জুয়ালকাঠি গ্রাম। গাছে গাছে আড়াল হয়ে থাকে গ্রামের চালাঘরগুলো। মাগারাম মুচি কোনও রকমে দিনান্তের খোরাক জোগায়। বাড়িতে বৃদ্ধা মা। বউ বেদনি আর দুই ছেলে। সপরিবারের সমবেত কায়িক শ্রম

যাদের একমাত্র সম্বল। সেই আদিম, গ্রাম্য জীবনের প্রতিনিধি মাগারাম এবং বেদনি। চৈত্রের রোদ গায়ে মেখে শিমুল তুলো সংগ্রহ করে তারা। মহাজনের কাছে সেগুলো বিক্রি করে তাই দিয়ে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে নেয়। মাগারাম সকাল সকাল শিমুল তুলো খুঁজতে বেরোনোর তাগাদা দিলে বেদনি ছেলের মুখ থেকে স্তন্য কেড়ে নিয়ে তাকে খাটের দড়িতে আছড়ে ফেলে। মা বেদনির এই আচরণের কারণটিকে লেখক নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন এইভাবে—"উঠে-কে-উঠেই, সংসারের এটাসেটা করতে করতে, স্বাভাবিকভাবেই দেয়াল টপকে রোদ এসে পড়ে উঠোনে।" বাইরের কাজে বেরোনোর আগে সংসারের যাবতীয় গুছিয়ে নিতে হয় বেদনিকে। ঘরে তেমন খাবার মজুত না থাকলে মুড়ি ভাজার জন্য চাল প্রস্তুত করে রাখে। জ্বালানির জন্য উনুনের কাছে রেখে দিয়ে যায় শুকনো শিমুলের খোলা। তারপর স্বামীর সঙ্গে আশমানমুখী আঁকশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। জোয়ালকাঠি গ্রামের পাশেই সাঁওতাল গ্রামের মেয়েরা শাল গাছের দাতন, পাতা কিংবা রাইবাঁশের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। সীমান্তবঙ্গের গ্রামীণ নারীদের এই বৃত্তিমূলক, কর্মমুখর জীবনের ছবিটিকে গল্পকার এইভাবে চিত্রিত করেছেন।

মাগারামের মধ্যে হতাশার প্রকাশ নেই। কাঁধে আঁকশি নাচিয়ে ক্রমশ হেঁটে চলেছে প্রখর অনুসন্ধানী চোখ। রঞ্জনডিতে ভকু গরাইয়ের বাড়িতে শিমুল গাছের সন্ধান পেয়ে চনমনে হয়ে ওঠে সে। ভুকু অবস্থাসম্পন্ন সচ্ছল মানুষ। সামান্য দামাদামি করে চল্লিশ টাকায় গাছ চুক্তি করে ফেলে মাগারাম। আঁকশির টানে পড়ে যাওয়া শুকনো শিমুল ফল কুড়োনোর নেশায় মেতে ওঠে তার ছেলে নীলকমল। ভুকুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বেদনি বলে, ফাগুন মাসের বৃষ্টিকেই যত ভয়। বৃষ্টিতে শিমুল ফুল ঝরে গেলে তখন পেটে মরা ছাড়া উপায় নেই। শিমুল গাছকে আঁকড়ে ধরে শিমুল গাছে ওঠা-নামার মাঝখানে বেঁচে থাকা জীবনটা ভুকুকেও ভাবিয়ে তোলে মুহূর্তের জন্য। ভুকুর সেই সহানুভূতির কাছে নত হয়ে আসে মা বেদনির মন। অভুক্ত শিশুর জন্য একটুখানি ফ্যানের প্রত্যাশা। ভুকু এক হাতা ভাত মেশানো ফ্যান তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তি ও গৌরবের সঙ্গে বলে ওঠে—খাক, খেয়ে বাঁচুক। ভুকুর এই উক্তির মধ্যে দিয়ে দুই বিপরীত আর্থ-সামাজিক চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। তিনি লিখছেন—

> "ঠাণ্ডা জল হয়ে যাওয়া মাড়ের গন্ধ কেমন করে যেন পৌঁছে যায়
> মগ ডালে। তার অমোঘ আকর্ষণে মাগারামও তড়াক তড়াক করে
> নামতে থাকে। ডালে ডালে লাট খেতে খেতে সে আপনা আপনি
> ধপাস করে পড়ে মাটিতে। সামলেও নেয়।"[১]

সামান্য ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার আনন্দ। স্ত্রী সন্তানের দু-একদিনের অন্ন সংস্থানের নিশ্চিন্তি। আর এই আনন্দেই আঁকশি দুলিয়ে মাগারাম এগিয়ে চলে লৌকিক গান গাইতে গাইতে। পিছনে বেদনি আর লীলকমল সেই সুরে সুর মিলিয়ে হেঁটে চলে। এই হেঁটে চলা আবহমান। অনন্ত। পাঠক মনের সড়কের ওপর দিয়ে—আশা জিজ্ঞাসার অসংখ্য মোড় পেরিয়ে। বেদনির মধ্যে দিয়ে সাংসারিক অতৃপ্তি এবং পাশাপাশি জননীর দায়বদ্ধতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে সমগ্র গল্পের মধ্যে দিয়ে সৈকত রক্ষিত তার যাত্রাপথটিকে স্পষ্ট করে দিলেন । কলমের আঁকশি দিয়ে টেনে আনলেন গ্রাম্য জীবন এবং তার প্রেক্ষিতকে।

'মূলুন' গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে জীবন জীবিকার দ্বন্দ্ব এবং সংকট। দুয়ারা গাছে চড়েছে কিন্তু বাসে চড়ার সুযোগ তার হয়নি। গাছের উপর চড়ে সে দেখে পুবের শহরের উন্নয়ন। উন্নত জীবনের হইচই। অথচ এই বিরাট দেশ দুনিয়ায় তার যাওয়ার কোথাও নেই। পুকুরের পাঁক থেকে পদ্মমূল তুলে এনে তাই বিক্রি করে সে দিনপাত করে। দুয়ারার তুলে আনা পদ্মমূল, গোছা করে

আটি বেঁধে দেয় বউ আদরি। এক একটা আটি পঁচিশ পয়সা। এ ছাড়াও জঙ্গলের বুকে সংগ্রহ করে আনে কুসুমের বিচি। সেই বিচিগুলো রোদে শুকিয়ে পাইকারের কাছে বিক্রি করে। কালো হড়হড়ে শরীর দুয়ারার। মরে যাওয়া খিদেয় চুপসে যাওয়া পেট। ঝামা ধরা পিঠে রোদ পড়ে না আর। লেখক বলছেন—

> “অদ্ভুত এক নিস্তরঙ্গ ও স্তব্ধ জীবন। মাঝে মাঝে প্রকৃতি তাদের কাজ দেয়। আবার প্রকৃতি কেড়ে নেয় তাদের কাজ। তখন সেই সকরুণ নিশ্চল বাতাবরণ সঙ্কুচিত করে দেয় তাদের জীবনযাপনকে। তাদের বেঁচে থাকাকেও। তবুও জীবনের জন্য এক বিচিত্র অন্বেষণ নিয়েই তারা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার আমরণ প্রয়াস চালায়।”[২]

এক বাঁধে বেশি দিন মূল থাকে না। পাঁক ফুরিয়ে আসে। মূল ফুরিয়ে গেলে শূন্য পুকুর তাদের বিষন্ন করে তোলে। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যেও তবু উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার আভাস নেই। লেখক বলছেন—

> “তাদের বেঁচে থাকা যে এক বিরাট আকাশের নীচে! এই বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর হলেও, তারাও, বেঁচে থাকে প্রকৃতির মতোই। মুক্ত ও প্রতিবন্ধকতাহীন। মানুষের কাছে, নিকটবর্তী শহর-সভ্যতার কাছেও কোনো দাবি বা প্রত্যাশা তাদের নেই।...যত প্রত্যাশা, বঞ্চনা এবং নৈরাশ্য সবই প্রকৃতিকে ঘিরে। ঋতুকে ঘিরে। মূলন ফুরিয়ে গেলে, তারা কেবল পুকুরের শূন্যতা দেখে বিষন্ন হয়। হেসে ওঠে পলাশের প্রগলভতায়। আবার ডালে ডালে যখন মহুল ফুল পাকে, তখন সেই মহলের গন্ধে নিহিত তাদের যত উল্লাস।”[৩]

সীমান্ত জীবনের বেঁচে থাকার মূল শক্তি, মূল সুরটি এই সামান্য কথার মধ্যে লেখক প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন পদ্মের মতো।

অভাব অনটনে তাড়িত বাবা-ছেলের অদ্ভুত নিয়তি ‘হাম্বা’ গল্পে প্রতীত হয়েছে। এই গল্পে উঠে এসেছে মোষের শিং সংগ্রহের কারবার। বর্ষা পড়লে গোবিন্দ, বউকে নিয়ে মাঠে মজুর খাটতে গেলেও বাকি সময় সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে মোষের শিং সংগ্রহ করে। তারপরেও সংসার চালানোর ভার অসহায় করে তোলে গোবিন্দকে। লেখকের কথায়—

> “বর্তমানে, গোবিন্দ, তার বিধ্বস্ত বাসভূমি, শীর্ণকায় গরু, আর ঠিক গরুর মতনই অস্থিসার চেহারাটির দিকে তাকিয়ে, বৃত্তির নামে কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বঞ্চনা টুকুই টের পায়?... মুচি বলেই খড় দিতে পারেনি চালায়। লজ্জা নিবারণের একখণ্ড বস্ত্র যথাসময়ে তুলে দিতে পারেনি তার বউয়ের শরীরে।”[৪]

‘চুন’ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় চুন ব্যবসার সংকট এবং চুনের কারবারের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর আর্থিক অনটন। মন্দার বাজারে পুঁজিও নিঃশেষিত টুনুর। তার উপর লুটতরাজ প্রশাসনিক সিন্ডিকেট চক্রান্ত। ব্যবসার এই অচল অবস্থা, পরিবারের মধ্যেও ক্ষতের সৃষ্টি করে। বউ সাগরি, টুনুর পতনের যথাযথ কারণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তুচ্ছ মেয়ে মানুষের কাছে এই পরাজয় মর্যাদায় লাগে টুনুর। সাগরি বলে, চুনের কারবার যদি পেট চালাতে না পারে

তাহলে শুধু শুধু খেটে মরা কেন? দশ বছরের চুনের কারবার তাকে কিছুই দেয়নি। সাগরি এখনও ঘুঁটে দেয় দেওয়ালে, কাঠ-পাতা কুড়িয়ে এনে ফ্যান ভাত খায়। গল্পে সাগরির কথা এটুকুই। গণপতিকে দেখে ঘোমটার আড়াল নিয়ে গল্পের উঠোন থেকে তার নিশ্চুপ নির্বাসন। গণপতি তনুকে পরামর্শ দেয়—শরীর যদি পুঁজি হয়, বেঁচে থাকার এই কঠিন লড়াইয়ে সেই শরীরকেই তছনছ করে এগোতে হবে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নের জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর ভাঙনটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বারবার। 'হাম্বা' গল্পে দেখতে পাই, গ্রামবাসীদের মধ্যে গবাদি পশু পালনের প্রতি অনাগ্রহ। গরুর ঘানির বদলে পেশাইয়ের কলের ব্যবহার। উপার্জনশীল গ্রামজীবনের সব পথে ক্রমশ ভগ্নপ্রায় দুর্বল হয়ে পড়ছে। গোবিন্দ তাই আশাহত জীবনে উপলব্ধি করে—মানুষের চামড়ার কোন কিমত নেই। গল্পের নির্যাসটুকু গল্পকার নিজেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব বয়ানে—

> "ছোট ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে জড়িয়ে আছে এক নিঃস্ব গ্রামবাসী, এক তুচ্ছ চর্মকারের জীবন ও জীবিকার যোগসূত্রটুকু। যখন সে বড় বড় থলি ভর্তি করে শিং-এর বোঝা ঘরে এনে ফেলেছে, চামড়া এনেছে কাঁধে বয়ে, তখন দু-শ মাইলের মেঠো পথ পায়দল করতেও তার ফাটা ফাটা পায়ের পাতায়, গুলিতে পরিশ্রমের সামান্য চিড় সে অনুভব করেনি। বরঞ্চ উদ্দীপনা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে—জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত আর সজনে পাতা সিদ্ধ খেয়ে। জ্যোৎস্না রাতে, উঠোনে, দড়ির খাট পেতে চঞ্চলাকে পাশে বসিয়ে সে অনুভব করেছে প্রকৃতির নিত্য মহিমা।"[৫]

গল্পে দেখি, নাটকীয় দৃশ্যের সূচনার মতো, চঞ্চলা ঝুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে বেলা শেষে। ঝুড়িতে শুকনো কাঠ আর কুসুমের বিচি। পিছন পিছন হাঁসফাঁস করতে করতে ঘরে ঢুকে গরুটা। গরু এখানে সময়ের একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। চঞ্চলার সংসার নিমগ্ন সময়ের। গ্রাম্য রমণীয় মুহূর্তের থেকে দূরে সরে যেতে যেতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্লান্তি—অনীহা এবং হা-পিত্যেশ করে ওঠা দীর্ঘশ্বাসের। খরাপীড়িত গ্রামীণ জীবনের কারুণ্য এবং অসহায়তার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে চঞ্চলার কথার মধ্যে দিয়ে। চঞ্চলা জানে, চারশো টাকা শুনতেই অনেক। হা-অন্ন সংসারে তার মূল্য কিছুই নয়। তাই পাইকারকে সে তাড়া দিয়ে বলে আরও বিশ-পঞ্চাশ টাকা গাইয়ের দাম বাড়িয়ে দিতে। অনেকদিন পর পেট ভরে দুবেলা খেতে পাবার খুশিতে চঞ্চলা গোবিন্দকে বলে—আগে দু'মুঠো চাল নিয়ে আসতে। তারপরে ঘরের ছাউনি সারানো যাবে। গোবিন্দ খিদে, তৃষ্ণায়, প্রলোভনে চঞ্চলার আদুড় গায়ের মধ্যে খুঁজে পায় ভাতের আদিম ঘ্রাণ।

খেটে খাওয়া, নিরন্ন, অভাবতাড়িত, বঞ্চিত, বুভুক্ষু জীবনের ছবি তিনি সুনিপুণভাবে এঁকেছেন করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। জীবন-জীবিকার টানাপোড়েনে নারীরা পুরুষের মর্মসঙ্গিনী নয় বরং কর্মসঙ্গিনী। 'আরেক আরম্ভ' গল্পে বানেশ্বরের মুখে শুনেছিলাম, 'দৈনিক ল টাকা লসকান।' অন্তঃসত্ত্বা বউকেও জীবিকা ও জীবনের জন্য সংসার ও সংসারের বাইরে লড়াই করে দিন গুজরান করতে হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা পুরুষের পাশে সমানভাবে এই কর্মযুদ্ধ চালিয়ে যায়। কখনও কায়শ্রমে ছাপিয়ে যেতে হয় পুরুষটিকেও। 'আঁকশি' গল্পের বেদনি হোক বা 'মাড়াই কল' গল্পে ভাবনি, প্রত্যেকেই তার পুরুষের মর্মসঙ্গিনীর চেয়ে তত বেশি কর্মসঙ্গিনী। সংসার এবং সংসারের বাইরে যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র, যে অবারিত অবাধ জীবনের বিচরণভূমি—

সৈকত রক্ষিত তার 'চেতনা কাতর' দৃষ্টিতে নারীকে সেই বৃহৎ জীবনের বুকে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন নয়, বেঁচে থাকার অভিঘাতকে সহজ-সত্যরূপে গল্পে প্রতিফলিত করেছেন গভীর শ্রদ্ধায় এবং সহানুভূতিতে। বাস্তব-সচেতন সারস্বত সাধনায়।

তথ্যসূত্র:

১। রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩
২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৫
৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৬
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৭
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৩।

রবীন্দ্রচিন্তায় মহামানব গৌতমবুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষতা : একটি পর্যালোচনা

তাপস হালদার
অতিথি অধ্যাপক, পালি বিভাগ
সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাহিত্যে তথা বিশ্ব মানব সাহিত্যে এক কবি, সাহিত্যিক, মানবতাবাদী, সমাজ সচেতক, দার্শনিকের আবির্ভাব বিশ্বকে চমকিত করে, তিনি হলেন আমাদের সকলের গুরু কবি গুরু রবি ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি হলেন আমাদের বিশ্বকবি। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে বাংলা সন ২৫ শে বৈশাখ (৭ই মে ১৮৬১ সালে)। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মাতা ছিলেন সারদা দেবী। শৈশবকাল থেকে ঠাকুর বাড়ির ব্রাহ্ম আদব কায়দা, সাহিত্যালোচনা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প, অভিনয়, ও ধর্মভাবনার মধ্যে দিয়ে বড় হলেও তাঁর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ভাবনা ও চিন্তার বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। যার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে অতুলনীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রকৃষ্টি অধ্যয়নের অন্যতম হাতিয়ার তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যসম্ভার। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির ঐতিহ্য, কৃষ্টি, বিশ্বাস ও জীবনবোধের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। সাহিত্য একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে বিশ্বমঞ্চে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বারূপে চিহ্নিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এছাড়াও সাহিত্যের দ্বারা একটি জাতির চেতনার মূল ভিত্তি ও স্থাপিত হয়। সাহিত্য গুরু রবীন্দ্রাথ ঠাকুর একজন দক্ষ জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশ ভ্রমণকালে বিভিন্ন ধর্মের (খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলীম, পারসিক) আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি, প্রেম, সৌন্দর্যতা আহরণ করে যা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, গান, উপন্যাস, ও ছোটগল্পের মতো সুসজ্জিত সাহিত্য সম্ভার এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃত অর্থেই একজন উদার, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত এক ব্যক্তিত্ব তা বলার বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর এই পরিবর্তিত দার্শনিক চিন্তাধারার পিছনে নিঃসন্দেহে মহামানব গৌতম ও তাঁর সদ্ধম্ম এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য বৌদ্ধ অধ্যুষিত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ পরিভ্রমন ও তার প্রভাব রবীন্দ্র জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

তাছাড়াও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুশীলনে রত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীদের আলোচনায়, রচনায় বুদ্ধের "অবতার" রূপটি কখনও প্রকট আবার কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখা গেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধদেবকে কোথাও "অবতার" বলে স্বীকার করেননি বরং তিনি স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই নিয়েই দেখেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ভগবান বুদ্ধদেব "মহামানব" রূপেই থেকে গেছেন। অতএব এখান থেকে নতুন ভাবে, নতুন রূপে এক বিশ্বকবিকে পাই। এই প্রবন্ধের মধ্যে এই বিষয়ে আলকপাতের প্রয়াস করেছি।

সূচক শব্দ: ধর্মনিরপেক্ষ, রবীন্দ্রনাথ, মহামানব গৌতম বুদ্ধ, অবতার, সাহিত্যসম্ভার।

মূল আলোচনা:
রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শিক্ষায় ও ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে যে সব সাহিত্য রচনা করেছিলেন সেগুলি মূলত কাব্য, কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য এবং গীত।

কাব্য

কথা ও কাহিনী (১৯০০): 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের প্রায় পুরোটাই বুদ্ধ প্রসঙ্গ বা বুদ্ধ ভাবনায় জারিত। কথা কাব্যের কবিতা গুলি হল – কথা কও, শ্রেষ্টভিক্ষা, অভিসার, প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণ, মস্তক বিক্রয়, পূজারিণী, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষী, অপমান-বর, স্বামীলাভ, স্পর্শমনি, বন্দীবীর, মানী,প্রার্থনাতীত, দান, রাজবিচার, গুরু গোবিন্দ, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হরিমেলা, বিবাহ, বিচারক, পণরক্ষা। তারমধ্যে কবিতাগুলি বুদ্ধ বা বৌদ্ধযুগকে উপস্থাপিত করেছে।

আর 'কাহিনী' কাব্যে রয়েছে ৮টি কবিতা। সেগুলি হলো – কত কী যে আসে, গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, দেবতার গ্রাস, নিস্ফল উপহার, দীনদান, বিসর্জন। অর্থাৎ 'কথা ও কাহিনীর' এই তেত্রিশটি কবিতার বৌদ্ধ কাহিনী জাত না হলেও বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে মেলে-

"এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হয়েছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালি বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণ গুলি দু, একটি ইংরেজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হয়েছে। ... মূলের সহিত এই কবিতা গুলির কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে – আশা করি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য – বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইবে না।"

'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের শাপ মোচন কবিতা।

'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যের বুদ্ধ জন্মোৎসব, বোরোবুদুর, সিয়াম, বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রার্থনা বৈশাখী পূর্ণিমা;

'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতা।

'নবজাতক' (১৯৪০) কাব্যের বুদ্ধভক্তি কবিতা এবং

'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যের ৩ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় রয়েছে বুদ্ধের নিরপেক্ষ ভাবনা, ও বুদ্ধভক্তি।

প্রবন্ধ সাহিত্য যেহেতু চিন্তামূলক, তাই সেখানে বুদ্ধ প্রসঙ্গ সেভাবে আসেনি কিন্তু। 'সমালোচনা (১৮৮৮)' গ্রন্থের 'অনাবশ্যক' নামের প্রবন্ধে রয়েছে বুদ্ধের উপস্থিতি। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে স্বদেশী সমাজ ও দেশীয় রাজ নামের প্রবন্ধ দুটিতে রয়েছে বুদ্ধের কথা। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে সমাজভেদ, নববর্ষ, ব্রাহ্মণ, চীনা ম্যানের চিঠি ও অত্যুক্তি প্রবন্ধে মহামানব বুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে।

প্রবন্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ আখ্যান এসেছে নানাভাবে। সমালোচনা, ভারতবর্ষ, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজা-প্রজা, ধর্ম, সঞ্চয়, পরিচয়, জাপানযাত্রী, লিপিকা, জাভাযাত্রীর পত্র, মানুষের ধর্ম, ভারত পথিক, রামমোহন, শান্তিনিকেতন, কালান্তর, পথের সঞ্চয়, আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্বভারতী, ইতিহাস, বুদ্ধদেব, খ্রিস্ট প্রভৃতি গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ গৌতম বুদ্ধের মানবিক ভাবনা, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা, অহিংসা, বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তি, সংস্কৃতি ও আখ্যানের উল্লেখ রয়েছে।

নাটক, কবিতায় ও প্রবন্ধে বুদ্ধ প্রসঙ্গের অবতারনা ব্যাপক হলেও উপন্যাস এবং ছোটগল্পে সরাসরি নেই বললেই চলে। নাটকে আমরা দেখতে পাই দশটি নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান রয়েছে। মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), গুরু (১৯১৮), অরূপ রতন (১৯২০), নটীর

পূজা (১৯২৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শাপমোচন (১৯৩১) এইসব নাটক গুলি ছাড়াও `শোধবোধ` নাটকে সতীশ ও নলিনীর উক্তি ও সংলাপে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ রয়েছে।

বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাস রচনা না করলেও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় এসেছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের প্রসঙ্গ এবং 'শেষের কবিতা' (১৯২৬) উপন্যাসে ত্রয়োদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক উক্তিতে অমিত ও লাবন্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শোভনলালের পরিকল্পনায় হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রার খবর জানিয়েছেন ঔপ্যনাসিক রবীন্দ্রনাথ। 'রাজর্ষী' উপন্যাসে পশুবলির বিরুদ্ধে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে, অহেতুক প্রানী হত্যার বিরুদ্ধে রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যকে সচেতন করেছেন। রাজা হয়েও শাক্যপুত্র ন্যায় ঋষি যেমন। জাতপাতের ব্যবধান তথাগত বুদ্ধ এসে ঘুচিয়েছেন আজ হতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। বুদ্ধের শিক্ষায় ক্ষৌরকার পুত্র উপালি কিংবা রূপজীবনী আম্রপালি, বিভিন্ন বার বনিতা, রাজা ও ভিক্ষু সবাই সমান অধিকার লাভ করে। কারও স্পর্শে কোন কিছুই নষ্ট হয় না, কেউ কারও নিকট অস্পৃশ্য নয়। বরং মহাপরিনির্বানের অনতি পূর্বে তথাগত চুন্দ নামক এক তথাকথিত অন্তজ এক উপাসকের বাড়িতে নিমন্ত্রনের আহার খেয়ে অসুস্থ হন। তাসত্ত্বেও তিনি উপস্থাপক আনন্দকে বলেন চুন্দের নিন্দা বা কেউ অনিষ্ঠ না করে। বুদ্ধের এই চর্চা রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীতে এনেছেন বহুবার। গোরা উপন্যাসে জাতপাতের কথা ভুলে মা কুড়িয়ে নেন সাহেবের ঔরসে জন্ম নেওয়া ক্রিশ্চান গোরাকে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ সমাজে বুদ্ধের নিরপেক্ষ শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

নির্বাণের পথে অপার মৈত্রী ও করুনার চর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ কারী সিদ্ধার্থ গৌতম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মননে প্রতিনিয়ত বিচরন করেছেন বুদ্ধিময় আলোকনে। সেই আলোক উৎসের ঝর্ণাধারাতেই উপরিক্ত রবীন্দ্ররচনাগুলি হয়েছে কিরীটিময়। ঠিক এখানে আমাদের এক সূক্ষ্ম ভাবনার বিষয় রয়েছে যে -রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন কীভাবে? কেন অন্য কোন ব্যাক্তি বা ধর্ম নয়, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কবির জীবনবোধ কোন পথে সমন্বয়ের এক বিন্দুতে এসে বার বার মিলিত হয়েছে, আর কীভাবেই বা বুদ্ধ ভাবনা ও শিক্ষাকে নিজের আদর্শ শিক্ষা বলে ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধের জন্ম রাজপ্রসাদে আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম জমিদার বাড়িতে। অর্থাৎ দুজনেরই জন্ম বিলাস ও প্রাচুর্যে। কিন্তু দুজনের মনেই বেড়ে উঠেছে ত্যাগ ও মানবতার চেতনা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যদিয়ে সমন্বিত হয়েছে: উনিশ শতকে বাঙালীর নবজাগরন, সমন্বয়ী সুফিবাদ, বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের লৌকিক চিন্তাধারা, সাহিত্য- সংস্কৃতির উপলব্ধির সঙ্গে ধর্মচিন্তাজাত দার্শনিক উপলব্ধির সংযোগ ঘটে। এছাড়াও পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদও তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। ভারতবর্ষের এই জ্ঞান উত্তরনের পর্ব ছিল– অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর ধর্মীয় একছত্র অধিকারের বিপ্রতীপে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ) বৌদ্ধধর্ম (১৯০১) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভ্রাতা) (১৮২৪-১৯৪৬) আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ঘাত প্রতিঘাত (১৮৯৯), রাজেন্দ্রলালা মিত্র (১৮২২-১৮৯১) "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৮২)" কৃষ্ণ বিহারী সেনের "অশোকচরিত" (১৮৯২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন , রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশব চন্দ্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, সত্যচন্দ্র দেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ মনীষীদের রচিত মহামানব বুদ্ধের জীবন ও দর্শন নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রায় রবীন্দ্র সমসাময়িক। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্যে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধ চর্চার কেন্দ্রভুমি শ্রীলঙ্কা ভ্রমণকালে ছোট রবিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেখান থেকেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মে উদার বিশ্বমৈত্রীর দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নিজের পাঠ্য তালিকাতে রেখেছিলেন –
নিম্নরুপ:

১। হস্তহসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রান, পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, ১৮৯৩ কোলকাতা।
২। রত্নমালা, গুনালংকার মহাস্থবির ও পুন্নানন্দ স্বামী সংকলিত, ১৯১২, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার কোলকাতা।
৩। মধ্যমনিকায়, অনুবাদ বেনীমাধব বড়ুয়া, কোলকাতা।
৪। বৌদ্ধ এদাহিল্লা, ডি. এইচ. এস. অ্যাবারেতুয়া। ১৯০৪ কলম্বো।
৫। The Jataka, V. Fousboll.
৬। The Creed of Buddhism, Edmund Holmes,1906.
৭। Light of Asia, Sir Edwin Arnold, 1879.
৮। The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Rajendralala Mitra, 1882, Calcutta.
৯। Hand Book of Pali. O. Frankfurter. London. 1883.
১০। A Compendious Pali Grammer, B. Clough, 1824. Colombo.
১১। Kaccayana Pali Grammar. Francies Mason, 1886, Colombo.
১২। Dictionary of the Pali Language, Robert Chesar Childers, 1875. London.

বুদ্ধ ও ধর্মের উপরে পাঠের পর আমরা তাঁর ধর্মচিন্তায় দেখতে পাই তিনি ঈশ্বরকে নানা সময়ে নানা নামে ডেকেছেন। কিন্তু প্রচলিত ঈশ্বর বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রভাবনায় ঈশ্বর তেমন নন। তাঁর ঈশ্বর সাধনা, পার্থিব জগতকেই ব্যাখ্যা করে। তাই তাঁর ঈশ্বর পূজন রীতির চর্চা। এক অর্থে ক্ষুদ্র আমির সংকীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে বৃহৎ আমির সন্ধান। মানবের মধ্যে 'মহামানবের' সন্ধান। তাঁর ঈশ্বর সাধনা প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মমতের ভিত্তিতে যৌথ আচার বিধি পালন নয়। তাঁর ঈশ্বর সাধনা একান্তই স্বানুভূতির মধ্যমে সত্য, সুন্দর ও চির কল্যান করের সাধনা। তিনি লিখেছিলেন – "ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড় অশান্তির কারণ হয়।"। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উৎযাপনে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে এসে বুদ্ধের পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "আমি যাঁকে আমার অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করছি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে তাঁকে আমার প্রণাম করতে এসেছি, এ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে অর্ঘ্য নিবেদন নয়। যাঁকে নির্জনে বারংবার অর্ঘ্য নিবেদন করেছি, সেই অর্ঘ্যই আজ নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছি। একদিন বুদ্ধ গয়াতে বুদ্ধমন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম। সেই দিন একথা মনে জেগেছিল – যে সময়ে বুদ্ধ মহামানবের চরণস্পর্শে সমস্ত বসুন্ধরা জেগে উঠেছিল, গয়াতে যেদিন তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, কেন সেদিন অনুভব করিনি তাঁকে একান্তভাবে শরীর মন দিয়ে...। যারা প্রতাপবান, বীর্যবান তাঁদের সংখ্যা প্রথিবিতে বেশি নয়। অনেক মানব, রাজা, ধনী মানি ও রাস্ট্রনেতা এ পৃথিবীতে জন্মেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে কতজন এসেছেন? যিনি সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়ে এসেছিলেন আবার তাঁকে আহ্বান করছি আজকে এই ছিন্ন বিছিন্ন ভারতে, যেখানে মানুষে মানুষে বিসম্বাদ, যেখানে বাদ বিবাদে মানুষ জর্জরিত,

সেই ভারতে তিনি আবার আসুন। সত্যের দ্বারা মানবের পূর্ণ প্রকাশ। যিনি আপনার মধ্যে সকল জীবকে দেখেন, তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তিনি প্রকাশিত হবেন তাঁর মহিমার মধ্যে"।

১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ জামাতা ও কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় বার বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলেন। বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে তাঁকে প্রণাম জানাবার ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলেন। যা তিনি আগে কখনো করেনি কারণ তিনি পারিবারিক ভাবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি লিখেছেন – 'Only once in his life said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was, when he saw the Buddha at Gaya' (Visva – Bharati quarterly, April 1943, P. 179). এ প্রসঙ্গে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন – 'প্রতিদিন প্রাতরাশের পর গুরুদেব বুদ্ধমন্দিরে গমন করতেন একাকী এবং প্রায় দু-তিন ঘণ্টা তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। বড়মা (হেমলতা ঠাকুর) একদিন কৌতূহল বশত অজ্ঞাতসরে মন্দিরের ভেজানো দরজা ইসদমুক্ত করে দেখতে পান উচ্চ বেদিতে উপবিষ্ট বিরাট বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে দন্ডায়মান কবিগুরুর ধ্যান গম্ভীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি, দুই চক্ষে দরবিগলিত অশ্রুধারা'। তাই এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ নয় আমরা ধ্যানী রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি।

দীর্ঘদিনের ব্যাধানের ফলেই কবির পক্ষে মহত্ত্ব অনুধাবন করা সহজতর হয়েছে। সমসাময়িক কালে নিরপেক্ষভাবে সার্বিক মুল্যায়ন করা যে সম্ভব হত না, পরবর্তীকালে তাই সম্ভব হয়েছে কবির পক্ষে; বুদ্ধকে কবি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে অধিষ্ঠিত দেখেছেন। মানব কতৃক মহামানবের স্বীকৃতি ঘটে মহাযুগের পটভূমিকায়। পৃথিবীতে যাঁরা খ্যাতিমান বলে স্বীকৃত লক্ষিত হয় তাঁদের খণ্ড প্রকাশ। পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেইসব বিরল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ঘটে, যাঁদের চেতনা কোন কারণে খণ্ডিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের সত্য স্বরূপ বুদ্ধের হৃদয়ে দেদীপ্যমান। সকল জীবকে তিনি নিজের মতো করে জেনেছিলেন, সকলকে তিনি নিজের বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। বিরল সংখ্যক মানুষই আবির্ভূত হন সকল মানুষের জন্য এবং সকল কালের জন্যে, এঁরাই মহামানবের স্বীকৃতি লাভ করেন, যেমনটি লাভ করেছিলেন বুদ্ধ। বুদ্ধের কৃতিত্ব যাগযজ্ঞ থেকে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকতা থেকে মানুষকে মুক্তিদান। তিনি দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য থেকে অপসৃত করেছিলেন। মানুষের আত্মশক্তির প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল মানুষের কাছে, প্রার্থিত বস্তু ছিল দয়া এবং কল্যান।

কৈশোরের বুদ্ধ তীরবিদ্ধ রাজহাঁস দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। শৈশবে হলকর্ষণ উৎসবে গিয়ে লাঙলের ফলায় কেঁচো কাটা দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ ও এগার বছর বয়সে মালী হরিশের সাথে ব্রিটিশ চীফ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ খরগোশ দেখে তীব্র শোক পেয়েছিলেন। শৈশব হতেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বুদ্ধের দর্শনকে কবিগুরু নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। বুদ্ধ কতৃক দেশিত 'পানাতিপাতা বেরমণি সিকখাপদং সমাদিয়ামি' হতে রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তর পাঠ করে নেন, 'পানং ন হানে'। অযথা প্রাণ না হরণের শিক্ষায় দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করেন। এজন্য তিনি তাঁর স্যার উপাধিও ত্যাগ করেন। খাদ্যের জন্যে প্রানীহত্যাকে তিনি প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করে তাকে নিবৃত্তি করাই শ্রেয় বলে উল্লেখ করেছেন।

গৌতম বুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাগুলি বিভিন্নভাবে রবীন্দ্র ভাবনায় ফুটে উঠেছে তাঁর রচনার মাধ্যমে। 'বুদ্ধদেব' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন রচনাতে উল্লেখ পাই যেমন – বর্ণে বর্ণে, জাতীতে

জাতীতে, রক্তের হোলি আর ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা দেখে, ধর্মের নামে রক্তে পঙ্কিল ধরাতল দেখে, পরস্পর হিংসার চেয়ে পরস্পর সাংঘাতিক ঘৃণায়, পদে পদে অপমানিত মানুষকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'সর্ব জীবনে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তারই বানীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভাতৃবিদ্বেষ কলুষিত হতভাগ্য দেশে'। বুদ্ধ একদা বলেছিলেন – যো সহসসং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে

একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে্ব সঙ্গামজুত্তম।।

যদি কেহ সংগ্রামে সহস্রগুণ সহস্র ব্যাক্তিকে জয় করেন, এবং ওপর কেহ কেবল নিজেকেই জয় করেন, তবেই তিনি সংগ্রামে জয়ীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধের শিক্ষা রবীন্দ্র মননে সত্যিকার মানবতার বানী ফুটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন 'আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরন করে মনুষ্যত্বের জগতব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলো 'বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি'।

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে ভক্তির লক্ষ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভক্তিই যে মুক্তির উপায় তা রবীন্দ্রনাথ নিজেও মনে করতেন। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ধর্মপদ'। রবীন্দ্রনাথ 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে নিজেই বলেছেন 'জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদং তাহার একটি'। ধম্মপদ হল মৌলিক বানী গুচ্ছের সমাহার, তার একটি হল 'মনপুব্বংগমা ধম্মা মনসেট্ঠা মনময়া'। অর্থাৎ মন ধর্মের পূর্বগামী, মন ধর্মের উৎপাদন ভুমি এবং মনই শ্রেষ্ঠ। নিজ উৎসাহে এই গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ধম্মপদের আর একটি অমেয় বানী "অক্কোধেন জিনে কোধং" তথা ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করা যায়। এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজেই গ্রহণ করেননি বরং তা সিল্কের কাপড়ের ওপর নিজের হাতে লিখে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জুন-জিরো তাকাসুকুকে উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রম্ভবিহার

বুদ্ধ প্রবর্তিত ব্রম্ভবিহার শিক্ষা ছিল রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক চর্চা ও বিশ্বাসের বিষয়। এগুলো হল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। একসাথে এগুলো অনুশীলন করাকেই বলা হয় ব্রম্ভবিহার। **১৩১৫** প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রম্ভবিহার প্রবন্ধে বুদ্ধবানীকে অত্যন্ত্ কুশলতায় আত্মস্থ করার বর্ণনা দেন। তিনি বিশ্বাস করেন বুদ্ধের সাধনা কেবল নঞর্থক নয় (অনিত্য, অনাত্মা, পঞ্চশীল বা দশশীলের মত) সর্বশূন্যতার মধ্যে বাসনা নির্বাপণে এর চরম কথা নয়, এই সাধনা মঙ্গলের, প্রেমের - যে প্রেম আদানবিহীন প্রদানে আনন্দ ও পরিপূর্ণতায় সাধকের চিত্তকে সর্ব প্রাণীর প্রতি উন্মুখ করে তোলে। তাই তিনি বুদ্ধ ভাষিত 'করনীয় মৈত্রী সূত্র' থেকে প্রথম সূত্রটিকে নিজের জীবনে একাত্ম করে নেয় –

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তঅনুরক্খে
এবম্পি সব্বভুতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং

মা যেমন তাঁর এক মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ুর বিনিময়ে রক্ষা করেন তেমনি জগতের সকলের প্রতি অপার মৈত্রী পোষণ করবে। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাকে অন্তরের গভীরে লালন করেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের 'ব্রম্ভবিহার' ভাবনা এক অভিনব তাৎপর্যে তাহাঁর চিন্তা রাজ্যে ধরা দিয়েছে। 'কালান্তর' গ্রন্থে ব্রম্ভবিহারের সংজ্ঞাও তিনি নির্দেশ করেছেন – 'সকল জীবনের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক। তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রম্ভবিহার অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেবের করুণার্নব – পুঞ্জ পুঞ্জ জল ভারাক্রান্ত মেঘের সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ কালের পিপাসার্ত ধরিত্রীকে তিনি করুণা ধারায় সিক্ত করে দিয়েছেন। এটাই বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণার বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ ভাষিত আটত্রিশ প্রকার উত্তম মঙ্গল ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ তাই অতি আপ্লুত হয়ে এই উত্তম মঙ্গল সমূহের বঙ্গানুবাদে করেছেন। সেগুলোর মধ্যে থেকে –

'অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চে পূজানীয়া নং এতং মঙ্গলমুত্তমং'

সূত্রকে রপ্ত করেছেন নিজের কর্ম ও আচরনে। পূর্বে উল্লেখিত প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের মহানুভতা, আদর্শ, শিক্ষা, বৌদ্ধ যুগের ঘটনাবলী, বর্হিভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণতামুখী সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকাশ ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধুমাত্র সমাজের পরিবর্তন ও মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং উন্নততর জীবন যাত্রার জন্য। কবি আবেগে ভেসে গিয়ে বুদ্ধকে গ্রহণ করেননি, তিনি বুদ্ধের আদর্শ অনুসারে তাঁর শিক্ষাকে যুক্তিদ্বারা যাচাই করে বাস্তব সম্মত ভেবেই তাঁর কাব্যে সাহিত্যে অন্তর্ভূক্তি করেছেন। গ্রন্থ বর্ণিত বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তক বিক্রয়, পূজারিণী, নগর লক্ষী, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, অভিসার, শাপমোচন, বুদ্ধদেবের প্রতি, বুদ্ধভক্তি, সিয়াম, বুদ্ধ জন্মোৎসব এই কবিতা গুলি পড়লেই বোঝা যায় বৌদ্ধ কাহিনী গুলি রবীন্দ্রনাথের মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় কবি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে ত্যাগের আদর্শকে খুব বড় করে দেখিয়েছেন। তাই কবিতায় অখ্যাত দীন নারীর জীর্ন, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ধনরত্নের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

বৌদ্ধ যুগের আর এক মহৎ আত্মত্যাগের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে 'মস্তক বিক্রয়' কবিতায়। আত্মত্যাগের মহান আদর্শ অপরের হৃদয় পরিবর্তনের মহান চিত্র এই কবিতায় তুলে ধরেছেন।

'পূজারিণী' কবিতায় বুদ্ধের বেদি মুলে শ্রীমতির আত্মদান উল্লেখিত হয়েছে। এই আত্মদান কোনো সাধারণ আত্মদান নয়। এটা ছিল পরম সত্যের জন্যে, পরেরহিতের জন্যে মৃত্যুহীন মৃত্যুকে বরন করা, কবিতার মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী তার একাগ্র নিষ্ঠা, পরম শ্রদ্ধা এবং স্নিগ্ধ ক্ষমা ও করুনায় সিক্ত হয়ে অনন্ত অসীম চির সুন্দরের দিকে জনসাধারণকে পথ প্রদর্শন করিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগ বৈরাগ্যের, অনিত্য, অনাত্মার দেশনা অপেক্ষা করুণা, সেবা, ও মৈত্রীর আদর্শ কবিকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল। 'অভিসার' কবিতা তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বুদ্ধদেবের প্রতি, সিয়াম, বুদ্ধ ভক্তি, জন্মদিনে প্রভৃতি কবিতায় বুদ্ধের কর্মের মহিমা, গৌরব আদর্শের কথা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের নানা কৌণিক উপস্থাপনা, বুদ্ধের জন্ম যে মহাজাগরন, এবং বুদ্ধের দর্শনে যে তিনি পরম ধন্য হয়েছেন তা উপরিক্ত কবিতার মাধ্যমে জানা যায়।

'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় বাস্তবতার চরম চিত্র ভেসে উঠেছে। শ্রাবন্তী নগরীর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া অন্ন-বস্ত্র হীন সব বুভুক্ষ মানুষদেরকে অন্নদানের জন্যে মহামানব বুদ্ধ পুরবাসীকে আবেদন জানিয়ে পাশে দাঁড়ানোর গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। বুদ্ধের এই ধর্ম, সেবা ও আদর্শকে কবি হৃদয় দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতার মাধ্যমে --- বৌদ্ধযুগের রাজধর্ম ও ন্যায় পরায়নতার এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

নাটকের মধ্যে দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজের অবক্ষয় রুখতে, সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধের বাস্তব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। **'নটীর পূজা'** নাটকে কবি ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিধি নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ মানব-আত্মার রুদ্ধাবস্থা অঙ্কন করেছেন। যে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধান মানুষকে অবহেলা ঘৃণা ও পীড়ন করে সেখানে সর্ব বন্ধন মুক্ত সত্যদর্শী মানুষের অপমান ও লাঞ্ছনাই প্রাপ্য। নটীর পূজা নাটকে ধর্ম, সমাজ ও রাজ শক্তির এই সংকীর্ণতা ও রুদ্ধাবস্থা দূরীকরণের জন্যই শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গ। কবি শক্তি ও আচারের দ্বারা অবরুদ্ধ মানব আত্মার করুন ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যনাট্য **'চণ্ডালিকার'** মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের আধ্যাত্মিকতা, প্রান্তিকতা এবং মুক্তির দ্বন্দ্বকে দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা করেছিলেন। এই নাটকে একজন প্রান্তিক নারীর শ্রেণী চেতনা এবং তার অন্তর কে মুক্ত করার আখাঙ্খাকে চিত্রিত করেছেন। তিনি আবেগের সাথে সামাজিক রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ এবং সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চান, সেইসঙ্গে মহিলা সমাজের দুর্দশার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। বুদ্ধের আদর্শ ও শিক্ষানুসারে এখানে জাতপাতের ভেদাভেদ ও লিঙ্গ পক্ষপাতকে ধ্বংস করার ছবি ফুটে উঠেছে। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দের দ্বারা মাতৃ জাতির প্রতি শদ্ধা, সহানুভূতির বহু নিদর্শন বৌদ্ধ সাহিত্যের মতো ও এই নাটকেও দৃশ্যমান হয়েছে।

'মালিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগ যুগ ধরে চলে আসা বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের মধ্যে দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটি আসলে বৌদ্ধ বিশ্বজনীনর ভ্রাতৃত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষতা আঙ্গিকে বহু প্রাচীন ধর্মীয় বিবাদের পটভূমিতে এবং সামাজিক ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের অমানবিক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অবশেষে এই নাটকের মধ্য দিয়ে কবি মানবতার জয়গান সর্বজনীন ভাতৃত্ব, ধর্মীয় সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিয়ে ছিলেন সমাজের কাছে।

'অরূপরতন', ও **'রাজা'** নাটকে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। এক- অরূপের মধ্যে রূপের সন্ধানে ও দুই- দুর্গম দুঃসময় পথ অতিক্রম করতে পারলেই সত্য ও শ্রেয়কে লাভ করা যায়। অর্থাৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ যা বুদ্ধের দর্শনের অন্যতম উপাদান। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় সুরঙ্গমাও ঠাকুরদা' রাজার অরূপের মধ্যে রূপের সন্ধান পেয়েছেন কেবল সাধনার দ্বারা। আর সুদর্শনা রূপের মধ্যে আবিস্কার করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন, সুবর্ণর প্রতি মোহান্ধ হয়েছেন এবং কাঞ্চী রাজ্যের দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধের আদর্শ, নৈতিকতা ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও শান্তি নিকেতনে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় - বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেটি প্রাচীন বৈদিক ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বৌদ্ধদের বিহার (মঠ) এর আদলে সবচেয়ে বড় শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যেখানে দেশ ও বিদেশের মানুষের শিক্ষার মুক্ত দ্বার খুলে দিয়েছেন। এই বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তিনি আধ্যাতিক মূল্যবোধ এবং একটি নতুন বিশ্ব সৃষ্টির প্রচার করেছিলেন। যেখানে সংস্কৃতি, বহু - সাংস্কৃতিকতা, বৈচিত্র্য এবং সহনশীলতায় প্রতিষ্ঠিত। এর পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় (শান্তির আবাস) তৈরি করেছিলেন। তাঁর জীবদশায় তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার দেশ গুলিতে বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃতি ও আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে বক্তৃতা দিয়ে ভ্রমন করেছিলেন।

উপসংহার:

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য কর্মের বিচারেই বলা যায় যে, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শন যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কোন একক মনীষী তা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মে

প্রথাগত ভাবে দীক্ষিত না হয়েও বুদ্ধের বানী প্রচারে যতটা ভূমিকা রেখেছেন বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা সম্রাট অশোকের পর গৃহী হিসাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ শিষ্য। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গুরু রূপে মহা মানব 'বুদ্ধকে' স্বীকার করেছিলেন। করাচীতে অবস্থান কালে এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে দিয়ে।

মহামানব বুদ্ধ মুক্তির কথা বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য আত্ম শক্তির ওপরই ছিল তাঁর জোর, কোন দৈব শক্তির উপর নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও বুদ্ধের মুক্তির সাধনায় ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, ক্রোধ ত্যাগের সাধনা, মমতার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা।

বুদ্ধ মানুষকে প্রজ্ঞার দর্শন দিয়ে গেছেন। আর প্রজ্ঞাবান মানুষ প্রজ্ঞার ধারে মিথ্যা দৃষ্টিকে আলাদা করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন বলেই অন্তর্লালিত সত্যে বলতে পেরেছিলেন।

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল করহ কলংকশূন্য
এস দানবীর দাও ত্যাগ – দীক্ষা
মহা ভিক্ষু লহ সবার অহংকার ভিক্ষা।"

রবীন্দ্রনাথ যে এক আপাদমস্তক বুদ্ধ ভাবে মগ্ন দার্শনিক তা তাঁর সাহিত্যের গতিপথ থেকে সহজেই বোধগম্য। বুদ্ধকে নিয়ে তাঁর সংকলিত স্বতন্ত্র গল্প "বুদ্ধদেব" স্বয়ং এ দাবির অন্যতম সাক্ষ্য।

আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রে শাক্যসিংহ বুদ্ধকে স্থাপন করেছেন। বুদ্ধের আলো – ঝঙ্কৃত বানী এবং বৌদ্ধ যুগের যা কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অসীম দাক্ষিণ্যের পরিচয় বহন করে সূর্যের আলোকের মতো তাঁর অন্তরে এসে পড়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভারতের বিপুল জ্যোতিপুঞ্জের সংহত জ্যোতি হল রবীন্দ্রনাথ। রূপে, রসে, জ্ঞানে, আনন্দে এবং উজ্বল শোভায় বৌদ্ধ ভারত তাঁর কাছে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে ধরা দিয়েছে।

ফুটনোট:

1. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, পৃঃ ৪১৩।
2. ঐশ্বর্য বিশ্বাস। *বৌদ্ধঅবদান ও প্রাচীনসাহিত্য।* পৃঃ ৪৬।
3. কিশোরী মণ্ডল। *রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধঅনুষঙ্গ।* পৃঃ ৪৭-৪৮।
4. কালান্তর; *ছোট ও বড়প্রবন্ধ*।
5. সৌজন্য, দেশ, কোলকাতা ২মে, ২০০৫, পৃ-৪১ *ভাষণ*, ১৮মে, ১৯৩৫ সাল, ধর্মরাজিকাবিহার, মহাবোধি সোসাইটি, কোলকাতা।
6. *আত্মশক্তি প্রবন্ধ*। পৃঃ৭।
7. রোটারিয়ান কাজীশাহাদাত।*বুদ্ধজ্যোতিতেরবিরকিরন*।
8. *সহস্সবগগ*, শ্লোক – ১০৩।
9. প্রাচীনসাহিত্য, *ধম্মপদ* পৃঃ৮৩।
10. *মেত্তাসুত্ত*, সুত্তনিপাত।পৃঃ ২৬।
11. রবীন্দ্র রচনাবলী। চতুর্বিংশ খণ্ড। পৃঃ ৪৫৭, বিশ্বভারতী।
12. আশা দাশ। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। পৃঃ ৫০০।
13. সঙ্ঘমিত্রা সুর চৌধুরী। *রবীন্দ্র কবিতায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। পৃঃ ৪৭।

14. ক্ষুদিরাম দাস। *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*। পৃঃ ৩৮০।

গ্রন্থপঞ্জী

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আত্মশক্তি প্রবন্ধ।* দিনময়ী প্রেস, কোলকাতা, ১৯০৫।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *প্রাচীন সাহিত্য।* বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।
- দাশ, আশা। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা (কোলকাতা), ১৯৬৯।
- দাস, ক্ষুদিরাম। *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়।* ইন্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ, কলিকাতা (কোলকাতা), ১৯৫৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৬৬।
- বিশ্বাস, ঐশ্বর্য। *"বৌদ্ধ অবদান ও প্রাচীন সাহিত্য"। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : নবীন অনুভব।* সন্দীপকুমার মন্ডল (সম্পাদনা)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা (কলকাতা) ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
- মণ্ডল, কিশোরী। Trisangam International Refered Journal (TIRJ), *রবীন্দ্র কাব্যে বৌদ্ধ যুগ ও বৌদ্ধ অনুষঙ্গ,* Volume- iv,Issue -I, 2024।
- মহাস্থবির, পন্ডিত ধর্মাধার। ধম্মপদ। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কোলকাতা, ১৯৫৪।
- মহাস্থবির, পন্ডিত ধর্মাধার। *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন।* মহাবোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০১৫।
- মহাস্থবির, শ্রীমৎ সাধনানন্দ। *মেত্তাসুত্ত,* সুত্তনিপাত। রাঙ্গামাটি, রাজবন বিহার (বাংলাদেশ), ২০১৩।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। চতুবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৯৫৮।
- শাহাদাত, রোটারিয়ান কাজী (সম্পাদক)। *বুদ্ধ জ্যোতিতে রবির কিরন,* দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ। চাঁদপুর, ২০২৩।
- সুর, চৌধুরী সঙ্ঘমিত্রা। নিবোধত, *রবীন্দ্র কবিতায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। ১ম সংখ্যা, তুলি কলম, ২০১৭।
- সৌজন্য, দেশ, *ভাষণ,* কোলকাতা ২মে, ২০০৫, ধর্মরাজিকা বিহার, মহাবোধি সোসাইটি, কোলকাতা ১৮মে, ১৯৩৫।

ব্রাত্য বসুর নাটকে মহামারি প্রসঙ্গ

শুভঙ্কর দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে ব্রাত্য বসু নাটককার হিসেবে উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে উঠেছেন। তাঁর নাটকগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি খুবই সমাজ সচেতন একজন মানুষ। তাঁর বেশিরভাগ নাটকেই সমাজের নানান স্তরের কথা উঠে আসে। ঠিক তেমনই তিনি তাঁর নাটকে তুলে ধরেন মানবজাতির ভালো মন্দ দিকগুলি। মানুষের মননের নানান স্তর তাঁর নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। একইসঙ্গে তিনি সচেতনভাবে তাঁর সমকালে মানুষের শরীরে নানান রোগ, মহামারির ঘটনা নিয়েও নাটক লিখেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক 'ভাইরাস এম'(২০০৩), 'করোনার দিনগুলিতে প্রেম' (২০২০)। এই দুই নাটকেই আমরা দেখতে পাই ভাইরাস কীভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। ব্রাত্য বসু নাটকগুলির মধ্যে ভাইরাসের খারাপ প্রভাব যে শুধুই মানবজাতির ধ্বংস এটা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি তারই সঙ্গে এই ভাইরাস ছড়ানোর মূলে যে একটা বড়ো রাজনীতি রয়েছে সেই দিকটাও তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর নাটকদুটিকে একইসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। আমার প্রবন্ধের মূল আলোচনায় সেটা দেখাবারই চেষ্টা করেছি।
সূচক শব্দ: মহামারি, ব্রাত্য বসু, করোনার প্রভাব, মড়ক, মানবিকতার অবক্ষয়, কোভিড১৯, ভাইরাস, রাজনীতি।

মূল আলোচনা:
ঊনবিংশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে মহামারি প্রসঙ্গ অনেকভাবেই এসেছে। তবে বাঙালির কাছে সেটা মহামারির থেকে 'মড়ক' নামটিই বেশি পরিচিত ছিল। তার কারণ অবশ্য 'মহামারি' শব্দটির সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের যোগ। 'মহামারি' অভিধাটির সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের যোগ নিবিড়, যা একান্ত ভাবেই আধুনিক রাষ্ট্রের উপজাত। 'মহামারি' বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় কোনও রোগের সংক্রমণকে বোঝায়। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। 'নির্দিষ্ট জনসংখ্যা'। যেটা জনগণনা ছাড়া সম্ভব নয়। আর জনগণনা একান্ত ভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই দস্তুর। সে হিসেবে দেখলে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তৃত হওয়ার আগে 'মড়ক' ছিল, কিন্তু 'মহামারি' ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' তাই এক 'মড়ক'-এর কথাই বলে, 'মহামারি'-র নয়। 'আনন্দমঠ' লিখনকালে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই উপন্যাসের পটভূমিকা যে সময়ের কথা বলে, সেই সময়ে তা ছিল না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন, তা মড়কের বর্ণনা। যেখানে রাষ্ট্রিক অনুপ্রবেশ নেই, 'সামাজিক কাজ' হিসেবে 'ত্রাণ' বা 'সেবা'-র বন্দোবস্ত নেই। মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও তার কোনও গতি হয় না। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দেখা যায় প্লেগের রুগীদের সেবা করতে গিয়ে ঐ রোগেই মারা পড়েন জ্যাঠামশাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসে ওলাউঠা, প্লেগ এর কথা বার বার এসেছে। তাঁর লেখা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে 'কোয়ারেন্টাইন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে একজায়গায় লিখেছেন—

> “পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়।”[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকে দেখা যায় কলেরা মহামারির কালে সেবাব্রত গ্রহণ করতে। তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনাতেও মহামারি, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট পল্লিসমাজের কথা এসেছে। এসেছে সংবেদী নায়কের সেবাব্রত গ্রহণের কাহিনি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আরণ্যক’-এ শুয়োরমারি বস্তিতে কলেরা মহামারির যে মর্মান্তিক বিবরণ রেখেছেন, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দারিদ্র। সেই ভয়ঙ্কর দারিদ্রের সঙ্গে কলেরা মহামারির ভয়াবহতা মিশে যা তৈরি করেছে, তা বাংলা সাহিত্যেই নজিরবিহীন। কয়েক মুঠো ভাতের প্রতি এক কিশোরী বধূর যে আর্তিকে বিভূতিভূষণ তুলে এনেছিলেন, তা ‘আরণ্যক’ পড়লেই পাঠক শিহরে উঠেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মহামারি বাংলা সাহিত্যে অনেক আগে থেকেই স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে ভয়াবহ মহামারি যেটা হয়েছে তার রেশ এখনও সমগ্র বিশ্বের মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ২০২০ সাল, অনন্য সাল, যার তুলনা সে নিজেই। এই সালে যে মহামারি বা অতিমারির সঙ্গে বিশ্বের মানুষের পরিচয় হয়েছে তা এযাবৎকালে নজিরবিহীন। প্লেগ, ইয়োলো ফিভার, স্প্যানিশ ফ্লু, ইবোলা, এবং সারস, এর কোনোটাই পৃথিবীর সবগুলো দেশকে একাধারে আক্রান্ত করতে পারেনি যা করেছে কোভিড-১৯। আমরা এই উপমহাদেশে প্লেগ মহামারি নিয়ে কখনই উদ্বিগ্ন হইনি। কিন্তু কোভিড-১৯ বিশ্বের কোনো সীমারেখার তোয়াক্কা না করে প্রতিটি দেশকে প্রায় সমভাবে আতঙ্কিত করেছে। ফলে নাটকই তার সবচাইতে বড় জীবন্ত বলি হয়েছে। পৃথিবীর সব মঞ্চনাট্যপ্রেমিক, মঞ্চাভিনেতা, মঞ্চনির্দেশক, মঞ্চকলাকুশলী, নাট্যলেখক, এবং মঞ্চনাট্যদর্শক দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি হতাশা ও নৈরাশ্যে সময় এর মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে নাট্যগৃহ আপাতত বন্ধ। এহেন সমস্যা নিয়ে ব্রাত্য বসু যে দুটি নাটক লিখেছেন—‘ভাইরাস এম’, ‘করোনার দিনগুলোতে প্রেম’।

ভাইরাস এম

‘ভাইরাস এম’ নাটকটির রচনাকাল ২০০৩ সাল। নাটকটির মূলে রয়েছে একটি জায়গা যার নাম নাটককার রেখেছেন ‘রূপান্তরী’—সেখানকার মানুষেরা হঠাৎ এক ভাইরাসের প্রভাবে বাঁদরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই গল্প শুনে মনে আসবে ১৯৫৯ সালে রচিত ফরাসি নাট্যকার ইউজেন আইওনেস্কোর নাটক ‘রাইনোসর’ এর প্লটের কাহিনি। এখানে একটা জায়গায় মানুষগুলো গণ্ডারে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু প্লট একরকম হলেও ব্রাত্য বসুর নাটকটি কিন্তু কোনও অনূদিত নাটক নয়। তার কারণ নাটকটি পড়লেই বোঝা যায়। তিনি যে সময়ে লিখছেন ঠিক তার কিছু আগেই ২০০৩ সালে ১৬ এপ্রিল ‘SARS’ (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) নামে ভাইরাস রোগ সমগ্র এশিয়া জুড়ে মারাত্মক মহামারি আকার ধারণ করেছিল। বলা যেতে পারে প্রতীক রূপে এই ঘটনা বীজাগার থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে নাটকে।

নাটকে দেখা যায় 'রূপান্তরী' নামে ছোট মফঃস্বল শহরের মানুষরা বাঁদরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এই শহরের 'মানবিকীকরণ' এজেন্সি ছিলেন বহিত্র বসু। বহিত্র বসুর সহকারী কর্মচারী হলেন পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়। পল্লবী খুবই সংবেদনশীল নারী। বহিত্রর মতো অত গভীর কথা সে বোঝে না। সে তার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যায়। পল্লবীর প্রেমিক নীলাঞ্জন বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়। সে সংস্কার, উন্নয়ন, প্রগতি এসব শব্দে বিশ্বাসী নয়। বহিত্রর আচার আচরণে সে জালিয়াতির সন্ধান পায়। এদিকে শহরে অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত। এক ভাইরাসের প্রভাবে মানুষের রূপ পরিবর্তন ঘটে। মানুষ বাঁদরে পরিণত হয়ে যায়। যে ভাইরাসের প্রভাবে এই রূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় সেটি হল 'মাংকিস্যাপিয়েন্স বিয়িং'। বহিত্র বসু যেন এই বিষয়টি আগে থেকেই টের পেয়েছিল। তাই সে মানবত্রাতা রূপে মানবিকীকরণের প্রতিষ্ঠান খুলেছে। কিন্তু কোনও রুগী এখনও আসেনি। তবে একজন এসেছে যার পেছনে লেজের অঙ্কুরোদগম দেখা দিয়েছে। এরপরই একটা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রহসনের ছবি উঠে আসতে থাকে। শাসক দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা একে একে বাঁদরে পরিণত হতে থাকে। শহরের চেয়ারম্যানের হম্বিতম্বি, ক্ষমতার আস্ফালন, দুর্নীতির বাড়াবাড়ি, ভাইস চেয়ারম্যানের ভাইরাসের প্রতিষেধক সংগ্রহে ব্যর্থতা, চেয়ারম্যানের মাস্তান ছেলের বাঁদরে পরিণত হয়ে যাওয়া এই সব হয়ে উঠেছে দুর্দান্ত প্রহসন।

নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছতে পৌঁছতে এই সংকট চরমে ওঠে কিন্তু জানা যায়, বহিত্র তার মানবিকীকরণের রূপান্তর প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই অনেককে আবার মানুষ করে তুলেছেন। বহিত্র চরত্রটি একজন বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, স্থির সত্যানুসন্ধানী রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে নীলাঞ্জন পবিত্র, সৎ। কেননা সে প্রেমিক। অথচ প্রেম নিয়ে তার বেশি আবেগ নেই। সে বর্তমান সময়ের সার্বিক অসাড়তা অনুভব করেছে। অথচ সে জীবনবিমুখ নয়। তাই নাটকটির শেষে দেখা যায় এই দুই ব্যক্তির মুখোমুখী হতে। দুই ব্যক্তিত্বের তীব্র তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে—

"**বহিত্র**। কর্মহীন দর্শনও তোমাকে এটাই দিতে পারে। তোমার নেতিবাচকতার প্রতি শেষ ইতিবাচক আস্থাও তোমাকে এটাই দিতে পারে। ঠিক এইটা। কী মনে হচ্ছে, কোন পন্থায় বাঁচাটাকে চিহ্নিত করবে তুমি? আমি আগেই বলেছিলাম, তোমার অনিবার্য ভবিতব্য আমার দিকে যাওয়া। তোমাকে বলি হতেই হবে নীলাঞ্জন। তোমার সামনে আর কোনও রাস্তা নেই।...

নীলাঞ্জন। আমি আপনার ডেস্টিনিতে যাব না। ওটা আমি অস্বীকার করি। আমরা আলাদা। আমাদের কোনওদিন মিলবে না।..."[২]

এরকম কথোপথনের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে কে বেশি মানুষ থাকতে পারে এই বাকদণ্ডে নিজেরা পাঞ্জা লড়ে।

নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার মানুষ থেকে বাঁদরে পরিণত হওয়াকে আসলে অবক্ষয়ী মনুষ্যত্বের সংকটকে প্রকাশ করেছেন। এই নাটকে এমন একটা জগতের কথা আছে যেখানে ক্রমশ চেতনার স্তর থেকে অবচেতনার স্তরে চলে যায় বক্তব্য। নাট্যকার নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

"ফিলো-পলিটিক্যাল নাটক, এমন নাটক, যাতে ফিলজফি আছে, পলিটিক্স আছে। আর সেই পলিটিক্সটা একটা লোক ক্ষমতায় অংশ নেবে কি নেবে না—তা নিয়ে তার ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বন্দ্ব"।[৩]

মানুষের এই ক্ষমতা লোভের জন্য বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে সমাজে যে ব্যাধি ছড়িয়ে দেয় বারবার তা মানবজাতিকেই ধবংস করে। তার উদাহরণ ২০০৩ সালে যেমন এই নাটকে উঠে

আসছে ঠিক তেমনই ২০২০ সালে রচিত ব্রাত্য বসুর আরও একটা নাটকেও সেই প্রসঙ্গ পেয়ে থাকি।

করোনার দিনগুলিতে প্রেম

নাটকটি ২৬ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২০ এই সময় পর্বে লেখা হয়েছে। ১৭ মে, ২০২০ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাটকটির বিষয় হিসেবে এসেছে করোনাকালের ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের কথা, ঘরবন্দী মানুষের দুরবস্থা, বয়স্ক মানুষের মানসিক অসুস্থতার কথা। নাটকটি শুরু হচ্ছে সংবাদপাঠের মধ্যে দিয়ে। এক সংবাদপাঠিকা জানাচ্ছেন যে, ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে জীবিত মানুষের সংখ্যা দু'লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার, স্পেন জনশূন্য, ইতালি জনশূন্য এবং আমেরিকায় জীবিত মানুষের সংখ্যা মাত্র ছ'লক্ষ, চিনে ন'লক্ষ। খবরে এও বলা হয় যে, এই দেশে সেদিন সকাল অবধি মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ। এর ফলে রাস্তায় উড়ে বেড়াচ্ছে চিল-শকুন। প্রতিটি মহল্লায় কুকুর-শিয়াল ও অজস্র হিংস্র জন্তু ঘুরে ঘুরে মানুষের পড়ে থাকা লাশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছে অজস্র জন্তু জানোয়ার। তাদের গর্জন শোনা যাচ্ছে। নিশাচর প্রাণী পেঁচা-বাদুড়রা দিনের আলোতে উড়ে বেড়াচ্ছে। গোটা শহর কার্যত মরা লাশের স্তূপে পরিণত হয়েছে। সেইসব লাশ পেরিয়ে সংবাদপাঠিকা সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে না পেরে আমাদের কাছে খবর পরিবেশন করতে আসছেন প্রতিদিন। এইটুকু বর্ণনার মধ্য দিয়েই নাট্যকার আমাদের সামনে করোনার সময়ের সমাজের ছবিটা স্পষ্ট করে তুলে ধরছেন।

নাটকের দুই মূল চরিত্র বিজয় ও সুলগ্না। তাদের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনি এগিয়েছে। বিজয়ের বয়স ৪৫-৫০, সুলগ্নার বয়স ৪০-৪২। বিজয় শেষ খাবার খেয়েছে পরশুদিন সকালে। সুলগ্না শেষ কবে খেয়েছে, শেষ কবে টয়লেট গিয়েছে সেসব মনে নেই তার। এই মুহূর্তে তারিখ, বার সবকিছুই উল্টেপাল্টে গেছে। পাশের ঘরে সুলগ্নার আশি-উত্তীর্ণ মা যিনি এখন একেবারেই বাতিলের খাতায় চলে গেছেন, যাকে সুলগ্না ইঁদুর মারার ইঞ্জেকশন দিয়ে খুন করবে এবং বন্যপ্রাণী বা শকুন ঈগলের জন্য ফেলে দিয়ে আসবে বাড়ির পেছনে। তাদের খাবার দিতে আসে গোপাল নামে যে ছেলেটি শ্রমজীবির প্রতিনিধি, যাদের সহজে সংক্রমণ হয় না, খাবার দিয়ে ফেরার পথে তাকে ছিঁড়ে ফালাফালা করে বন্য জাগুয়ার, নিরাপদ দূরত্বে দূরবীন দিয়ে পুরো দৃশ্যটি দেখে বিজয়, তখনও সে আঁকড়ি দিয়ে জানলা গলিয়ে খাবারটি নিতে কিন্তু ভোলে না। মানুষের কাছে আগে নিজেদের খবর পৌঁছে দেবার জন্য সংবাদপাঠিকাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে মিডিয়া দুবার ভাবছে না। তাই খবর পড়তে পড়তেই মারা যায় সংবাদপাঠিকা। অর্থাৎ আমরা এই সময়ে মানুষের মানবিক গুণের অবক্ষয়ের ছবি দেখতে পাই।

বেঁচে থাকার এমন এক অনিশ্চিত সময়েও বিজয় ও সুলগ্না আশায় বুক বাঁধে। নিজেদের জীবনের অপরিপূর্ণতায় পারস্পরিক সমালোচনায় মুখর হয়। তাদের ছেলে রুনু থাকে ক্যালিফোরনিয়ায়। সে অবশ্যই বেঁচে আছে এমনটাই তাদের আশা। তাই পৃথিবী সুস্থ স্বাভাবিক হলে তারা যাবে ছেলের কাছে। পৃথিবীর এই অসুখ যে একদিন সেরে যাবে সেই নিয়ে তারা আশাবাদী।

এই নাটকে 'করোনা' নিজেই একটা চরিত্র হয়ে এসেছে। সে অল্পবয়সী। আসলে এই করোনা হল বিবেক। লোভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর যোগ্যতাহীন হিংস্র চাহিদা নিয়ে মানুষই তাকে অপরাধী করে তোলে। করোনা সতর্ক করে যে, অপরিমিত চাহিদা মানুষের উত্তর পুরুষদের লাশ বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে, এই যে সংকট পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল

তার মূলে ছিল মানুষের রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের লোভ। যে কারণে মানবসভ্যতার উপর নেমে এসেছিল এমন বিপর্যয়। একজায়গায় করোনা বিজয়কে বলেছে—

"আপনারা এখন ভয়ে ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে আছেন। মাথা নিচু করে আছেন। আপনাদের জ্বলজ্বলে চোখ, চকচকে মুখ, লকলকে দাঁত আর ঝকঝকে থুতনিতে এখন কালির দাগ।..."[৪]

করোনাকালে প্রত্যেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তিত। প্রত্যেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট। করোন। কীভাবে ছড়ায় সেকথা করোনা নিজেই বলছে এইভাবে—

"...আমাকে আপনাদের চালে-ডালে-দুধে-নেশার সামগ্রীতে টেনে এনেছে। আপনি নিঃশ্বাস নিতে গেলেই আমি আপনার ফুসফুসে ঢুকে পড়ব। আপনি কাউকে করমর্দন করতে গেলেই আপনার দু'হাতের আঙুল আমি চটচট করব। আপনি কোনও নারীকে আদর করতে গেলেই আপনার ওই নারীর সর্বাঙ্গে থিকথিক করে উঠবো"।[৫]

করোনার এমন বাগাড়ম্বর বিজয় সুলগ্না সহ্য করতে পারেনা। তারা গুলি করতে যায়। ঠিক সেইসময় নাটকে প্রবেশ করে তাদের পুত্র রুনু। যে লকডাউনের সময় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাঁটতে শুরু করে বাড়ির উদ্দেশ্যে। হাঁটতে হাঁটতে কানাডা হয়ে আমেরিকার আলাস্কার নোম শহর হয়ে রাশিয়া প্রবেশ করে। তারপর সোয়া হয়ে মঙ্গোলিয়া হয়ে চিন হয়ে ভুটান দিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পৌঁছায়। কিন্তু বাড়িতে আসা মাত্রই মৃতু ঘটে। এখানে আসলে পরিযায়ী শ্রমিকদের চিত্র তুলে ধরেছেন। রুনুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আসলে করোনায় আপনজনকে হারানোর বেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন। গুলিতে যখন সে মারা যায় তখন করোনা বলে ওঠে—

> "আমার ভ্যাকসিন বার করার আগে, আপনারা আপনাদের পরের প্রজন্মকেই এইভাবে খুন করতে করতে যাবেন। আপনাদের লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর যোগ্যতাহীন হিংস্র চাহিদা এইভাবে আপনাদের উত্তরপুরুষদের লাশ বানিয়ে দেবে"।[৬]

অর্থাৎ নাটককার একটা মহামারিকে বিষয়বস্তু হিসেবে যেমন তাঁর নাটকে এনেছেন, তেমনই সেই মহামারির যাতে পরবর্তীকালে পাঠকদের কাছে পরিষ্কার থাকে তাই বিস্তারিত বর্ণনাও দিতে ভুলেননি। এখান থেকেই প্রমানিত হয় একজন লেখককে যেমন সমকালীন হতে হয় তেমনই তাঁর লেখা যেন ভবিষ্যতেও দলিল হয়ে থাকে সেই প্রতিভাও থাকতে হয়। ব্রাত্য বসুর এই নাটক কিন্তু সেই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলা যায়। তবে করোনা সাময়িকভাবে যতই আস্ফালন দেখাক, যতই ক্ষমতা প্রদর্শন করুক শেষে মানবিকতার কাছে হার মেনে যায়। জয় হয় মানবতার। পৃথিবী আবার আগের মত সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর হয়ে ওঠে। নাটককার ২০২০তে বসেই এই যে ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন আজ যে তা ফলে গেছে আমরা সকলেই সেটা দেখতে পাচ্ছি। তাই তাঁর নাটকও কালোত্তীর্ণ হবে একথা বলা যেতেই পারে।

পরিশেষে বলতে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহামারি নিয়ে অনেক অবিস্মরণীয় সাহিত্য রচনা হয়েছে। ব্রাত্য বসুর এই দুই নাটকও তেমন এক সময়ের খননচিত্র হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র,বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, *শ্রীকান্ত(২),* 'শ্রীকান্ত(অখণ্ড),৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, পৃ: ৪২-৪৩।

২। বসু, ব্রাত্য,প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪, *ভাইরাস এম,* 'নাটক সমগ্র'(১),৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ: ২৪০।

৩। বসু, ব্রাত্য,বইমেলা ২০১৫, *রাত্রির পালক খসে খসে যায় দিগন্তের দিকে,* 'ব্রাত্য বসু: নাটক থেকে নাট্যে নতুন শতাব্দীর অন্তর্ঘাত', শম্পা ভট্টাচার্য, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, দীপ প্রকাশন, পৃ: ৩১।

৪। বসু, ব্রাত্য,প্রথম সংস্করণ মে, ২০২২, *করোনার দিনগুলিতে প্রেম,* 'নাটক সমগ্র'(৪),৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ: ৩০৬।

৫। আগের সূত্র, পৃ: ৩০৭।

৬। আগের সূত্র, পৃ: ৩০৯।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১। বসু, ব্রাত্য,প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪, 'নাটক সমগ্র'(১), ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স।

২। বসু, ব্রাত্য, প্রথম সংস্করণ মে ২০২২, 'নাটক সমগ্র'(৪), ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স।

সহায়ক গ্রন্থ

১। গোস্বামী, জয়, বইমেলা ২০২২, 'ব্রাত্য : বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ', ৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৪, কারিগর প্রকাশনা।

২। ভট্টাচার্য, শম্পা, বইমেলা ২০১৫, 'ব্রাত্য বসুর নাটক থেকে নাট্যে নতুন শতাব্দীর অন্তর্ঘাত', ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, দীপ প্রকাশন।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু, জানুয়ারি ২০১৩, 'অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ ব্রাত্য বসুর নাটক', ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, দীপ প্রকাশন।

৪। মিত্র, সৌমিত্র (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২১, 'অনেক কমলা রঙের রোদ : ব্রাত্যব্রত বসু', ৬বি, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, কলকাতা ৬, পূর্ব পশ্চিম।

কণা বসু মিশ্রের গল্পভুবন : একটি আলোচনা

সুজিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যাকাশে কণা বসু মিশ্রর আবির্ভাব সত্তর দশকে। বারোটি গল্পসংকলন ও পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস এখনো পর্যন্ত তিনি রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যের মুখ্যভাগে নারী। তাঁর গল্পের নারীরা আধুনিক কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক অন্যায় বিধি-নিয়মের প্রতি প্রতিবাদ করে। সমাজের নানা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে লড়াকু নারীর সংগ্রামের কথা তাঁর গল্পগুলি। সৃষ্টির প্রারম্ভকালে তাঁর গল্পগুলি রোমান্টিক। কিন্তু পরিণত বয়সে রোমান্টিক মনের বদলে প্রেমমনস্তত্ব প্রকাশিত। এছাড়া সমাজের নানা সমস্যা তাঁর গল্পের আলোচ্য বিষয়। কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস, পণপ্রথা, ধর্মের ভণ্ডামির কারণে বিপর্যস্ত জীবন চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। দাম্পত্যজীবন তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয়। একই ছাদের নীচে বাস করা দুই নর-নারীর দাম্পত্যসম্পর্কে প্রেম, জটিলতা, তিক্ততার, মনোদ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য গল্প রচনা করেছেন। মূলত তিনি কিশোর সাহিত্য রচনা করেছেন। কিশোর মনের অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দার মতো রহস্য উদঘাটনের কৌতূহলতা, বেপরোয়া মনের গতির দিকটি আলোচিত। কণা বসু মিশ্রের বৈচিত্র্যময় গল্পভুবনটি নিম্নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো।
মূল শব্দ: কণা বসু মিশ্র, ছোটগল্প, রোমান্টিক গল্প, সামাজিক গল্প, দাম্পত্যজীবনের গল্প, নারীকেন্দ্রিক গল্প, কিশোর গল্প, গল্পভুবন।

মূল আলোচনা:

বাঙালি পাঠকের কাছে কণা বসু মিশ্র (১০ই মার্চ, ১৯৪৬) খুব একটা পরিচিত নন। অথচ, তিনি সত্তর দশক থেকে সাহিত্যরচনায় ব্রতী। ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। লিখেছেন তিনশোধিক ছোটগল্প এবং বহু উপন্যাস। স্কুলজীবন থেকেই তিনি গল্প বানানোর খেলায় মেতে ওঠেন। রুপকথার বদলে ধীরে ধীরে বাস্তব মানুষের জীবন তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'এক অ-কবির ডায়েরিতে' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় অসমে। অসমের নিসর্গ প্রকৃতির মাঝে নিজের সৃজনশীল সত্তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় অসমের প্রকৃতি, নদ-নদী, পাহাড়ের প্রসঙ্গ বারবার আসে। উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর কলকাতায় আগমন। স্নাতকস্তরে ভর্তি হন বালিগঞ্জের 'মুরলীধর গার্লস কলেজ'এ। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় 'রায়বাড়ি ও সিংহাসনের মামলা' গল্প লিখে প্রথম হয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বাণী রায়। কলেজ ম্যাগাজিন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতেন। বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরে 'দেশ' পত্রিকার জন্য গল্প লেখেন। 'দেশ' পত্রিকার দপ্তর থেকে দুইবার গল্প ফেরত পাঠায়। তৃতীয় গল্পটি মনোনীত হয়; গল্পের নাম 'লেডিস কম্পার্টমেন্ট' (১৯৬৫)। তিনি ছিলেন বিমল করের স্নেহধন্য। এছাড়া কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও গুণীজনদের সান্নিধ্য তাঁর লেখনী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'তুলির কিছু সময়' (১৯৮০), এবং প্রথম উপন্যাস 'ওরা সবাই' (১৯৭৭)।

(২)

লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন-

> “কি করে লেখক হলাম জানি না। কোন রোমান্টিক মনের যন্ত্রণা থেকে কলমটাকে ভালোবেসেছিলাম, তাতো জানি না। একটা বোহেমিয়ান মন যে কখনও থামতে জানে না, নিজের মধ্যে হারিয়ে নিজেকেই খুঁজে বেড়ায়।”[১]

অবিরত আত্মানুসন্ধানই লেখক হওয়ার বড় উদ্দেশ্য। সৃষ্টির প্রারম্ভপর্বে কণা বসু মিশ্রের গল্পগুলি প্রেমমূলক। কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শোনা বা দেখা প্রেমকাহিনি ছিল তাঁর গল্পের বিষয়। কিন্তু পরিণত বয়সের সঙ্গে রোমান্টিক মনের বাঁকবদল ঘটেছে। সাধারণ রোমান্টিক গল্পের পরিবর্তে প্রেমমনস্তত্ত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ‘ঊর্মি’ গল্পে ঊর্মি-সুগত-জয়ন্তানুজের ত্রিকোণ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক জটিলতা প্রতিপাদ্য বিষয়। ঊর্মির সঙ্গে সুগতর প্রেম কলেজ জীবনে। বিবাহের জন্য তারা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, তবুও প্রেমের একটা তাগিদ রয়ে যায়। বেকার সুগত চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য দিল্লি রওনা দেয়। সুগতর অনুপস্থিতিতে বিবাহের জন্য পরিবারের চাপ, একাকীত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জর্জরিত ঊর্মির জীবনে আকস্মিক উপস্থিত হয় জয়ন্তানুজ। ঊর্মির অতীতের আশাহত যন্ত্রণার নাম জয়ন্তানুজ। যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে পরস্পরের মনে জন্মেছিল ভালোলাগা। কিন্তু জয়ন্তানুজের প্রেম নিবেদন করার ভীরুতায় ঊর্মির অষ্টাদশী মন হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। সেই জয়ন্তানুজ বহু বছর পর প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। দোলাচল মনে বর্তমান প্রেমিক সুগতর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা মাপতে গিয়ে দেখে সেখানে কেবলই বালির চর। সঙ্গলাভের প্রয়োজনে সুগতর সঙ্গে প্রেম। স্বভাবে সম্পূর্ণ পরস্পরের বিপরীত। সুগতর কাছে প্রেম-ভালোবাসা কেবল সময়ের অপচয়, তার চেয়ে অনেক শ্রেয় শরীরী খেলা-

> “চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে অনেক শ্রেয় ঊর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকে।”[২]

শরীর সর্বস্ব সম্পর্কে ঊর্মির মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অসুস্থ সম্পর্কের পরেও ঊর্মি মনস্থির করে জয়ন্তানুজের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করা। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকা ঊর্মি যথারীতি জয়ন্তানুজের বলা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়। কারণ ঊর্মির কাছে পৃথিবীর সব প্রেমিক পুরুষই সমান। পুরুষের প্রেমশিখা দ্রুত নিভে গিয়ে নারী শরীর লোভী হয়ে পড়ে। তাই ভবিষ্যতের অজানা পথে পাড়ি দিতে বেকার সুগতর চেয়ে মোটা বেতনের জয়ন্তানুজ শ্রেয়। ঊর্মির শরীরটা কেবল এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের হাতবদল হবে। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে প্রেম হয়েছে শরীরী খেলা ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা পাওয়া। প্রকৃত ভালোবাসা নয়, প্রেমকে অবলম্বন করে আত্মস্বার্থচরিতার্থ করাই উদ্দেশ্য।

প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকা বর্তমান সময়ে মুখোমুখি হলে দুইজনের মধ্যে দেখা দিয়েছে মনস্তাত্বিক জটিলতা। ‘সংলাপের মধ্যে’ গল্পে পৌলমী ও শুভায়ু যৌবনের প্রেম সামাজিক নানা বাধা বিপত্তির কারণে পরিণতি পায়নি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর দুইজনের সাক্ষাৎ। সময়ের গতিতে দুইজনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক্ষণে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণায় দুজনেই আবেগতাড়িত। পরস্পরকে না পাওয়ার দুঃখবোধের মধ্যেই নিজেদের বর্তমান জীবন কতখানি সুন্দর সেই খেলায় দুজনেই মেতে ওঠে। বাস্তবে দুজনেই অসুখী; মেকি জীবন তুলে ধরলেও তাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

শরীরসর্বস্ব প্রেমের আরেক গল্প 'আজকাল'। রমেন ও পারমিতার কলেজ প্রেম। কলেজে বদ্ধ ঘরে পারমিতাকে সঙ্গম করতে প্রেম উপচে পড়ে। কিন্তু পারমিতা গর্ভবতী হলে সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে রমেন। দায়িত্ব, কর্তব্য এলে মধুর ভালোবাসা তিক্ত সম্পর্কে পরিণত হয়। এছাড়া 'সোনিয়া', 'বাজী', 'চেনা ফুলটুসি' গল্পগুলিতে সদ্য যৌবনে পা রাখা তরুণ-তরুণীর প্রেমজীবন চিত্রিত হয়েছে।

(৩)

লেখক সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী। একজন সুলেখক কখনো সমাজকে অতিক্রম করে সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কণা বসু মিশ্র একজন দায়বদ্ধ শিল্পী, তাঁর গল্পে সমাজের নানান সমস্যা প্রকটিত। একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে। গ্রাম, শহর নির্বিশেষে কুসংস্কারের কারণে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। তেমনই এক গল্প 'শোষণ'। পরাণের স্ত্রী নবাহ্নি তিনবার গর্ভবতী হলেও সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। পরাণের বিশ্বাস, নবাহ্নির প্রতি তার বন্ধু নজরার মনে গোপন ভালোবাসা ছিল। মাঠে দুইজনে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে নজরা মারা যায়। নজরার অতৃপ্ত আত্মা নবাহ্নির উপর ভর করেছে , তাকে বাবা হতে দিচ্ছেনা। অপদেবতার নজর এড়াতে সাধু—গুণিনের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস-

> "গুণিনের মন্তরের জোরে কত বাঁজার ছেলে হয়। ধাই নাড়ি কাটতি না কাটতি মা মা বলে কেঁদে ওঠে। গুণিন যে সাক্ষাত ধন্বন্তরী-ডাক্তার বদ্যি তার কাছে হার মেইনে যায়। ডাক্তার বদ্যির সাধ্য আছে ভুত তাড়ানোর।"[৩]

'জ্যান্ত ছেলের বাপ হতে' পরাণ নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে নবাহ্নিকে নিয়ে এসেছে ষাটোর্দ্ধ্ব গুণিনের কাছে। বহু মানুষষের ভাগ্যবিধাতা গুণিন ট্যারা চোখে নবাহ্নিকে আপাদমস্তক দেখে লাল ছোপ পরা দাঁতে রহস্যের হাসি খেলে। ঝাঁড়ফুক করার অছিলায় নতুন কাপড়ের প্রয়োজনে গুণিন পরাণ ও হুদোবালাকে গ্রামে পাঠায়। সেই সুযোগে ভীত, বিস্ময়া নবাহ্নিকে একা পেয়ে গুণিন তাকে ধর্ষণ করে। উতপ্ত বালির উপর গুণিনের পাশবিক অত্যাচারে নবাহ্নি বিধ্বস্ত। কামচরিতার্থের পর গুণিন বলে "কউ গো পরাণ ভাই, পুজো শেষ। ঘরের বউ কে ঘরে নিয়ে যাও।"[৪] ধ্বস্ত নবাহ্নিকে দেখে পরাণের চওড়া বুকে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; তার দৃঢ় বিশ্বাস এবার সে 'জ্যান্ত ছেলের বাপ হবে'। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, লোকবিশ্বাসের কারণে আমাদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে। কিছু ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। ধর্মের ভেকধারীদের আসল মুখোশকে কণা বসু মিশ্র তাঁর গল্পে খুলে দিয়েছেন। পরিশ্রমহীন অর্থোপার্জন, সামাজিক সম্মানের জন্য অনেক অসাধু ধর্মের ভেক ধরে। 'রাধারানী' গল্পে গণেশ জাতিতে ভুঁইমালী। নীচু বংশে জন্মের কারণে সমাজের উপেক্ষায় অপমানিত বোধ করে গণেশ ভুঁইমালী। তার মাথা চাড়া দেয় সামাজিক সম্মান প্রাপ্তির। ভবঘুরে গণেশের সেই আশা পূরণ হয় বৃন্দাবনে। সে দেখে বৃন্দাবনে সাধু-সন্ন্যাসীরা রাধা নাম জপ করা বিনামূল্যে খাদ্য ও অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সকলেই সম্মান করছে। গেরুয়া বস্ত্রের অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থচরিতার্থ করার মনস্থির করে। সাধু সাজে গ্রামে ফিরে গণেশ বড় মন্দির বানায়। গণেশ সাধুর অলৈকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে প্রণামী বাক্সখানি অর্থে ভরে ওঠে। ধর্মের ভেকধারী গণেশ পারেনি মনের বাসনা সংযম করতে। তাই সকলের অগোচরে শহরে গিয়ে আমিষ ভোজন করে এবং রাত্রে চটুল নাচ দেখে। গণেশের ধর্মব্যবসা নিয়ত ফুলে ফেঁপে ওঠে। গেরুয়া বসনের অপার ক্ষমতা গণেশ সেদিন অনুভব করে যেদিন জমিদার বাড়ির গিন্নিমাকে অভ্যাসবশত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গেলে-

> "ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, করিস কী? করিস কী গণেশ! তুই যে এখন অন্য গণেশ। আর পায়ে হাতে নয়-গিন্নিও উল্টো দুহাত আকাশে তুলে পেন্নাম করলো। ছিঃ গণেশ! গেরুয়ার তো একটা মর্যাদা আছে? তুই তো তার কাছে ঠাঁই পেয়েছিস আমাদের তো কিছুই হল না রে।"[৫]

ধর্মের ভেকধারীরা মানুষের ভক্তিকে পুঁজি করে আত্মস্বার্থসিদ্ধি করে। অসৎ সাধুদের জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম ও সংস্কার আজ অবক্ষয়ের মুখে।

পণপ্রথা সমাজের আরেক ব্যাধি। কণা বসু মিশ্র 'পণ চাই পণ' গল্পে ভয়ঙ্কর এই ব্যাধির কবলে বিপর্যস্ত নারীর জীবন চিত্রিত। মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ পণ মেটাতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির সমস্ত আক্রোশ পড়ে সুচেতার উপর। সুচেতার কাছে শ্বশুরবাড়ি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অত্যাচার এতটাই চরমে পৌছায় যে বাড়ির বধূকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সুচেতার প্রতিবাদীসত্তা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পণপ্রথাকেন্দ্রিক এক ভিন্নধর্মের গল্প 'ছেলে বিক্রি'। মাতৃহীন আহ্লাদীর বিয়ের পণ জোগাড় করতে নিজের সর্বস্বটুকু বিক্রি করে গুবড়ে। এমনকি বরকর্তার অতি চাহিদা মেটাতে গুবরে নিজেকে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখে। লেখক এখানে সমাজের গতানুগতিক প্রথা থেকে বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলের পিতা পণের পাওনা বুঝে নবদম্পতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়লে বেঁকে বসে ছেলে মদন। পিতার কর্মে লজ্জিত পুত্র বলে-

> "হেথা মানুষজন যারা রইছ শোন, আমার বাপ কুড়ি হাজার টাকায় আমার শ্বশুরের কাছে আমাকে বেচে দেছে। আমি এখন এবাড়ির কেনা গোলাম। এদের বাড়ি খাটব। এদের কথায় চলব।"[৬]

পণপ্রথায় ছেলেকে কিনে নেয় মেয়ের পিতা। নির্মলের মত প্রতিবাদী যুবকের চিন্তাভাবনায় আমাদের সমাজের একদিন পরিবর্তন হবে।

(৪)

কণা বসু মিশ্র দাম্পত্যজীবনকেন্দ্রিক বহু গল্প রচনা করেছেন। একই ছাদের নীচে থেকেও দাম্পত্যজীবনের ভালোবাসা, জটিলতা, তিক্ততা, মনোদ্বন্দ্বের দিকগুলি গল্পে উঠে এসেছে। দাম্পত্যজীবনের গল্পগুলি প্রায়ই নাগরিক পটভূমিতে রচিত। শিক্ষিত নাগরিক সমাজে ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যজীবন তাঁর গল্পে চিত্রিত। 'ফারাক' গল্পে উৎসা ও দীপকান্তের তিরিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে দেখা দিয়েছে জটিলতা। সংসারে স্বামী-সন্তানের জন্য সর্বস্বটুকু উজাড় করে দিয়ে উৎসা জীবনের একপ্রান্তে এসে অনুভব করে সে নিঃস্ব। ব্যস্ত দীপকান্তের জীবনে দাম্পত্যসম্পর্ক বলতে-

> "শুধু হঠাৎ কোনোদিন খেয়াল হল নেশাগ্রস্ত দীপকান্ত ময়াল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরছে ওকে। এইতো ছিল ওদের প্রেম আর সংসার।"[৭]

সঙ্গে দীপকান্ত নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভুত্ব ফলিয়ে উৎসার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নিজের হাতে সাজানো সংসার ছেড়ে নতুন করে বাঁচার তাগিদে উৎসা তার বন্ধু শ্রীজয়ের সঙ্গে নবসূচনার জন্য অজানা পথে পা রাখে। প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনে যন্ত্রবৎ সম্পর্ক পালনের ভঙ্গুর দিকটি গল্পে উঠে এসেছে।

লেখকের কলমে দাম্পত্য সম্পর্কে অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার দিকটি প্রতিফলিত। 'কথায় কথায়' গল্পে সৌরদীপ ও রুপার দাম্পত্য জীবন বলতে একই ছাদের নীচে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলা। পরকীয়া সম্পর্কের বাসনা থাকলেও সৌরদীপ সামাজিক মান-মর্যাদার জন্য

পিছিয়ে আসে। অন্যদিকে তাদেরই ফ্ল্যাটে অর্থবান শৌভিক রুপার প্রতি দুর্বল। বিকৃত মানসিকতার দুই পুরুষ নিজেদের যৌনস্বাদের পরিবর্তনের জন্য বউ বদলের ইচ্ছা প্রকাশ করে-

> "পাল্টাপাল্টির খেলাটা চলুক তাহলে? দেখা যাক দুজনের এক্সপেরিমেন্টেকে বেশি সফল হয়। আপনি না আমি? বলুন বউ পাঠাচ্ছেন কবে?"[৮]

দাম্পত্য সম্পর্কে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই আমরা এই গল্পে। অসমবয়সী দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়নের গল্প 'আমি বুড়ো হতে চাই না'। পঞ্চাশের বিপত্নীক জ্যোতিশঙ্কর নিঃসঙ্গতা কাটাতে বিবাহ করে বাইশ বছরের সর্বাণীকে। অসমবয়সী দাম্পত্য সম্পর্কে একজনের অভিভাবকসুলভ নিরাপত্তা, অন্যজনের কেবল মানিয়ে চলা। জ্যোতিশঙ্করের সঙ্গে পা মেলাতে সর্বাণী নিজের প্রাণবন্ত মনটাকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পড়িয়ে রাখে। অন্যদিকে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' সম্পর্কে নাকাল জ্যোতিশঙ্কর। শেষ বয়সে পাওয়া দাম্পত্য সুখের জন্য জ্যোতিশঙ্কর আরো কিছু বছর বাঁচতে চায়। কিন্তু অসমবয়সের দাম্পত্যজীবনে দেখা দেয় নানান জটিলতা ও অনিশ্চয়তা। জ্যোতিশঙ্করের বয়সোজনিত অক্ষমতার কারণে সর্বাণীর যৌবন কুঁড়ির মতো কাঁদে। জৈবিক চাহিদার অপূর্ণতার সঙ্গে সর্বাণী ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভোগে। সে অনুভব করে কিছু বছর পর তাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে। তার সন্তানরা নিজের পিতাকে ঠিকভাবে চিনতেও পারবে না। দুই দম্পতির মনের মিল থাকলেও বয়স তাদের সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

(৫)

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য মূলত নারীজীবনকেন্দ্রিক। সমাজের বিভিন্নপ্রান্তে থাকা সকল শ্রেণির নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তাঁর গল্পের আলেখ্য। তাঁর লেখনীর মুখ্যভাগে নারী হলেও তিনি উগ্র নারীবাদী নন, বরং তিনি নারীদরদী। তিনি তাঁর গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি হওয়া অত্যাচার, অবহেলা, বঞ্চনায় নিগৃহীত নারীর প্রতিবাদের মাধ্যমে উত্তরণের কথা বলেছেন। তাঁর গল্পের নারীরা পরনির্ভরশীল হয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে জীবনে বাঁচতে চায় না; নারীরা আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরও মাথা উঁচু করে নারীর বেঁচে থাকার গল্প 'বাঁচা'। পিতৃহীন জয়ন্তী দাদ-বৌদির সংসারে করুণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে চায়নি। আর্থিক স্বাবলম্বী হতে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি দুটো টিউশন পড়ায়। সংসার নির্বাহের জন্য উপার্জনের অর্ধেক টাকা দাদার হাতে তুলে দেয়। তবুও দাদা-বৌদির কাছ থেকে শুনতে হয় কটূক্তি। বাঁচার জন্য জয়ন্তী ঘরে-বাইরে লড়াই করে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে জয়ন্তীকে ভোগ করতে চায়-

> "জানোতো আজকাল চাকরি রাখতে গেলে স্কুলের কর্তৃপক্ষের মন রাখতে হয়। হে, হে,। তা কর্তৃপক্ষ বলতে তো আমি।"[৯]

দাদ-বৌদি জয়ন্তীর নিশ্চিত ছাদটুকু কেড়ে তাকে অনাশ্রিতা করে। এমন সংকটপুর্ণ অবস্থাতেও জয়ন্তী অবিচলিত; সে চাঁদের আলোয় দেওয়ালে লেখা বিপ্লবের বাণী পড়ে-"বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।"[১০] জয়ন্তীর মতো লড়াকু মেয়েদের বাঁচার পথ সহজ নয়। আশ্রয়হীনা জয়ন্তীর চারপাশে পুরুষের লালসার জাল পাতা-তবুও সে আশাহত না হয়ে দিনের শুরুর সঙ্গে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে নেয়।

কণা বসু মিশ্রের গল্পের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শত প্রাচীন বদ্ধ নীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। নারীকে চার দেওয়ালে বন্দী করে রাখার নিয়মনিগড়কে ধূলিসাৎ করে বিজয়কেতন

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবলে আমরা অত্যাধুনিক যুগে বাস করি। সভ্যতার উন্নতি ঘটলেও চিন্তাভাবনায় আমরা এখনো সেকেলে। লিভ টুগেদার বা লেসবিয়ান সম্পর্ক আমাদের সমাজে এখনো একপ্রকার ব্যাধি। এ সম্পর্কে আমরা মুক্তভাবে কথা বলতে পারি না। লেখক 'ওরা দুজন' গল্পে সমাজের সেই স্টিরিওটাইপ ভাবনাকে ভেঙেছেন। গল্পে দেখি মধুশ্রী কন্যা সম্প্রদানে বিশ্বাসী নয়। বিবাহের দিন ছাদনাতলায় বসেছে, সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করেছে, স্বামীর হাতে সিঁন্দুর পরেছে, কিন্তু গোত্রান্তর পরিবর্তন করেনি। স্বামি ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিতে চায়লে স্বাবলম্বী মধুশ্রী প্রতিবাদ করেছে-

> "ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব আবার কী? আমি তো একটা চাকরি করি। দুজনের ফিফটি-ফিফটি আয়ে সংসার চলবে তাই তো কমিটমেন্ট ছিল তাই না।"[১১]

বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে মতান্তর ঘটায় মধুশ্রী পারিবারিক অশান্তি বা আইনি ঝামেলায় না গিয়ে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে। পিতা-মাতার কাছে আশ্রয় নিলে মধুশ্রীর উপর উপদেশের বাণী বর্ষিত হয়। একজন সহনশীল, গুণবতী, নম্র নারীর কর্তব্য সম্পর্কে তার মা জ্ঞান দেয়; সকলের ধারনা মধুশ্রীর জন্যই সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে। প্রতিনিয়ত সতী নারীর কর্তব্য জ্ঞানে মুখরিত পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে মধুশ্রী স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বাঁচা শুরু করে। জীবননির্বাহের জন্য সে ব্যবসা শুরু করে, তার পার্টনার হয় সৃজলীনা। তারও পুরুষের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস। পুরুষের আশ্রয় ছাড়া দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর একই ফ্ল্যাটে বাস করা সমাজ ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। সকলেই ওদের দুজনকে লেসবিয়ান বলে সমাজে একঘরে করতে চেয়েছে। সমাজের কুৎসায় ভ্রুক্ষেপ না করে মধুশ্রীর উত্তর-

> "মুখ বন্ধ করার কি দরকার? যারা নোংরা ঘাঁটতে ভালোবাসে তারা নোংরা ঘাটুক।"[১২]

কণা বসু মিশ্রের গল্পে নারীরা সমাজের মান-মর্যদার ভয়ে, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, নিশ্চিত নিরাপত্তা হারানোর আশঙ্কায় পুরুষের সকল অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে পায়ের শিকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

(৬)

কণা বসু মিশ্র ছোটদের জন্য গল্প রচনা করেছেন। মূলত তিনি কিশোর সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। 'ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী' তাঁর কিশোর গল্প সংকলন। কিশোর মনের অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা রহস্য উদঘাটনের কৌতূহলতা, বেপরোয়া মানসিকতার দিকগুলি তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। পাঠ্যবই ও টিউশনির চাপে কিশোর তার কৈশোরত্ব হারিয়ে ফেলছে। অভিভাবকরা কিশোর মনের প্রতি যত্নশীল না হয়ে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ঘোড়াদৌড় করায়। কিশোর মনকে বুঝতে না চাওয়ার গল্প 'কেউ বোঝে না'। পড়াশুনা, অভিভাবকের প্রত্যাশার চাপে কিশোর মন ওষ্ঠাগত। তাই রাজার মনোইচ্ছাপূরণে কোনো অলৌকিক শক্তিই ভরসা-

> "একবার যদি কোনো দেবতার সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে যায়, ও তাহলে প্রথমেই বায়না ধরবে, কিছু বাড়ি দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের জন্য কিছু খেলার মাঠ করে দাও না।"[১৩]

বর্তমান সময়ে কৈশোরকাল থেকে খেলার মাঠ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। নম্বর আনার প্রতিযোগিতায় ক্লাসের সহপাঠী হয়ে উঠছে চরম শত্রু। অসুস্থ এক মানসিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা কৈশোরকালকে।

অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসন কিশোর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কৈশোরকালে স্বাভাবিক স্ফুরণে ব্যহত হলে তার প্রভাব পরবর্তীকালে দেখা যায়। 'তাতার জ্যাঠামশায়' গল্পে দেখি রাশভারী, কঠোর জ্যাঠামশায় পড়াশুনার বাইরে খেলাধূলা, গল্পের বই পড়াকে অযৌক্তিক মনে করে। ফলে তাতা একাকীত্বে ভুগতে থাকে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ঘরবন্দী করায় কৈশোরের প্রাণবন্ততাকে ছিনিয়ে নিয়ে অবসাদের মুখে ঠেলে দেয়।

পাশাপাশি কণা বসু মিশ্র কিছু অলৌকিক গল্প রচনা করেছেন। 'ভূতুড়ে গাড়ির যাত্রী', 'পাহাড়ী রাস্তা', 'রাত্রি' ভৌতিক গল্প।

কণা বসু মিশ্রের সাহিত্য বিষয়বস্তুতে বিচিত্রময় তবুও তিনি পাঠকমহলে সেভাবে খ্যাত নন। সত্তর-আশির দশকের উত্তাল সময়ের প্রভাব সেভাবে না থাকলেও সমকালীন সময়ের ছাপ তাঁর বহু গল্পের বিষয়। কণা বসু মিশ্র এখনো সৃষ্টিশীল। গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠুক তাঁর সাহিত্য ভুবন।

তথ্যসূত্র:

১) মিত্র রঞ্জনা, সাহিত্য বিসারী পত্রিকা, লেখনীর ভাষায় জীবনের খোঁজ-কণা বসু মিশ্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২
২) মিশ্র বসু কণা, তুলির কিছু সময়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃ-৯৮
৩) মিশ্র বসু কণা, সম্বুদ্ধ, প্রমা প্রকাশনী, ওয়েস্ট রেঞ্জ কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-মে, ১৯৯৭, পৃ-১৫২
৪) তদেব, পৃ-১৫৩
৬) মিশ্র বসু কণা, বন্ধ দরজা, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- জানু ১৯৯৯, পৃ-৬
৭) তদেব, পৃ-৪৫
৮) মিশ্র বসু কণা, বাছাই গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃ-৭০
৯) মিশ্র বসু কণা, জনারণ্যে একা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ-১১২
১০) তদেব, পৃ-৬৭
১১) মিশ্র বসু কণা, স্বনির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃ-২০
১২) তদেব, পৃ-২৪
১৩) মিশ্র বসু কণা, ভূতুড়ে গাড়ীর যাত্রী, পুনশ্চ পাবলিকেশন, ব্যানার্জী রোড় কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১০ পৃ-১৬।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক : বিষয়ের সন্ধানে

শিউলী মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যাও কম নয়। বীরভূমের লাভপুর গ্রামের নাট্যপরিবেশই তাঁকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর প্রথম নাটক 'মারাঠা তর্পণ'। নাটকটি মারাঠাদের বিজয় ইতিহাস নিয়ে রচিত। 'মারাঠা তর্পণ' কলকাতার আর্ট থিয়েটারে প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি নাটকের পথ থেকে সরে আসেন। এই সময় তিনি উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনা করেন। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি আর কোনো নাটক রচনা করেননি। পনেরো বছর পর 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। তিনি তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটোগল্পের নাট্যরূপ দেন। এছাড়াও কয়েকটি মৌলিক নাটকও রচনা করেন। তবে মৌলিক নাটক অপেক্ষা গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপই বেশি জনপ্রিয় ছিল। তাঁর 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক', 'দ্বীপান্তর', 'বিংশ শতাব্দী', 'যুগ বিপ্লব', 'কবি', 'কালরাত্রি', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' প্রভৃতি নাটকগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল স্বতন্ত্র।

সূচক শব্দ: কালিন্দী, দুই পুরুষ, পথের ডাক, দ্বীপান্তর, বিংশ শতাব্দী, যুগ বিপ্লব, কবি, কালরাত্রি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মারাঠা তর্পণ, কলকাতার আর্ট থিয়েটার।

মূল অংশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি লাভপুর হল বীরভূমের একটি বিশিষ্ট নাট্যক্ষেত্র। এই লাভপুরের মাটিতেই তিনি পেয়েছিলেন নাটকের পরিবেশ। ছোটোবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন অনেককে নাটক লিখতে, নাটক করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার সাহিত্য জীবনে' বলেছেন—"তখন আমাদের গ্রামে নাটকের রচনার ঢেউ উঠেছে। স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার হিসেবে বাংলা দেশে খ্যাতিলাভ করেছেন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হয়েছে। সে সব নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হত আমাদের গ্রামের রঙ্গমঞ্চে।"[১] ছোটোবেলায় গ্রামের রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখে দেখে তিনি বড় হয়েছেন,আবার নিজে অনেক নাটকে অভিনয়ও করেছেন। লাভপুরের প্রাণপুরুষ নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর নাট্যগুরু।তাঁর হাত ধরেই তাঁর নাট্যজগতে প্রবেশ। এছাড়াও নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণাতে তিনি আঠারো টাকা খরচ করে গ্র্যান্ড ডাফের তিন খন্ডের মারাঠা ইতিহাস পাঠ করে লেখেন তাঁর প্রথম নাটক 'মারাঠা তর্পণ'। অতুলশিব মঞ্চে নাটকটির অভিনয় বেশ সাফল্য লাভ করে। উচ্ছ্বসিত হয়ে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ের জন্য কলকাতার আর্ট থিয়েটারে নিয়ে যান। কিন্তু আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ তা পাঠ না করেই ফিরিয়ে দেন। এই প্রত্যাখ্যানে তিনি গভীরভাবে আহত হন। ক্ষোভে, অভিমানে 'মারাঠা তর্পণ' নাটকের পান্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন। নাট্যকার হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিরতরে বিলীন হয়।

এই ঘটনা তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"সেদিন যদি এই ঘটনাটি না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'ত, এমনকি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে দেখার ছল ক'রেও দু দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার সঙ্গে 'হল না' কথাটা বলতেন তা হ'লে নাটক লেখা ছাড়তাম না। নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়তো আমার পরিচয় হত। কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম।"[২] দীর্ঘকাল তিনি নাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। এই সময় তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীর্ঘ পনেরো বছর পর তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপের মধ্য দিয়ে আবার নাট্যজগতে ফিরে আসেন। তারপর তিনি বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই নাটকগুলি। বাংলার রঙ্গমঞ্চের জগতেও নাটকগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

তারাশঙ্করের নাট্যরচনাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-নাট্যরূপান্তর ও মৌলিক নাটক। তাঁর মৌলিক নাটক অপেক্ষা গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরগুলি বেশি জনপ্রিয়। 'মারাঠা তর্পণ' তাঁর প্রথম নাটক। কিন্তু সে নাটকের পান্ডুলিপি তিনি নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেলেছেন। মারাঠা তর্পণ ছাড়াও গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ ও মৌলিক নাটক মিলে অনেকগুলি নাটকের নাট্যকার তিনি। তাঁর নাটকগুলি হল—'কালিন্দী' (১৩৪৮), 'দুই পুরুষ' (১৩৪৯), 'পথের ডাক' (১৩৪৯), 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০), 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৫১), 'চকমকি' (১৩৫২), 'যুগবিপ্লব' (১৩৫৮), 'কবি' (১৩৬৪), 'কালরাত্রি' (১৩৬৪), 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৩৬৭), 'সংঘাত' (১৩৬৯) 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৭৪)। এছাড়াও আছে 'উমানন্দের মন্দির', 'ডাইনির মায়া', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতি বেতার নাটক। বেতার নাটকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।

তারাশঙ্করের নাট্যরূপান্তরগুলি তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পের নাট্যরূপ। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে প্রচুর নাটকীয় উপাদানের সমাবেশ রয়েছে। সেজন্য তিনি তাঁর উপন্যাস ও গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন—'কালিন্দী' (১৩৪৮), 'কবি' (১৩৬৪) ও 'আরোগ্যনিকেতন' (১৩৭৪)। গল্পের নাট্যরূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'দুই পুরুষ' (১৩৪৯), 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০),ও 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৩৬৭)।

কালিন্দী (১৩৪৮)

'কালিন্দী' চার অঙ্ক বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকটি তিনি নাট্যনিকেতনের প্রবোধচন্দ্র গুহর অনুরোধে রচনা করেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ নাট্যনিকেতনে অভিনয়ের জন্য 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করলে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি 'কালিন্দী' নাটক রচনা করেন। নাটকটি দুই জমিদার বংশের বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত। কালিন্দী নদীর চর দখলকে কেন্দ্র করে রামেশ্বর চক্রবর্তী ও ইন্দ্র রায় দুই জমিদারের বিরোধ বাধে। ইন্দ্র রায়ের ভগ্নী রাধারানীর সঙ্গে বিবাহ হয় রামেশ্বর চক্রবর্তীর। তিনি নিজের হাতে স্ত্রী রাধারাণী ও পুত্রকে হত্যা করে কালিন্দীর চরে পুঁতে দেন। রাধারানীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুই জমিদারের বিরোধ চরমতম রূপ পায়। তাঁর অধিকাংশ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জমিদার। কিন্তু এই নাটকের জমিদার চরিত্রগুলি বড়ো বেমানান। জমিদার পুত্র অহীন চরিত্রটিকে তিনি আদর্শবাদী করে তুলেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে তিনি যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন নাটকে সেভাবে পারেননি। নাটকের শুরুতে যে বিরোধ ছিল দুই জমিদার বংশের, নাটকের শেষে সেই বিরোধ জমিদার বংশের সঙ্গে শিল্পপতির বিরোধে পর্যবসিত হয়।

কবি (১৩৬৪)

তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'কবি'। 'কবি' নাটকের মূল চরিত্র নিতাই কবিয়াল। এক অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সন্তানের কবি হয়ে ওঠার কাহিনী হল 'কবি' নাটক। অন্যান্য নাটক থেকে এই নাটকে গানের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। নাটকের গানগুলি সংগ্রহ করা নয়, নাট্যকারের নিজের লেখা। তারাশঙ্কর গান লিখতে লিখতে নিজেই কবি হয়ে উঠেছিলেন। গানগুলি শুধু নিতাই কবিয়ালের নয়,তারাশঙ্করই নিতাই কবিয়াল হয়ে উঠেছেন।

'কবি' নামে তাঁর একটি গল্পও আছে। তিনি গল্প থেকে প্রথমে উপন্যাস এবং উপন্যাস থেকে পরে নাটক লেখেন। চার অঙ্কে একুশটি দৃশ্যে সমগ্র নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের অনেক অনাবশ্যক ঘটনা নাটকে বর্জিত হয়েছে, আবার অনেক নতুন নতুন ঘটনা নাটকে সংযোজিত হয়েছে। কবি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ নাটক। নিতাই এর জীবন, কবি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা লাভ, তাঁকে কেন্দ্র করে ঠাকুরঝির পরিবারের সংকট, বসনের সঙ্গে নিতাই এর দ্বন্দ্ব জটিল সম্পর্ক নাটকটিকে করে তুলেছে দ্বন্দ্বমুখর। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় নিতাই তার আত্মীয় পরিজন ছেড়ে, পরিচিত জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। নাট্যদ্বন্দ্ব শুরু হয় এখান থেকেই। তারপর সে বন্ধু রাজনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। রাজনের বাসায় থাকতে থাকতে ঠাকুরঝির সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় গভীর প্রণয়ে পরিণত হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে নাট্যকাহিনীর জটিলতার সূত্রপাত। ঝুমুরওয়ালি বসনের সঙ্গে নিতাইকে দেখে ঠাকুরঝি ক্ষোভে অভিমানে নিতাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তৃতীয় অঙ্কে নিতাই ঠাকুরঝির কাছে ফিরে আসে বসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। ঠাকুরঝিকে বারবার ভুলতে চেষ্টা করেও নিতাই ভুলতে পারেনি। তার মধ্যে দেখা গিয়েছে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। চতুর্থ অঙ্কে বসনের মৃত্যুর পর নিতাই যখন ঠাকুরঝির কাছে ফিরে আসে তখনই ঠাকুরঝির মৃত্যু সংবাদ শুনে। ঠাকুরঝির মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি।

কবি একটি ট্রাজিক নাটক। নিতাই এর জীবনের ট্রাজ্যেডিকে নাট্যকার সার্থক রূপ দান করেছেন। ঠাকুরঝি ও বসনের মৃত্যু বিশেষত ঠাকুরঝির মৃত্যু নিতাইকে বেদনায় পূর্ণ করে তোলে। তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে হাহাকার—"ভালোবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে। হায় জীবন এত ছোটো ক্যানে।"[৩] এই হাহাকার দর্শকদের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাই কবি শুধু নাটক হিসেবে নয়, মঞ্চ সফল নাটক হিসেবেও সফল।

আরোগ্যনিকেতন (১৩৭৪)

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আরোগ্যনিকেতন' অন্যতম। বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন 'আরোগ্য নিকেতন' নামে। উপন্যাসে চিকিৎসা ও আরোগ্যের প্রেক্ষিতে প্রবীণ ও নবীণের যে দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে বিস্তৃত পরিসরে নাটকে তাকেই সংহত রূপ দান করা হয়েছে। ফলে নাটকটি তীব্র গতিবেগ যুক্ত ও আদ্যন্ত দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৃহৎ আকারের উপন্যাসকে তিনি চার অঙ্কে নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর 'কালিন্দী' ও 'কবি' উপন্যাস থেকে 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করা ছিল অনেক বেশি কষ্টকর এবং সে রূপায়ণে তিনি সফল হয়েছেন সার্থকভাবে।

গল্পের নাট্যরূপান্তর

তারাশঙ্কর তাঁর 'নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'আখড়াইয়ের দিঘী', ও 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পের নাট্যরূপ দেন। গল্প থেকে নাট্যরূপান্তরগুলি হল—

দুই পুরুষ (১৩৪৯)

'দুই পুরুষ' নাটকটি গ্রন্থাগারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালে। নাটকটি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ নাটক। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক। নাটকটি তিনি 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পের কাহিনী অবলম্বনে লেখেন। নাটকের কেন্দ্রভূমিতে আছে নুটুবিহারী ও জমিদার শিবনারায়ণ রায়। জমিদার শিবনারায়ণ রায় অত্যাচারী এবং প্রজাপীড়ক একজন জমিদার। তাঁর অত্যাচারে জর্জরিত এক প্রজা মহাভারতের পাশে এসে দাঁড়ায় নুটুবিহারী। নাটকীয় সংঘাতের একদিকে আছে অত্যাচারী জমিদার শিবনারায়ণ অপর দিকে আছে পরোপকারী দেশ সেবক নুটুবিহারী ও প্রজা মহাভারত। নুটু বিহারী বিপর্যস্ত প্রজা মহাভারতকে সর্বত্রভাবে সাহায্য করেছে। জমিদারের অত্যাচারের অবসান ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশসেবামূলক কর্মের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। নুটু বিহারী চরিত্রটিকে নাট্যকার সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। পার্শ্ব চরিত্র কল্যানী, সুশোভন, বিমলা এই চরিত্রগুলিকেও তিনি বাস্তাবানুগ করে তুলেছেন। তবে গল্প থেকে নাট্যরূপায়ণে বেশ কিছু অদল বদল দেখা যায়। ঘটনা প্রবাহ, চরিত্র চিত্রন, জীবন দর্শন ও পরিণতিতে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। গল্পে ছিল একটি সরল কাহিনী। অত্যাচারী জমিদারের সঙ্গে নুটু মোক্তারের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গল্প গড়ে উঠেছিল। গল্পের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নাটকে তার সঙ্গে চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্বও যুক্ত হয়েছে। অনেক নতুন নতুন চরিত্রের আগমন ঘটেছে নাটকে। কল্যাণী, সুশোভন, মমতা, অরুন, বরুণ চরিত্রগুলি গল্পে ছিল না। নাটকে তারা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্ব নাটকে নতুন সংযোজন। প্রাচীন ও নবীন জমিদারের দ্বন্দ্ব শিবনারায়ণ রায় ও তাঁর পুত্র দেবনারায়ণ রায়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এর ফলে নাটকের পরিণতিও ভিন্নতর হয়েছে। নুটু বিহারী তাঁর পুত্রের সঙ্গে জমিদারের নাতনির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলে তাঁর চরিত্রের বদল দেখা যায়। এর ফলে অত্যাচারী প্রজা মহাভারত তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। নুটুবিহারীর পতনে গল্পের সমাপ্তি ছিল। কিন্তু নাটকে সেখানে নুটুবিহারী তাঁর চরিত্রকে পতন থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। তাঁর মুক্তিতেই নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি।

'দুই পুরুষ' মঞ্চ সফল নাটক। তার পরেও তারাশঙ্কর আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু দুই পুরুষের মত মঞ্চ সফল আর কোনো নাটক লাভ করতে পারেনি। এই নাটকটি সম্পর্কে তিনি নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। এই হিসেবে 'দুই পুরুষ' আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম "পিতা-পুত্র" এবং ওই নামেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "নাট্যভারতী" কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন।"[৪] 'দুই পুরুষ' বেশ সাফল্যের সঙ্গে নাট্যভারতীতে একশো রজনী অভিনীত হয়।

দ্বীপান্তর (১৩৫০)

তারাশঙ্কর তাঁর 'আখড়াইয়ের দিঘী' গল্পের নাট্যরূপ দেন 'দ্বীপান্তর' নামে। নাটকটি ১৮৭২ সালের ঘটনা অবলম্বনে লেখা। তার কয়েক বছর আগেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে। মহারানী ভিক্টোরিয়া দেশের শাসনভাগ গ্রহণ করেছেন। গ্রামে গ্রামে তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের শাসন-পীড়ন চলছে। জমিদাররা প্রজাশাসন, উৎপীড়ন ও ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই নাটকের জমিদার ধনদাপ্রসাদ রায় তেমনি এক জমিদার। লাঠিয়াল বাগ্দী কালীচরণ ও জমিদার ধনদাপ্রসাদ নাটকের দুই মূল চরিত্র। কালীচরণ সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল। নাট্যকাহিনীর

শুরুতে দেখা যায় কালীচরণ ফিরে এসেছে। তার অবর্তমানে জমিদার ধনদাপ্রসাদ তার জমি জমা কেড়ে নিয়ে তার পরিবারকে নিঃস্ব করে দিয়েছে এবং তার একমাত্র ভগ্নী পদ্মকে তার সাধন সঙ্গিনী করে বাগান বাড়িতে এনে রেখেছেন। কালীচরণ ফিরে এলে জমিদারের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে জমিদারের বড়ো ছেলে প্রমদাপ্রসাদের পদ্মের প্রতি আসক্তিতে। তার প্রতিশোধ নিতে কালীচরণ জমিদারের বড়ো ছেলে প্রমদাপ্রসাদকে হত্যা করে। তখন থেকেই কালীচরণ পেট চালানোর দায়ে মানুষ খুন করতে থাকে। একসময় সে নিজেরই অজান্তে তার পুত্র তারাচরণকে হত্যা করে। নিয়তি তাড়িত এক অসহায় পিতার করুণ হাহাকার ধ্বনিত হয় নাটকের শেষে কালীচরণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

'আখড়াইয়ের দিঘী' গল্প থেকে নাট্যরূপান্তরে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক নতুন চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে নাটকে, যেমন ধনদাপ্রসাদ, প্রমদা, জ্ঞানদা, পদ্ম প্রভৃতি চরিত্রগুলি গল্পে ছিল না। নাটকে এই চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুধু চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, অনেক নতুন নতুন ঘটনাও সংযুক্ত হয়েছে। পিতার হাতে ভুল ক্রমে পুত্রের হত্যার বিষয়কে কেন্দ্র করে 'আখড়াইয়ের দিঘী' গল্পটি গড়ে উঠেছিল। পিতার অসহায়তা প্রদর্শনই গল্পকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নাটকে জমিদারের প্রসঙ্গ, জমিদারের অত্যাচার, কালীচরণ ও পদ্মের সঙ্গে ধনদাপ্রসাদের রক্তের সম্পর্ক আবিষ্কার এগুলি নাটকের নতুন উপাদান। গল্পে এই চরিত্র ও প্রসঙ্গ কিছুই ছিল না। গল্প হিসেবে 'আখড়াইয়ের দিঘী' যতটা সফল নাটক হিসেবে 'দ্বীপান্তর' ততটা সফল হতে পারেনি।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা (১৩৬৭)

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' এক অঙ্কের নাটক। অজয় নদীর তীরবর্তী এক বৈষ্ণব আখড়া এই নাটকের পটভূমি। নাটকের মূল চরিত্র গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাসের সেবাদাসী কৃষ্ণভামিনী। গোবিন্দদাস অর্থপিশাচ, কদর্য চরিত্রের মানুষ। গোবিন্দদাসের প্রতিপক্ষ কৃষ্ণদাস আখড়ার অধিকারী। আখড়ার দখলকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। কৃষ্ণদাসের সমস্ত সম্পত্তি সে আত্মসাৎ করে এবং আখড়ার দখল নেয়। সেবাদাসী কৃষ্ণভামিনী সব দিতে রাজি হলেও আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও তার ঘরটুকু দিতে চাইনি। বিগ্রহ ছিল তার প্রাণস্বরূপ। সে সবটুকু দিয়ে বিগ্রহকে রক্ষা করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। গোবিন্দদাস তাতে রাজি হয়নি। গোবিন্দদাস আখড়ার বিগ্রহ ও কৃষ্ণভামিনীর দেহ মন অধিকার করেছে। নাটকের শেষে গোবিন্দদাসের চরিত্রের বদল ঘটেছে। সে কৃষ্ণদাসের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে এবং বিগ্রহ তুলে নিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণভামিনীর হাতে ফেরত দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গোবিন্দ দাসের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রেমের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নাটকের নাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

তারাশঙ্কর কখনো উপন্যাস থেকে নাটক বা গল্প থেকে নাটক রচনা করেছেন। নাট্যরূপ দেওয়ার সময় তিনি যে শুধু রূপগত পরিবর্তন করেছেন তা নয়, তাঁর জীবনভাবনাগত পরিবর্তনও তার সঙ্গে মিশে আছে। শুধুমাত্র আঙ্গিকের জন্য রূপগত পরিবর্তন তিনি করেননি। তাঁর জীবনবোধের পরিবর্তনও নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া রঙ্গমঞ্চের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। চরিত্রের নাম পরিবর্তন করে, কখনো ঘটনার জাল বিস্তার করে, কখনো মূল চরিত্রের জটিলতা বৃদ্ধি করে, কখনো দেশ কালের পটভূমি বিস্তৃত করে বা মূল জীবনভাবনার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে রূপান্তর সাধন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রূপান্তর সফল হয়নি। গল্প উপন্যাস রচনায় তিনি যতটা সফল, নাটকে তিনি ততটা হতে পারেননি। অনেক নাটকেই তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ

ও এমন সব অতিনাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে শিল্প হিসেবে তা উৎকৃষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তারাশঙ্করের নাটকগুলি মঞ্চে যথেষ্ট সফল্যলাভ করেছিল।

মৌলিক নাটক

তারাশঙ্কর কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা করেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক নাটকের সংখ্যা খুবই কম। তিনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক মৌলিক নাটক রচনা করেন। এছাড়াও একটি প্রহসনও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর মৌলিক নাটকগুলি হল—

পথের ডাক (১৩৪৯)

'পথের ডাক' তারাশঙ্করের একটি মৌলিক নাটক। এটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট একটি দেশাত্মবোধক নাটক। তাঁর পূর্ববর্তী নাটকগুলিও ছিল দেশপ্রেমমূলক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটকটিতে তেমন কোনো অভিনবত্ব নেই। পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলা মুক্ত করে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য পথ ডাক দিয়েছে। নাট্যকার নিখিলেশ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মুক্ত ভারত গড়ে তোলা কথা বলেছেন। নাটকের মূল চরিত্র নিখিলেশ রায়বাহাদুর ও অতুল। রায় বাহাদুর ক্ষমতা ও অর্থের মোহে অন্ধ। অতুল শক্তি ও সম্পদের নেশায় স্নেহ প্রীতি ও কর্তব্যের প্রতি উদাসীন। সে খনিগর্ভ থেকে ভূগর্ভস্থ ঐশ্বর্য অহরণ করে সম্পদ বৃদ্ধিতে মত্ত। তার মধ্যে স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতির কোনো চিহ্ন নেই। নাটকের নিখিলেশ চরিত্রটির আদর্শ অন্যান্য চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে। শেষ পর্যন্ত রায় বাহাদুর ও অতুল চরিত্র দুটি পরিবর্তিত হয়েছে নিখিলেশের প্রভাবে।

নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রমা ও সুনন্দা। নাট্যকার চরিত্র দুটিকে ব্যক্তিত্বময়ী ও আত্মবিশ্বাসী রূপে অঙ্কন করেছেন। রমা নিখিলেশের কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ। নিখিলেশকে সে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে গ্রহণ করেছে। সুনন্দার নিখিলেশের প্রতি আসক্তি থাকলেও নিখিলেশের মানব সেবায় সে নিজেকে যুক্ত করে স্বামী ও পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। নাটকের শেষে রায় বাহাদুরও তাঁর কন্যার মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যা করেন। পরপর দুটি মৃত্যুর ঘটনায় নাটকটি দুঃখময় পরিণতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দী (১৩৫১)

'বিংশ শতাব্দী' তারাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক। নাটকটি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫ শে ডিসেম্বর রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নাটকটি রচিত। তিনি দেখেছিলেন বিজ্ঞান ও ধনতান্ত্রিক শক্তি এই বিংশ শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ। এই দুই শক্তির প্রচন্ড ক্রিয়াই তিনি নাটকে তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপপ্রয়োগ দেখে তিনি এই নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নাটকের মূল চরিত্র শ্যামাদাস শাস্ত্রী। তিনি এক মহা শক্তিধর জড়বিজ্ঞানী। তিনি শুধু বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক শক্তির উদ্ভাবনে রত। তাঁর কাছে মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসার কোনো জায়গা নেই। সেই জন্য তিনি অনিমা ও করুণার ভালোবাসার আবেদনে কোনো সাড়া দিতে পারেননি। নাট্যকার এই চরিত্রটির উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির দিকে তিনি তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি। শ্যামাদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র ব্রজবিহারী চরিত্রটি পুঁজিবাদী শক্তির প্রতীক। বিজ্ঞানকে বশীভূত করে সে তার কাজে লাগাতে চায়। পুঁজিবাদী শক্তি যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে নাট্যকার এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তা দেখিয়েছেন। এই নাটকে নাট্যকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে বেশি জোর দিয়েছেন, তত্ত্বকে রসবস্তুতে পরিণত করতে পারেনি। সেই জন্য বিংশ শতাব্দী নাটকটি একটি তাত্ত্বিক নাটক হয়ে উঠেছে। নাটকটি নাটক হিসেবে জনপ্রিয় হলেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সাফল্য লাভ

করতে পারেনি। নাটকটিতে শুধু তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে। তাই বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব নির্ভর নাটক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

যুগবিপ্লব (১৩৫৮)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে লেখা একটি ঐতিহাসিক নাটক 'যুগবিপ্লব'। এটি তারাশঙ্করের একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত আফগান বাদশা আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণে এ নাটকের সূচনা এবং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ে নাটকের সমাপ্তি। এর আগেও তিনি মারাঠাদের ইতিহাস নিয়ে তাঁর 'মারাঠা তর্পণ' নাটক লিখেছিলেন। সেই ইতিহাস কাহিনীকে তিনি নতুনভাবে লিখলেন এই নাটকে। 'যুগবিপ্লব' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"যুগবিপ্লব নাটকখানি তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক। আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে 'মারাঠা তর্পণ' নামে একখানি নাটক লিখেছিলাম। নাটকখানি শখের রঙ্গমঞ্চে সেকালে সার্থকতা লাভ করেছিল। বর্তমানে (১৯৫১) কলকাতার কোনো বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ নাটকখানি মঞ্চস্থ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ...।"[৫] অভিনয়ের জন্য তিনি নাটকটি লিখলেও কোথাও ইতিহাসকে তিনি লঙ্ঘন করেননি। গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। এই নাটকের অভিনয় সাফল্য বিষয়ে তিনি আশান্বিত ছিলেন। সেই আশা তাঁর পূরণ হয়েছে। স্টার থিয়েটারে ১৯৫১ সালে তাঁর 'যুববিপ্লব' নাটক অভিনীত হয়।

তারাশঙ্করের নাটকের অভিনয়

তারাশঙ্করের বেশিরভাগ নাটক ছিল মঞ্চ সফল নাটক। মঞ্চের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেজন্য মঞ্চাভিনয়ের কথা মাথায় রেখে নাটক লিখতেন। তাঁর নাটকগুলি পেশাদার মঞ্চে সফল হয়েছিল, কারণ বাংলার রঙ্গমঞ্চে তখন বিষয়বৈচিত্রের অভাব ছিল। স্বদেশভাবনামূলক নাটক আগে থেকেই অভিনীত হত। তারাশঙ্কর তাতে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এলেন, যা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পালাবদল ঘটিয়েছিল। যদিও অতিনাটকীয়তা ও দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপ তাঁর অনেক নাটকেরই ত্রুটি। তবুও ভালো অভিনয়ের গুণে নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তারাশঙ্করের নাটক অভিনয়ের একটি তালিকা দেওয়া হল—

কালিন্দী—নাট্য নিকেতনে ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় (১৩৪৮ ও ১৩৫৫)

দুই পুরুষ ও পথের ডাক—নাট্যভারতী মঞ্চে (১৩৪৯)

দ্বীপান্তর—কালিকাতে (১৩৫৭)

কবি—রঙমহল মঞ্চে (১৩৫১)

আরোগ্য নিকেতন—বিশ্বরূপা মঞ্চ (১৩৬৩)

যুগবিপ্লব—স্টার থিয়েটার (১৯৫১)

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২. কালিন্দী
৩. কবি
৪. আরোগ্যনিকেতন
৫. দুই পুরুষ
৬. দ্বীপান্তর
৭. পথের ডাক
৮. বিংশ শতাব্দী

৯. যুগ বিপ্লব
১০.বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

সূত্রনির্দেশ :

১. আমার সাহিত্য জীবন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬০, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২, পৃ.১২
২. তদেব, পৃ. ১৮
৩. তারাশঙ্কর নাট্য-সমগ্র (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫, পৃ. ৩৪৪
৪. দুই পুরুষ(ভূমিকা), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৪৯, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস,কলিকাতা-৩৭
৫. যুগবিপ্লব (ভূমিকা), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাবণ ১৩৫৮, কাত্যায়নী বুক স্টল, কলিকাতা।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্যে স্বপ্নদর্শন সমীক্ষা

সোমনাথ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মানুষ স্বপ্ন দেখে। নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ মানুষের আছে। আর এখান থেকেই তার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। জীবনে চাওয়া ও না-পাওয়া বিষয়গুলিকে সে স্বপ্নে পূরণ করে নিতে চায়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা সাধারণ মানুষদের যে স্বপ্ন দেখায়, তা নিছকই স্বপ্ন নয়। তাদের এই স্বপ্নদর্শনের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণীত চিন্তাভাবনা লুকিয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্যটি তেমনই এক স্বপ্নদর্শনের প্রতিচ্ছবি। এখানে দেবী গোসানী দেবী চন্ডীরই রূপান্তর। এই কাব্যের স্বপ্নদর্শনে মিশে আছে দেবী চণ্ডী ও কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর মানসভাবনা। দেবী গোসানী কান্তনাথকে যেভাবে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে, তাতে এক মানসিক দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। দেবী গোসানী ও রাজা কান্তেশ্বরকে কেন্দ্র করে স্বপ্নদর্শন আবর্তিত হয়েছে। কীভাবে ‘বেহার’ রাজ্যের অরাজক পরিস্থিতি দেবীর স্বপ্নদর্শনের ফলে দূর হয়েছে, তা সমীক্ষা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: স্বপ্ন, লোককথা, রাজা কান্তনাথের বিচারব্যবস্থা, দেবীর নৈতিকতাবোধ, মঙ্গলকাব্যের মঙ্গলময় পরিস্থিতি।

মূল আলোচনা:

মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে ঐতিহ্যবাহিত অনেক সুড়ঙ্গপথ। প্রতিকূলতার বৈপরীত্যে মানুষ সবসময়ে লড়াই করে চলেছে। জীবনের মর্মমূলে রয়েছে এই লড়াই করার মানসিকতা। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে সাধারণ মানুষকে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখানো সমাজ জীবনে লড়াই করার এই প্রবণতাকে একটি ঐক্যবোধে গ্রথিত করতে চেয়েছে। এই ঐক্যবোধ এসেছে মঙ্গলকাব্যের কবিদের পরিকল্পনা অনুসারে। তাঁরা মানুষের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এই প্রবণতাকে হারতে দেননি। প্রতি মঙ্গলকাব্যের দেবীরা এসেছে মানুষের অতৃপ্ত চাহিদা পূরণ করার জন্যে। দেবী মনসা, চণ্ডী মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যদশা দূরীকরণের দায়িত্ব নিয়েছে। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে ভিটে-মাটি ছাড়া কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর সহায় ও সম্বলহীন জীবনযন্ত্রণাই তাঁকে স্বপ্নে দেবী চণ্ডীর দর্শন করিয়েছেঃ “**ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে/ নিদ্রা যাই সেই ধামে/ চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।**”[১] তিনি নিজের জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তার প্রতিফলন রূপে তাঁর স্বপ্নে দেবী চণ্ডী এসেছে। মানসিক ও একইসঙ্গে শারীরিক শ্রমহেতু কবির কাছে দেবীর এই স্বপ্নদর্শন কোনো অলীক কল্পনা নয়, বরং তা বাস্তবের যাথার্থ্যটাকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উপরের পঙক্তিতে একটু লক্ষ্য রাখলেই বোঝা যায় যে, ‘ক্ষুধা’ আর ‘পরিশ্রম’ কবির স্বপ্ন দেখার মূল কারণ। দেবী চণ্ডী কবিকে তার নামে চন্ডীমঙ্গল সংগীত রচনা করার আজ্ঞা দিয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, নরপতি বাঁকুড়া রায়ের কাছে এই সংগীত পরিবেষণ করে কবি সম্মানিত হয়েছেন।[২] দেবী চণ্ডী এমন দেবী, যিনি বনের সামান্য ব্যাধকেও নগরের রাজা করতে পারার

সক্ষমতা রাখে। জীবনে হতাশার শিকার মানুষ সেদিন বাংলার ঘরে-ঘরে ব্রতকথার মধ্যে লুক্কায়িত শক্তিমান দেবী চণ্ডীর মঙ্গলময় বাসনা ইচ্ছে পূরণে আস্থা রেখেছিল। 'গোসানীমঙ্গল'-কাব্যে কবি রাধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগী প্রার্থনা করেছেনঃ

"বেহারে নাহিক রাজা ব্যাকুল হইল প্রজা,
অরাজক কত কাল ছিল।।
হইল আকাশ বাণী, পূজা কর মা ভবানী,
পুনঃ হবে রাজ্যের ঈশ্বর।"[৩]

'বেহার' অর্থে এখানে কোচবিহারের কথা বলা হয়েছে। খেন বংশের রাজত্বের পর শহরে যে 'অরাজক' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।[৪] 'রাজ্যের ঈশ্বর' অর্থে সম্ভাব্য এক রাজার কথা বলা হয়েছে, যে দুর্গতি থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আরাধ্য দেবীর কাছে নতজানু হবার ইচ্ছে থেকে নয়, বরং সমাজ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে কবির এই স্বপ্নদর্শন তাঁর জীবনের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সমাজের সঙ্গে মিশে এক অনন্য মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে মানুষের সত্তা। কবিশিল্পীর সত্তা সমাজকে ঘিরেই তৈরি হয়েছেঃ **"গোসানী করহ পূজা/ সুখে রবে যত প্রজা/ রাজা হবে নাম কান্তেশ্বর"।**[৫] কাব্যে গোসানী নামধেয় কোনো এক লৌকিক দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের এই আখ্যানটি নির্মিত হয়েছে। এই নির্মাণে কবির শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কবি এই বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা হয়েছে যে, গোসানী দেবীর পুজো করলে রাজ্যের সকল প্রজারা সুখে থাকবে। এই দেবীর পুজো করলে রাজ্য এমন এক রাজা পাবে যে, রাজ্যের 'অরাজক' পরিস্থিতি দূর করতে পারবে। কবি দেবী গোসানীর যে 'মঙ্গলাচরণ' লিখেছেন, সেখানে 'কান্তেশ্বর' নামধেয় রাজার কথা বলা আছে। লক্ষ করার বিষয় হল, কান্তেশ্বরের কিন্তু তখনও জন্ম হয়নি। 'রাজা হবে নাম কান্তেশ্বর'। অর্থাৎ কান্তেশ্বরের জন্মের সঙ্গে স্বপ্নের একটা যোগসূত্র দেখা গেছে।

কোচবিহারের দক্ষিণগ্রামের জামবাড়িতে ভক্তীশ্বর ও অঙ্গনা নামে স্বামী-স্ত্রী অপুত্রক অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেছে। এমন মুহূর্তেঃ

"স্বামীমুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পুজিবার তরে করিল মনস্থ।। . . .
মোর পূজা কর ধনি ! হবে যশস্বিনী।।"[৬]

স্বামীর মুখে চণ্ডীর 'মাহাত্ম্য' শুনে অঙ্গনা দেবীর পুজো করতে চেয়েছে। লক্ষ করার বিষয় হল, অঙ্গনা কিন্তু প্রথমে 'চণ্ডীর মাহাত্ম্য' শুনেই পুজো করতে চেয়েছে। তার এই চাওয়ার মধ্যে 'যশস্বিনী' হবার মূল লক্ষ্য দেখা যায়নি। আর্থিক দুরাবস্থা অঙ্গনার আছে। সেখান থেকে বের করতেই দেবী গোসানী অঙ্গনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। 'যশস্বিনী' হবার স্বপ্নটি দেবী নিজে অঙ্গনার কাছে বলেছে। আমাদের মনের অসামাজিক ও অনৈতিক ইচ্ছাগুলি প্রবৃত্তিজাত। আমাদের সবকিছু অভিজ্ঞতা লাভে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সমূহের একটা ভূমিকা যেমন আছে, তেমন পরোক্ষ ইন্দ্রিয়ের দান সর্বব্যাপ্ত। পতিব্রতা নারীর চণ্ডী সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্ব সংস্কার। চেতনা এক সংবেদন গ্রাহক ইন্দ্রিয়। চেতন স্তর মনের সবসময়ে উপরে থাকার কারণে তা বাইরের পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করার এই শক্তি ভক্তীশ্বর ও অঙ্গনার আছে। অঙ্গনার দ্বন্দ্বমুখরিত মনের অবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

দারিদ্র্য + গোসানী (চণ্ডী) সম্পর্কিত পূর্ব সংস্কার + দেবী গোসানীর (চণ্ডী) উচ্চারিত 'যশস্বিনী' হবার উদ্দেশ্যপ্রণীত চিন্তাভাবনা

যখনই কোনো আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র হয়ে মানুষের মানসভাবনাকে পরিপুষ্ট করতে চায়, তখনই ভাবনার অবকাশে সে গড়ে তোলে নিজস্ব ভুবন। **“শ্রীদুর্গা ঈশ্বরী তুমি নৃমুণ্ডধারিণী”**[৭] দেবীর রূপের এই স্তব ভক্তীশ্বরের কোনো কাল্পনিকতার আদলে তুলে ধরা বাচনের সজ্জাবিন্যাস নয়। এর পেছনে থেকে গেছে বহু সুখের আশাঃ

“তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর।।
সত্য করি কহি, ব্যর্থ হবে না বচন।
মম বরে তব পুত্র হইবে রাজন।।”[৮]

নিদ্রাকালে অঙ্গনা ও ভক্তীশ্বর যে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নের পূর্বাভাষ কবির ‘মঙ্গলাচরণ’ শ্লোকেই ধরা পড়েছে। কাব্যের নাম ‘গোসানীমঙ্গল’ হওয়াতে কবির দ্বারা মানুষের মঙ্গলসাধনের একটা বোধ কাজ করেছে। আর এই কাজে কবি সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন দেবী গোসানীর দ্বারা **‘সুখে রবে যত প্রজা’**[৯]র উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে। যথাযথ চরিত্র তৈরি করে সেসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। দেবী গোসানী নিজে বলেছেঃ

“শুন শুন পদ্মা মা কুমারী বিষহরী।
কান্তনাথ রাজা হবে গ্রাম জামবাড়ী।।
কোচ রাজ্য মধ্যে কান্তা সুপবিত্র স্থান।
আমিও তথায় গিয়া হব অধিষ্ঠান।।
কান্তনাথ হতে হবে পূজার প্রচার।
মনে মনে এই যুক্তি করিয়াছি সার।।”[১০]

দেবী গোসানী রাজ্যের কান্তা নামক স্থানকে ‘সুপবিত্র’ ঘোষণা করেছে। দেবী গোসানীর বিশ্বাস মতে, মানুষ কান্তনাথ থেকেই মর্ত্যে তার পুজো প্রচার শুরু হবে। কান্তনাথ হল ভক্তীশ্বর ও অঙ্গনার একমাত্র পুত্র।

দেবী গোসানী মনে মনে তার পুজো প্রচারের জন্য এই ‘যুক্তি’ করেছে। দেবীর এই মানস যুক্তি তার চেতন স্তর থেকে তৈরি হয়েছে। নিজ নিজ পুজো প্রচারের জন্য দেবদেবীরা সবসময়ে স্বর্গলোকের অধিবাসীকেই বেছে নিয়েছে। যুক্তি-অযুক্তির খেলায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অনেকটাই নির্ভর করেছে তাদের দৈব নির্ধারিত পথে। এই কাব্যে দেবী মর্ত্যে জন্মানো মানুষের উপরেই আস্থা স্থাপন করেছে। কান্তনাথের জন্ম দেবীর লক্ষ্যপূরণের উপায়। এই লক্ষ্য হল ‘কান্তনাথ হতে হবে পূজার প্রচার’। “কান্তেশ্বরের রাজ্যপ্রাপ্তি”- অংশটি তারই সাক্ষ্য বহন করেছেঃ

“শুন বাপু কান্তেশ্বর আমার উত্তর।
প্রভাতে হইবা তুমি রাজ্যের ঈশ্বর।।
কান্তনাথ নাম তোর, হ'লে রাজ্যেশ্বর।
আজি হ’তে নাম তোর হ’ল কান্তেশ্বর।।”[১১]

শিশু কান্তনাথ থেকে কান্তেশ্বরে পরিচয় পাবার পেছনে দেবী গোসানীর মঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্বপ্নদর্শন শুধু নিছকই কাহিনি কাঠামো নয়। কান্তনাথের দ্বারা দেবীকে স্বপ্নে দেখার মধ্যে তার এক মানসিক দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। শিশু কান্তনাথের জীবন পিতার মৃত্যুজনিত কারণে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়েছিল। পিতা ভক্তীশ্বরের মৃত্যুর পর সামান্য শিশু এক বিপ্রের ঘরে গাভী চড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকা, গাভীগুলোর কৃষকের শস্য ভক্ষণ করা, দ্বিজের

কাছে কান্তর শিষ্যত্ব গ্রহণ ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা শৈশবের সহজ-সরলতাকে ক্রমশ করেছে বিপন্ন। অঙ্গনার জীবনে নতুন করে দুর্দশা দেখা গেছে। দেবী গোসানীর **'ধন পুত্র লৈয়া সুখে বঞ্চ সংসারে'**[১২]- এই বর অঙ্গনা পেলেও ভক্তীশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে। অঙ্গনার দেবীর দেওয়া এই বর সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মিশে থেকেছে আক্ষেপের স্বরঃ **"রাজা না হইলে বাপু ব্যর্থ হ'ল বর। . . . কি মতে হইবে বাপু ভরণ পোষণ।"**[১৩] তবে প্রতিবারই দেবী গোসানী **"শুন বাপু কান্তেশ্বর আমার উত্তর।/ প্রভাতে হইবা তুমি রাজ্যের ঈশ্বর।।"**[১৪] এই আশ্বাস পূরণ করেছে। ভয় ও ক্ষুধা থেকে বেরিয়ে আসতে শিশু কান্তনাথকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে দেবীর স্বপ্নদর্শন। পিতার মৃত্যুর পর শিশু কান্তার চৈতন্যের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার বোধকে নিয়ন্ত্রণে স্বপ্ন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সমাজ জীবনে মানুষের গড়পড়তা হিসেবের গণ্ডগোল থাকলেই স্বাভাবিক জীবন ভেঙে পড়তে বাধ্য। ভেঙে পড়ার খুঁটিনাটি সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির চোখে ধরা পড়েছে। জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে মানুষ জয় করতে চায়। কান্তনাথ সেটাই করেছে। তবে এসবের মাঝে দেবী গোসানীর উচ্চারিত সাবধান বাণীঃ **"অবিচারে রাজ্য তুমি না করহ পালন।।/ যদ্যপি আমার বাক্য অন্যথা করিবে।/ আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে।।"**[১৫] দেবী গোসানীর নৈতিকতাবোধকে প্রশংসা করতেই হয়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর প্রণয় সম্পর্কের খবর পেয়ে যে রাজবিচার কান্তনাথ করেছে, তা দেবী গোসানী কখনোই সমর্থন করেনি। কান্তনাথ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রাজা হয়েছে, সেখানে তার বিচার ব্যবস্থায় রাজ্য শাসনের অভাব লক্ষ করা গেছে। রাজ্যের মন্ত্রী শশীপাত্রের পুত্র মনোহরের সঙ্গে নিজের স্ত্রী বনমালার প্রণয় সম্বন্ধের কথা রাজা শুনেছে। এরপরেই মনোহরের দেহমাংস নিজের স্ত্রীকে ভক্ষণ করিয়েছে। রাজা কান্তেশ্বরের এইধরনের আচরণে ক্রূরতার স্বভাব ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারটি দেবী গোসানীর চোখে কান্তনাথের 'দোষ' হিসেবেই ধরা পড়েছে। দেবী চণ্ডীর দ্বারা মনসার উপর নানাভাবে অত্যাচারের কাহিনি বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা গেছে। শিবের সংসারে বিমাতা চণ্ডীর দ্বারা নির্মমভাবে লাঞ্ছনা মনসার স্বভাবকে ক্রূর করে তুলেছেঃ **"কোন্ জন ঘুচাইবে মোর মনস্তাপ।"**[১৬] এরপরেই সাপের দংশনে চাঁদ সদাগর পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে। এই ক্রূরতার স্বভাবকে দেবী গোসানী (যেহেতু তিনি দেবী চণ্ডীরই রূপান্তর) কান্তেশ্বরের মধ্যে লক্ষ করতে পেরেছে। সেজন্য দেবী রাজা কান্তেশ্বরকে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছে। নইলে 'আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে।' দোষ করার ফলে দীর্ঘকাল ধরে মোগল রাজের সঙ্গে সমরের পর কান্তেশ্বর বন্দী হয়েছে। কান্তেশ্বরের পরবর্তী সময়ে রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। আবার এই বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধ স্বপ্নদর্শনের দ্বারাই করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শিবের ঔরসে জন্ম নেওয়া পুত্র রাজ্যের শুভ সূচনা করবেঃ **"শিবের ঔরসে রাজা হইবে বেহারে। . . . রামরাজ্য সম রাজ্য নাহি কেহ দুঃখী।।"**[১৭] কথামত তাই হয়েছেঃ

"গোসানীমঙ্গল গীত শুনে যেই জন।
গোসানীর বরে সেই পাই ধন জন।।"[১৮]

কবি সময় ও পরিসরে তাঁর চেতনে থাকা সামাজিক অনুশাসনকেই দেবী গোসানীর দ্বারা কান্তনাথকে সাবধান বাণী উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডীর আখ্যানকে অবলম্বন করে দেবী গোসানীর কাব্যরূপ নির্মাণ করে নিয়েছেন। কবির কাব্যচাতুর্য এই সামঞ্জস্য রক্ষার চাবিকাঠি। সমাজের কাছে দেবীর নিজেকে তুলে ধরার প্রয়াস মানুষ কান্তনাথকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। দেবী গোসানী শুধু নিজের পুজো প্রচারের জন্য ভক্তীশ্বর, অঙ্গনা ও

কান্তনাথের স্বপ্নে আসেনি, রাজ্যের অরাজক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তার সম্যক ধারণা আছে। কবি রাজ্যের ‘সুমঙ্গল’[১৯] করতে দেবী গোসানীর স্বপ্ন কাঠামোটিকে বেছে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কবি মুকুন্দরাম বিরচিত), পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২।
২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪।
৩) পাল নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোসানীমঙ্গল, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯২, অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭০।
৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৮।
৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০।
৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭২।
৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪।
৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩।
৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭০।
১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫।
১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫।
১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪।
১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮১।
১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫।
১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯।
১৬) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদিত), ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারি, ২০১১, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ২১১।
১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮।
১৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮।
১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮।

আকর গ্রন্থ:

১) পাল নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী, গোসানীমঙ্গল, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯২, অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কবি মুকুন্দরাম বিরচিত), পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
২) নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদিত), ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস, মনসামঙ্গল, প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারি, ২০১১, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯।

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় 'কবিতা' পত্রিকার প্রসঙ্গ

শেখ রফিজুল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ: বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে যে আন্দোলন তার মুখপত্র বলা যেতে পারে 'কবিতা' পত্রিকাকে। এই পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হন জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখ তরুণ কবিরা। তাই 'কবিতা'কে তরুণ কবিদের মুখপত্র ও বুদ্ধদেব বসুকে তরুণ কবিদের অভিভাবক বলা যায়। এই পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু গদ্য-ছন্দের কবিতার জন্য অন্দোলনে নেমে ছিল এবং তার ফল আজ সুবিদিত। এই পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই পত্রিকার কথা বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতিকথায় কেমন ভাবে নিয়ে এসেছেন তাই এই রচনার লক্ষ্য।
মূল শব্দ: কবিতা পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গদ্য ছন্দ।

মূল আলোচনা:

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-জীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে যে 'প্রগতি' পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি আর ঢাকা শহরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তাই ১৯৩১ সালে বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে ছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বেকারত্বের সীমা ছিল গগনচুম্বী। তাই লিখে ও টিউশনি করে সংসার চালানোর কাজে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর কাছে মহানগরের যে প্রাণ ভোমরা ছিল 'কল্লোল' পত্রিকা তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেই আড্ডা, বন্ধুত্ব, আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যাওয়ায় বুদ্ধদেব বসু নিজেকে প্রকাশের জন্য একটি পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু কেন? তখন তো 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হলো 'পূর্ব্বাশা'। প্রথম প্রকাশ কুমিল্লায় হলেও কয়েক মাস পরেই 'পূর্ব্বশা'র দপ্তর উঠে এলো কলকাতায়। আর এই কলকাতায় উঠে আসার অন্যতম উৎসাহক বুদ্ধদেব বসু।

দুটি পত্রিকাতে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার প্রকাশিত হতো। কিন্তু উক্ত পত্রিকা দুটি যথাক্রমে সুধীন্দ্রনাথ এবং যুগ্মভাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্তের নিজস্ব। তাঁদের পত্রিকার আদর্শ, দর্শন তাঁদের ওপর নির্ভর করে। বুদ্ধদেব বসুর যেটা নিজের জায়গা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের কৃতি ছাত্র এবং কবিতায় নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করেছিলেন যে পত্রিকাগুলিতে কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটকের যেরকম গুরুত্ব ও কদর কবিতার ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। নিতান্ত কোনো পাদপূরণের জন্য কবিতা ছাপা হয়। এর মধ্যে থাকে কবিতার জন্য তুচ্ছতার ইঙ্গিত। 'কল্লোল' ও 'প্রগতি'তে কবিতাকে সম্মানের সঙ্গে প্রকাশ করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল কিন্তু পত্রিকা দুটি অকালে ঝরে যাওয়ায় 'কবিতা' আবার আগের স্থানে ফিরে যায়। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় লিখছেন—

> আবাল্য দেখেছি বাংলা মাসিকপত্রে কবিতার সাধারণ স্থান পাদপ্রান্তিক। অর্থাৎ যেখানে কোনো গদ্য রচনা শেষ হলো তারই ঠিক তলায় থাকে কবিতা-কোথাও-কোথাও বর্জইস অক্ষরে কুণ্ঠিত হয়ে।[১]

নিজের জীবনচর্যায় কবিতাকে বুদ্ধদেব স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। তাই কবিতার এই অপমান তাঁকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিত। এইসব ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ তাঁকে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে উৎসাহিত করে তুলেছিল নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে। এই স্বপ্ন তিনি মনের মধ্যে লালন করেছিলেন। কিন্তু কোন সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে পারেননি। এই স্বপ্নের গোমুখ কোথায়? এই গোমুখের একটা কারণ পত্রিকায় কবিতার অমর্যাদা যা আগে উল্লেখ করেছি আর দ্বিতীয় যে কারণ সেটি বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা থেকে জানা যাক—

> *পরিচয়ের* কোনো-এক বৈঠকে দেখেছিলাম অন্নদাশঙ্করের হাতে একটি ইংরেজি পত্রিকা-চেহারা কিছুটা শেষ-উনিশ-শতকী, ইট-রঙের মলাট থেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন শেলি, লম্বা রোগা অক্ষরে আঁকা 'পোইট্রি' তার শিরোনামা। আমি জানি না সেটাই হ্যারিয়েট মনরো-স্থাপিত শিকাগোর 'পোইট্রি' কিনা - তখনও সেই বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম শুনিনি। কিন্তু সেটাতেও ছিলো শুধু কবিতা আর হয়তো কিঞ্চিৎ কবিতা-সংক্রান্ত গদ্য। নমুনাটি উল্টে-পাল্টে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা উস্কানি জাগলো: এ-রকম একটি কবিতাসর্বস্ব পত্রিকা বাংলায় কি বের করা যায় না? তখন এ নিয়ে কথা বললাম না কারো সঙ্গে, হয়তো অসম্ভব ভেবে মনের তলায় চেপে দিয়েছিলাম-কিন্তু সেই অঙ্কুর থেকেই ফল ফললো প্রায় চার বছর পরে-আমার সে-সময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন আমার সঙ্গী, প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন।[২]

এই পত্রিকা দেখে যে স্বপ্নের অঙ্কুর তৈরি হয়েছিল তাকে মহীরুহে পরিণত করার জন্য বুদ্ধদেব বসু কাজে নেমে পড়লেন। প্রথম সংখ্যার জন্য বিষ্ণু দে ও আরও দু-তিন জন কবি পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিলেন। অনিল ভট্টাচার্য এঁকে দিলেন প্রচ্ছদ যিনি 'প্রগতি' পত্রিকারও প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন এবং বুদ্ধদেব বসুর আযৌবনের বন্ধু ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য। আর প্রথম দুই সংখ্যা সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সত্যপ্রসন্ন দত্ত সদ্য স্থাপিত পূর্ব্বাশা প্রেস থেকে বিনামূল্যে ছেপে দিলেন। মুহূর্তটিকে বুদ্ধদেব বসু ধরে রেখেছেন তার স্মৃতিতে—

> অনেক ধাত্রীর পরিচর্যায়, হলুদ মলাটে চল্লিশ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনহীন, জন্ম নিয়েছিলো আমাদের ত্রৈমাসিক *কবিতা* - এক আশ্বিনের দিনে ভবানীপুরের গলির মধ্যে সেই একতলায়...[৩]

বুদ্ধদেব বসু চেয়েছিলেন 'কবিতা' পত্রিকা এমন একটি পত্রিকা হবে যার মধ্য দিয়ে কবিতা হতে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত, প্রচারিত এবং কবিতা প্রেমিকদের রসদের কেন্দ্রবিন্দু। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি এই ভাবনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শুধু কবিতা নিয়ে এমন পত্রিকা আগে কেউ দেখেনি। বুদ্ধদেব বসু এমন দুই একটি পত্রিকার কথা শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেননি। স্টলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার সংখ্যাগুলো মুহূর্তে শেষ হতে থাকলো। রবীন্দ্রনাথকে ভয়ে ভয়ে প্রথম সংখ্যার এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর মতামত জানবার জন্য। 'নিরতিশয় ক্লান্ত শরীরে', 'অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষরে' লেখা তাঁর উত্তর এল, পত্রিকা সম্পর্কে যেমন মন্তব্য করলেন তেমনি প্রত্যেক কবিদের লেখাকে পৃথক পৃথকভাবে সমালোচনাও

করলেন অর্থাৎ পত্রিকাটিকে কেবল দেখেই রেখে দেননি। সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ করেই মতামত লিখে পাঠিয়েছিলেন। শুধু মতামত জানিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, পাঠিয়েছিলেন তাঁর সেই সময়কার একটি রচনা গদ্য কবিতা 'ছুটি'। এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য 'কবিতা' পত্রিকার সাহিত্য বিষয়ের উপর লেখা 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যে উৎস' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেটি সাহিত্য বিষয়ে তাঁর শেষ প্রবন্ধ।

'কবিতা' পত্রিকা নতুন কবিদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। কবিতাকে জনগণের দৃষ্টিগোচর করার অভিপ্রায় ছিল বুদ্ধদেবের। তাঁর এই অভিপ্রায়ের অংশই ছিল 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে ভালো কবিকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

> *প্রগতি*র সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের। সাহিত্যে আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পারি না; তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ করে থাকি যাকে চলিত বাংলায় বলে 'বনের মোষ তাড়ানো'। আমার এই বৃত্তিটি নির্বাধ ছাড়া পেলো *কবিতা* বেরোবার পর, কেননা, তখনই একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা, দেখা দিচ্ছেন বা প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণতি - বাংলাভাষায় কবিতা লেখা কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশাপূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি 'আন্দোলন', যার মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে *কবিতা* পত্রিকা। আমি জানি না সেটা আন্দোলন না সমাপতন, কবিতা নিয়ে কোনো আন্দোলন সম্ভব কিনা সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই; - তবে অন্তত *কবিতা* এজন্যে বিশেষ কোনো গৌরব দাবি করতে পারে না; আসল কথা লগ্ন ছিলো অনুকূল ও পত্রিকাটি ভাগ্যবান; আর আমার কৃতিত্ব হয়তো এটুকু যে উৎসাহের ঝোঁকে দু-একবার ভুল করে থাকলেও মোটের উপর আমি ঠিক-ঠিক ঘোড়াগুলিকেই ধরেছিলাম।[৪]

এই উপরি উল্লিখিত বিনয়ী উদ্ধৃতিটির সত্যতা ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের বহু কবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এই 'কবিতা' পত্রিকাটির মাধ্যমে। কবিতা বা অন্যান্য পত্রিকায় যে সমস্ত কবিরা অল্প প্রকাশের পর হারিয়ে গেছে তাঁদের সত্যিকারের কবিতাগুলি নিয়ে একটা সংকলন করার কথা ভেবেছিলেন। এবং অনেক লেখায় তাঁদের কথা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর গুণগ্রাহীতা বাংলা সাহিত্যের লেখকদের জন্য মঙ্গলজনক ঘটনা। কবিতার মর্যাদা রক্ষার জন্য শুধু *কবিতা* পত্রিকা প্রকাশ করেননি, যেহেতু কবিতার বই প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক ছিল না, তাই তিনি শুরু করলেন 'কবিতাভবন' প্রকাশনী। আর্থিক লাভের জন্য নয়, কবিতাকে সুন্দর, আভিজাত্য সহকারে পাঠকের সামনে কাছে উপস্থিত করার জন্য এই প্রয়াস। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন - আরো অনেকেরই তিনি প্রথম প্রকাশক। যাঁকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার জগতে অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে ধরা হয় সেই জীবনানন্দ দাশ সত্যিকার অর্থে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর হাতে। এর আগে 'প্রগতি'তে যে কাজ শুধু করেছিলেন বুদ্ধদেব সেই কাজ 'কবিতা'র পাতাতেই সমাপ্তি করেছিলেন। 'প্রগতি' আর 'কবিতা' পত্রিকা জীবনানন্দের সাহিত্যিক বিকাশে সবচেয়ে বড় সোপান হয়ে উঠেছিল। 'কবিতা'তে জীবনানন্দ দাশের অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, শুধু দ্বিতীয় বছরে (১৩৪৩-৪১) কবিতায় জীবনানন্দ দাশের ১৩টি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই বছরের চৈত্র সংখ্যায়

বুদ্ধদেব বসু আর একটি আশ্চর্য প্রবন্ধ লেখেন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র উপর। প্রবন্ধটির নাম 'প্রকৃতির কবি'। সেখানেই বুদ্ধদেব বসু আবারও ঘোষণা করেন—

> আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ।... জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে বিবেচনা করি এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ।[৫]

শুধু জীবনানন্দ নয়, সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ প্রমূখ এই 'কবিতা' পত্রিকাতেই নিজেদের আসন পাকা করেছিল। সমর সেনকে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এক অর্থে 'কবিতা'রই কবি বলা চলে। তাঁদের প্রচার ও খ্যাতি 'কবিতা'র মাধ্যমেই হয়েছে। 'কবিতাভবন' থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের বই, বিজ্ঞাপিত আলোচিত হয়েছেন 'কবিতা'র পাতায় পাতায়। সমর সেনকে কবি হিসেবে তুলে আনা বুদ্ধদেবের অসাধারণ কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন—

> সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'র উপর বুদ্ধদেববাবুর বিখ্যাত সমালোচনা "নবযৌবনের কবিতা"। এখানে যদি এই মন্তব্য করি যে বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না-করতেন এবং সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না-লিখতেন তাহ'লে তখনকার দিনের সমর সেন হয়তো অমন উৎসাহে অত কবিতা লিখতেন না এবং তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না - তাহ'লে বন্ধুবর সমর সেন হয়তো আমার উপর বিরূপ হবেন না।[৬]

আর 'পদাতিক' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও 'কবিতা'র পাতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতাভবন' থেকে নিজের উদ্যোগেই বই 'পদাতিক' প্রকাশিত হল। এক কপি বই পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে, সঙ্গে সুভাষের কবিতার প্রতি নিজের অনুরাগ জানিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'কবিতা'র ষষ্ঠ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪৭) 'পদাতিক' তথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

'কবিতা' পত্রিকায় কেবলমাত্র কবিতা ছাপা হত না, প্রকাশিত হত অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বিষয় প্রবন্ধ ও আলোচনা। যা মাঝে মাঝে বিতর্কের জন্ম দিত। স্থবিরতা নয়, গতিশীলতাই সৃষ্টির মূল রহস্য, এই কাজটাই করে গেছে বুদ্ধদেব বসু। তিরিশের কবিদের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ ছিল কবিতার দুর্বোধ্যতা; পাঠকের বোঝার বাইরে তাঁদের ভাষা, বিষয়, শৈলী, এই অভিযোগ যখন চতুর্দিকে দানা বাঁধছে তখন 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাতেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' শিরোনামে একটি অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় রচনা করে লিখেছিলেন:

> ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না, 'বোঝানো' যাবে না। যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায় তার উচ্চতম রূপ আঠারো শতকের ইংরেজি কবিতা তাতে আর সবই আছে, কবিতা নেই।[৭]

এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন কবি হতে গেলে যেমন একটি বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্ম নিতে হয় তেমনি বিশুদ্ধ কবিতা উপভোগ করতে হলেও পাঠকের জন্মগত ক্ষমতার প্রয়োজন। কবিতাকে গণিত বা দার্শনিক প্রবন্ধের মতো যুক্তি দিয়ে বুঝতে গেলে হবে না। এই ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় ও সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করলেন কবিতার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'কবিতার পাঠক' শিরোনামিত সম্পাদকীয়তে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন -

> পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ-পর্য্যন্ত অন্তত, কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা আছে, কবি হ'য়ে জন্মাতে হয়; কবিতার পাঠক হ'য়েও জন্মাতেই হয় হয়তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি : যার থাকে না, তার থাকে না।[৮]

বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে অপবাদ তাকে ঘোচাতে হলে পাঠকের সামনে নিত্য নতুন উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে, ক্রমাগত আলাপ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখক ও পাঠকে মধ্যে থাকা দূরত্ব দূর করতে হবে। 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি সেই কাজ অক্লান্তভাবে করে গেছেন। উপরি উল্লেখিত সম্পাদকীয় উপসংহারে তিনি বলেন—

> কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরি হ'তে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প কিছু বাড়ানো যেতে পারে, এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।[৯]

শুধু বুদ্ধদেব বসু নয়, বিভিন্ন কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচকরা 'কবিতা'র পাতায় প্রবন্ধ, সমালোচনা লিখতেন, আলোচনা করতেন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গদ্যকাব্য', জীবনানন্দ দাশ 'নতুন কবিতা (কঙ্কাবতী)', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'নতুন বই' (আধুনিক বাংলা গল্প) নামে প্রবন্ধ লেখেন। তাই 'পরিচয়' পত্রিকায় হিরণকুমার সন্যাল বুদ্ধদেবদেবের সাম্প্রতিক কাব্যচর্চাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেও 'কবিতা'য় প্রকাশিত গদ্যালোচনার প্রশংসা করেছিলেন -

> ... কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় শুধু কবিতা ছাপা হয় না। কবিতার সমালোচনাও এই পত্রিকার বিশিষ্ট অঙ্গ ও এই অঙ্গের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধদেববাবু পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন।... মতামতের সংকীর্ণতা সত্বেও কবিতার বিচারে বুদ্ধদেববাবুর নিরপেক্ষতা ও নতুন কবিতার সমাদরে তাঁর অসীম আগ্রহ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় বললে খুব মিথ্যা বলা হবে না।[১০]

'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর সবচেয়ে স্মরণীয় কাজটি হল, গদ্য কবিতার বিবর্তন ও রূপান্তর। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার একটা বড় অংশ 'কবিতা'কে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছিল। দু-পক্ষের তুমুল ছড়ার তাপ-উত্তাপ নিয়ে 'কবিতা' এক সময় মুখর হয়েছিল গদ্য-কবিতা বিতর্কে। গদ্য যে কবিতার বাহন হতে পারে এই ভাবনা তখন অনেক সাহিত্যিক মানতে চাননি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সেই ভাবনাকে ধারণ করতেন ও পালন করতেন। আর এই আন্দোলনে তিনি পাশে পেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটিই ছিল গদ্যকবিতার বাহন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংখ্যাটি পড়ে মন্তব্য করেন :

> অল্পদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দি পাখির ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। ... তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ।[১১]

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন, লিখছেন এবং *কবিতার* পরের সংখ্যায় 'ছুটি' নামে গদ্য-কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন ও গদ্য-কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'কবিতা'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় *গদ্য-কাব্য* নামে প্রবন্ধে লেখেন।

বুদ্ধদেব বসু যেমন রবীন্দ্রনাথকে গদ্যকবিতা নিয়ে আলোচনা করতে বলছেন তেমনি নিজে গদ্যকবিতা নিয়ে আলোচনা করছেন, আর সঙ্গে নতুন কবিদের সেই বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। সমর সেন তার প্রমাণ। বুদ্ধদেব বসুর উৎসাহে ও পরামর্শে সমর সেন গদ্যকবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধদেব স্মৃতিকথায় লিখছেন—

> সমর বোধহয় আরো দু-একবার রমেশ মিত্র রোডে এসেছিলো, কিন্তু তার বিষয়ে আমার পরবর্তী স্মৃতি অন্য বাড়িতে বছর দুয়েকের ব্যবধানে। সেদিন তার মৌলিক কয়েকটি বাংলা রচনা সে দেখিয়েছিলো আমাকে; আমি, তার ছন্দের হাত টলোমলো দেখে, তাকে গদ্যকবিতা লেখার পরামর্শ দিলাম - *পুনশ্চ*র পরে বাংলা ভাষায় গদ্যকবিতা জাতে উঠেছে ততদিনে।[১২]

তবুও অনেকেই এই গদ্য-কবিতার পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা বিরোধিতা করতে থাকেন। 'কবিতা'তে লীলাময় রায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' শিরোনামে প্রবন্ধে লেখেন—

> আমার স্থির ধারণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব। যাঁরা গদ্যকবিতা সুরু করেছেন তাঁদের পদ্য কবিতায় ফিরে আসতেই হবে, কেনা পদ্যকবিতাই কবিতা।[১৩]

এছাড়াও অন্নদাশঙ্কর রায় ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বিরোধিতা করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাকে 'গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জন' বলতেন। কিন্তু সব বিরোধিতা সত্ত্বেও গদ্যকবিতা ধীরে ধীরে আসন লাভ করতে থাকে। আর এই গদ্যকবিতা প্রতিষ্ঠার পিছনে বুদ্ধদেব বসুর বাহন যে 'কবিতা' পত্রিকা ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'কবিতা' পত্রিকার ধারক ও বাহক বুদ্ধদেব বসু, আর বুদ্ধদেব বসুর প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। তাই পত্রিকার প্রায় শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই যে শ্রেষ্ঠতম, এই দৃষ্টিভঙ্গি 'কবিতা'য় প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এবং তার পরেও - রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধার ভাব 'কবিতা' পত্রিকা থেকে কখনো বিদায় নেয়নি। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে লেখেন— "তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকো। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে, তাদের পার করে দেবে সর্বজনের পরিচয়ের তীরে"।[১৪] এই যে কবির 'খেয়ার নৌকো'র অভিধা এটি নিশ্চয় বুদ্ধদেব স্মরণে রেখেছিলেন। কেননা পরবর্তীকালে 'কবিতাভবন'-এর স্মারকচিহ্নটি তৈরি করেছিলেন উত্তাল অথৈ সমুদ্রর ভাসমান নৌকো। এই ভাসমান নৌকোর প্রতীক ছাড়া অবিরল বিরোধের বিরুদ্ধে 'কবিতা' পত্রিকার সংগ্রাম ও যাত্রাকে কিভাবে বোঝানো যেত! এমনই ছিল অগ্রজের নির্দেশের প্রতি অনুজের শ্রদ্ধা।

'কবিতা' পত্রিকার একটা মূল্যবান সম্পদ হল বুদ্ধদেব বসু লিখিত 'স্মরণলেখ'গুলি, যা তিনি বিভিন্ন কৃতী মানুষদের প্রায়াণে তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হিমাংশুকুমার দত্ত প্রমুখদের নিয়ে। এই লেখাগুলি কেবল নিয়মরক্ষার জন্য করেননি। তাঁদের কৃতিত্বের প্রতি ব্যক্তি বুদ্ধদেব ও সম্পাদক বুদ্ধদেবের মূল্যবান মূল্যায়ন। যা পরবর্তীকালে পাঠক, গবেষকদের প্রভূত সাহায্যে লেগেছে। এবং স্মরণীয় ব্যক্তিদেরকে অনুধাবন করতে পাঠকের সুবিধা হয়েছে।

'কবিতা' পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিশেষ সংখ্যাগুলো। কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ) বিশেষ সংখ্যাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষ সংখ্যার তালিকায় - তিনটি মার্কিন সংখ্যা (দ্বিভাষিক), বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংখ্যা, এবং আন্তর্জাতিক বিশেষ সংখ্যাটি 'কবিতা'র সম্পাদকের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ব্যক্তিদের বিশেষ সংখ্যার মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে হয়েছিল তা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। দশম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১) নজরুল সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম সম্পর্কে লিখছেন—

> বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামে। ...নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি - তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ-সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাত-তালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।[১৫]

'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধবেব বসু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, সেটি হল অনুবাদ-কবিতার চর্চা। এ কাজে বিষ্ণু দে ও তিনিই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষত, তাঁর অনূদিত রিলকে, হ্যোল্ডারলিন ও বোদলেয়ারের কবিতা সমকালীন বাঙালি কবি ও পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তিনি যেমন পাশ্চাত্য কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তেমনি প্রাচ্য কবি কালিদাসের কাব্য অনুবাদ করে স্বদেশী পাঠকদের কাছে প্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্যতা তুলে ধরেছিলেন।

'কবিতা'র সর্বশেষ বছরের তৃতীয় সংখ্যাটি 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা।' পঞ্চবিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটিই 'কবিতা'র সর্বশেষ সংখ্যা, যদিও মাত্র আর একটি মাত্র সংখ্যার প্রকাশেই বছর পূর্ণ হতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও আর একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারেননি সম্পাদক বুদ্ধদেব।

কবিতা পত্রিকার পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পথ চলাকে গবেষক প্রভাতকুমার দাস এইভাবে দেখেছেন :

> তিনজন প্রধান আধুনিক বাঙালি কবির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকার বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষের 'রবীন্দ্রসংখ্যা' পর্যন্ত 'কবিতা'র প্রথম পর্ব। সপ্তমবর্ষ থেকে উনবিংশ বর্ষ 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা' পর্যন্ত 'কবিতা'র দ্বিতীয় পর্ব। আর বিংশ বর্ষ থেকে পঞ্চবিংশ বর্ষ 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা' পর্যন্ত 'কবিতা'র পত্রিকার অন্তিম বা শেষ পর্ব।[১৬]

'কবিতা' পত্রিকা কেন বন্ধ হয়ে গেল? এই প্রশ্নের অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল, আর্থিক কারণ। জন্ম থেকেই আর্থিক অনটন ছিল 'কবিতা'র নিত্যসঙ্গী। পত্রিকা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বর্ষে এসে আর্থিক সংকটের কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওরার কথা ভেবেছেন। এবং কি পরিমাণ মানসিক শক্তি থাকলে সেখান থেকে এত দীর্ঘ বছর ধরে 'কবিতা'কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা আমাদের ভাবতে অবাক লাগে। আর্থিক অবস্থা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও স্তব্ধ করে দিতে পারেনি, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে যখন তিনি আগ্রহ পেলেন না তখন তিনি পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন বুদ্ধদেব:

> অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম 'কবিতা' বন্ধ করে দেব। কিন্তু বহু দিনের অভ্যাসের বন্ধন কাটাতে পারছিলাম না। তারপর কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবার বিদেশ যেতে হল এবং সেই সময়েই 'কবিতা' এত অনিয়মিত হয়ে পড়ল যে, আমি ফিরে আসার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। পারলাম না বললে ঠিক হয় না, ইচ্ছে করলে পারতাম।

> আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে সরে গিয়েছিল। তার কারণ কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে, বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোই চলনসই রকমের ভালো কবিতা ও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে আসল কারণ বোধহয় এই যে, আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশী সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এলে তা না করাই উচিত।[১৭]

সদ্য পাঠ সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র মাত্র তেইশ বছর বয়সে কোলকাতায় এসেছিলেন, আর কবিতা যখন প্রকাশিত হয় তখন বুদ্ধদেব সাতাশ বছরের যুবক। উত্তাল সমুদ্র পার করে বাহান্ন বছর বয়সে কবিদের 'খেয়ার নৌকো'-র হাল ছাড়লেন তিনি, কিন্তু ততদিনে কবিতাকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন বিশ্বের দরবারে। জীবনের মধ্যে গগনে পৌঁছে তিনি যে আর প্রথম যৌবনের মতো উৎসাহ পাবেন না এটাই স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া তিনি লক্ষ করেছিলেন 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তরুণ কবিসংঘ গড়ে উঠছে। সেই সঙ্গে তিনি নিজের লেখার প্রতি এই বয়সে পৌঁছে আরও মনযোগী হতে চাইলেন। এসবেরই ফলশ্রুতিতে 'কবিতা' বন্ধ হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের ছিল না - ছিল প্রহর জাগা শান্ত্রীর - সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই ছিল পর্যবেক্ষণ। এই ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় কবিতার পঁচিশ বছরের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনায়। 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর হাতেই ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারথ্য। তাই প্রতিপক্ষও তাঁর বিরুদ্ধে অনবরত শরবর্ষণ করেছে। সমকালীন লেখকদের মুক্ত কণ্ঠে স্বাগত জানানো, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আত্মবিস্তৃতির পথ তৈরি করে যাওয়া - সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর কে করেছে?

তথ্যসূত্র:

১। বসু বুদ্ধদেব, *আমাদের কবিতাভবন, আত্মজৈবনিক,* বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ - ১৪৭

২। তদেব, পৃ - ১৪৮

৩। তদেব, পৃ - ১৪৯

৪। তদেব, পৃ - ১৫৩

৫। বসু বুদ্ধদেব, *প্রকৃতির কবি, কবিতা* পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৪৩), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ৮২

৬। দত্ত জ্যোতির্ময় সম্পাদিত, *কলকাতা* পত্রিকা, *বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা,* সম্পাদনা অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ, সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ কলকাতা ২৯, প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৬৮ জানুয়ারি ১৯৬৯, *কলকাতা* পত্রিকা সংকলন, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম প্রকাশ - ১৭ ডিসেম্বর ২০০২, পৃ - ৪৮

৭। বসু বুদ্ধদেব, *কবিতায় দুর্বোধ্যতা, কবিতা* পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৪২), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ২৫

৮। বসু বুদ্ধদেব, *কবিতার পাঠক, কবিতা* পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৪৩), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ৫৪-৫৫

৯। বসু বুদ্ধদেব, *কবিতার পাঠক, কবিতা* পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৪৩), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ৫৬

১০। সান্যাল হিরণকুমার, *পত্রিকা-প্রসঙ্গ* শীর্ষক নিবন্ধ, *পরিচয়* (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত), শ্রাবণ, ১৩৫২

১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *চিঠিপত্র (বুদ্ধদেব বসুকে), কবিতা* পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (পৌষ, ১৩৪২), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ৩৩

১২। বসু বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ- ১১৫

১৩। রায় লীলাময়, *আধুনিক বাংলা কবিতা*, তৃতীয় বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৪৫), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ২০০৮, পৃ - ২০৫

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *চিঠিপত্র (ষোড়শ খণ্ড)*, সম্পাদনা : সুতপা ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ - ৭ পৌষ ১৪০২, পৃ - ১২৮

১৫। বসু বুদ্ধদেব, নজরুল ইসলাম, *কবিতা* পত্রিকা, দশম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১), *বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা সংকলন ২*, সংকলক : মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা ০২, প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ - ২৭৬

১৬। দাস প্রভাত কুমার, তরুণ কবিদের অভিভাবক, বৈদগ্ধ্য পত্রিকা, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, শেখর বসুরায় (সম্পাদিত), ৫ হেস্টিংস পার্ক রোড, কলকাতা ২৭, প্রকাশ - মে, ১৯৯৯, পৃ - ২৫৫

১৭। কবি মনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে : বুদ্ধদেব বসু (সাক্ষাৎকার) অন্যমনে, শরৎকালীন সংখ্যা ১৩৭৬, প্রভাত কুমার দাস, *কবিতা পত্রিকা : সূচীগত ইতিহাস* গ্রন্থে সংকলিত, পৃ – ৭৬।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর : লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও সংগঠক

সফিয়ার রহমান
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
কেন্দ্রডাঙাল, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: উত্তর ২৪ পরগনার স্বনামধন্য লেখক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু করলেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন সফল কথাসাহিত্যিক হিসাবে। শৈশবে স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা 'নাংলার বিল' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। 'তরঙ্গ' পত্রিকা আয়োজিত কবি সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে উপস্থিত অতিথিদের মুগ্ধ করে দেন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে'। পর পর আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর গল্প ও প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মধুমতী অনেক দূর'। এই গল্পগ্রন্থ তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। 'অন্য ইহুদী' ও 'স্বপ্নের দ্বিতীয় মেরু' গ্রন্থ দুটিও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তবে কপিলের অন্যতম প্রধান ও অনন্যসাধারণ সৃষ্টি 'উজানতলীর উপকথা'। এই উপন্যাসের জন্য ২০০২ সালে তিনি ত্রিপুরা সরকারের 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার' পান। সফল সাহিত্য-সংগঠক হিসেবেও দক্ষতা দেখিয়েছেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর।
সূচক শব্দ: লিটল ম্যাগাজিন, কাব্য, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, সম্পাদক, সাফল্য, আন্দোলন, সংগঠক।

মূল আলোচনা:
শৈশবে শিক্ষক নারায়ণ পালের অণুপ্রেরণায় তিনি স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন 'নাংলার বিল' নামক একটি কবিতা। এই কবিতায় নাংলার বিল সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি দেখে তারিফ করেছিলেন স্বয়ং বাংলার শিক্ষক নারায়ণ পাল। তারপর চলতে থাকে জীবনের চড়াই-উতরাই। দেশ ভাগের যন্ত্রণা সারা দেশে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে চরম অস্থিরতা। সেই অস্থিরতা থেকে তিনিও রেহাই পান নি। তবে অস্থির সময়েও লেখালেখি সম্পর্কে তিনি সজাগ থেকেছেন। অস্থির সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন কলম দিয়ে। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনকে। সেই লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরেই তাঁর উত্থান।

লিটল ম্যাগাজিন ও কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর: বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে। প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহ বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিকের নাম বলা যেতে পারে। সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। শুধু সাহিত্য নয়, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় উঠে আসে লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়। সাহিত্যের নিত্যনতুন প্রকরণের জন্ম দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন পাঠকের কাছে অন্যরকম পাঠ্যস্বাদ তুলে দেয়। লিটল ম্যাগাজিনের বিষয়-বৈচিত্র্যও লক্ষনীয়ভাবে বেড়েছে। কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্য থাকলেই তো হবে না। তার জন্য দরকার উপযুক্ত লেখক। নবীন লেখকের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে লিটল ম্যাগাজিনে লিখে যাওয়া অভিজ্ঞ লেখকও প্রয়োজন, যাঁরা তাঁদের

লেখনীর মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সেরকমই একজন সাহিত্যিক, যিনি নিরন্তর সাহিত্যসাধনা করে গিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনে। তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়। এমনকি মধ্যগগনেও তিনি ক্রমাগত লিখে গিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনে। অবসর জীবনের পরেও তিনি লিখে চলেছেন। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেই লেখেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। হাতে গোনা কিছু লেখা প্রথম সারির বাণিজ্যিক পত্রিকাতে লিখলেও লিটল ম্যাগাজিনে লিখতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর আর লিটল ম্যাগাজিন যেন একে অপরের পরিপূরক।

শৈশব-কৈশোরে সাহিত্য: ঠিক কবে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের জন্ম তা জানা যায় না। তিনি নিজেও বলতে পারেন না। স্কুলের নথিতে রয়েছে ১৫ এপ্রিল ১৯৫৬ সাল। পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সাতপাড় গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেশায় শিক্ষক। শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ নামকরা ফুটবলারও ছিলেন। মা প্রমীলা দেবী পড়াশুনা খুব বেশি না জানলেও কবিতা লিখতেন ও সংস্কৃতি চচা করতেন। কপিলের জন্মের মাত্র পাঁচ মাস পরেই দেশ ত্যাগ করতে হয় তাঁর বাবা-মাকে। তাঁরা আশ্রয় নেন বর্ধমান জেলার কাঁকসা ট্রানজিট ক্যাম্পে। তারপর বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় পুনর্বাসনের জন্য। ইতিমধ্যে কলিপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। তাঁরা আবার সপরিবারে ফিরে যান ওপারে। কিছুদিন পর আবার ফিরে আসতে হল এদেশে। কপিলের পরিবার আশ্রয় নেয় মছলন্দপুরের ঘোষপুর গ্রামের মামাবাড়িতে। আর তাঁর পিতা জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন। শেষ পযন্ত কুমড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পান অতি অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। শুধু দেশের অস্থির সময় নয়। তাঁদের জীবনেও নেমে এল চরম অস্থিরতা। ১৯৬০ সালে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ঘোষপুর রিফিউজি প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানেও থিতু হতে পারেন নি। বাবা বীরেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে হাবড়ার কুমড়া গ্রামে। ভর্তি করলেন নিজেরই স্কুলে।

প্রাইমারি পাঠ শেষ করে তাঁকে ভর্তি করা হল দক্ষিণ নাংলা কে ইউ ইন্সটিটিউশনে। নাংলা বিলের পাশেই অবস্থিত তাঁর স্কুল। জানলা দিয়ে হাঁ করে তিনি বিলের সৌন্দর্য দেখতেন। তখন কপিল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সেই সময় তাঁদের বাংলা পড়াতেন নারায়ণ পাল। নারায়ণবাবু স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য ছাত্রদের লিখতে বললেন। কপিল লিখে ফেলেন 'নাংলার বিল' কবিতা। রবীন্দ্রনাথের মোতি বিলের আদলে লেখা 'নাংলার বিল' পড়ে শিক্ষক নারায়ণ পাল খুব প্রশংসা করেন। ম্যাগাজিনে ছাপাও হল সে কবিতা। সেটাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। শিক্ষক নারায়ণ পাল নিজেই একজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। তাঁর লেখা কিছু মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ক্লাসের ছেলেরা জানত সেকথা। সেই শিক্ষক প্রশংসা করলে কার না আনন্দ হয়? নারায়ণবাবু নবম শ্রেণিতে একবার ছাত্রদের লিখতে বললেন 'একটি গ্রাম্য মেলা' প্রবন্ধ। তিনি জানান কোনো অনুকরণ না করে নিজের মত করে লিখতে হবে। সেবারও কপিলের প্রবন্ধ উচ্চ প্রশংসিত হয়। নারায়ণ পালের প্রশংসা কপিলের কাছে যে সাংঘাতিক অনুপ্রেরণা ছিল তা কপিল নিজে স্বীকার করেছেন 'ক্র্যাকার' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে।[১]

শৈশব-কৈশোরের লেখালেখি সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছেন যে তিনি দক্ষিণ নাংলা হাইস্কুলে যখন সাতক্লাসে পড়েন, তখন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য লিখে ফেলেন প্রথম কবিতা। বাংলার শিক্ষক সাহিত্যসাধক নারায়ণ পাল মশাইয়ের সংস্পর্শে এসে সাহিত্যের একটা জমি তৈরি হচ্ছিল। পরে সাতপাড়া স্কুলে গিয়ে একটা সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শিক্ষাব্রতী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তিনি কপিলের খাতার পাশে 'কবির করকিশলয়েষু'

লিখে প্রথম পুরস্কার তুলে দেন। "বলতে পারেন সেটাই আমার প্রথম প্রেরণা, প্রথম পুরস্কার।"[২] যে নারায়ণ পালকে নিয়ে লেখকের এত আবেগ সেই নারায়ণ পাল কপিলকৃষ্ণ সম্পর্কে কী বললেন একটু সেদিকে ফিরে তাকাতে হয়। "...সেদিন কপিলের কাছে শিখলাম হালুই গীতের কথা। পরবর্তীকালে হালুই গীত সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। লোকসংস্কৃতির উপর এই লেখার উপকরণ কপিলই আমাকে দিয়েছিল। আমার ছোটবেলায় হালুই গীতের কথা মার মুখে শুনতাম, সেকথা মনে পড়ে গেল। আজ এর চাক্ষুস পরিচয় পেলাম। কপিলের বাড়ি না এলে আমার এ বিষয়ে কোনও ধারণা গড়ে উঠত না। পরে লোকসংস্কৃতির উপর কিছু লেখা তৈরি করেছি কিন্তু হালুই গীতের কথা কপিলের বাড়িতে এসে বৌমার হাতের রান্না না খেলে আমার ঐ বিষয়ে কোনও ধারণা জন্মাত না। এ কৃতজ্ঞতা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমি কপিলের শিক্ষক, আর এ বিষয়ে কপিল আমার শিক্ষক"[৩] কৈশোরেই তিনি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'দিশারী' সাহিত্যগোষ্ঠী। ওই নামে তিনি একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। শুধু নিজের স্কুল নয়, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্কুলে গিয়ে তিনি লেখক ও পাঠক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। নাটকের প্রতিও ছিল তাঁর আগ্রহ। নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য টাকা চাই। সেই টাকা যোগাড় করতে তিনি বন্ধুদের নিয়ে একটা দল গঠন করে তহবিল গড়েছিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন ১৯৭২ সালে।[৪]

পরিণত বয়সে সাহিত্য: ১৯৭৫ সালে তরুন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর 'তরঙ্গ' সাহিত্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই মনোরঞ্জন নট্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'তরঙ্গ' সাহিত্য পত্রিকা। মনোরঞ্জন নট্ট সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করলেও পত্রিকার লেখা সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহের মত নানা গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন কপিল। সেই সময় দক্ষিণ নাংলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহিত্য সভার আয়োজন হত। এই সাহিত্যসভা চলত নারায়ণ পালের পৌরোহিত্যে। তরুণ কবি কপিলকৃষ্ণ নিয়মিত হাজির হতেন সেই সভায়। ১৯৭৬ সালে 'তরঙ্গ' একটি কবি সম্মেলনের আয়োজন করে। সেই সাহিত্য সম্মেলনে কপিল একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান উপস্থিত 'দেউটি' পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লব চন্দ ও কবি ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। বিপ্লব চন্দ কপিলকে ডেকে বলেন সে একদিন প্রতিভাবান কবি হবে। তবে লেখাটা ছাড়লে চলবে না।[৫]

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বিপ্লব চন্দের কথায় অনুপ্রাণিত হন। সুযোগ এসে যায় বিপ্লব চন্দের 'দেউটি'[৬] -তে লেখার। দেউটি ছাড়াও অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনে তিনি নিয়মিত লেখালেখি চালিয়ে যান। স্থানীয় ধারাপাত পত্রিকায় প্রায়ই তাঁর কবিতা প্রকাশ পেত। নিয়মিত লেখার ফল পেলেন তিনি হাতে-নাতে। ১৯৭৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ ডায়মন্ড হারবারে আয়োজন করে সারা বাংলা গল্প প্রতিযোগিতা। সেই গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পান কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। ১৯৭৮ সালে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নিখিল ভারত'। কপিলকৃষ্ণ ছিলেন এই পত্রিকার প্রকাশক ও সহ সম্পাদক। এই সময় মরিচঝাঁপিতে উদবাস্তুদের আগমন ঘটলে কপিল ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু অসহায় ও বঞ্চিত উদবাস্তুদের পাশে দাঁড়ান। নানা স্থানে সভা করে জনমত তৈরি করার চেষ্টা করেন। যদিও সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই কর্ম প্রচেষ্টা কপিলের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয়। কবি হলেও তিনি সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যান নি। লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কপিলকৃষ্ণ। কুমড়ায় মাস্টারদা সূর্য সেন ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন তিনি। ক্লাবে একটি পাঠাগার গড়ে ওঠে তাঁরই প্রচেষ্টায়। নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়স্ক ও শ্রমজীবী মানুষের

নিরক্ষরতা দূরিকরণে যেমন তাঁর ভূমিকা ছিল, তেমনি এলাকায় দুস্থ পরিবারের কন্যার বিয়েতে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতেন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা। তবে এসবের মধ্যে লেখালেখির জগৎ থেকে কখনও তিনি সরে আসেন নি। ১৯৮১ সালে বিপ্লব চন্দ নিজের খরচে দেউটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে'। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহ দিতে ইউনিভার্সিটির গেটে দাঁড়িয়ে অনেক বই বিক্রি করেছিল। সেই সময় হাবড়া ও অশোকনগরকে কেন্দ্র করে 'উত্তর চব্বিশ পরগনা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। সেই সংগঠনের তিনি সহ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটার পর একটা সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং দায়িত্ব সামলেছেন।

সাহিত্য সাধনা: কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর শুরুতে কবিতা কবিতা লিখতেন। কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছয়। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে'। কাব্যের বিষয় বাংলা ভাগ। বাংলা মাকে ভাগ করা মেনে নিতে পারেনি বাংলার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। শাসক বঙ্গভাগ করে বিজয়ের হাসি হাসলেও সাধারণ বাঙালির যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল তা মেনে নিতে পারেনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মানতে পারেন নি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরও। সেকথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়।

> "আর সেই জন্যই তোমার বিভক্ত সত্তার লাশ/ ঐ শকুনগুলোর মুখে ছুঁড়ে দিতে চাই আমরা/ তাদের নারকীয় বীভৎসতায় যদি ঐ প্রান্তর কেঁপে ওঠে অখন্ড সত্তায়,/ ঐ রুক্ষ জলাশয়, কোপন পরা নদী আর ক্ষুব্ধ অরণ্য/ নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতায় এতটুকু ব্যথা অনুভব করে হৃদপিন্ডে/ মনে রেখ, তবে সে সার্থক জাগরণ, দীর্ঘ --- দীর্ঘকাল ধরে/ স্পন্দিত করবে পৃথিবীকে।"[৭]

দেশভাগ কপিলের মনে গভীর ক্ষত এনে দিয়েছে। সেই ক্ষত এসে বার বার ভিড় করে তাঁর মনে। সভ্যতার নির্মমতা তাঁকে অস্থির করেছে। তাঁর নিজের মনের অবস্থা যেমন হাহাকারময় হয়ে ওঠে, তেমনি বঙ্গ প্রকৃতির মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কপিল লেখেন, "মনের অবস্থা এখন/ সব খোয়ানো অন্নদা পিসির মত/ নবান্নে কি স্বাদভক্ষণে তার কিছু যায় আসে না,/ জ্যোৎস্না জারি মেখে, কেউ আর/ তার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে না ---"[৮]

হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করতে বার বার মরিয়া হয়ে ওঠেন কবি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। আবার ১লা বৈশাখ কবিতায় লিখেছেন ----

> "বাবুইয়ের বাসার মত কোমল, নিবিড় ও/ শিল্পময় হোক সমস্ত সম্পর্ক / প্রগাঢ় মানবতার সামনে এসে খসে পড়ুক/ আততায়ীর উদ্যত ছুরি! ---"[৯]

কবিতার এই পংক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে একটা গভীর সম্পর্কের কথা। সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কথা। কপিলকৃষ্ণ মানবতার পুজারি। হতাশার মধ্যেও তিনি মানবতার প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে চান। শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি যে স্বপ্ন দেখেন, কপিলকৃষ্ণ সেই স্বপ্নই দেখেছেন।

বাংলা ছোটগল্পেও তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের ছোটগল্পে কোনও বানানো কথা নেই, নেই অনাবশ্যক আতিশয্য। সমস্ত প্লট ও চরিত্র বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা। 'মধুমতী অনেক দূর' গল্প সংকলনটি বাস্তব ভাবনারই প্রতিফলন। এই সংকলনে মোট এগারোটা গল্প রয়েছে। প্রথম গল্পের শিরোনামই সংকলিত গ্রন্থের নাম। গল্পগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় চরিত্রগুলো পাঠকের খুব পরিচিত, পাঠক কোথাও না কোথাও তাদের দেখেছে। মনে হয় মধুমতী অনেক দূরের সেজ ঠাকুমা, নমিতা আর মাধুরী মাসির সঙ্গে পাঠকের একাত্মতা ছিল

কোনো এক সময়। নমিতার মত একই প্রশ্ন প্রতিটি মধ্যবিত্ত মানুষের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়, "ক্যানো যে সব ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়?"[১০]

'ক্রান্তিকাল' ও 'উত্থান' গল্পে ফুটে উঠেছে ভারতীয় রাজনীতির চিরন্তন ছবি। রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সাধারণ অসহায় মানুষের করুণ অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পদুটোতেও চিত্রিত হয়েছে পরিচিত চরিত্র ও চিত্র। পরিচিত চিত্রপট ও ঘটনা ফুটে উঠলেও গল্পকারের মুনসিয়ানায় সেগুলি স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। 'জানোয়ার' গল্পে সমাজ-সংসার থেকে নির্বাসিত রুইদাসের একাকীত্ব, দু:সহ রোগযন্ত্রণা এবং হাট থেকে কুড়িয়ে আনা একটি কুকুরের আনুগত্য বর্ণিত হয়েছে দারুণ ভাবে। সমাজের গলগ্রহ হয়ে অনাহারে থাকতে থাকতে রোগজর্জরিত রুইদাস শেষ পর্যন্ত 'কিম্ভুতদর্শন জানোয়ারে' পরিণত হয়। বাংলা ভাগের কারণে নিম্নবর্গের মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। তাদের জীবন যে শুধু বিপন্ন হয়েছে তা নয়, তাদের দেশ বলতে আর কিছুই ছিল না। আজও তারা অনেকাংশে দেশহীন। এক বাংলায় সে ধর্মের পরিচয়ে দেশ হারায়, আর এক বাংলায় গিয়ে উদবাস্তু হয়ে ছিন্নমূলই থেকে যায়। কোনও দেশ নেই বলে অনায়াসে ধর্ষিতা হয় --- দেশহীনতার এই যন্ত্রণাবহ ছবি ধরা পড়ে লেখকের 'অন্য ইহুদী' গল্পে।

মাতৃভূমিকে মনুষ্যেতর কোনও প্রাণী অর্থাৎ পশুপাখিরা ভাগ করে না, ভাগ করে মানুষ। মানুষের ভাষায় লেখা হয় নির্মম ভাগাভাগির কথা। মানুষ দেশ ভাগ করলেও আকাশ বিচ্ছিন্ন হয় না। পাখির ওড়ায় বিধিনিষেধ নেই, কোনও সীমানা নেই। সীমানা নেই নদীর প্রবহমান ধারার। পাখি বা নদীর মত কপিলকৃষ্ণ সীমানাহীন বাংলায় একুশের ভোরের প্রভাতফেরীতে অমর গানের সাথে সুর মেলাতে চান। আর তাতে বাধা পেয়ে গুলিবিদ্ধ বাঘের মত চিৎকার করেন।[১১] কিন্তু তাতেও কপিল দমেন না। তিনি আবার ফিরে আসতে চান এক আকাশে একটাই চাঁদ দেখার আশায়।[১২] অখন্ড বাংলা তাঁর হৃদয় থেকে মোছা যায় না। তিনি শুধু নিজেই ফিরে আসতে চান না। তেরো পার্বনের সংসারে সেইসব গৃহবধুদের ফিরিয়ে আনতে চান, যারা লক্ষ্মীর পা আঁকা উঠোন দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আর সামলায় একান্নবর্তী পরিবার। যারা সবকিছু হারিয়ে আজ পথে পথে অনাদর আর উপেক্ষা নিয়ে না মরে বেঁচে আছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে চান। এমন স্বপ্ন তো কপিলকৃষ্ণের মত মানবিক লেখকরাই দেখেন।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের বহুল আলোচিত উপন্যাস 'উজানতলীর উপকথা' সম্বন্ধে কিছু না বললে এই প্রবন্ধের সার্থকতাই হারিয়ে যাবে। এই উপন্যাস শুধু সমাজ জীবনের দলিল নয়, সামাজিক যাপন প্রবাহের কক্ষ-কক্ষান্তরে যে সংকট তার চিত্র। সামাজিক জীবনের, জনপদ জীবনের যে প্রাণ, তারই এক ট্র্যাজেডি চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসের সঙ্গে এই ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য রয়েছে। এই ইতিহাস আবার দেশভাগজনিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের উপর ভর করে গড়ে উঠেছে। 'উজানতলীর উপকথা'-য় সামাজিক সংকটের প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে দেশ ভাগের ঘাত-প্রতিঘাত। দাঙ্গার উন্মত্ততা, প্রিয়জন বিচ্ছেদের শোক, মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষকে মাটিছাড়া করা, মানুষে মানুষে সন্দেহ ও অবিশ্বাস--- এসবই উঠে এসেছে উপন্যাসে। এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দেশবিভাগ বাঙালির সমগ্র জীবনে যতটা ছাপ ফেলেছে, সাহিত্যে ততটা নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এপার-ওপার মিলিয়ে ইতস্তত দু-চারটি উপন্যাস লেখা হয়ে থাকলেও প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার অভাবে বৃহত্তর লোকজীবন --- আরও পরিস্কার করে বলতে গেলে নিম্নবর্গের অন্দরমহলে সে পৌঁছুতে পারেনি। উজানতলীর উপকথায় তা-ই উপস্থিত হয়েছে সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে।"[১৩]

এই উপন্যাসে লেখক মূলত নিম্নবর্গের মানুষের জীবন যাপনের রূপকে তুলে ধরেছেন। এক সময় পরাধীন দেশের মানুষ নীলকরদের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে গিয়ে নতুন বাসভূমি, নতুন চাষভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত বিস্তৃত জলাভূমি খুঁজে পেল। কঠোর পরিশ্রম ও ঘাম-রক্তের বিনিময়ে জলাভূমিকে উর্বরা করে তুলল। গড়ে তুলল নতুন জনপদ। উজানতলী সেরকমই জনপদের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বসতি স্থাপনের পর আরও পরিশ্রম করে গড়ে তুলল বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট, স্কুল। বাংলার পালা-পার্বণ, সামাজিক রীতিনীতি, নানা ব্রত, উৎসব, রাজনীতি নতুন করে গড়ে উঠল। ছিন্নমূল মানুষের ভিত্তিভূমি আবার কিছুটা পাকাপোক্ত হল। এই ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠার কাল চলেছিল বহুদিন ধরে। ভূমিহীন মানুষ যখন নতুন করে থিতু হল ঠিক তখনই ঘটল দেশ বিভাগ। লেখক মনে করেন, এই বিভাজনে সাধারণ মানুষের সায় নেই। উচ্চবিত্ত নেতারা ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা এ কাজ করেছে। এই বিভাজন উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্গের চক্রান্ত। উপন্যাসের এক জায়গায় রয়েছে, "... শেষ পর্যন্ত সমস্তই বিফলে গেল। জমিদার জোতদার তথা বর্ণবাদী নেতাদের ইচ্ছাই পূরণ হল। যারা কৃষক-শ্রমিক, জমির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হলে যারা জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মত ছটফটিয়ে মরে যান, সেই মাটির সঙ্গে সংযুক্ত নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের দাবি কোনও আমলই পেল না।"[১৪] ঔপন্যাসিক খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের অপূরনীয় আকাঙ্ক্ষার বেদনার হাহাকার তুলে এনেছেন এখানে। জনপদ জীবনের আত্মাকে স্পর্শ করেছেন কপিলকৃষ্ণ তাঁর মরমি হৃদয় দিয়ে। এখানেই উলন্যাসের সার্থকতা।

শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও সফল লেখক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। তাঁর 'তালপাতার সেপাই' অনবদ্য শিশু উপন্যাস। মানুষের শৈশব খুব দ্রুত হারিয়ে যায়। সেই শৈশব ফিরিয়ে আনেন শিশু সাহিত্যিকরা। শিশুসাহিত্য রচনা করা বড় কঠিন কাজ। প্রাপ্তবয়স্ক লেখকেরা যখন শিশুসাহিত্য রচনা করেন তখন তাঁরা শিশুমনের অধিকারী হয়ে ওঠেন। লেখক তাই-ই হয়েছেন। এটি রূপকথার কোনো কাহিনি নয়। একেবারে মাটির গল্প। 'উজানতলীর উপকথা'-য় যেমন তিনি মাটির কথা বলেছেন, এখানেও তাই। কাহিনির বুনন অসাধারণ। অসম্ভব মুন্সিয়ানায় তিনি তালপাতার সেপাই-এর কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সে তালপাতার সেপাই হলে কি হবে, তার গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সে ম্যাজিক জানে, শুন্য থেকে লজেন্স আনে। আবার প্লাস্টিকের বল খেয়ে ফেলে বিষ্টুর পেট থেকে সে বল বের করে আনে। এরকম অসম্ভব সব শিশুতোষ ঘটনায় সমৃদ্ধ তালপাতার সেপাই।

কবিতা, ছোটগল্প ছাড়াও কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বহু প্রবন্ধ ও মুক্তগদ্য রচনা করেছেন। তিনি সার্থক প্রাবন্ধিকও বটে। লিটল ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অগণিত প্রবন্ধ। প্রথম সারির দৈনিকেও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। এখনও লেখেন। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারাতেই তিনি পারদর্শী।

সম্পাদক হিসেবে তাঁর অন্যতম সার্থক সম্পাদনা 'দলিত মনন'। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক --- 'দলিত' শব্দটি। 'দলিত মনন' দলিত সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক লিটল ম্যাগাজিন। এই পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের মূল উদ্দেশ্য মানব জীবন ও সত্তার প্রতিবন্ধক। দলিত আন্দোলনের শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন প্রথম গড়ে ওঠে অবিভক্ত বঙ্গভূমিতেই। অথচ সেই ইতিহাস থেকে গেছে অলিখিত। সম্পাদক কপিলকৃষ্ণ তা তুলে আনলেন পত্রিকায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা সহ আরও কয়েকটি অঞ্চলে শুরু হয়েছিল নম:শূদ্র জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল সর্বাত্মক ও ব্যাপক। বিদ্রোহ চলেছিল প্রায় চারমাস ধরে। চাঁড়াল বলে

ঘৃণা করা উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁদের এই লড়াই ছিল মর্যাদা রক্ষার লড়াই। কপিল 'দলিত মনন'-এ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক লড়াইকে তুলে এনে দলিত জাগরণের চারাগাছটি আবার নতুন করে লালন করতে শুরু করলেন। তৎকালীন জেলাশাসক ডব্লিউ এস ওয়েলসের তৎপরতায় এই চন্ডাল বিদ্রোহের প্রাথমিক অবসান ঘটে। বিদ্রোহ প্রাথমিক ভাবে তুলে নেওয়া হলেও প্রতিবাদ তারা থামায় নি। সেই সময় দলিত জনগোষ্ঠী জুতো পরে বা ছাতা মাথায় দিয়ে চলতে পারত না। আর পালকি চড়া ছিল অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এই লড়াইয়ে দলিতরা জুতো পরে, ছাতা মাথায় দিয়ে, এমন কি পালকি চড়ে প্রতিবাদ করেছে। এর কিছুদিন পর সিলেটে ঘটল একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনা। পাটনী সম্প্রদায়ের এক অস্পৃশ্য ছাত্র জুতো পরে স্কুলে গেলে সেখানে সে নিগৃহীত হয়। এই ঘটনায় চন্দ্রমণি চৌধুরীর নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। প্রায় পাঁচশো যুবক পায়ে জুতো পরে মাথায় ছাতা নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়। এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ বেছে নিয়েছিল আর এক অভিনব আন্দোলন। এক লক্ষের বেশি রাজবংশী পৈতে ধারণ করে নিজেদের রাজবংশী ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করে। হারিয়ে যাওয়া এরকম বহু তথ্য কপিল তুলে ধরেছেন দলিত মননের মধ্য দিয়ে। গণশিক্ষার আলোয় নতুন দিশারি হয়ে ওঠে এই ম্যাগাজিন। লিটল ম্যাগাজিনের নতুন পথিকৃৎ 'দলিত মনন'। তবে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হলেও এটি অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। মাঝে বেশ কয়েক বছর বন্ধ থেকে নতুন করে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি প্রায় প্রকাশিত হয়না বললেই চলে।

লেখক কপিলকৃষ্ণ বহু লিটল ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা বা প্রধান অভিভাবক। সেইসব লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও লেখকদের অনুপ্রেরণা দেন কপিল। তাছাড়া লেখালেখি সংক্রান্ত নানা সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে এইসব সংগঠনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই জন্যই তিনি দ্বিধাহীন ভাবে সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে থেকে দায়িত্ব পালন করে যান। এ প্রসঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের কথা উঠে আসে। ২০১৮ সালে প্রগতি লেখক সংঘের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কার্যকরী সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ঐ বছর প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বামনগাছিতে। মূলত কপিলবাবুর প্রচেষ্টায় সফল ভাবে জেলা সম্মেলন হয়। ১৯১৯ সালে তিনি পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ বছরই বারাসতে আয়োজিত হয় দুই বাংলার কবিতা উৎসব।[১৫] আয়োজক ছিল 'কলকাতা কলস্বর'[১৬]। সেই অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন মানবিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন কপিল বিভিন্ন সময়ে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন গড়ে উঠলে তার সমর্থনে এ বঙ্গেও গড়ে ওঠে নানা আন্দোলন। আন্দোলনের সমর্থনে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় 'শাহবাগ মঞ্চ'[১৭]। দলিত সাহিত্য আন্দোলনের গতি সঞ্চারের জন্য ধূর্জটি নস্কর, শ্যামল প্রামাণিক, বিরাট বৈরাগ্য, নীতিশ বিশ্বাসদের নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলা দলিত লেখক শিল্পী সংঘ'[১৮]। প্রকাশিত হয় সংস্থার মুখপত্র 'দলিত মনন'[১৯]। উত্তর চব্বিশ পরগনার মন্ডল পাড়ায় দলিত লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে 'চেতনা উৎসব' আয়োজন করা হয়। এসব সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। সেই কাজটা এখনও নিরন্তর করে চলেছেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর।

তবে সবকিছু অতিক্রম করে লেখক সত্তাই তাঁর বড় পরিচয়। আসলে তিনি নিষ্ঠাবান শব্দশ্রমিক। শব্দ নিয়ে খেলা করতেই পছন্দ করেন। তাই ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা যেখানেই হাত দিয়েছেন, সোনা ফলিয়েছেন। অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে শব্দ প্রতিমা গড়ে তোলেন। সেই জন্য হয়তো সেই প্রতিমা পুজিত হয় পাঠকের কাছে। আর সেই

কারণেই হয়তো তিনি সাহিত্যের সফল পূজারি। বাংলা সাহিত্যে তিনি বহু অনুগামীও তৈরি করেছেন। সেই অনুগামীদের নিয়ে তৈরি করেছেন নানা সংগঠন। লেখক কপিলকৃষ্ণ আজ উত্তর ২৪ পরগনার একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন।

গ্রন্থাবলী:

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের লেখা অগণিত কবিতা, প্রবন্ধ বা মুক্তগদ্য ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য কেটেছে উত্তর ২৪ পরগনায়। তাই এই জেলা একেবারে তাঁর নখদর্পনে। জেলার লিটল ম্যাগাজিন ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা রয়েছে। লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সব লেখা মলাটবন্দি করা যায় নি। তবু ইতিমধ্যে বেশকিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত ছটি কাব্যগ্রন্থ হল -- বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে (১৯৮১), চলেছি চৈত্রের উৎসবে (১৯৯৩), সরো পাথর (১৯৯৬), কী সুন্দর অন্ধ (২০০১), প্রিয় পঁচিশ (২০১১) এবং যে কথা কখনও বলিনি (২০১৮)।

তাঁর প্রকাশিত তিনটি গল্পগ্রন্থ হল -- মধুমতী অনেক দূর (১৯৯১), অন্য ইহুদী (১৯৯৭) এবং স্বপ্নের দ্বিতীয় মেরু (২০০৫)। প্রবন্ধ গ্রন্থ মাত্র একটি 'মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ' (১৯৯৪)। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিকে আলোচিতও হয়েছে।

তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা তিন। উজানতলীর উপকথা (১ম খন্ড, ২০০০), উজানতলীর উপকথা (২য় খন্ড, ২০১১), তালপাতার সেপাই (২০০২) ও গাঙপুরের মানুষ (২০১৮)।

তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ত্রিপুরা, আসাম পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের গল্প (২০০০), অদ্বৈত মল্লবর্মণ: একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত (২০০১), বাংলাদেশের কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার (২০০২), আলোর পথিক রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), সমাজ জাগৃতি: গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন (২০১৬), বি আর আম্বেদকর নির্বাচিত রচনা সংকলন (২০১৮)।

তিনি বহু লিটল ম্যাগাজিন ও সাময়িক পত্রিকার সফল সম্পাদক। কৈশোরেই সম্পাদনা করেছেন লিটল ম্যাগাজিন 'তরঙ্গ'। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে নিখিল ভারত, চতুর্থ দুনিয়া, বিজয় সরকার স্মারক পত্রিকা, দলিত মনন প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিন।

পুরস্কার ও সম্মাননা: লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি নানা পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। বাংলা ছোটগল্পের জন্য পেয়েছেন--- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), নীপশ্রী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), মধুমতী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২), রামমোহন স্মৃতি রণজিৎ পাল সাহিত্য পুরস্কার (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। উপন্যাস 'উজানতলীর উপকথা'-র জন্য তিনি পেয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার (২০০২)।

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আরও পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পেয়েছেন -- গুরুচাঁদ স্মারক সম্মান (২০০৩), মনীষা সাহিত্য পুরস্কার (২০০৪), নির্মলেন্দু ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার (২০০৯), বীরেন্দ্র সম্মাননা (ঢাকা, ২০১১)। এছাড়া বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে তিনি অসংখ্য সম্মাননা ও সংবর্ধনা পেয়েছেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. ক্র্যাকার, আটত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় পর্যায়, পঞ্চদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা: ১০৬
২. ঐ, পৃষ্ঠা: ১০২
৩. 'ক্র্যাকার', সম্পাদক - গৌরাঙ্গ দাস, আটত্রিশ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০২১ সংখ্যা
৪. ২০১৮ সালে ১০ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স - এর একটি সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন।
৫. হাবড়া স্টেশনে তখন বিপ্লব চন্দের নেতৃত্বে নিয়মিত চায়ের আড্ডা চলত। সেই আড্ডায় বিপ্লববাবু অনেকবার একথা বলেছেন।
৬. দেউটি তখন উত্তর চব্বিশ পরগনার অত্যন্ত জনপ্রিয় লিটল ম্যাগাজিন। সেখানে কবিতা বা প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার করে লেখা নির্বাচন হত।
৭. বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে, দেউটি, হাবড়া, পৃষ্ঠা- ২৫
৮. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, ২০১৬, যে কথা কখনও বলিনি, নিখিলভারত প্রকাশনী, কলকাতা।
৯. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, ২০১৬, যে কথা কখনও বলিনি, নিখিলভারত প্রকাশনী, কলকাতা।
১০. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, ১৯৯১, মধুমতী অনেক দূর, একুশে, কলকাতা – ৭৩
১১. অন্য ইহুদী, পৃষ্ঠা – ১৭
১২. অন্য ইহুদী, পৃষ্ঠা – ১৩
১৩. উপন্যাসের ইনার-ব্যাক কভারে কথাগুলি রয়েছে।
১৪. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, ২০০০, উজানতলীর উপকথা, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা।
১৫. ১০ মার্চ ২০১৯ রবিবার, বারাসাত তিতুমীর হলে অনুষ্ঠিত।
১৬. পূর্বে জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন ছিল 'কলকাতা কলস্বর'। সেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আজিজুর রহমান এই নামকরণ করেন।
১৭. সেই সময় 'শাহবাগ মঞ্চ' বাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সভা করে।
১৮. 'বাংলা দলিত মনন শিল্পী সংঘ' নিয়মিত নানা অনুষ্ঠান করে দলিতদের অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে। দলিত সাহিত্য একাডেমি প্রতিষ্ঠায় এই সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম।
১৯. 'দলিত মনন' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এটি মূলত দলিত মানুষের মুখপত্র।

শামীম রেজার কবিতায় বিপন্ন পাখিকথা

অভিষেক মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

'কতবার ভেবেছি পাখিজন্ম কিংবা বৃক্ষজন্ম হতো, যদি আমার/তোমাদের জলে অবগাহন শেষে পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতাম আবার'[১] এই আকুতি বাংলাদেশের নয়ের দশকের কবি শামীম রেজার কবি সত্তার স্বরূপকে চেনায়। শামীম তাঁর কবিতায় নদী-গাছ-পাখির প্রতি বারবার ভালোবাসার কথা বলেছেন। নদীর তীরে গাছ, আর গাছের উপরে বসে আছে পাখি এই দৃশ্য আমাদের সকলেরই চেনা। পাখি ছাড়া আমাদের বাস্তুতন্ত্র অসম্পূর্ণ। মানুষ জন্মের বহু বহু যুগ আগে পাখির অস্তিত্ব ছিল এই পৃথিবীতে, তখন পাখির জীবন ছিল নিরাপদ-ভয়মুক্ত। গবেষকদের মতে, ডাইনোসর থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাখির জন্ম হয়। কিন্তু মানুষ যখন এই পৃথিবীতে এলো, তারপর থেকেই পাখিরা বিপন্ন হতে শুরু করলো, অথচ এই পাখিরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। মানুষের জীবন বিপন্ন করে না। আমরা অনেকেই দৈনন্দিন যাওয়া-আসার পথে বা অন্যকোন সূত্রে পাখির বাসা দেখেছি, কী গভীর মমতায় পাখি তার বাসা নির্মাণ করে। কখনো দেখেছি সেই পাখির বাসার ভিতর আছে কয়েকটি ডিম। কখনো দেখেছি অতি বৃষ্টিতে পাখি তার বাসার ভিতর ডিম বা বাচ্চাদের আগলে রেখেছে। কিছুতেই তারা বাসা ছেড়ে কোথাও যায় না। আবার ঠোঁটে করে নানারকম খাবার এনে স্ত্রী পাখি ও পুরুষ পাখি বাসার ভিতর বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে, এ দৃশ্যও দেখেছি। অকৃত্রিম প্রেম আর যত্নে পাখি তার জীবনকে সাজায়। এই জীবন দর্শনকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। পাখির বাসাতে সাপ প্রবেশ করে যখন ডিম বা বাচ্চাদের খেতে আসে, তখন পাখি চিৎকার করে সাপের চারপাশে ঘুরতে থাকে, মাঝে মাঝে সাপের শরীরে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরেও দেয়। সাপের ফনাকে উপেক্ষা করে সন্তানদের বাঁচাতে চায়। প্রশ্ন জাগে, আধুনিক বিশ্বের মানুষের মধ্যে এই প্রেম-ভালোবাসা-যত্ন-দরদ-সুখ কি আছে? উত্তরে বলতে হয় নেই, কৃত্রিম জীবনের ঘোলাজলে প্রেম-ভালোবাসা, দাম্পত্য সন্তান সবই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। কবি শামীম এই প্রেমহীন আধুনিক মেকি আপাত চকচকে জীবনের অন্দরমহলে ঘুরে ঘুরে বুঝেছেন আমাদের সম্পর্কগুলি বড়ো বেশি কৃত্রিম। খাঁচার ভিতর ছটফট করা ছাড়া আমদের কিবা উপায় আছে। যন্ত্রণায় কাতর হতে হতে কবি লেখেন: 'কতবার ভেবেছি পাখিজন্ম হতো যদি আমার,/ধান পোকার সবুজ উড়াল থেকে খাদ্য নিতাম/অনাদিকাল, এইতো মনুষ্যজন্ম! সন্ধ্যারাতে ঈশ্বরীর/মতো বিক্রি হয় আমার শরীর'[২]

কবি জীবনানন্দ দাশ পাখির এই অকৃত্রিম জীবনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন:

১. 'পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুক;/সুস্থ করে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ'[৩]

২. 'হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চলে গেছে ছিঁড়ে/পাতার মতন করে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!/তবু পাতা— তবুও পাখির মতো ব্যথা বুকে লয়ে, বনের শাখার মতো— শাখার পাখির মতো হয়ে'[৪] মানুষের জীবনকে গড়ে নিতে গেলে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গাছ ও পাখির মতো সহ্য করার শিক্ষা চাই, জীবনানন্দ এই বার্তা দিলেন।

কবি শামীম রেজা ও কবি জীবনানন্দ দাশ অভিন্ন বোধের ধারক, তাঁরা প্রত্যেকেই পাখির প্রতি যত্নশীল, কারণ বস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় বোধ করতে হলে, পাখির অস্তিত্বকে বিপন্ন করলে চলবে না। পাখি আমাদের নানাভাবে উপকার করে।

কবি শামীম রেজা লেখেন: 'প্রিয় চন্দনা/পাখিটা বাঁইচা থাক; রূপশালী ধানের কী ক্ষতি, কী ক্ষতি/তোমার?'[৫]

কখনো কবি শামীম এই বিপন্ন যুগের প্রেমের স্বরূপ সূত্রে লেখেন সেই আশ্চর্য বেদনা-বিধুর পঙক্তি: 'আমার প্রেম মৃত দোয়েলের ছেঁড়াখোঁড়া পাখনায় ছড়ানো/মলিন প্রান্তর'[৬]

সত্যিকারের প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম পাখির জীবনের মতো অনিশ্চয়তায় ভরা, একথা কবি শামীম রেজা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তবে কিছু মানুষ আছেন সত্যিই ভালো। সেই ভালোমানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কবি শামীম পাখির অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখেন:

> '...জেনেছি আকাশের সব পাখিরা পাখি নয়, সব বৃক্ষই হয় না বৃক্ষ-ফলের পরিচয়; কিছু/ বৃক্ষ একাকার যারা ভালোবাসতে জানে, পায় না কিছুই, তারাই/বৃন্দাবন দাস কিংবা চন্দ্রাবতীর চন্দ্রের বাহার, মানুষের মধ্যে মানুষ/প্রকৃত মানুষ থেকে যায়; সৌন্দর্য সৃষ্টি-মূলে থাকে কিছু প্রতারণা কিছু বিস্ময়/কিছুটা নির্দয়। কে বলে মানুষ কাছে গেলে প্রকৃত পাখি উড়ে যায়?/কিছু অচিন পাখি আছে কিছু অচেনা বৃক্ষ, যারা সব ছেড়ে/শিকড় গাড়ে উড়ে উড়ে বাসা বান্দে মানব হৃদয়'[৭]

এই সূত্রে মনে পড়ে যাচ্ছে কবি বিনয় মজুমদারের কবিতার পঙক্তি: 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়'[৮] বিনয় মজুমদারের এই একরোখা নেতিবাদী বিশ্বাসে কবি শামীম সুর না মিলিয়ে বলেন: সত্যিকারের পাখিরা-সত্যিকারের মানুষেরা কখনো অনিষ্ট করেনা। সত্যিকারের মানুষ যারা, তারা হৃদয়বান, মনুষ্যত্বের পূজারী। তাঁরা গাছ ও পাখির মতো সুন্দর। তবে সব গাছ যেমন সুন্দর নয়; সব পাখি যেমন সুন্দর নয়; তেমনি কিছু কিছু গাছ বিশল্যকরণী, কিছু কিছু পাখি সত্যিকারের পাখি। এই সত্যিকারের পাখিরা পারে, ঠোঁট দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে, ভালোবাসার গান শোনাতে। চন্দ্রাবতী ও বৃন্দাবন দাস সেই পাখি; যারা আমাদের বুকের ভিতর সারা জীবন ধরে ভালোবাসার গান গায়।

মনে পড়ছে কবি শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতার পঙক্তি: 'কিছু পাখি শিকারির কাঁধে এসে বসে জীবন ভালোবেসে।'[৯]

এখানে কিছু পাখি আসলে সত্যিকারের বিবেক-মেধা-সম্পন্ন প্রতিবাদী মানুষ, যারা নানান বিপন্নতা থেকে আমাদের কে উদ্ধার করেন, আমাদের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে যেতে দেন না। পাখির সাথে তুলনার তাৎপর্য এখানেই, পাখি কখনো খারাপের সংকেত বা প্রতীক হতে পারে না। পাখি সর্বদা কল্যাণের প্রতীক। কিছু পাখি হয়তো আমাদের ফসল নষ্ট করে বা অন্য কোন ভাবে সাময়িক ক্ষতি করলেও পাখি ইকোসিস্টেমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে।

কবি শৈলেশ্বর ঘোষ যেমন পাখিকে কল্যাণব্রতী মানুষের প্রতীকে ব্যবহার করলেন, তেমনি কবি শামীম রেজা চন্দ্রাবতী ও বৃন্দাবন দাসের শুদ্ধ মানবতাকে পাখির-গাছের প্রতীকে আমাদের চেতনায় পৌঁছে দিলেন। বিশিষ্ট পাখি গবেষকের মতে: 'সভ্যতার শুরুতে মানুষ ওর পুজো করত। পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে, পাথরখণ্ডে, বাসনে, তৈজসে যুগ যুগ ধরে এঁকে গেছে পাখির ছবি। ভাস্করের দল মূর্তি গড়েছে- কখনও ঈশ্বরবাহক কখনও পাখিই ঈশ্বর। রাজা রাষ্ট্রনায়কদের শৌর্যের প্রতীক, গৌরবের আঙ্গিকে তাদের পরিচিত প্রিয় পাখির প্রকাশ ঘটেছে বহুবার। পশু হত্যা মাংস ও চামড়ার লোভে। কিন্তু পাখি হত্যা শুধু এক খাবলা মাংসের জন্য নয়।

পাখির পালক তারা মাথার চুলে গুঁজত। একেক প্রজাতির মানুষের দলীয় প্রতীক একেকরকম পাখির পালক। ফ্রান্স, স্পেন, চিন, আফ্রিকা, ভারতে প্রস্তর যুগের গুহায় মানুষের আঁকা পাখির ছবি। প্রায় সোয়া বাইশ কোটি বছরের বিবর্তন ইতিহাস, পাখির ডানায় প্রোথিত, ডাইনোসর থেকে যার শুরু। কত প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছে মানুষ। শিকারের লোভে টিপে টিপে শেষ করেছে ওদের।'[১০]

কবি শামীম রেজার কবিতা পাখি নিধনের বিরুদ্ধে কথা বলে, পাখি রক্ষার কথা বলে, পাখির বিপন্নতার কথা বলে:

১. 'চন্দনা পাখির মৃত্যুদিনে চন্দন বনে করাতকল নামে, আমার ঠোঁট শুকনা হইয়া আসে'[১১] ২. এ তল্লাটে গান গায় না রাতপাখি আর, ...কইলা পাখির ভয়ার্ত চিৎকার শুধু উত্তরের দাওয়ায়।'[১২] ৩. 'এখানে ঘুঘু ডাঙ্গার ঘুঘু ছিল, পূর্বপুরুষরা শিকার/করতো না; পাখি-মাংস নিজ মাংস-বিশ্বাসে, ...বুকের ভিতর ঘুঘু ডাক পারে,/ঘুঘুডাঙ্গার সব ঘুঘু শিকার হয়েছে অকাতরে; এখন আর/ঘুঘুডাঙ্গায় কোন ঘুঘু থাকে না'[১৩]
৪. 'প্রিয় বটগাছটা ঝিমুচ্ছে, ঘুঘুপাখির বাসা থেইকা/এখন আর ডিম চুরি কইরা কেউ একই জায়গায় রাইখা আসে না; কারণ পাখি নাই, বাসা বাঁধে না এ মরা গাছে,/সুবর্ণগাঁ কোন এক তারকাটায় ঘেরা দ্বীপ সমুদ্রের দেশ,/আমার ছেলেটার কাছে, বটেদের কোন গাঁ-বটগাছটাও/মরতে বসেছে, দীঘিটা ভইরা ফেলছে সেই কবে, এসব প্রশ্ন কোনদিন কি আর প্রকাশিত হবে।'[১৪]
৫. 'ছিন্ন খঞ্জনার দেহ এক হয়া মিশা যায় আমার আত্মায়।'[১৫]
৬. 'ক্ষয়িত পাখিকুল/আর তোমার মুখের উপর জন্মাল/অচেনা উদ্ভিদ, দেখলাম জন্মভূমি ও তুমি/হয়ে আছ দোআঁশ সমৃদ্ধ কলের পুতুল।'[১৬]
৭. 'পাখিরা চলে গেছে-প্রেমিকাও উদ্যান ফাঁকা।'[১৭]
৮. 'আহারে! দোয়েলা; রাত্তির আমার, একলা পরান! কার/ভিডায় কান্দ নরমকণ্ঠী পাখি, কার প্রশ্রয়ে ভিজাও মন।'[১৮]
৯. 'ও পাখি পালাতে পারবে না/মধুমাসে তুই; সামনে কাঁটাতার, তারপরও যাও-এ/তোমার তৈরি ক্ষমতার নকশাকাটা জাল,'[১৯]
১০. 'বুকের মইধ্যে সেই রূপের পাখি,/তারে ক্যামনে ভুইলা থাকি।'[২০]
১১. 'ব্যক্তিগত ডায়েরির পৃষ্ঠার ভাঁজে শরাহত ঘুঘুর ডানপাখ/রাখা আছে।'[২১]
১২. '...মুছে দিচ্ছো প্রিয় পায়রার উড়াল! শিকারির ফেইলা যাওয়া/মুহূর্তগুলির ভেতর মাছ হইয়া সাঁতরাই আর মাঝে মাঝে/সুরের খোঁজে বাঁশরিপট্টির দিকে যাই দেখি শহর উইঠা আসে বন্দি পাখির খোপে,'[২২]
১৩. 'সামরিক রাষ্ট্রের/দিকে থু-থু দিতে দিতে মনে হয় পাখিদের রাষ্ট্রে অস্ত্র/হাতে কোন দানব দাঁড়িয়ে হায় এতিম ভিটামাটি/জন্মভূমি আমার!'[২৩]
১৪. 'কোথাও অচেনা পাখির শিষ/চিঠির অক্ষর/নিয়ে কেঁদে ওঠে,'[২৪]
১৫. 'আবাবিল পাখি নাই মুক্তিকামী মেধাবী দুপুর।'[২৫]
১৬. 'মৃত কোকিলের গান কার কণ্ঠে বেজে ওঠে/স্বপ্ন বিক্রি শেষে কারা গোধূলিতে নির্জনে হারায়।'[২৬]
১৭. 'অনাহূত পাখির ছানার কান্না ধ্বনি বাজে দূরে'[২৭]

১৮. ‘একদিন সকালে ভুল শিকারির হাতে চেনা ডাহুকের মৃত্যু হলে মরা নদীর জলে/আলোড়ন ওঠে না আর,’[২৮]

১৯. ‘উজানীয়া ডাহুক তার ডাক ডাকবে না শান্তিয়ানো নদীটার ধারে– নদীটা ভরে যাচ্ছে চর জেগেছে ভেতরে ভেতরে’[২৯]

২০. ‘চারিদিকে পাখিদের কান্নায়/দোলনচাঁপার কামুক ঘ্রাণ বন্দ হইয়া আসে,’[৩০]

২১. ‘এমন অর্যমাকালে, তাই জলগামী রাজহাঁস চির একা/জলের ভাঙন ভেঙে ডাকে উজান গাঙে’[৩১]

২২. ‘আমি দেখি বিবর্ণ সাদা হাঁস উজান/সাঁতরায়, আর সমুদ্র খলিপায়ে চলে আসে/তাদের অন্দরে, চারদিকে নোনাজল-/হাঁসের ঠোঁটে সময়ের ছায়া, অথচ/পায়ে পায়ে আলতারাঙানো-/বিজয়া-বিজয়া’[৩২]

কবি শামীম রেজার কবিতায় এই হাঁসের বিপন্নতার সূত্রে আল মাহমুদের কবিতায় বিপন্ন হাঁসের কথা মনে পড়ে।

আল মাহমুদ তাঁর ‘আরব্য রজনীর রাজহাঁস’ কবিতাতে বলেছেন: ‘হায় হতভাগ্য পাখি/তুমি কেন নতুন নগরপ্রান্তের জলাশয়গুলোতে বিহার করতে চাও?/নাকি তুমি তাক করা বন্দুকের নল চিনতে পারো না?/অথচ হাজার বছর আগে/বেবিলনের ঝিলগুলো থেকে তোমার এস্ত উড়ালের শব্দে/আমি আনন্দ প্রকাশ করতাম! বলতাম/পালাও পালাও/মাংসাশী বাঘমানুষ,/সিংহমানুষ/চিতা-মানুষের থেকে মেঘের গম্বুজে আত্মগোপন করো।’[৩৩]

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘পাখিরা’ কবিতায় পাখিদের জীবন আধুনিক পৃথিবীতে যে নিরাপত্তাহীন সে কথা বললেন। ‘তাদের ডিম জন্মিবার এসেছে সময়’ কিন্তু সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো সুস্থ পরিবেশ নেই। কবি রফিক আজাদ বিপন্ন পরিবেশের কথা শোনালেন: ‘জননী বৃক্ষের বুক খালি হচ্ছে দুর্বৃত্তের হাতে-/প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অসম্ভব দ্রুত।/গুম-খুন অসংখ্য সেগুনশিশু.../ টুনটুনি পাখির জন্যে, ব্যাঙ ও সাপের জন্যে, আর/অতিথি পাখির জন্যে দেড় লক্ষ বর্গ কি.মি চাই/ মায়ের আদর-যত্নে আমিই অরণ্য সামলাবো–/অযুত নিযুত কণ্ঠে ‘মা’ ডাক শুনবো প্রাণ ভ’রে!’[৩৪]

কবিরা এভাবেই পৃথিবীর ক্ষয়কে দেখান। এবং সুস্থ পরিবেশ রক্ষার চেতনাকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে পৌঁছে দেন।

কবি শামীম রেজার কবিতার বড় অংশ জুড়ে আছে পরিবেশ চেতনার কথা। কখনও নদী-গাছ কখনও পাখির কথা ও সামগ্রিক পরিবেশের দূষণ মুক্তির কথা তিনি বারবার বলেছেন। পাখিকে রক্ষা করতে হলে, গাছ কাটা, জলাশয় ভরাট, নদী ভরাট বন্ধ করা উচিৎ। পাখির বাসস্থানের সংকট কমাতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো উচিৎ। ‘পরিবেশে পাখিদের নিরাপত্তা বাড়াতে পাখিরালয় (Birds’ sanctuary)-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রজনন ঋতুতে পাখিদের নিরাপত্তা অবশ্যই বাড়ানো উচিত। প্রজননকালে যেসব পাখি দলবদ্ধ হয়ে বাসা বাঁধে তাদের ওই সময় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বংশবিস্তারে ব্যাঘাত ঘটবে।’[৩৫] চোরা শিকারিদের অবাধ পাখি হত্যা থামাতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ‘একা গাও পাখি-কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে শিকারি’[৩৬] এই শিকারিদের জন্যই পাখি সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের দিকে চলে গেছে। ‘যে পাখিকে মেরেছি একদিন সে কেন? আজ বুকের ভিতর ডাকে/একের পর এক পর্দা সরিয়ে আমরা খুঁজে চলেছি তাকে।’[৩৭]

তথ্যসূত্র:

১. রেজা, শামীম; *উৎসর্গ কবিতা, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৩২

২. রেজা, শামীম; *দুই সংখ্যক কবিতা, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৩৪

৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা); *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, প্রেম,* ধূসর পাণ্ডুলিপি, ভারবি, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ১২৭

৪. তদেব, পৃ. ১২৭

৫. রেজা, শামীম; *তেত্রিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১১৫

৬. রেজা, শামীম; *একুশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১০৬

৭. রেজা, শামীম; পুঁথি চিত্রকর, পাথর চিত্রে নদীকথা, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৪৬

৮. মজুমদার, বিনয়; ২ সংখ্যক কবিতা, *ফিরে এসো* চাকা, *কাব্যসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* প্রতিভাস, কলকাতা-২, পঞ্চম মুদ্রণ: আগস্ট ২০২১, পৃ. ৪৩

৯. ঘোষ, শৈলেশ্বর; *আমার শূন্যতা, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৪৩

১০. চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর; *সৃষ্টির আঁতুড়ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পরবর্তী প্রলয়-দায়ী কে, আকাশলীনা ডাইনোসর থেকে পাখি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ১১৯

১১. রেজা, শামীম; *তেত্রিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১১৪

১২. রেজা, শামীম; *চব্বিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১০৮

১৩. রেজা, শামীম; *উনপঞ্চাশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১২৫

১৪. রেজা, শামীম; *সাতচল্লিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১২৫

১৫. রেজা, শামীম; *উনপঞ্চাশ সংখ্যক কবিতা,* ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৬২

১৬. রেজা, শামীম; জল ফড়িঙের ঘর, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৮৩

১৭. রেজা, শামীম; লালন ও বৃক্ষের মূর্ছনা, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৫৪

১৮. রেজা, শামীম; *বিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১০৫

১৯. রেজা, শামীম; *ত্রিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১১২

২০. রেজা, শামীম; *ছত্রিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, *কবিতা সংগ্রহ-১,* একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১১৬

২১. রেজা, শামীম; *বাহান্ন সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১২৮

২২. রেজা, শামীম; ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৪৭
২৩. তদেব, পৃ. ১৫৯
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৮
২৫. রেজা, শামীম; *আট সংখ্যক কবিতা, হৃদয়লিপি, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৮৬
২৬. রেজা, শামীম; *ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতা, হৃদয়লিপি, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৯৮
২৭. তদেব, পৃ. ১৯৮
২৮. রেজা, শামীম; উজানিয়া ডাহুক, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৬০
২৯. তদেব, পৃ. ৬০
৩০. রেজা, শামীম; *ছয় সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে, কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৯৬
৩১. রেজা, শামীম; *উজান গাঙের একই রীতি,* পাথর চিত্রে নদীকথা, কবিতা সংগ্রহ-১, চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ২৯
৩২. রেজা, শামীম; সমুদ্র খালি পায়ে চলে আসে অন্দরে, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে, *কবিতা সংগ্রহ-১,* চৈতন্য প্রকাশন, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৬৩
৩৩. মাহমুদ, আল; *আরব্য রজনীর রাজহাঁস,* কবিতা সংগ্রহ-১, অনন্যা, ঢাকা-১১০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ: জুলাই ২০১৯, পৃ. ২২০
৩৪. আজাদ, রফিক; *মায়ের দু'চোখ চাই, ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস,* কবিতা সমগ্র, অনন্যা, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩৫১
৩৫. দে, সুবিমল চন্দ্র; *কৃষিকার্যে পাখির সহায়ক ভূমিকা, আমাদের পাখি ও পরিবেশ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২২, পৃ. ৩০
৩৬. ঘোষ, শৈলেশ্বর; *অন্ত্যজ,* উৎসব, দীপঙ্কর প্রেস, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১৮
৩৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর; অষ্টাশি সংখ্যক কবিতা, *আমাদের এই বীজ ক্ষেত,* কারুবাসনা, কলকাতা, প্রথম কারুবাসনা সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৯।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য : ঔপনিবেশিক প্রতিরূপের অনুসন্ধান

অরিজিৎ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানকর কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, কিংবা আরো নির্দিষ্টভাবে বললে, ১৭৬৫-র দেওয়ানী লাভের মধ্যে দিয়ে বণিকের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ড হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষের বুকে, সেদিন থেকেই শুরু হল এক নতুন অধ্যায়ের, এক উপনিবেশের ইতিহাসের। ঔপনিবেশিক শক্তির ইতিবাচক প্রভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতা শহর-কেন্দ্রিক যে খণ্ডিত নবজাগরণের উদ্ভব হল, কাব্য সাহিত্যে সেই নবজাগরণের ঋত্বিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যাঁর মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়াগুলি দর্পণের মত প্রতিফলিত হয়েছে। এই যুগ তাঁকে যেমন এনে দিয়েছে মহাকবির সম্মান, তেমনি দিয়েছে সংশয়, দোলাচলতা, সীমাবদ্ধতা। আর এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতের সার্থক ফসল হয়ে উঠেছে ‘মেঘনাদবধকাব্য’।
সূচকশব্দ: উপনিবেশ, নয়া উপনিবেশ, ওরিয়েন্টালিজম, মিথ, ক্ষমতা।

মূলপ্রবন্ধ:

বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণের চিরন্তন মিথকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে গিয়ে মধুসূদন প্রথম যে-কথাটি বললেন, তা হল *‘I despise Ram and his rabble’* এবং অন্যদিকে রাবণ-মেঘনাদ তাঁর কাছে হয়ে উঠল *‘Grand fellow’*. আমরা জানি, ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি ঘৃণা ও উপনিবেশের মানুষের প্রতি স্বাজাত্যবোধই এর মূলে কাজ করেছে। কিন্তু যখন দেখি, রাবণ-মেঘনাদ অসংখ্যবার রাম-লক্ষ্মণের প্রতি *‘অসভ্য’, ‘বর্বর’, ‘নীচ’, ‘দাস’, ‘তস্কর’, ‘শৃগাল’* এই শব্দগুলি প্রয়োগ করেন, তখন তা যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি যেভাবে নিজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে উপনিবেশের মানুষকে, তার দেশজ সংস্কৃতিকে হেয় করেছেন, *‘Native’, ‘Slave’* শব্দগুলো প্রয়োগ করেছেন তাদের সম্পর্কে, তখন যেন মধুসূদন ঐ একই শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণাই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে মধুসূদনের দৃষ্টি প্রাথমিকভাবে মোহগ্রস্ত হলেও আমাদের দেশজ সাংস্কৃতিক সম্পদ যে ঔপনিবেশিক শক্তির তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না, ‘মেঘনাদবধ’কাব্যে আমরা তার পরিচয় পাই, যেমন লঙ্কার বর্ণনায়-

“নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি
বিবিধ রতনপূর্ণ এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে
রেখেছে রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে
জগৎ বাসনা তুই সুখের সদন।”

কিংবা রাবণের রাজসভার যে-বর্ণনা আমরা পাই, তা কি শুধুই মহাকাব্যিক আয়োজন, না কি তার পেছনে ঔপনিবেশিক শক্তির কৌশলী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছে?

আধুনিক *Orientalism* দিয়ে আমরা এর ব্যাখ্যা এভাবে করতে পারিনা যে *East-other of the West* নয়। তারও সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রয়েছে আর নিজের দেশজ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েই মধুসূদন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছেন।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাম-রাবণের সংঘাতের মূল কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কবি একাধিকবার বলেছেন ***'বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ'***। চিরন্তন মিথের প্রেক্ষিত ভেঙে আমরা যদি এর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট বিচার করতে চাই, তবে যে বৈদেহীর জন্ম হয়েছিল তা হল কর্ষণের সময় ভূমি থেকে যিনি ধরিত্রীর কন্যা, তাঁকে কি আমরা সেই কৃষি সম্পদের (কাঁচামাল) প্রতীক বলে ধরে নিতে পারিনা, যার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঔপনিবেশিক শক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়েছে? দেশে দেশে ভূমিজাত পণ্যের জন্যই ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাই দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে, সমুদ্র অতিক্রম করে, রাম-লক্ষ্মণ যখন সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় পৌঁছায়, তখন যেন তা ঔপনিবেশিক শক্তির মূল উদ্দেশ্যকেই প্রতীকায়িত করে।

উপনিবেশকদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি বা জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তি অনেক উন্নত থাকায় তারা প্রায় সারা পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই তথ্যই যেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে সেতুবন্ধনের চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। লঙ্কার প্রাকারের ওপর থেকে সেতুবন্ধন দেখে রাবণের সমুদ্রের প্রতি যে-প্রশ্ন ***'কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?'***কিংবা রাণী মন্দোদরীর উক্তি-

'শুনেছি মৈথিলীনাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে।'

- মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রধান হাতিয়ার যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাকেই যেন এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যা উপনিবেশের মানুষের হাতে ছিল না।

উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়া আলোচনা করলে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শক্তি বিভিন্ন দেশীয় শক্তিকে কখনো শত্রুতা কখনো মিত্রতার নীতি নিয়ে বশীভূত করে এবং নিজেদের পছন্দমত পুতুলশক্তিকে সিংহাসনে বসায়। 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ রামও একই প্রক্রিয়ায় দেশীয় শক্তিকে বশীভূত করতে করতে লঙ্কার দিকে এগিয়েছেন। যেমন সীতা বলেছেন-

'একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে।'

কিংবা সীতার প্রতি বসুন্ধরার উক্তি-

'সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে
মিত্রবর! বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরি রাজা বিখ্যাত জগতে।'

ব্রিটিশ শক্তির কখনো মিত্রতামূলক নীতি, কখনো স্বত্ববিলোপ নীতি। কখনো প্রত্যক্ষ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে দেশীয় শক্তিকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করার ঔপনিবেশিক কৌশল যেন এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দেশীয় রাজন্যশক্তি যেমন ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তারে একটি সহায়ক শক্তি, তেমনি শুধু নিজ স্বার্থের জন্য বহিরাগত শক্তির পদলেহনকারীরা এই শক্তিকে মজবুত হতে সাহায্য করে। ঔপনিবেশিক শক্তিও এই সুবিধাভোগী শ্রেণিটিকে নিজস্বার্থে প্রয়োজনমত ব্যবহার করে। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের বিভীষণ চরিত্রটি এরই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদের প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ যখন বলেন-

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে।

কিংবা মেঘনাদের অমঙ্গল আশঙ্কায় রাণী মন্দোদরী যখন সভয়ে বলে ওঠেন-

কাল-সর্পসম
দয়া শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ মদে
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু।

- বিভীষণের এই লোভমত্ততা কীসের জন্য? কীসের জন্য সে অনায়াসে মারতে পারে *'স্ববন্ধু-বান্ধবে'*? ইতিহাসের পর্যালোচনায় আমরা বারবার বিদেশী শক্তির পদলেহনকারী ক্ষমতালোলুপ একটি শ্রেণির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা জানে ঔপনিবেশিক শক্তি চিরকাল থাকবে না, আর তারা যাবার সময় দেশের শাসনদণ্ডটি তুলে দিয়ে যাবে তাদের বশংবদ এই শ্রেণির হাতেই। তাই রামের পক্ষ অবলম্বনের জন্য বিভীষণ যতই ধর্মের দোহাই দিন না কেন, এর মধ্যে দিয়ে তার ঔপনিবেশিক শ্রেণি-চরিত্রটি অস্পষ্ট থাকে না।

সারা পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শক্তির উপনিবেশ বিস্তারের মূলনীতি হল একদিকে কৌশল, অন্যদিকে নীতিহীনতা। একান্ত বাধ্য না হলে দেশীয় শক্তির সঙ্গে অকারণ সংঘর্ষ তারা এড়িয়েই চলতে চায়। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র রাম চরিত্রেও এই ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। যেমন প্রমীলা মেঘনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দূতীর মাধ্যমে রামের কাছে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে রাম দূতীকে বলেন-

শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে

কিন্তু দূতী কৃতজ্ঞচিত্তে সেই স্থান থেকে চলে যাওয়ার পরেই রাম বিভীষণকে বলছেন-

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর ! যুদ্ধ সাধ ত্যাজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে হেন বাঘিনীরে।

সৌজন্যের আড়ালে এই নির্লজ্জ কৌশল আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ফিরে ফিরে আসছে।

আর আছে নীতিহীনতা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীতিহীন ছলনাই অন্যতম হাতিয়ার ঔপনিবেশিক শক্তির। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ যেভাবে হত্যাকরেছেন এবং এই হত্যার যুক্তি হিসাবে বলেছেন- *'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু, ছাড়ে রে কিরাত তারে'*- এটি ঔপনিবেশিক শক্তির মূল ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে। এছাড়া এইকাব্যে 'মায়া'র যে-ধারণা ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে তাও এই ছলনারই নামান্তর, কারণ রাম-লক্ষ্মণ ভালো করেই জানেন- *'হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে/ দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে/রাবণিরে।'*

‘মেঘনাদবধকাব্যে’র ‘প্রমীলা’চরিত্র কল্পনায় নারীর স্বভাবসুলভ কোমলতার সঙ্গে যে-বীরত্বের কল্পনা করেছেন, তা শুধুই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে মনে হয় না। ভারতের প্রথম উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) অন্যতম যোদ্ধা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ছায়াপাত এই চরিত্রে ঘটেছে। কিন্তু শুধু প্রমীলাই নয়, তার সহচরী দূতীরাও যে বীরগুণে গুণান্বিত- সেই তথ্যেরও এক দীর্ঘ বর্ণনা এখানে পাই। প্রমীলার দূতী, নাম যার নৃমুণ্ডমালিনী, একাকিনী যখন নির্ভয়ে বিপক্ষ শিবিরে উপস্থিত হয়, তাকে দেখে রাম-শিবিরের প্রতিক্রিয়া-

"চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামা রে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে।"

-দূতীর বিস্তৃত চরিত্রায়নের মধ্যে দিয়ে মধুসূদন উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি সাধারণ নারীদেরও সশস্ত্র ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের এক তাৎপর্যময় পূর্বাভাসই সূচিত করেছেন।

'মেঘনাদবধকাব্যে’র কাহিনি-বয়নের অগ্রগতির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বীরবাহুর মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে কাব্যের শুরু এবং মেঘনাদের মৃত্যুতে লঙ্কার পরাধীনতা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে কাব্যের সমাপ্তি। ১৮৬১-তে এই কাব্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশে তার শাসনদণ্ড সুনিশ্চিত করে ফেলেছে এবং তা সম্ভব করেছে বিভিন্ন আইন ও সংস্কারের মাধ্যমে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এককথায় দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। এই কাব্যে লঙ্কা যদি হয় উপনিবেশের প্রতীক, তবে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ হল এই উপনিবেশের অর্থনীতির স্তম্ভস্বরূপ সেই ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, কৃষির প্রতীক, যেগুলি একের পর এক ধ্বংস করতে করতে ঔপনিবেশিক শক্তি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই নবম সর্গে রাবণ নিজের পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলছেন *‘বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে/কর্বুর গৌরব রবি।’*

'মেঘনাদবধকাব্যে’ অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদের প্রভাব একটি বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু নবম সর্গে এসে সর্বহারা রাবণ যখন বলেন- *‘বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?’* তখন এর মধ্যে দিয়ে পরাধীনতার কাছে আত্মসমর্পণই যে উপনিবেশের মানুষের একমাত্র নিয়তি সে কথাই কি প্রতিধ্বনিত হয়না? প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তো থাকবেই, কিন্তু বিশ্বায়নের যে অদৃশ্য থাবা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করছে তাতে নয়া উপনিবেশবাদের কাছে আত্মসমর্পণও তো আমাদের ভবিতব্য, আমাদের নিয়তি, হয়ত-বা আমাদের ট্র্যাজেডিও !

সহায়কগ্রন্থ:

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত): মেঘনাদবধ কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০২০।

২। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত): মেঘনাদবধ কাব্যচর্চা, সোনারতরী, দ্বিতীয়প্রকাশ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৮।

৩। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): মেঘনাদবধ কাব্য, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৯।

৪। সুশোভন মুখোপাধ্যায়: মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠের ভূমিকা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২।

৫। শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী ও মহান চক্রবর্তী (সম্পাদিত): মেঘনাদবধ কাব্য, দেজ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯।

নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটোগল্পে মৃত্যুচেতনার নানারূপ

শিখা ঘোষ
সহকারী শিক্ষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
আনন্দনগর হাইস্কুল, আনন্দনগর, নিশ্চিন্দা, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বৃহদায়তনের সাহিত্য ধারার নানা রূপ-রীতির মধ্যেই কবির মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ পাই। এর মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটি নির্বাচিত গল্পের পরিসরে তাঁর মৃত্যুচেতনার কোন্ কোন্ দিকগুলি পরিস্ফুট হয়েছে সেটিই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ : রবীন্দ্রসাহিত্য, মৃত্যুচেতনা, ছোটোগল্প, অস্তিত্ব সংকট, মৃত্যু, মনোকষ্ট, বিয়োগব্যথা, নিঃসঙ্গ।

মূল আলোচনা:
রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যুচেতনার প্রসঙ্গ বিভিন্নসময়ে নানা আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে। কখনো মৃত্যুকে তিনি অমৃত স্বরূপ মনে করে বলেছেন— 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান'। আবার নিশ্চিত অথচ অজ্ঞাত মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে তিনি হতে চেয়েছেন মৃত্যুর চেয়ে বড়ো—মৃত্যুঞ্জয়। ব্যক্তিগত জীবনে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখেছেন তিনি। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনকে ওলোট-পালট করে দেয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ও ব্যথায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু সেই বিয়োগ ব্যথার দান হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর অমর সাহিত্য রচনাগুলি। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। কবিতায়, গানে, গল্পে সর্বত্র এই বিয়োগব্যথা দুঃখকে জারণ করে নবসৃষ্টিকে সম্ভাবিত করেছে। এই মৃত্যুচেতনার ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পগুলির কয়েকটিতে। এর মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি ছোটোগল্প হল— 'দেনাপাওনা', 'জীবিত ও মৃত', 'ছুটি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', এবং 'সম্পত্তি সমর্পণ'। এই গল্পগুলিতে মৃত্যুঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর মৃত্যুচেতনার দর্শন ও অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে যে ভিন্ন আঙ্গিকে—তার বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই আসা যাক 'দেনাপাওনা'' গল্পে। এই গল্পের কাহিনির মূলে রয়েছে প্রণপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যা। ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের সঙ্গে রামসুন্দর বাবু তার কন্যা নিরুপমার সম্বন্ধ পাকা করেন। কিন্তু পাত্রপক্ষের দাবিমতো দশহাজার টাকা ও দানসামগ্রী দিতে না পারার কারণে নিরুপমার বিয়ের আসরে বর নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতেই রাজী হন না রায়বাহাদুর। অন্দরমহলে কান্নার রোল পরে যায়। এমতাবস্থায় পাত্র বেঁকে বসে যে, সে বিয়ে না করে কিছুতেই ফিরবে না। তাই বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার অবস্থা কন্টকাকীর্ণ হয়ে ওঠে। শ্বশুর-শাশুড়ি, দাস-দাসী সকলের অবহেলার পাত্র হয়ে ওঠে সে। রামসুন্দরবাবুও বেয়াইবাড়িতে দিনের পর দিন কেবল অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে থাকেন। শেষপর্যন্ত বাড়ি বিক্রি করে পণের টাকা বেয়াই বাড়িতে দিয়ে নিরুপমাকে আনতে গেলে তার ছেলেরা সেখানে গিয়ে কাঁদাকাটা-ঝগড়া-অশান্তি শুরু করে দেয়। নিরুপমাও বাবাকে বারণ করে দেয় আর একটা টাকাও যেন তিনি না দেন। রামসুন্দরবাবু চলে যান। শ্বশুরবাড়িতে অবহেলা, শরীরের প্রতি অযত্ন এইসব কারণে শেষ পর্যন্ত নিরুপমা ঘোরতরভাবে অসুস্থ হয় এবং

তার মৃত্যু হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে শরীরের অযত্নের কারণে নিরুপমার মৃত্যু হল কিন্তু তার মৃত্যু মূলত মানসিক কষ্ট ও অবহেলার কারণে। সেই মনোকষ্টের বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "...সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশুড়ি বলিতেন, "নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।" কখনো বা বলিতেন, "দেখো না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখোনা, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।"[১]

মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পিতার অপমান এবং চোখের সামনে মেয়ের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। মেজো মেয়ে রাণী বা রেণুকার দিনে দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ছবিই যেন 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মৃত্যুতে প্রকাশিত হয়েছে। এই মৃত্যু একপ্রকার পরোক্ষ হত্যা।

এবার আসি 'ছুটি' গল্পের আলোচনায়। এই গল্পে প্রকৃতিলগ্ন ফটিককে দুষ্টুমি থেকে বিরত হয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করানোর জন্য মামা বিশ্বম্ভরবাবু কলকাতায় নিয়ে যান। মামা স্নেহ করলেও মামী কিংবা মামাতো ভাইবোনেরা তাকে একেবারেই পছন্দ করত না। একদিকে মাতৃস্নেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মামার বাড়িতে আসা এবং সেখানেও অবহেলা, শহরের স্কুলেও গ্রামের পরিবেশ থেকে এসে মানাতে না পারা সবকিছু নিয়ে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ফটিক একা একা বাড়ি চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। বেঁহুশ অবস্থায় পুলিশ তাকে দিয়ে যায়। পূজার ছুটি তখনো অনেক বাকি। তার আগেই জীবন থেকে ছুটি হয়ে যায় ফটিকের। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে বকতেই মৃত্যু হয় তার—

> "ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"[২]

এই দৈহিক মৃত্যুর বহু আগেই গ্রাম্যপ্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য ফটিকের মৃত্যু হয়েছিল মনে মনে। শহর থেকে গ্রামে পারস্পরিক গোত্রান্তরের ফলে 'পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টার এবং 'ছুটি' গল্পের ফটিকের অবস্থা ডাঙায় তোলা মাছের মতোই হয়ে ছিল। পোস্টমাস্টার শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান, কিন্তু অকূল দরিয়ার তল পেতে ব্যর্থ হয় ফটিক। এই মৃত্যুর কারণস্বরূপ বিচ্ছিন্নতার বেদনা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

> "ছুটি গল্পটি পোস্টমাস্টার গল্পের উল্টোপিঠ। শহরবাসী পোস্টমাস্টার আত্মীয়স্বজনহীন পল্লীপ্রবাসে আসিয়া পড়িয়াছে, আর ফটিক পল্লীগ্রামের ছেলে, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন হইয়া শহরে গিয়া পড়িয়াছে। দুটি অবস্থাই বেদনাজনক হইতে পারে, তেমন ক্ষেত্রে বেদনার রূপ আলাদা, স্বরূপ এক। একই বেদনাকে ভিন্ন ক্ষেত্র হইতে দেখিবার ইচ্ছায় পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখিবার বছর খানেক পরে ছুটি গল্পটি লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। প্রথম গল্পটি লিখিবার সময় কবি শহরবাসীর পল্লীপ্রবাসের দুঃখই কেবল জানিতেন, কিন্তু এতদিনে পল্লী জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবার ফলে বিপরীত দুঃখটার প্রকৃতিও বুঝি জানিতে পারিয়াছেন।"[৩]

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পেও আমরা মৃত্যুপ্রসঙ্গের কথা পাই। রাইচরণ বারো বছর বয়সে বাবুদের বাড়ি চাকরি করতে এসেছিল। গল্পের অনুকূলবাবু তখন একবছরের শিশু।

রাইচরণের কোলে-পিঠে অনুকূল বড় হয়েছেন। রাইচরণ এখন অনুকূলের শিশু পুত্রের দেখাশোনা করে। এই শিশুটিই খোকাবাবু। শিশুর সঙ্গ দিতে দিতে রাইচরণের বয়স বাড়লেও তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি। তাই সে বয়স্ক শিশুর মতোই রয়ে গেছে। খোকাবাবুর সুখে তার সুখ, দুঃখে – দুঃখ। খোকাবাবু একটু বড় হলে রাইচরণ তাকে পদ্মার তীরে বেড়াতে নিয়ে গেলে সেখানেই বিপর্যয় ঘটল। রাইচরণ যখন কদম্বফুল সংগ্রহে ব্যস্ত, খোকাবাবুকে মৃত্যুরূপিণী পদ্মা গ্রাস করল। রাইচরণ খোকাকে জলের দিকে যেতে বারণ করেছিল। কিন্তু ছোটোদের যে জিনিসে নিষেধ করা হয় সেদিকেই তাদের আকর্ষণ প্রবল হয়। একটা লম্বা ঘাস কুড়িয়ে তাকে ছিপ কল্পনা করে মাছ ধরতে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে তলিয়ে গেল। রাইচরণ বাবুদের বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হল। এরপর দেশে ফিরে তার বিবাহ এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়, যার নাম 'ফেলনা'। কিন্তু রাইচরণের মনে হল এ ছেলে আসলে তার মনিবেরই ছেলে, যে পুনর্জন্ম নিয়ে তার ঘরে এসেছে। সেই থেকে সে ফেলনাকে বাবুদের ছেলের মতোই বড়ো করে এবং ফেলনাও রাইচরণকে তার প্রতিপালক ভিন্ন আর কিছু ভাবে না। শেষপর্যন্ত রাইচরণ ফেলনাকে তার মনিব অনুকূল বাবুর বাড়ি ফেরত দেয় এবং জানায় যে, সে তাকে চুরি করেছিল। অনুকূলবাবুর স্ত্রী তাকে পুনরায় বহিষ্কৃত করে কিন্তু ফেলনার অনুরোধে রাইচরণের মাসোহারার ব্যবস্থা হয়। এই গল্পে মৃত্যুচেতনার সঙ্গে পুনর্জন্মের বিশ্বাস বোধ; মগ্নচৈতন্যের আর্কেটাইপ প্রধান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তপোব্রত ঘোষ বলেছেন—

> "অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, স্মৃতি হল বিস্মৃতির বিকাশ, বিস্মৃতি স্মৃতির বিনাশ নয়। স্মৃতি যেখানে অপরিস্ফুট সেখানেই আমাদের অন্তর্গত বিস্মৃতির মহাবিশ্ব। এই 'অতি বিপুল বিস্মৃতি' কে কেন্দ্র করেই ফ্রয়েড গড়ে তুলেছিলেন তাঁর 'ব্যক্তি'-গত মগ্নচৈতন্যের সূত্রাবলী। আর তাকেও ব্যবচ্ছেদ করে ইয়ুং আবিষ্কার করলেন 'সমষ্টি'গত মগ্নচৈতন্যের সত্য।...
> দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বলতে পারি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে পূর্ববর্তী খোকাবাবু পরবর্তী খোকাবাবুর আর্কেটাইপ। নতুন শিশুদের মধ্যে একটি শিশুর 'আদিরূপ'ই রাইচরণের প্রত্নচৈতন্যে বারবার ফিরে আসে।"[৪]

এবার আমরা 'জীবিত ও মৃত' গল্পের প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। রানীহাটের জমিদার শারদাশংকর বাবুর সংসারে বিধবা ভ্রাতৃবধূ কাদম্বিনী ছিল বৃত্তের বাইরে। পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল উভয় ক্ষেত্রেই সে ছিল একাকী, নিঃসঙ্গ। পরগাছার মতো সে ছিল আশ্রয়প্রাপ্ত। তাই শারদাশংকরের ছোট ছেলে অর্থাৎ এই ভাসুরপোটি ছিল তার একমাত্র অবলম্বন, এহেন কাদম্বিনীর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে শ্মশানে আনা হয় এবং তারপর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন না করেই ভয় পেয়ে চলে যায়। তাতে বোঝা যায় কাদম্বিনীর প্রতি তার বাড়ির লোকের অবহেলা বোধ কতটা প্রবল ছিল। কাদম্বিনী আসলে মরেনি। কিন্তু সে ভাবতে লাগল যে সে মৃত। তার মনে এই বদ্ধমূল ধারণা হল যে সে প্রেতাত্মা। তার মগ্নচৈতন্যে প্রেতপ্রতীতি কাজ করে চলেছে। দিনের আলোকে সে অস্বস্তি বোধ করেছে। পথিক ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সে উদ্‌ভ্রান্তবোধ করেছে। সই যোগমায়ার বাড়িতে গিয়ে সে পূর্বের মতো সখীর সঙ্গে সহজ হতে পারেনি। সেখানেও সে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে এবং রোগে পাণ্ডুর অসুস্থ খোকাকে দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জল পান করিয়েছে। তার প্রেতসত্তা ক্রমে মাতৃসত্তায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এরপর যেটা ঘটছে সেটা খুবই দুঃখজনক। এরপর থেকে কাদম্বিনী বুঝতে পারছে সে জীবিত অথচ বাড়ির সকলে ভাবছে সে মৃত। নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার জন্য কাঁসার বাটি দিয়ে নিজেকে আঘাত করেছে সে। রক্তের ধারা কপাল

দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তবুও কেউ বিশ্বাস করছে না যে সে বেঁচে আছে। শেষ পর্যন্ত আরও বড়ো প্রমাণ দেবার জন্যই সে বাড়ির পুকুরে ঝাঁপ দিল। বিরোধ ভাস অলঙ্কারের উজ্জ্বল ব্যবহারে অন্তিম বাক্যটিকে মহিমা মণ্ডিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ—'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'[৫]

কাদম্বিনীর এই মৃত্যুর মূলে রয়েছে অস্তিত্ব সংকট। এই আত্মহত্যার মধ্যে জীবনকে আঁকড়ে ধরার প্রবল বাসনাই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তপোব্রত ঘোষ বলেছেন—

> "সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই।' বৃষ্টি এখানে যেন অনিঃশেষ অশ্রুজলে ঝরে পড়ছে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'। মরা আর না-মরার পারস্পরিক অন্তঃসংঘাতে শেষ পর্যন্ত উঠে এসেছে জীবন। কোন্ আত্মহত্যা এর চেয়ে বেশি করে জীবনকে জাপটে ধরতে পারে?"[৬]

এরপর আসা যাক অন্তিম আলোচ্য গল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর বর্ণনায়। এই গল্পের মূলে মগ্নচৈতন্যের উপর যে আদিমতম বিশ্বাস কার্যকরী হয়েছে সেটি হল যক্ষসাধনা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মরে যাওয়ার পরেও যখ হয়ে সম্পত্তি আগলায়। শিলাইদহে প্রচলিত কৃপণব্যক্তি যুগল সাহার কিংবদন্তী এই গল্পের উৎসস্থল। এই গল্পের পিতা যজ্ঞনাথ কুণ্ড ও পুত্র বৃন্দবন কুণ্ডর মধ্যে বচসা হওয়ায় পুত্র বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। প্রথমে কৃপণ বৃদ্ধ খুশি হলেও পরবর্তীকালে নাতি গোকুলচন্দ্রের জন্য সে উতলা হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নিতাই রূপে গোকুলের আবির্ভাব। গোকুলের সঙ্গে তার দুরন্তপনার সাদৃশ্যেই তাকে যজ্ঞনাথ খুব ভালোবাসতে শুরু করে কিন্তু চিনতে পারেনি। শেষপর্যন্ত নিতাইকেই সে নিজের সম্পত্তি সমর্পণ করার জন্য যখসাধনার উপযুক্ত করে তোলে। জীবিত নিতাইকে মন্দিরের ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে জ্যান্ত কবর দেয় সে। মনে মনে যখন নিজের সম্পত্তির সঠিক সংরক্ষণ হয়েছে ভাবে তখনই তার ছেলে বৃন্দাবন নাতি গোকুলের খোঁজ করতে আসে। আর যজ্ঞনাথ জানতে পারে নিতাই-ই আসলে গোকুল। এই নিষ্ঠুর সত্য জানতে পেরে নিজের পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে যজ্ঞনাথ শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। এই যে হত্যা তা আসলে মগ্নচৈতন্যের যখসাধনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। যখসাধনার দ্বারা সম্পত্তি সমর্পণ করতে গিয়ে যজ্ঞনাথ নিজেই শেষপর্যন্ত যখ্-এ পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> '...যখ্ শুধু নিজেরই জন্য নয়, ন্যায্য উত্তরাধিকারীর জন্যেও ধনরত্নপাহারা দিত। যজ্ঞনাথ মুখ্যত পৌত্রের জন্যই যখ্ দিয়েছিলেন। পৌত্রের প্রতি সংগুপ্ত স্নেহদৌর্বল্য কুলিশকঠোর এই কৃপণের চিত্তে হৃদয়ধর্মের একমাত্র নিদর্শন; আর ঠিক সেইখানেই নেমে এসেছে নিষ্করুণ নিয়তির নির্মম আঘাত। প্রভাতকুমার যা লক্ষ করেননি তা হল, গল্পের শেষে প্রকৃতির প্রতিশোধে যজ্ঞনাথ নিজেই যখ্ হয়ে গিয়েছেন। তাই 'বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর'-এ পতনই তাঁর অভিশপ্ত মৃত্যুর সাংকেতিক রূপকল্প। প্রাচীন কাহিনী কিংবদন্তি অনুযায়ী মানুষের নিজেরই যখ্ হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে আত্যন্তিক অর্থলোভ। কিন্তু যজ্ঞনাথ যখ্ হয়ে নিজের ওই অর্থলোভেরই প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।"[৭]

এইভাবে লক্ষণীয় আলোচ্য প্রতিটি ছোটোগল্পে উল্লেখিত নানা মৃত্যুদৃশ্য এবং সেই মৃত্যুঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার নানা রূপও প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। প্রতিটি গল্পপাঠের শেষে সেই অনুভূতিগুলি আমাদের নতুনভাবে ভাবায়—এখানেই গল্পগুলির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড সং), স্কুল লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, দোলপূর্ণিমা নতুন সং, পৃ. ১৫।

২) তদেব, পৃ. ১২০।

৩) বিশী, প্রমথনাথ, বৈশাখ ১৪১৭, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, পৃ. ৩১।

৪) ঘোষ, তপোব্রত, জানুয়ারি ২০১৮, 'রবীন্দ্র ছোটোগল্পের শিল্পরূপ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৩।

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৬) ঘোষ, তপোব্রত, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৭) তদেব, পৃ. ৭২।

সৈকত রক্ষিতের হাড়িক : অন্ত্যজ জীবনের দলিল

মানু বধূক
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড

সারসংক্ষেপ: একবিংশ শতকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও লেখনীর সাহায্যে সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত। রুক্ষভূমি পুরুলিয়ার মাটিতেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। শৈশব থেকে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরুলিয়ার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের জীবনসংগ্রাম তাঁর চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর লেখালেখি মূলত অন্ত্যজ সমাজকে নিয়ে। অন্ত্যজ বলতে হীন, দলিত, ব্রাত্য সমাজকেই বোঝায়। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষদের কাছে এরা অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত বলে পরিগণিত হয়। ইংরেজি 'Subaltern' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অন্ত্যজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।পুরুলিয়ার এই অন্ত্যজ
সমাজকে নিয়ে সৈকত রক্ষিত লিখেছেন 'হাড়িক' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে লেখক শুয়োর পালক হাড়িদের জীবনসংগ্রাম, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির বর্ণনা করেশেন। পাশাপাশি উঠে এসেছে তাদেরকে নিয়ে ক্ষমতাশালী শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনা এবং ঘৃণ্য রাজনীতির প্রসঙ্গ।
সূচকশব্দ: রুক্ষভূমি, অন্ত্যজ, জীবনসংগ্রাম, ক্ষমতাশালী, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা:
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক সৈকত রক্ষিত। তাঁর জীবন দৃষ্টির প্রজ্ঞা ও গভীরতা নিয়ে জঙ্গলমহল তথা পুরুলিয়ার রুক্ষমাটির জীবন ও সংস্কৃতির দৃশ্যপটগুলি তাঁর গল্প উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাই আধুনিক ভারতবর্ষের মানচিত্রে পুরুলিয়ার অবস্থান। যেহেতু তিনি একজন পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র তাই পুরুলিয়ার সাধারণ নরনারী বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষজন তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তাঁর গল্প - উপন্যাসগুলিতে আমরা খুঁজে পাই অন্ত্যজ সমাজের আশা- নিরাশা, দুঃখ-বেদনা, পেশা, খাদ্যাভ্যাস সহ জীবন সংগ্রামের খুঁটিনাটি চিত্র।

লেখক সৈকত রক্ষিত স্কুলজীবন থেকেই তাঁর লেখালেখি শুরু করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্য পড়তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং সাহিত্য রচনার সংকল্প করেন।নিজের সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন- "স্কুল জীবনে রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে সাহিত্য রচনার সংকল্প করি। তখন বাংলা সাহিত্যে কোথাও পুরুলিয়া ছিল না। এই ভূখণ্ডের ভাষা-সংস্কৃতি, এমন চমৎকার নিঃসর্গ- টিলা- ডুংরি আমচুর খেত, লোকায়তিক প্রেক্ষিতে ঝামাধরা বুভুক্ষু মানুষের দল, যাদের জীবনভর বাবুই ঘাস কাটতে কাটতে মেরুদন্ড বেঁকে যায়, আর দড়ি পাকাতে পাকাতে ছাল ওঠে হাতের তালুর, যারা শুধু চাল তেল নুনের সংস্থান টুকু হবে বলে সারা দিনমান নদীর পাড় ভেঙে বহমান স্রোতের মাটি ধুয়ে ধুয়ে সোনার রেনু ছাঁকছে, সাবানের বিকল্প মাটি মেখে নিজেকে পরিষ্কার করছে; আকাশমণির ফল পুড়িয়ে কাপড় কাচারসোডা করছে, বাটনা বাটার শিল কিনতে পারেনি বলে অযোধ্যা পাহাড়ের মাথা থেকে মস্ত এক পাথর ঘাড়ে নিয়ে টলমল পায়ে সমতলের দিকে নামছে। অভুক্ত শিশু উঠোনের মাটি খাচ্ছে, শুয়োরের লোম কেটে কৌটোয়

রাখছে, এমনকি মেয়েদের মাথার চুলও ফেলছে না, চিরুনি থেকে ছাড়িয়ে দলা পাকিয়ে গুঁজে রাখছে দু-পাঁচ টাকা পাবে বলে, গুঁজে রাখছে ঘরের চালার মাথায়।বাচ্চা ছেলেমেয়েরা লজেন্স টিপকার, ফিতা, প্লাস্টিকের চুড়ি পাবে বলে –এই প্রান্তিক অচলায়তন মানুষগুলির জীবন কথার কিছুই স্থান পায়নি সেদিন বাংলা কথাসাহিত্যে।

সেদিন মনে হয়েছিল রাঢ়ের এই অঞ্চলই হবে আমার সাধন সঙ্গিনী। এমন কিছু লিখব যা আগে লেখা হয়নি, যা অখন্ড পুরুলিয়াকে তার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সহ পাঠককে চিনিয়ে দেবে, মিতালি পাতাবে তার সঙ্গে।”[১]

স্বাভাবিকভাবেই সৈকত রক্ষিতের গল্প উপন্যাসগুলিতে অন্ত্যজ, অপাংক্তেয়, নিম্নবর্গীয় মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। এখন প্রশ্ন অন্ত্যজ বলতে আমরা কি বুঝি? ইংরেজি ‘Subaltern’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ‘অন্ত্যজ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ‘অন্ত্যজ’ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল, অন্ত-√জন +ড = অন্ত্যজ।সমাজে যারা অন্তেবাসী তারাই অন্ত্যজ।কেউ কেউ অন্ত্যজ অর্থে নীচজাতি, চন্ডালাদি জাতি এবং শূদ্র সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন।সাধারনত এরা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। সমাজের উচ্চবর্গের দ্বারা চির অবহেলিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হন। এরা সমাজে অস্পৃশ্য বা অচ্ছুত বলে পরিগণিত হন।

‘অন্ত্যজ’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কেউ কেউ ‘ব্রাত্য’ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেনI ‘ব্রত’ ও ‘ব্রাত’ শব্দ থেকে ব্রাত্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। জাতিগত দিক থেকে কিছু মানুষ যেমন ব্রাত্য হতে পারেন তেমনি বৃত্তিগত দিক থেকেও ব্রাত্য বলে গন্য হন। বৈদিক যুগে জীবিকা বা পেশার উপর ভিত্তি করে সমাজ বিভক্ত হয়েছিল। তখন থেকেই চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্টি।চতুর্বর্ণ প্রথার চারটি শ্রেনী- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।মুখবিবর থেকে ব্রাহ্মনদের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, উরু থেকে বৈশ্যদের এবং পদযুগল থেকে শূদ্রদের জন্ম হয়েছে বলে ধরা হয়। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল পূজার্চনা করা, ক্ষত্রিয়দের দেশরক্ষা, বৈশ্যদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শূদ্ররা এই তিন বর্নের সেবা করত।

বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই অন্ত্যজ সমাজ জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমাজের ডোম, চন্ডাল, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়কে। চর্যাপদের অধিকাংশ কবিরা ছিলেন শূদ্র। শবর পাদ, ডোম্বী পাদ, তন্ত্রী পাদ প্রমুখ কবিরা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। চর্যাপদের অন্যতম প্রধান পদকর্তা ভুসুকু পাদ নিম্নবর্গের অন্তর্গত। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি তাঁর একটি পদে লিখেছিলেন, ‘আজি ভুসভু বাঙ্গালী ভইলী। নি অ ঘরণী চন্ডালে লেলী।’ অন্যদিকে বাংলা ভাষায় রচিত যাবতীয় মৌখিক সাহিত্য, লৌকিক সাহিত্য, ভাটি পূজার গান, কীর্তন, বিয়ের গান, বাউল, কবিগান, ছেলে ভুলানো ছড়া, বাঁধা ছড়া ইত্যাদি সবই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের সৃষ্টি। এই পর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে ময়মনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত পালা ‘মহুয়া পালা’র অন্যতম নারী চরিত্র মহুয়া বেদেনী কন্যা এবং এই পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন।

সৈকত রক্ষিতের ‘হাড়িক’ উপন্যাসটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। ‘হাড়িক’ শব্দটির মূলে রয়েছে ‘হাড়ি’ শব্দ। হাড়ি বলতে সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থিত মেথর সম্প্রদায়কে বোঝায়। আবার কোন অবাধ্য কুকুরকে তাড়ানোর জন্য জঙ্গলমহল এলাকার গ্রাম্য অঞ্চলে হাড়ি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ‘হাড়িক’ উপন্যাসে যে সম্প্রদায়ের কথা রয়েছে তারা মূলত সহিস। একসময় তারা আস্তাবলে ঘোড়া পরিচর্যার কাজ করত। পরবর্তীকালে সেই কাজ হারিয়ে তারা শুয়োর পালনের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।হাড়িক উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র গুহিরাম

সহিস। লেখকের বর্ণনা- "গুহিরাম সহিস পাগলাটে গোছের লোক। পাগলামি রয়ে গেছে তার কাজকর্মে, দৈনন্দিন আচরণে। সহিসদের এই পাড়ায় এমন লোক যেন আর দ্বিতীয়টি নেই। সে যেন খামখেয়ালী, তেমনি একগুঁয়ে। জেদী। তাই নিয়ে কেউ অবশ্য ঠাট্টা তামাশা করে না। করবেটাই বা কেন? অনেক সহিসের এই পাড়ায় সেও তো এক সহিস? বস্তুতঃ সহিসের পাড়া বলেই এ পাড়া শুয়োরেরও।মানুষেরও।শুয়োর আর মানুষ এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে সহজে তাদের আলাদা করা যায় না। তবু একপাল শুয়োরের পাশাপাশি অনিবার্যত এসে পড়া একপাল শুয়োর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করালে এই সবের ভেতর থেকেও গুহিরামকে চিনে নেওয়া যায়।"[২]

গুহিরামের কাজ হল সারাদিন রোদে পুড়ে, জলে ভিজে শুয়োর চরানো আর এই কাজটি করতে গিয়ে তার শরীর একেবারে রুগ্ন হয়ে গেছে । দিন মজুরের কাজ করতে গেলে হয়তো তার কিছু রোজগার হতো কিন্তু সব দিন সে কাজ পায় না। কোনো কোনো দিন মানবাজারে কাজের সন্ধানে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তাই এই সময় গুহিরামকে গৃহপালিত শুয়োরগুলোর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতে হয়। শুয়োরগুলোকে নিয়মিত মাড় জল, তুষের গুঁড়ো তাকে দিতে হয়। অথচ যে মাড় জল খেলে শুয়োর গুলো গায়ে-গতরে হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে দু পয়সা উপার্জনের মুখ দেখাবে –"সেটা নিজেদের পেটে দিতে কুলোয় না। সেই মাড়ের জন্য সহিসের ন্যাংটো ছেলে বাটি হাতে বসে থাকে উনুনশালে।কাঠের উনুনে বসানো কালো হাঁড়িতে ভাত ফোটে।ভাত ফোটার গন্ধে, পেটের ভেতর খিদের মতো, সেও চনমন করে নাচতে থাকে।কখনো বা সেই উল্লাস নিয়ে, মাটির হাঁড়ির গায়ে যে কালির পুরু আস্তরণ পড়ে, তার ওপরে সে কাঠি দিয়ে আঁক টেনে টেনে শিল্পীর এক স্মারক রচনা করে।"[৩]

মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তিনটি উপাদান হল অন্ন- বস্ত্র এবং বাসস্থান। গুহিরামের মতো হাড়িপাড়ার মানুষদের অন্ন তো দূরের কথা, এক বাটি মাড় জল যেমন জোটে না তেমনি শরীরের আচ্ছাদনের জন্য এক টুকরো বস্ত্রও নেই। জরাজীর্ণ একটি ন্যাকড়াই তাদের একমাত্র সম্বল। আর বাসস্থান বলতে মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের ছাউনি। যে জায়গায় তাদের ঘরগুলির অবস্থান সেটা ভদ্র সমাজের কাছে হাড়িপাড়া। মাত্র বারোটি ঘর নিয়ে সহিসদের বসতি গড়ে উঠেছে। লেখকের বর্ণনা- "ক্ষেত আর জলাজমি থেকে পশ্চিমে যে স্থানটুকু কাছিমের খোলের মতো উঁচু হয়ে উঠে গেছে সেখানে মাটির ঘর আর খড়ের ছাউনি করে থাকে তারা। ঘরগুলোর গঠনও বিচিত্র।অথবা সেই অর্থে কোন গঠনই নেই বলা চলে। ঘরগুলোর স্থাপত্য হাড়িদের জীবন যাপনের মতোই কতকটা আদিম প্রকৃতির। বেশিরভাগ ঘরে দেয়াল নেই। মাথার ওপরে ঘরের ছাউনিটাই নেমে এসেছে মাটির কাছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত। ঘরের মেঝে বলতে একটা মাটির বেদি যা হাঁটু অব্দি উঁচু। তার ফলে এই ঘরে ঢোকার আলাদা করে কোনো দুয়োর থাকে না। দরকারও হয় না দুয়োরের।মাথাটা গলিয়ে অথবা হামাগুড়ি দিয়েই ঢোকা যায়।"[৪]

শুধু গুহিরাম নয় ভাকডু সহিস, গেনু সহিস, নিরঞ্জন সহিস সহ প্রত্যেক হাড়িকেই অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। কখনো কখনো রোগে অসুখে শুয়োরের কোন ক্ষতি হলে শুয়োরের মালিকরা তাদেরকে দোষারোপ করে। তাই দেখা যায় ভাকডুর প্রতিপালিত শুয়োরটি মারা গেলে মালিক বিষ্ণুপদ তাকে অকথ্য গালিগালাজ করেছে। তাকে শাসানি দিয়েছে- "ফের যদি আমার বরা মরেছে, ত তদেরকেও মরাব। পূজা দিব।শালা গরক চন্ডাল"।[৫]

হাড়িক উপন্যাসে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো রোহিণী উৎসব। হাড়িরা যতই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করুক না কেন, এই সময় তারা আনন্দ ফুর্তিতে মেতে ওঠে। রোহিনী মূলত কৃষি কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভালো ফসলের

কামনায় সমগ্র মানভুমের কৃষিজীবি মানুষেরা এই উৎসব পালন করে। হাড়িদের সঙ্গে লাঙল ও মৃত্তিকার কোন সংস্রব না থাকা সত্ত্বেও তারা এই উৎসবে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই গুহিরাম সহিস এই উৎসব উপলক্ষ্যে শুয়োর কাটার পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু শুয়োর কাটলেও হাড়িদের মধ্যে শুয়োর খাবার সামর্থ্য কারোরই নেই। হাড়ি পাড়ায় শুয়োর মাংসের অধিকাংশ খদ্দের আসে পাশাপাশি গ্রামগুলো থেকে। শুয়োরপালক হাড়িদের দশ টাকা কেজি দরে মাংস কিনে খাবার সৌভাগ্য হয় না। তাই মাংস খাবার ইচ্ছে থাকলেও অর্থাভাবে তাদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয় না।

> "গুহিরামের মতো যখন তারাও নিজেদের খাসি কাটে,কেবল সেদিন তাদের পাতে আমিষের গন্ধ লেগে থাকে কেবল ওই একটা দিন তারা পুরোসুরো খায়। ফেন ভাত নয়, ফেন থেকে ছেঁকে তোলা ঝাড়া ভাত।"[৬]

সামাজিক ক্ষেত্রেও হাড়িরা নানা বঞ্চনার শিকার। মানবাজারের মতো জনবহুল অঞ্চলে গেলে গুহিরামের মাংস বিক্রির সুবিধা হতো। "কিন্তু সেই লোকালয়ের মধ্যে হাড়িদের মাংস নিয়ে বসতে দেওয়া হয় না। সদরে শুয়োরের মাংসের বিক্রি নিষিদ্ধ।অথচ ছাগলের মাংসের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।"[৭]

বলাবাহুল্য এই সামাজিক বৈষম্যের অভিঘাতে তাদের জীবন জর্জরিত হলেও তাদের মধ্যে কোন অভিযোগ নেই। কোনো প্রতিবাদ নেই। সরকারি বিধি নিষেধের দোহাই দিয়ে তাদের প্রতি সমাজের এই বঞ্চনা তারা মাথা পেতে নিয়েছে। এটাই যেন তাদের নিয়তি। এ প্রসঙ্গে লেখকের শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য –"অস্পৃশ্যতাএবং সামাজিক ঘৃণা যে তাদেরকে কেবল সমাজের একপ্রান্তে নির্বাসিত করে দিয়েছে তাই না।বাবুদের সমাজের সব ব্যাপারে তাদেরকে করে দিয়েছে উদাসীন; নির্বিকার।বাবুদের সমাজ মনে করে কেবল বাবুদেরই সমাজ।হাড়িদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।"[৮]

হাড়িপাড়ায় হাড়ি পুরুষদের কাজ বিশেষ না থাকায় বাড়ির মহিলাদের ধাইয়ালি কাজের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কখন কার গৃহে গর্ভবতী মহিলা আছে সে সম্পর্কে তাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের কারণে হাড়ি বৌরা তেমন ডাক পায় না। গুহিরামের স্ত্রী লতিকা, নিরঞ্জনের স্ত্রী বিশালী সকলেরই প্রায় সমান অবস্থা।প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় হাড়িদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। সে সময় বসতবাড়িগুলি যেমন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তেমনি খাবার মতো ঘরে এক মুঠো চালও থাকে না। তাছাড়া কাজকর্ম করে যে এক মুঠো চাল কিনবে সেই উপায়টুকুও হাড়িদের নেই। এই সময় কেউই তাদেরকে কাজে লাগাতে চায় না। তাই দেখা যায় প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও স্ত্রী ছেলে মেয়ের পেটের কথা চিন্তা করে চিত্তকে কাজের খোঁজে মানবাজারে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সেখানেও তাকে শুনতে হয় কটুবাক্য- "দ্যাক! দ্যাক!শালা হাড়িটা কেমন আচকায় ভিজছে।"[৯]

তবে হাড়িরা কাজ পায় একমাত্র ধান কাটার সময়। কারণ তাদের মতো সস্তার মজুর পাওয়া যায় না। কাজ জোটাতে না পারলে বেকার থেকে যাবে এই আশঙ্কায় হাড়িরা যতটা সম্ভব মালিকের কাজ করার চেষ্টা করে। আবার কাজ করে সরকারের ধার্য করা ন্যূনতম মজুরিটুকুও তারা পায় না। ন্যায্য মজুরি দাবি করলে তাদের কাজ জোটানো মুশকিল হয়ে যাবে বলে তারা প্রতিবাদ টুকুও করে না। অন্যদিকে আবার শুয়োর বাগাল শিশুদের অসাবধানতায় শুয়োর কারো চাষের ক্ষেতে ঢুকে পড়লে ছাড়ঘরে গিয়ে তাদের মেটাতে হয় একটি নির্দিষ্ট অংকের জরিমানা। আবার গরু ভেড়ার চেয়ে শুয়োরের জরিমানা বেশি। কেউ জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে শুয়োর

নিলাম করে দেওয়া হয়। নিরঞ্জনের শুয়োর দিগাম মন্ডলের ধান ক্ষেতে প্রবেশ করার কারণে চৌকিদার নিরঞ্জনকে নোটিশ দিয়েছে। নিরঞ্জনের স্ত্রী বিশালী চৌকিদারকে কাতর অনুনয় বিনয় করলেও তার জরিমানা মার্জনা করা হয়নি। জরিমানার অতিরিক্ত দেড় টাকা বাঁচানোর জন্য নিরঞ্জন ছাড় ঘরে গিয়ে কাকুতি মিনতি করেছিল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। আর কিছুদিন দেরি করলে নিরঞ্জনের শুয়োর গুলো নিলাম হয়ে যেত। "তবু জরিমানা জমা দিতে যেটুকু দেরি সে করেছে, হিশেব মতো তার দন্ডও তাকে ভোগ করতে হলো। যে সাড়ে বারো টাকা জরিমানার ভয়ে বরাগুলো সে খালাস করে করতে পারে না, সেগুলোই তাকে চোদ্দ টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়।নোটিশ হাতে পাওয়ার পর থেকে প্রতি ঘন্টায় জরিমানা এক সিকি করে বাড়তে থাকে।"[১০]

সামাজিক বঞ্চনার পাশাপাশি হাড়িরা রাজনৈতিক দলাদলিরও শিকার। রাজনৈতিক কারণে হাড়িদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ যাবতীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা চোখে পড়ে। অথচ হাড়িরা এসব কিছুকেই মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। আর এই মেনে নেওয়াটাই যেন তাদের জীবনের নিয়তি। নেপাল চক্রবর্তীর মতো কিছু রাজনৈতিক নেতা বছরের পর বছর তাদের কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। সীতারামের কথায়- "এখন ভট পরব আসছে। বলতে গেলে বলবেক হামরা সোব করব। রাস্তা করব, টি কল করব, মানুইষের আর এই বরার ভিনু ভিনু হাসপাতাল করে দিব- লন্দর ফন্দর বহুত কিছু।"[১১]

গুহিরামের ছেলে নন্দলালের মৃত্যুকে ঘিরে হাড়িপাড়ায় রাজনৈতিক বিরোধ চরমে পৌঁছায়। ভাগের বরা নিতে এসে বিষম সরেন তির ছুঁড়ে গুহিরামের ছেলে নন্দলালকে হত্যা করলে হাড়ি পাড়ায় ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। নন্দলালকে মানবাজারের হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেলাইনের দ্বিতীয় বোতলটি শেষ হবার পূর্বেই নন্দলাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু দশ- বারো বছরের বালক নন্দলালের এই মৃত্যু হাড়িপাড়ার মানুষদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। লেখকের কথায়- "এই নাবালকের মৃত্যু হাড়িপাড়াকে নাড়া দিল ভেতর থেকে।পরস্পর মুখের দিকে চেয়ে তারা দেখতে পেল নিজেরই প্রতিবিম্ব। নিজেরই নিরাপত্তাহীন বিপন্ন অস্তিত্বকে।"[১২]

কিন্তু হাড়িপাড়ার এই একটি ছেলের মৃত্যু রাজনৈতিক নেতাদের হৃদয়ে কোন ছাপ ফেলে না। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে ছোট বড় সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এসব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থাকে। কারণ এসময় তারা প্রত্যেকেই ভোটের কাজে ব্যস্ত। পুলিশ অপরাধীকে ধরা তো দূরের কথা, রাজনীতির ছত্রছায়ায় ঢুকে বিষম সরেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে নিজের করায়ত্ত করে নেয়।

> "বিষম অবশ্য বেশিদিন পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারল না। সেভাবে থাকেও নি।আসলে সে পার্টিতে প্রভাবশালী এবং জেলাস্তরের নেতাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে বলে বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে তাদের আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল।প্রয়োজনে কিছু টাকা-পয়সাও খরচ করতে কসুর করল না। তার মতলব হলো যে করেই হোক মামলাটিকে খারিজ করার ব্যবস্থা করা।"[১৩]

বস্তুতঃ মামলা মোকদ্দমা চালাতে গিয়ে গুহিরাম সর্বসান্ত হয়ে যায়। তার পক্ষে আর মামলা চালানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আর এই দুর্দশার সুযোগে নেপাল চক্রবর্তী টাকার প্রলোভন দেখিয়ে হাড়িদের মীমাংসা করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তার আসল উদ্দেশ্য বিষমকে

খালাস করে মহুলবনা গ্রামের সকল ভোট আদায় করা। কারণ সেখানকার জনগন কেবলমাত্র বিষমের নির্দেশেই ভোট দেয়। কিন্তু নেপাল চক্রবর্তীর এই গোপন অভিসন্ধি হাড়িদের বুঝতে দেরী হয়নি। তারা বিষমের শাস্তির ব্যাপারে অনড় থাকলে নেপাল চক্রবর্তী জানায় –"ভোটের বাদে উয়ার দন্ড হবেক।"[১৪]

হাড়িরা সিদ্ধান্ত নেয় পানীয় জল, লোকদীপ প্রকল্পের সুযোগ, শুকর চাষের আধুনিকীকরণ, সরকারি সাহায্য ও লোন, পাঁঠার মাংসের মতই প্রকাশ্য বাজারে শূকর মাংস বিক্রির সুযোগ সহ নানারকম ব্যবস্থা করে না দিলে কোন পার্টিকেই তারা ভোট দেবে না। গুহিরাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করে- "শালারা ভট্ ভট্ করে হামদের ঘর দুয়ার কাদা করে দিছে। কাকৌ দিব নাই ভট। কাকৌ নাই।"[১৫] নির্বাচনী লড়াইয়ে নামাপ্রার্থীরা যতই হাড়ি পাড়ায় ঢোকার চেষ্টা করে হাড়িরা ততই তাদের প্রবেশে বাধা দেয়। তারা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে- লিকাল যাও। লিকাল যাও।

বলা বাহুল্য হাড়ি পাড়ার মানুষদের এই দুর্জয় প্রতিবাদ ভোটের ময়দানে নামা কোনো পক্ষই ভালোভাবে নেয় না। তারাও এটাকে ঠেকানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায়, শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হাড়িপাড়ার অধিবাসীদের ছোট ছোট চালাগুলিতে আগুনের লেলিহান শিখা।

"ভোরের আগেই হাড়িপাড়া পরিণত হলো ছোট একটা শ্মশানে।খড় আর তালপাতার ঝুপড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পুড়ে গেছে চালের ওপরকার সমস্ত কাঠ, বাতা। ঘরের পাশে পাশে ছোট ছোট খোঁয়াড়গুলোও ভেঙে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের বসবাসের আর কোন সম্ভাবনা যেন এখানে নেই।"[১৬]

বস্তুতঃ এই উপন্যাসে লেখক সৈকত রক্ষিত তাঁর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হাড়িদের জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিন্নতার স্বতন্ত্র মাপকাঠি। উঠে এসেছে তাদের দৈনন্দিন সংস্কার- বিশ্বাস, পূজা পার্বণ লোকাচার ইত্যাদি। যে আগুনে হাড়িদের ঘরগুলো পুড়ে গেছে সেই আগুনের তাপে তারা আরো সজীব হয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। তাই অগ্নিদহনে সৃষ্ট শ্মশান ভূমিতে ছাইয়ের স্তূপ সরিয়ে তালগাছের ঢাকউসপাতা দিয়ে নিরঞ্জন নতুন করে ঘর বাঁধার সংকল্প করে। "আবার ছুটতে থাকে শুয়োরের পাল। ক্ষেতে মাঠে। ছেলেরা দাপাদাপি করে গাছের ডালে। পুকুরের ধারে। গুলতি হাতে নিয়ে তারা ঝোপঝাড়ে মেরে বেড়ায় কাউয়া-বনি, গিরগিটি।মেয়েরা খেজুরপাতার ঝাঁটা বানিয়ে তকতকে করে ঝাঁট দেয় উঠোন।"[১৭]

তথ্যপঞ্জি (reference):

১) সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে, সম্পাদনা অরূপ পলমল, তপতী পাবলিকেশন, ৯/4 টেমারলেন, কলকাতা-০৯প্রথম প্রকাশ ৮ নভেম্বর, ২০২২ পৃ. ৩৪

২) সৈকত রক্ষিত 'হাড়িক', শিল্পসাহিত্য, ৪৯ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৯

৩) তদেব, পৃ.১০

৪) তদেব, পৃ.১১

৫) তদেব, পৃ.১৮

৬) তদেব, পৃ.২৫

৭) তদেব, পৃ.২৫

৮) তদেব, পৃ.২৬

৯) তদেব, পৃ.২৮
১০) তদেব, পৃ.৩৬
১১) তদেব, পৃ.৩২
১২) তদেব, পৃ.৭০
১৩) তদেব, পৃ.৭৪
১৪) তদেব, পৃ.৭৭
১৫) তদেব, পৃ.৮১
১৬) তদেব, পৃ.৮৩
১৭) তদেব, পৃ.৮৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১) দেবসেন ড. সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণী ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৯।

২) বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯ প্রথম প্রকাশ জুন ২০২৩

৩) সেনমজুমদার জহর, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন,পুস্তক বিপনি, ২৭, বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা -৯ প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৭।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা : নৈরাশ্যে থেকে জীবনবোধের উত্তরণ

হাসনারা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক মানুষের একাকিত্ব, হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদের বেড়াজাল বড়ই ক্লান্তিকর। বাস্তব জীবনের নানা সীমাবদ্ধতা তাকে গণ্ডীবদ্ধ জীবনে আবিষ্ট করে রেখেছে। আধুনিক কবির ভাষায় সেই নিঃসঙ্গ যাপনের প্রকাশ ঘটেছে নিরন্তর। এক নঞর্থক জীবনাদর্শ কখনো কখনো কবিতা রচনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে এসেছিল হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ, বিষন্নতা আর নিঃসঙ্গতা। যে কোনো যুদ্ধের প্রভাব গ্রাম অপেক্ষা শহরে, নজরজীবনকে বেশি প্রভাবিত করে। সেদিক থেকে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক কবিদের জীবনে হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ ইত্যাদির প্রভাব স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যেও আমরা সেই প্রভাব লক্ষ করি। তাঁরা হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদকে তাঁদের জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দুঃখকে দুঃখ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কেউ কেউ জীবনাদর্শকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ পেরেছেন, কেউ তা থেকে উত্তোরণের কখনও পথ খুঁজে পাননি। আধুনিক বাংলা কবিতায় হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ এর ধারা ত্রিশের দশক থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাধারার বিপ্রতীপে অন্য এক স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টির প্রয়াস থেকেই তার সূত্রপাত।

বিশ শতকের ষাটের দশকের কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর (১৯৪৫-২০০৫) কবিতায় আমরা এই হতাশা, ক্লান্তি, বিষাদ, বিষন্নতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, বিপন্নতা দেখি। এমনকি প্রেমের কবিতাতেও নৈরাশ্যের সেই ক্লান্তিকর আর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ (১৯৭১), ‘এসো, সুসংবাদ এসো’ (১৯৮১), ‘রাস্তায় আবার’ (১৯৮৩), ‘দেবতার সঙ্গে’ (১৯৮৬), ‘আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে’ (১৯৮৯), ‘স্বপ্ন দেখার মহড়া’ (১৯৯৩), ‘তুমি আমার ঘুম’ (১৯৯৮), ‘নীল রঙের গ্রহ’ (১৯৯৯), ‘কীরকম আছো মানুষেরা’ (২০০৫), ‘জিরাফের ভাষা’ (২০০৫), ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৯৯৯)। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে ‘প্রিয় সুব্রত’, ‘শয়নযান’ (১৯৯৮) উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ (১৯৭১)। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল। এই কাব্যগ্রন্থে উঠে এসেছে আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও শূন্যতাবোধের অমোঘ অকাট্য বোধ। এই কবিতাগুলি একদিকে নাগরিক জীবনের কান্না, স্তব্ধতা ও দীর্ঘশ্বাসের অবিকল চিত্ররূপ অন্যদিকে ক্লেদ, গ্লানি ও হতাশার বিরুদ্ধে এক ক্ষুব্ধ কবি হৃদয়ের নিরন্তর উপলব্ধি। কবি ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ‘দ্বিতীয় চিৎকার’ কবিতায় বললেন—

> “হাস্যকর তোমার অতীত—হাস্যকর তোমার ভবিষ্যৎ
> পুরোনো মুখগুলো তোমার থেকে সরে যাচ্ছে আরও তোমার পিছন দিকে
> মুখ থেকে উঠে, তোমার জন্যে উনুনে-সেঁকা পাউরুটি কোনোদিন
> আর খবরের কাগজ, আর রাতদিন”

(‘দ্বিতীয় চিৎকার’/‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’)

কিংবা, একই কবিতার অংশ—

“ঘটনাহীন ঘটনাহীন মস্ত ঘটনাহীন তোমার জীবন
কফির কাপে, মিছেই তুমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছো তোমার ব্যগ্র চামচ
তোমার মাথার ওপর চিরপুরাতন, সেই এক, পতনোন্মুখ চাঁদ”

(‘দ্বিতীয় চিৎকার’/‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’)

অথবা, কবি যখন বলেন—এই সে দিন এক শুয়োর তোমাকে অপমান করেছে। আর তার ফলে হঠাৎ আত্মা, লম্বা জুতোর চেয়েও আরও লম্বা হয়ে গেছে- এই উচ্চারণ আসলে বাংলা কবিতায়, বিপন্ন-বিষণ্ণ নাগরিক মানুষের ‘অথেনটিক’ কাব্যভাষাকে দ্যোতিত করে। এই কাব্যভাষার আবিষ্কারই ভাস্কর চক্রবর্তীর কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। গ্লানিময় ও অন্তঃসারশূন্য এই নগরজীবনের যথাযথ কাব্যভাষা দেবার তাগিদে বলেন—

“বছরের প্রথম দিনেও তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ একা একা
বছরের শেষ দিনেও তাই”

(‘দ্বিতীয় চিৎকার’/ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’)

কবির এই বেড়ানো আসলে নাগরিক মানুষের হতাশাকেই তুলে ধরে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে এই ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর প্রসঙ্গে তিনি ‘১৯৬৭’ কবিতাতেও উল্লেখ করেছেন—

“এখনও আমি বেঁচে আছি ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাবতেই অবাক লাগে কেমন
কিরোর মতে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল গতবছরেই
অথচ এখনও ফুরফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে প্রতিদিন”

(‘১৯৬৭’/ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’)

কবির এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে ‘ফুরফুরে হাওয়া’ লাগানোর আমেজটি অচিরেই নষ্ট হয়েছে। সেই জায়গায় এসেছে হতাশা। নাগরিক জীবনের দুঃসহ ক্লান্তি, শহরের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবিকে এক অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেয়। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে টিকতে পারেন না। হতাশার কালো দীর্ঘশ্বাস ডানা ঝাপটায়। কবি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন—

“কী বিশ্রীভাবে যে শুরু হয় আজকাল সন্ধেগুলো—চুপচাপ, আমি ঢুকে পড়ি ঘরে। দেখি, টেবিল ল্যাম্প মরার মতো পড়ে থাকে টেবিলের ওপর, মনে হয়, আমাকে খুশি করার কোনো ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই আর। এয়াস্ট্রে, ভয় হয়, আধ-পোড়া সিগারেটগুলো হয়তো আর গিলতে চাইবে না। বইগুলোর হাবভাব দেখে মনে হয়, কোনো পাতাই তারা আর খুলতে দেবে না সারারাত। এই যে রাত, এই যে লম্বা, আকাশছোঁয়া, মন্থর রাত শুধু ডানা ঝাড়ে আর ডানা ঝাড়ে— আর ছুঁড়ে দেয় নৈশব্দ্য, অন্ধকার, আর ধারালো ছুরি-ছোরা—”

(‘দু-চার লাইন’/‘এসো, সুসংবাদ এসো’)

আর হতাশার আবছায়া থেকেই বিচ্ছেদ এবং বিষাদের নিরস প্রহরগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কখনও সেই বিচ্ছেদ বন্ধুত্বের স্মৃতিকেও উস্কে দেয়। কিন্তু ক্লান্তকর জাগরণের মুহূর্তগুলি কোন উপশম পায় না।

“আমার যে হয়েছে কী মুশকিল দিনগুলো আর কাটতেই চায় না।
বন্ধুদের হাতগুলোও এমনই কৃপণ যে কাঁধেও পড়ে না
গলাগুলোও এমনই শুকনো যে ঘুম পাড়ায় না আমাকে।
তবে কি ওষুধপত্রই সারাজীবন ছড়িয়ে থাকবে আমার ঘরে?”

('বিশাল এই মহাদেশের ছায়ায়'/'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে')

হারানো দিনগুলি যখন স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে, তখন বেদনার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ভালো-মন্দের স্মৃতিচারণ কবিকে শুধুই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে ভরপুর করে তোলে—

"সাদাকালো দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার রক্ত, ঘাম, ভাইসব
আমি ভুলিনি কোনোকিছুই, আমি ভুলিনি
ঘুষির কথা, অপমান, আর চোখের জলের কথা
দেখো—আজো রাত হলো অনেক—ঘুমোতে পারছি না আমি।"

('ভাইসব'/'রাস্তায় আবার')

জীবনের যাবতীয় বিষাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে তিনি মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু সেখানেও রয়েছে সংশয়। কারণ বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ ইচ্ছা এখনও মরেনি। এই দ্বন্দ্বই কবিকে সংশয়ের চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

"—এটা কি সত্যি যে আমি মরতে চাই
এটা কি সত্যি যে আমি মরতে চাই
বেঁচে-থাকার জন্যে, তুমি বলো, আমি কি পাশ ফিরে শুইনি বিছানায়?"

('শান্তিহীন একটি'/'রাস্তায় আবার')

কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে নৈরাশ্যের আধিক্যে। আর কবির জীবনে নেমে এসেছে বীতশ্রদ্ধ এক শূন্যতা। অর্থহীন জীবনের হাহাকারকে স্থান দিয়েছেন কবিতার লাইনে -

"জানি না আমি— অর্থহীন বারান্দা
শুধু শুধুই জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতর—হায়, জীবন
আর কিছুই মনে পড়ে না আমার—আমার কিছুই মনে পড়ে না আর"

('হায়, জীবন'/ 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা')

অর্থহীন এই জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়াই তাঁর কাছে একমাত্র রাস্তা বলে মনে হয়েছে। নাগরিক জীবনের বিপন্নতা কবিকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেখান থেকে বাঁচতে পলায়ন বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। কবি জানেন এই পলায়নের কোন গন্তব্য নেই, তার মধ্যে কোন ভালোলাগা নেই। কিন্তু মানুষের ভিড়ের মধ্য থেকে তিনি নিভৃতে ঘুম চান।

".....—আমি
মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই
তড়বড়ে নিশ্বাস ফেলি এখন—যে-দিক দিয়ে আসি, সে-দিকেই দৌড় দিই
কেন এই দৌড়ে যাওয়া? আমার ভালো লাগে না
শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব"

('শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'/'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা')

কবি যখন কোথাও বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন এক চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জীবনের পরিসমাপ্তি। জীবনের চরম সত্য, এই মৃত্যুকে তিনি আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন। মৃত্যুর পরপারে হয়তো আর কোন হতাশা, আর কোন দৈনতা থাকবে না। কবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিরঘুমে শায়িত থাকবেন। তাই জীবনের সব গ্লানি মুছে ফেলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। 'রাস্তায় আবার' কাব্যগ্রন্থের 'কবিতা ১৪৩' নামক কবিতায় কবির সেই আর্তি ফুটে উঠেছে—

"শেষ হলো সময়। এবং, আমার জীবন।
—তেমন কিছু আফশোষ নেই আর।"

('কবিতা ১৪৩'/'রাস্তায় আবার')

কবির এই মৃত্যু বোধ জন্মেছে প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়েই। প্রিয়জনের মৃত্যু কবিকে জীবনের পরিসমাপ্তির পাঠ দিয়ে যায়। 'জীবন সংগীত' কবিতায় কবি তাই নিজের মায়ের মৃতদেহ খুঁজে বেড়ান—

"আমার মায়ের মৃতদেহ
কোন্ গাছে
ঝোলানো রয়েছে, আজো আমি
দেখি খুঁজে-খুঁজে।"

(জীবন সংগীত/'রাস্তায় আবার')

কবির কাছে মৃত্যু শুধুমাত্র কাব্যিক নস্টালজিয়া বা জীবনাদর্শের জটিল তত্ত্ব নয়, মৃত্যু কখনও কখনও 'দুই-তিন পয়সার খেলা'। আর পাঁচটা সাধারণ ক্রিয়ার মতো, খাওয়া-দাওয়া, মলমূত্র ত্যাগের মতো অতি তুচ্ছ ঘটনা। তাই তো তিনি মৃতুকে দুই-তিন পয়সার খেলা বলেছেন—

"মৃত্যু
দুই-তিন পয়সার খেলা।"

(মৃত্যু সম্পর্কে আরো/৪২)

দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কবির যাবতীয় 'ক্রিয়েটিভিটি'র মৃত্যুও ঘটে গেছে। আর সেই কারণেই হয়তো কবির যন্ত্রণা আরও বেশি। ভিতরে মৃত্যুর এক গভীর ছায়া সবসময় কাজ করত বলেই কবিতায় মৃত্যুর অনিবার্য উপস্থিতি তাঁর কবিতাকে সময়ের নীরব শাসনে দীক্ষিত করেছে।

"আমার ঘুমের ভেতরে
তুমি ঘুমিয়ে আছ, তোমার দিদিও ঘুমিয়ে আছে দেখি,
দেখি, আমার সমস্ত লেখালেখির ভেতরে মৃত্যু তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।"

(কবিতা ১৩৪/ 'রাস্তায় আবার')

আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর কবিতায় মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। কবি যেন মৃতুকে কবিতায় যাপন করতে চেয়েছেন, তিনি বারবার অসুস্থ হতে চেয়েছেন, অসুস্থ হওয়ার অনুভূতির আস্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। হয়তো সেজন্যই তাঁর কবিতায় অসুস্থ হওয়ার প্রসঙ্গকে কবিতার বিষয় করতে পেরেছেন। কবির কাছে মৃত্যু কখনও পালিয়ে যাওয়ার পথ হয়েছে, আবার কখনও যাপনের একটি অঙ্গ হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। নাগরিক কবির উদ্দেশ্যহীন জীবন, নিঃসঙ্গ যাপন, বিষাদ-বেদনাময় পথ চলা সময়ের আখ্যানকে পংক্তি দিয়েছে।

আসলে, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের এক উত্তাল সময়ে কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর আবির্ভাব। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার সেই যুগে ব্যক্তি মানুষের নৈরাশ্য, সামাজিক মূল্যবোধহীনতা মানুষকে একাকীত্বের বেড়াজালে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। মৃত্যুভয়, জীবনকে সংকীর্ণ এক খাতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সেই নৈরাশ্যের গলি থেকেই ভাস্কর চক্রবর্তীর 'জার্নি' শুরু হয়। এপ্রসঙ্গে কবি নিজেই তাঁর 'শয়নযান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক কবির মনে তখন এক ভয় কাজ করেছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয়, উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ভয়।

"যে দমবন্ধ জীবনের মধ্যে কোনোরকমে টিঁকে থাকতাম, তা থেকেই হয়তো জেগে উঠেছিল এক বিশাল ভয়। শহরের এ দিকটায় ১৯৭১-এ যে গণহত্যাটা হয়ে গিয়েছিল, আড়াই দিন সে-সময় বন্ধ ঘরে বসে বসে, আমার স্নায়ু বলতে আর কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত অসুস্থতা ঘিরে ধরল আমাকে। আমাকে ঘিরে ধরল অনিদ্রা।"[১]

তবে, সেই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছিলেন তিনি। জীবনবাদী কবি, নৈরাশ্যের যাবতীর চোখ রাঙানি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি' বইয়ে কবি লিখেছেন— "আমি লিখি, আমাদের সময়টাকে চাকার মতো, সূর্যাস্ত পেরিয়ে আরো একটু দূরে গড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। আমাদের সময়ের স্বপ্ন, বিরক্তি, বিচ্ছিন্নতা, ওষুধ, মজা, ব্যর্থতা, হাসিঠাট্টা, এসবই এসে ভিড় করেছে আমার কবিতায় — আমি শুধু তাদের মধ্যে একটু মায়া মিশিয়ে দিয়েছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও যারা দেখতে পান না নিজেদের, আমার ভাবতে ভালো লাগে, আমার কবিতায় তারা নিজেদের ঠিকঠাক চিনতে পারবে।"[২]

সময়ের দলিলকে লিপিবদ্ধ করতে ভাস্কর চক্রবর্তীর এই কবিতা যাপন তাই শুধুমাত্র নৈরাশ্যের ধুসর শূন্যতাকে তুলে ধরেনি। সেখান থেকে উত্তোরণের ইঙ্গিতও রয়েছে। যাবতীয় নঞর্থককে সামনে দেখেও, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ভীরুতা চেপে বসলেও জীবনবাদী কবি শেষ পর্যন্ত জীবনের ছন্দে ফিরতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় গণহত্যার রক্তাক্ত ক্যানভাস, 'আয়োডিনের গন্ধ', তা সত্ত্বেও কবি বাঁচতে চাইছেন। তিনি ডাক্তারকে বলছেন—

"ওগো ডাক্তারবাবু মোটা ডাক্তারবাবু কালো ডাক্তারবাবু
আমার সর্দি-কাশি ভাল করে দিন
আমার না-খেতে-পাওয়া দিনগুলোর কথা ভুলিয়ে দিন
আমার দুশ্চিন্তা দূর করুন, বিষণ্ণতা দূর করুণ,"

('আজ অথবা কাল অথবা পরশু'/ 'রাস্তায় আবার')

কবির সেই বাঁচার আর্তি 'সন্তাপ' কবিতাতেও দেখি -

"আজো আমি বেঁচে থাকতে চাই।-আজো আমি
সহসা উজ্জ্বলভাবে
হেসে উঠতে গিয়ে দেখি"

('সন্তাপ/ 'রাস্তায় আবার')

তাই একসময় যে মৃত্যুর শোক কবিকে বিহ্বল করেছিল, যে মৃত্যু কবিকে পলায়নের পথ দেখিয়েছিল, কবি তা থেকেও উত্তোরণের পথ খুঁজে নিয়েছেন। জীবন-মৃত্যুর খেলায় জীবনক্রের চরম সত্যকে আত্মস্থ করে কবি যখন বলেন—

"দুই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যিখানে, মৃত্যু, আমি তোমাকে
জন্মাতে দেখেছি"

('এপিটাফ'/ 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে')

তখন ধ্বনিত হয় জীবনেরই জয়গান। নতুন করে আবার জাগার এই আশা, হতাশার অন্ধকারকে কাটিয়ে দেবে। কারণ, এই বিশ্বসংসারের প্রতি তাঁর অমোঘ বিশ্বাস। তাই নতুনের জয়গান গেয়ে তিনি বলেন —

"প্রাচীন পৃথিবী এই সহসা নতুন হয়ে একদিন জাগবে জানি—
আজ তুমি দেখাও তোমার নাচ—

হৃদয়, সহস্রতম হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকো তাঁকে”

(১৫ / ‘দেবতার সঙ্গে’)

কবির কাছে এই উজ্জীবন আসলে জীবনের রঙিন উপহার এনে দেয়। তাই হতাশার ভাষা-মৃত্যু এখন ভাষা উপহার দিয়ে যায়। যাপনে – সৃজনে আকাশে রঙিন আভাস ফুটে ওঠে। মৃত্যুর ভাষা উপহার সৃষ্ট করে লেখার রঙিন জগৎ। –

“মৃত্যু এসে কবিতার ভাষা উপহার দিয়ে যায় আমাকে
আর জীবন ঢেলে দেয় রঙ।
হাহাকারের পেছনদিকের আকাশে আজ জেগে উঠেছে রঙিন আলো”

(‘হেমন্তভাবনা’/ ‘আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে’)

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা জীবনের অন্তর্গত বিপন্নতাকে যেন টেনে বের করে আনে, জীবনকে অশান্ত করে তোলে। পাঠককে এক যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর কবিতায় মূলত তাঁর জীবন, বর্তমান যা ইতিহাস হয়ে উঠবে তাকে নিয়ে উপস্থিত। তাই তাঁর লেখায় আসে বরানগরের গণ হত্যাকাণ্ডের কথা, নকশাল আন্দোলনের ছায়া। তবে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় নয় মৃদু সংলাপে সেইসব হতে চলা ইতিহাস ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়। তাঁর ভিতরে চলতে থাকা চেতনাপ্রবাহই তাঁর কবিতার বিষয়।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় মনখারাপ, অ্যালিয়েনেশন, বিচ্ছিন্নতা রয়েছে একথা সত্যি। তিনি যে চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে দেখেছেন সেখানেও অ্যালিয়েনেশন আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকুই তাঁর কবিতার পরিচয় নয়। তাঁর কবিতা জীবনকে চিনিয়ে দেয়। কখনও মৃত্যুর শীতলতাকে কবি অনুভব করেন এক স্বপ্নের ঘোরের মতো। অথচ মৃত্যু যেন খাওয়া-দাওয়া ও মলমূত্র ত্যাগ করার মতো অতি সাধারণ ঘটনা। মৃত্যুতে যেন বীভৎসতা নেই, বিরাট ক্ষতির কথা নেই। আর একথা তো সত্যিই মৃত্যুও সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনারই একটি। তাই তিনি তাকে মাত্রাছাড়া গুরুত্ব দিতে চাননি। যেখানে মৃত্যুর হাতছানি রয়েছে, আবার জীবনের জয়গানে উত্তোরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাঁর জীবনে যা যা ঘটে চলেছে তাই তাঁর কবিতার বিষয়।

ভাস্কর চক্রবর্তীর লেখার বৈশিষ্ট্য, তাঁকে যে স্বতন্ত্র কণ্ঠ দিয়েছে তা অবশ্যই তার লেখার কৃৎকৌশল। তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দ দৈনন্দিন জীবনের ঘর-গৃহস্থালি থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রতিটি লাইন একধরণের মোনোলগ। তবে তাতে মেলোড্রামা নেই, নাটকীয় আকস্মিকতা আছে। কবিতাগুলো এক ধরণের আত্মকথন। একা একা লাগাতার কথা বলে যাওয়া। নিজের সঙ্গে নিজের কথা। তাঁর কবিতা ক্রোনোলজিক্যাল চিহ্ন বিহীন এক ধরনের দিনলিপি যেখানে সময় সামনে পিছনে যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ায়। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার এই ‘জার্নি’, এই উত্তোরণ আসলে কবির জীবনদর্শনেরই উত্তোরণ। যুবক বয়েসের হতাশা-ক্লান্তি-নৈরাশ্যের জালকে অভেদ্য রূপে মেনে নেওয়ার জন্যই তাঁর জীবনে নিঃসঙ্গতার, মৃত্যুভয়ের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছিল। কবিতায় তার নির্মম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু আলো-অন্ধকারের মেলবন্ধনের এই জীবন শুধু ব্যর্থতাকে ঘিরেই অতিবাহিত হয় না। সময়ের অপ্রতিরোধ্য প্রলেপ উত্তোরণের পথ দেখাবেই। তাই পরিণত ভাস্কর চক্রবর্তী মৃত্যুকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলেই মেনে নেন। যাবতীয় অন্ধকারকে স্থিরতা দিয়ে, তার মধ্য থেকেই আলোর উৎস খুজে নেন।

তথ্যসূত্র:

১. ভাস্কর চক্রবর্তী, 'গদ্য সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), সুমন্ত মখোপাধ্যায় ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.-৩০৩।

২. তদেব, পৃ. – ২২৫।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

- অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', কলকাতা, ভারত বুক এজেন্সী, ২০০৩।
- দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' কলকাতা, দে'জ, ডিসেম্বর ২০০৭।
- ভাস্কর চক্রবর্তী, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কলকাতা, দে'জ, ডিসেম্বর ১৯৯৯।
- ভাস্কর চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), সুমন্ত মখোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১২।
- ভাস্কর চক্রবর্তী, 'কবিতা সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), সুমন্ত মখোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১০।
- ভাস্কর চক্রবর্তী, 'গদ্য সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), সুমন্ত মখোপাধ্যায় ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩।
  সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা', কলকাতা, সবিতা প্রকাশ ভবন, ভাদ্র ১৩৬৬ বাং।

কিন্নর রায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প : বিশ্বায়ন ও পরিবেশ ভাবনা

ঈশিতা সিন্‌হা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে একটি বহুল আলোচিত বিষয় বিশ্বায়ন ও পরিবেশ। বিশ্বায়নের ফলে গৃহীত মুক্ত অর্থনীতি, দ্রুত গতিতে পুঁজির বিকাশ, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি সরাসরি প্রভাব ফেলেছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে। পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও জীবনচর্চার। অন্যদিকে আধুনিকায়নের ফলে ধ্বংশ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। বনাঞ্চল কেটে, জলাশয় বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট, শপিংমল ইত্যাদি। হারিয়ে যাচ্ছে পশুপাখিদের স্বাভাবিক খাদ্য ও বাসস্থান।

বিশ ও একুশ শতকের একজন স্বনামধন্য গল্পকার কিন্নর রায়। তাঁর লেখনীর বিষয়বৈচিত্র্য তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনেরই প্রতিফলন। কিন্নর রায়ের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সারথি হল ‘সময়’। সময়ের সঙ্গে সমাজের পরিবর্তনশীলতা তাঁর লেখনীতে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর গল্পগুলিতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিষয় বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদল, পরিবেশ ভাবনা, বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। কিন্নর রায়ের লেখা ‘টেকনোলজি টেকনোলজি’, ‘এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার’, ‘একাগাছ’, ‘অনন্তের পাখি’, ‘বাঞ্ছাকল্পতরু’ ও ‘মেঘচোর’ এই ছয়টি গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে বিশ্বায়ন ও পরিবেশ ভাবনার দিকটি আলোকপাত করা হবে। কিন্নর রায়ের সমগ্র কথাসাহিত্য জুড়ে বিশ্বায়ন ও পরিবেশ ভাবনার ছাপ আছে। ‘টেকনোলজি টেকনোলজি’ গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন বিশ্বায়নের প্রভাবে কীভাবে বিদেশি টেকনোলজি এদেশে প্রবেশ করে মানুষের সাধারণ জীবন চলাচলকে উচ্চাকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে। ‘এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার’ গল্পে আমরা দেখছি ‘এন্টারটেনমেন্ট’-এর নেশা কীভাবে শিশু থেকে যুবক সকল শ্রেণীর মানুষের কাজের প্রতি মনসংযোগ নষ্ট করছে। ‘একাগাছ’, ‘অনন্তের পাখি’ ও ‘মেঘচোর’ গল্পে আমরা দেখতে পাই গল্পকারের পরিবেশভাবনা ও পরিবেশ সংকটের দিকটি।

সূচক শব্দ: এন্টারটেইনমেন্ট, কিন্নর রায়, টেকনোলজি, পরিবেশ, প্রযুক্তিবিদ্যা, বিশ্বায়ন, রাজনৈতিক পালাবদল।

মূল আলোচনা:

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন। **১৯৯১** সালে ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত মুক্ত অর্থনীতি, যার ফলে ভারতে শুরু হয় বিশ্বায়ন নামক প্রক্রিয়ার। বস্তুতপক্ষে, বিশ্বায়ন কোন একদিনের হঠাৎ আগত ধারণা নয়। আশির দশকের সূচনা লগ্ন থেকেই এর প্রভাব দেখা যায়। বিশ্বায়নের ফলে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে প্রযুক্তি নির্ভর, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-কর্পোরেট শক্তির বিস্তার ঘটে, ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে কামনা বাসনার দিকে চালিত করে। আবার বিশ্বায়ন সরাসরি প্রভাবিত করে চলেছে পরিবেশকে। মানব জীবনে পরিবেশের মূল যে উপাদানগুলি একান্তই প্রয়োজন তা হল

আলো, জল, বায়ু ও মাটি। বিশ্বায়নের ফলে মানুষের নিত্য জীবন চলাচলের বাহ্যিক উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও, নানাভাবে পরিবেশের মূল উপাদানগুলি ধ্বংস হয়ে চলেছে। রাস্তায় অত্যধিক ইঞ্জিনচালিত যানবাহনের ফলে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ বেড়ে চলেছে। অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে সৌরমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর শহরে কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে জলাশয় ও নদীর জল ক্রমশই দূষিত হয়ে চলেছে। অত্যাধিক প্লাস্টিক ব্যবহার, কৃষিকাজে কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে বিষাক্ত রেডিয়েসেনের শিকার হয়ে শত শত জীব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ সহ অন্যান্য জীবেরা এর ফলে ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশি পুঁজির আগমনের ফলে দেশের সামাজিক গঠনে পরিবর্তন এসেছে। সমাজ বদল ঘটলে তার প্রভাব পড়ে সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়ন নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় আশির দশক থেকে। বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কর্মহীনতা, শিক্ষা চিকিৎসা সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতিসাধন, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবেশ বিপন্নতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে। কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় একজন সমাজ ও পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণারই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যে। বিশ্বায়নের ফলে ঘটে যাওয়া আধুনিকীকরণ লেখক মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্প ও উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে বিশ্বায়ন ও পরিবেশ ভাবনার কথা।

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের নানাভাবে গ্রাস করেছে। কিন্নর রায় 'টেকনোলজি টেকনোলজি' গল্পে সেই দিকটি দেখিয়েছেন। গল্পটি লেখা হয়েছে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় তথ্যপ্রযুক্তির বাজার আজকের মতো রমরমা ছিল না বা বলা চলে সমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণ ছিল। আলোচ্য গল্পে দিলীপের স্ত্রী মণিকা ও তাদের সাড়ে-তিন বছরের মেয়ে টিভিতে বিনোদন দেখার প্রতি আকৃষ্ট। দিলীপের বাড়িতে টিভি নেই। পাশের বাড়িতে গিয়ে আঞ্চলিক সিনেমা থেকে শুরু করে হিন্দি নাটক সব কিছুই দেখে আসে তারা। সাড়ে-তিন বছরের মেয়েটির মুখ দিয়ে আনমনে বেরিয়ে আসে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের 'ট্যাগ লাইন'। এমনকি মণিকা ঘর-গৃহস্থলির কাজের স্বল্প বিরতির মাঝেও এক ঝলক টিভি দেখে আসে, এই 'Addiction' গল্পকারকে ভাবিত করে।

'টেকনোলজি'র মাধ্যমে বিদেশি পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে গেছে। বলা চলে উত্তর ঔপনিবেশিক মনোভাবের ফলে দেশের বাজারে বিদেশি পণ্যের চাহিদা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। কিন্নর রায় এই দিকটি গল্পে নির্দেশ করেছেন। দিলীপের কর্মস্থলের মালিক মধুবাবুর বিভিন্ন বিদেশি ব্র্যাণ্ডের পণ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তার 'জিনসের শার্টে' লেখা– 'ইউ.এস.এ আর্মি'। মধুবাবুর আচার-ব্যবহারের দিকটিও লক্ষণীয়। ছুটির দিনে কর্মীদের দিয়ে কাজ করানো, কর্মীদের অফিসে আসতে দেরি হলে রাগান্বিত হওয়া, কর্মীদের দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করানো। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক যেন দেখাতে চেয়েছেন যন্ত্রনির্ভর আধুনিক মানুষ নিজেও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে।

এছাড়া গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবেশ দূষণের প্রসঙ্গ পাই। বিষাক্ত পলিপ্যাকের ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। আজকাল পলিথিনের ব্যবহার এতোটাই বেড়ে গেছে যে, তা যেন নিত্য সামগ্রী আনয়নে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন— **'আর**

পলিপ্যাকে এখন তো অনেক কিছুই। অনেক বাজারেই খাসি-মুরগির মাংস পলিপ্যাকে, পলিথিনের ছোট প্যাকেটে শ্যাম্পু, এমনকি গুঁড়ো সাবান, কোল্ড ড্রিংসও।'[১]

'টেকনোলজি টেকনোলজি' শব্দবন্ধটির মধ্য দিয়ে দুটি দিক স্পষ্টত নির্দেশিত। প্রথমত, মনে হতে পারে 'টেকনোলজি টেকনোলজি' যেন কোনো উৎসাহমূলক শব্দবন্ধ। চারদিকে যেন টেকনোলজির জয়জয়কার। দ্বিতীয়ত, আবার মনে হতে পারে এটি কোনো ব্যক্তিমানসের বিরক্তিভরা আর্তনাদ। গল্পকার কিন্নর রায় এমন শিরোনাম ব্যবহার করে দুটি দিককেই নির্দেশ করেছেন। সারা বিশ্ব টেকনোলজির জয়জয়কার করলেও গল্পকার টেকনোলজির ফলে সৃষ্ট সংকটগুলি পূর্ব থেকেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি সবার মতো টেকনোলজির জয়জয়কার না করে তার সংকটের দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাপন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হচ্ছে। কীভাবে মানুষ দেশীয় সংস্কৃতি, রুচিবোধ সবকিছু ভুলে ক্রমশই যান্ত্রিকতার দিকে পা বাড়াচ্ছে।

'এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার' গল্পে রাহান আলি 'আরাধনা অ্যাপার্টমেন্ট'-এ বসবাসরত। সেখানে 'লোডশেডিং' হলে 'মিনি জেনারেটর'র মাধ্যমে আলো জ্বলে ওঠে। প্রসঙ্গত লেখক জেনারেটর ব্যবহারের সুবিধার দিকটির পাশাপাশি অসুবিধার দিকটিও দেখিয়েছেন। গল্পটি লেখা হয় ১৯৯৩ সালে। সেই সময় কেরোসিন চালিত জেনারেটরের বহুল ব্যবহার দেখা যেত। জেনারেটরটি ছিল অত্যাধিক আওয়াজযুক্ত ও ধোঁয়ানির্গমনকারী। লেখক এই দিকটি নির্দেশ করে দেখাতে চেয়েছেন জেনারেটরের দূষণক্রিয়া আমাদের স্বাভাবিক জীবন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। সাময়িক আলো পাওয়ার জন্য এতখানি দূষণকে লেখক মেনে নিতে পারেননি। একইসঙ্গে আরো একটি দিক লক্ষণীয়। যন্ত্রপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আমরা যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ছি ফলত ক্ষণিকের যন্ত্রবিকলতা আমাদের অতিষ্ট করে তোলে। গল্পে রাহান অ্যাপার্টমেন্টের লিফ্‌ট ব্যাবহারে অভ্যস্ত। বৈদুতিক এই লিফ্টের সাহায্যে সে বিনা পরিশ্রমে ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে। ফলত বিদ্যুৎ না থাকলে রাহান বিরক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য– **'একা সিগারেট, নিঃসঙ্গ রাহান বসার ঘরে একটি টেলিফোনের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে নীচে নেমে বাইরে আসার কথা ভাবলে – লিফ্‌ট চালু নেই।'**[২]

কিন্নর রায়ের গল্পগুলি নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করতে হলে 'সাম্প্রতিক প্রবণতা' এই কথাবন্ধটির সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন। যা বর্তমানে চর্চিত একটি বিষয়। সাহিত্যে আধুনিকতা, বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা পরিচিত। সময় যেন ঠিক বহমান নদীর মতোই গতিশীল। নদী যেমন তার প্রতিটি বাঁকে গতির পরিবর্তন করে, সময়ও যেন ঠিক তা-ই। আর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মানুষের রুচিবোধ সবকিছুই তার সাক্ষ্য বহন করে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সমাজ, সাহিত্যসহ আরও নানান দিকের পরিবর্তন লক্ষ করছি। ঠিক কোন প্রবণতার দিকে আমরা ঝুঁকে পড়ছি, সেই বিষয়টিই আসলে 'সাম্প্রতিক প্রবণতা'র বিষয়বস্তু। কিন্নর রায় তাঁর গল্পে এই দিকটি বারবার তুলে ধরতে চেয়েছেন। যা নির্দেশ করছে বিশ্বায়নের একটি বৃহৎ দিককে।

গল্পে বিচিত্রবীর্য হল আধুনিক মনোভাবাপন্ন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের এন্টারটেইনমেন্টের মাধ্যমও কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা দেখতে পাই এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। রাহান ছোটবেলায় তার দাদির কাছে লণ্ঠনের আলোয় জেন-খাব্বিশ জেনের গল্প শুনত। লেখক দেখিয়েছেন বর্তমানে বিচিত্রবীর্য'র কাছে এন্টারটেইনমেন্ট'র অর্থ টিভিতে সিনেমা, মিউজিক, স্পোর্টস। **'জানেন তো পনেরই আগস্ট থেকে পাঁচখানা চ্যানেল, ডিশ অ্যান্টেনা দিয়ে**

দেখা যাবে। ওফ্ রাত-দিন সিনেমা। থ্রিলিং। ওনলি এন্টারটেইনমেন্ট।'[৩] সাম্প্রতিক প্রবণতা প্রসঙ্গে বিচিত্রবীর্যের এই কথাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা মূলত বিশ্বায়নেরই ফল।

'এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার' কথাটির বাংলা অনুবাদ করলে অর্থটি হয়ে যায় 'বিনোদনের সময়'। কিন্তু মনে হচ্ছে কথা দুটির আবেদন এক নয়। এদেশে বিনোদন বিদেশি টেকনোলজি আসার পূর্বেও ছিল। সেই বিনোদন টেকনোলজির ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল ছিল না। গল্পে রাহানের লণ্ঠনের আলোয় দাদির কাছে গল্প শোনার বিষয়টি তার একটি উদাহরণ। 'এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার' কথাটি আসলে বিদেশি বিজ্ঞাপন থেকে আগত। যা সারাক্ষণ টিভির দর্শকদের মাথায় ঘুরতে থাকে। গল্পে বিচিত্রবীর্য এই এন্টারটেনমেন্ট দ্বারা আসক্ত। মনে করা হয় দেশের যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এখানে বিচিত্রবীর্য শুধুমাত্র একজন যুবক নয়, যুবসমাজের প্রতিনিধি। দেশের যুবকরা যদি টেলিভিশনের সামনে 'এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার'-এর প্রতি মগ্ন হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংসমুখী হবে। লেখক যেন এমনটিই আশঙ্কা করেন।

'একাগাছ' গল্পে বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের আগাছার ভয়াবহতা ও তা থেকে কীভাবে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব সেই দিকটিকে তুলে ধরেছেন কিন্নর রায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মহারাষ্ট্রের পুনেতে অধ্যাপক এইচ.পি. পরাঞ্জপে প্রথম পার্থেনিয়াম গাছ শনাক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গে এই আগাছা প্রথম দেখা যায় ডানকুনিতে ১৯৭৫ সালে। ১৯৪৫ সালে ভারত যখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি, তখন এদেশে আমেরিকা থেকে গম আমদানি করা হত। বিশেষজ্ঞদের মতে গমের মধ্য দিয়েই এই বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের বীজ ভারতে প্রবেশ করেছে। গল্পে আমরা দেখতে পাই সন্দীপ যে এলাকায় থাকে সেখানে পার্থেনিয়ামের আগাছা তৈরি হচ্ছে। সন্দীপ এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালায়। লেখক গল্পে পরিবেশ ভাবনার পাশাপাশি বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় দ্রব্যের সংকটের দিকটি নির্দেশ করেছেন। এদেশীয় নিমগাছ অত্যন্ত ভেষজগুণ সম্পন্ন। নিমগাছকে নানান রোগ প্রতিরোধের ঔষধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৪ সালে নিমের পেটেন্ট পায় ইউরোপীয়রা। এর ফলে এই নিমকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ নানান সামগ্রী উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারে লাভবান হয়ে চলেছে। উল্টে আমরা পেয়েছি পার্থেনিয়ামের মতো বিষাক্ত আগাছা। এভাবে বাইরের দেশগুলি আমাদের দেশীয় পণ্যকে গ্রাস করে চলেছে। আর এই বৃহৎ ধারণাটিকে গল্পকার একটি ছোটো চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে— **'পেছনে ফাঁকা জমির ভেতর নিমগাছ একটা। তাকে ঘিরে পার্থেনিয়ামের বাড়-বাড়ন্ত।'**[৪]

'অনন্তের পাখি' গল্পে পরিবেশ ভাবনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের মায়ের মতো। মা যেমন শিশুকে লালন পালন করে বড়ো করে তোলেন। প্রকৃতিও আমাদের খাদ্য জোগায়, জল, স্থল সবকিছু দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু আমরা বিলাসবহুল জীবনের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষিত হয়ে প্রতিনিয়তই প্রকৃতির ওপর অত্যাচার করে চলেছি। জলাশয় বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি। যার ফলে বাস্তুহারা হচ্ছে হাজার হাজার জলজ জীব। আবার অন্যদিকে অত্যধিক প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে দূষিত হচ্ছে জল, বায়ু ও মাটি। যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। গল্পে অনন্তের ভাবনায় প্লাস্টিক ব্যবহারের ভয়াবহতার দিকটি ফুটে উঠেছে—

> **এখন কোথায় যাই বলতে পারেন? ছাই মাখা পলিপ্যাক কে নেবে! অনন্ত কোনো উত্তর দিল না। খবরের কাগজের, এমনকি কাগজের ঠোঙা পচে। শালপাতা পচে। মাটিতে মিশে যায়। আমরা তো সহজে পচিনা। আমরা এবার কোথায় যাব অনন্তবাবু?**

অনন্তর মনে পড়ল আজই সন্ধেবেলায়, হ্যাঁ আজ সন্ধ্যেবেলাতেই তো, প্লাস্টিকের ফুল-ঝাড়ু কিনতে আসা সুবীরবাবুর বউ, ঐ যে যার রোগা মাইয়াটা বলেছিল, ঝাঁটা পলিপ্যাক দ্যান, শুধু ঝাঁটা। গেল সনে লক্ষ্মী মূর্তিও পলিপ্যাকে। এত পলিপ্যাক যাইব কোথায়?

…

এখন দুপুরে জল হারা, ঘর হারানো বক আসে ভাত খেতে। খায় উড়ে যায়। আবার আসে।[৫]

দেখা যাচ্ছে গল্পকার অনন্তের মাধ্যমে প্লাস্টিক ব্যবহারের কুৎসিত পরিণতির দিকটিকে তুলে ধরেছেন। তিনি পাঠক তথা সমাজকে এভাবেই তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে জাগ্রত ও সচেতন করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, দেখিয়েছেন আমাদের অসচেতনতার ফলে জলচর পাখিরা কীভাবে খাদ্য ও বাসস্থান হারাচ্ছে। তাই দায়ে পড়ে বক-কে নিজের খাদ্য ভুলে খেতে হচ্ছে ভাত।

গল্পে বর্ণিত হয়েছে অনন্তের নিদ্রাকালীন স্বপ্ন প্রসঙ্গ। এই স্বপ্ন কোনো আকাশকুসুম স্বপ্ন নয়। এই স্বপ্ন আসলে গল্পকারের ভবিষ্যৎবানী। যেভাবে পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে, কয়েক বছর পর অনন্তের সেই স্বপ্ন বাস্তব হবে বৈকি—

একটা বিশাল জল আর জলের বুকে শালুক, পদ্মের বদলে লাল নীল সবুজ সাদা অনেক পলিপ্যাক। মরা মাছ কিংবা কচ্ছপের পিঠ ছুয়ে তারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে বুঝি। কেউ বা চুপসে মিশে আছে জলের সঙ্গে। সেই সব রঙ চটে যাওয়া পলিব্যাগের গায়ে ভিতু চাঁদের আলো। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির কান্না।[৬]

অনন্ত ঘুমের মধ্যে শুনতে পায় গোটা জলাশয়কে 'বাঁচাও-বাঁচাও' আর্তনাদে কাঁদতে। জলাশয়ের বাঁচাও-বাঁচাও চিৎকার যেন সমগ্র প্রকৃতির। গল্পকার এই আকুতির মধ্য দিয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

'বাঞ্ছাকল্পতরু' গল্পে গল্পকার তির্যক দৃষ্টিতে বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে দেশীয় পণ্যের বিধ্বংসী দিকটিকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন— **'চতুর্দিকেই এখন বিশ্বায়নের সুপবন বহিতেছে। সেই মলয় বাতাসে বিশ্বায়নের সুগন্ধ। কেনটাকি চিকেন আসিতেছে। সস্তায়– প্রভূত সস্তায় পাইবে। আসিতেছে চীনা সাইকেল, জুতা, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ছত্র। কোরিয়া ও জাপানের নানা বৈদুতিক সরঞ্জাম সবই জলের দরে। সস্তা; অথচ তাহার তিন অবস্থা হয় না।'**[৭] বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের হাতছাড়া হয়ে পড়ছে।

গল্পে দেখা যায় বিশ্বের বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের পেটেন্ট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। যেমন ভারতে উৎপাদিত সুবাসিত বাসমতি চাল, হলুদ, নিম প্রভৃতি। এই মূল্যবান দ্রব্যগুলি আক্ষরিক অর্থেই শুধুমাত্র মূল্যবান তা নয়, এগুলির গুণগত মূল্য অধিক। সেগুলি বহির্দেশে রপ্তানি হওয়ার কারণে বানিজ্যিক মূল্য হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া। ফলত দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। গল্পে নিমগাছ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

'ভারতের নিম ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অনুমতি ব্যতীত নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারিবে না।'[৮]

কিন্নর রায় দেখিয়েছেন- এর ঠিক উল্টো দিকটা আরো ভয়ংকর। আমাদের দেশের যা কিছু তা বেশিরভাগই ভেষজ ও প্রাকৃতিক তাই তার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতাও বহুগুণ বেশি। কিন্তু বহির্দেশ থেকে যা কিছু আমাদের দেশে আসে তা অধিক ভেজাল মিশ্রিত। যার ফলে মানুষ তা

ব্যবহার করছে এবং নানান মারণরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন লোভনীয় বিজ্ঞাপণ দেখিয়ে দেশের মানুষকে বহির্দেশগুলি প্রতিনিয়তই শুধুমাত্র বানিজ্যিক স্বার্থে বোকা বানাচ্ছে।

গল্পে চাঁদ-কে বানিজ্যিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। চাঁদ আমাদের দেশে নানাভাবে শুভক্ষণের প্রতীক হিসেবে গৃহীত। কখনও কবিদের কবিতায় রোমান্টিকতা বহক হিসেবে, কখনও গল্পকারের গল্পে সান্ধ্যকালীন বর্ণনার উপকরণ হিসেবে ধরা দেয়, এমনকি বাংলার ঘরে ঘরে চাঁদকে 'মামা' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপণে চাঁদকে সাবানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এইভাবে মানুষের ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে বহুজাগতিক কোম্পানি গুলি মানুষের মনকে ছুঁতে চায়।

আবার গল্পকার দেখিয়েছেন একটি নতুন কোম্পানির টিভির বিজ্ঞাপনে শিংসহ মুণ্ডিতমস্তক শয়তান বলছে— **'আপনার গর্ব/প্রতিবেশীর ঈর্ষা'**[৯] এই বিজ্ঞাপন গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধা হরিদাসীর ভাল লাগেনি। সে বলেছে—**'খ্যাংরা মার অমন নেকার মুকে। একবার নয়, হাজার বার খ্যাংরা মার। একি অলপ্পেয়ে কতারে বাবা! আমি জিনিস কিনব আর আমার পাশের বাড়ির লোকের বুক ফাটবে! এমন অলুক্ষুণে সামগ্গিরি কেনার দরকার কি লা! না কিনলেই হয়। মুয়ে আগুন অমন কেনাকাটায়!'**[১০] এখানে 'প্রাচীন বৃদ্ধা' র কথাটি লক্ষণীয়। আসলে এদেশে যা প্রাচীন তা আমাদের। অন্যের মধ্যে হিংসা ছড়িয়ে দেওয়াটা এদেশীয় মনোবৃত্তি নয়। কাজেই বৃদ্ধাকে হিংসা ছড়িয়ে দেওয়ার মতো মনোবৃত্তি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তোলে।

'মেঘচোর' গল্পে কিন্নর রায় দেখিয়েছেন আমাদের যে ছয়টি ঋতুচক্র তারই সংকটময় পরিস্থিতির কথা। ক্রমাগত পরিবেশ দূষণের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সময়কাল বদলে যাচ্ছে। ফলত বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি, শীতকালে বৃষ্টি, আবার গ্রীষ্মে মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি। আবহাওয়ার এই ভারসাম্যহীনতার মূল কারণই হল পরিবেশ দূষণ।

গল্পের শুরুতেই দেখি সমস্ত মেঘ চুরি গেছে। গল্পকারের কল্পিত খণ্ডত আর বিসর্গ সেই মেঘ চুরি করে গর্তে লুকিয়ে রেখে মুক্তিপণ দাবি করেছে। মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করে লাল ও নীল রঙকে। গল্পকার এখানে খুব সচেতন ভাবেই এই রঙ দুটি ব্যবহার করেছেন। সবুজ অরণ্য ও নীল আকাশের প্রতীক যেন এই দুটি রঙ। মেঘহীন, বৃষ্টিহীন পৃথিবীকে মুক্ত করার পণ নেয় অঘা ও বঘা। অরণ্যরোদন ও দূষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেঘ তৈরি হচ্ছে না। যার ফলে অনাবৃষ্টি, প্রবল খরার, আবার কোথাও প্রবল বন্যার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে জীবজগৎ। তাই কিন্নর রায় লিখেছেন— **'এবার তো মহাপ্লাবন হয়ে ছুটে আসবে বিশাল বিশাল ঢেউ। তলিয়ে যাবে ঘর-বাড়ি, ফসলের মাঠ, সবজি ক্ষেত।'**[১১]

২০২২ সালে ইন্টার-গভর্নমেন্টার প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'র গবেষণায় দেখা গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ষার আগেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এর ফলে হিমালয় অঞ্চলে বন্যামুখর পরিস্থিতির তৈরি হচ্ছে। তাই তো গল্পকার লিখেছেন— **'পৃথিবীর এখন মহা বিপদ।'**[১২]

আলোচ্য গল্পে লেখক আগামী ২০৪৮ সালের পৃথিবীকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন— **'দুহাজার আটচল্লিশ সালের এই পৃথিবী। তার আকাশে কোনো মেঘ নেই'**[১৩] এ প্রসঙ্গে তিনি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'-কে খুঁজেছেন এবং আক্ষেপ করেছেন। গল্পে বর্ণিত অঘা ও বঘা কাল্পনিক চরিত্রদুটির দ্বারা কিন্নর রায় সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন। যারা পরিবেশকে এই সংকট থেকে মুক্ত করবে।

কিন্নর রায়ের ব্যক্তি জীবন অনুধাবন করলে আমরা দেখবো তিনি কিশোর বয়স থেকেই আর পাঁচজনের ভাবনায় ভাবিত নন। তিনি সমাজ ও প্রকৃতিকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেন ও

ভালো-মন্দের দিকগুলি নিজেই উপলব্ধি করেন। তরুণ বয়সে তিনি একজন রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন সক্রিয় প্রতিবাদী ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষমতার শিখরে থাকা নেতামন্ত্রীদের ভুল নীতি গ্রহণকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদল তাঁকে ব্যথিত করে তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেই পথ ত্যাগ করে কলম ধরেন অন্যায় ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। তিনি বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন কীভাবে দেশীয় দ্রব্যের পেটেন্ট পেয়ে যাচ্ছে বাইরের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলি, যার ফলে দেখা দিচ্ছে দেশীয় পণ্যের সংকট। বিশ্বায়নের ফলে বিদেশি পণ্যে বাজার ছেয়ে গেলে দেশীয় কালচারসহ সবকিছুই যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। আবার প্লাস্টিকের মতো বর্জ্য আমাদের জীবনকে কীভাবে বিপন্ন করে চলেছে সেই দিকটি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে দেখিয়েছেন যন্ত্রসভ্যতার বার-বারান্ত ও তার ভয়ংকর প্রভাব দেখিয়ে প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। কিন্নর রায়-ও যেন ঠিক একইভাবে বিশ্বায়নের প্রভাব ও পরিবেশের সংকটের দিকটি পাঠকের সামনে তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১। রায় কিন্নর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৮৪
২। তদেব, পৃ. ৩৬৫
৩। তদেব, পৃ. ৩৭১
৪। তদেব, পৃ. ২০৩
৫। রায় কিন্নর, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২০২
৬। তদেব, পৃ. ২০৩
৭। রায় কিন্নর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৯
৮। তদেব, পৃ. ৬০
৯। তদেব, পৃ. ৬৩
১০। তদেব, পৃ. ৬৩
১১। রায় কিন্নর, মেঘচোর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১২
১২। তদেব, পৃ. ১১০
১৩। তদেব, পৃ. ১০৯
১৫। মন্ডল মহাদেব, কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে পরিবেশ প্রসঙ্গ, কমলিনী পরিবেশক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২২।
১৬। বাগচী অমিয়কুমার (সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি), বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খন্ড), ন্যাশেনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭২, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০০।

“নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা” : রবীন্দ্রকল্পনায় নটরাজ-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ

মন্দিরা দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্ব-শাসিত), পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক ও অন্যান্য সাহিত্যে পুরাণকথা বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। পুরাণের নানা প্রসঙ্গ কবির সৃষ্টিশীল কল্পনায় নতুন রূপ লাভ করেছে। পুরাণের কাহিনি ও চরিত্রগুলি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা অভিনব রূপ পেয়েছে। পুরাণের দেবচরিত্রগুলির মধ্যে শিব চরিত্র রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। পুরাণের মতো রবীন্দ্রকাব্য-নাটকেও শিব চরিত্রের কল্পনায় বৈচিত্র্যের শেষ নেই। শিবচরিত্র অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রকবিতা ও নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিবচরিত্রের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অনেক গভীর ও ব্যাপক এবং তাতে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা অপেক্ষা কল্পনার প্রসারই বেশি। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যে শিবের বিচিত্র লীলারূপ — রুদ্র, ভোলানাথ, নটরাজ, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি নতুন ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়েছে। শিবের বিচিত্র রূপগুলির মধ্যে নটরাজের ঐতিহ্যকল্পনা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রগুলিতে নটরাজের মূর্তি ও তাৎপর্য কল্পনায় যে শিল্পভাবনা আছে, সেই শৈল্পিকচিন্তা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যে নটরাজ দেবাদিদেব শিবের সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার যুগ্ম প্রতীক। নটরাজ শিল্পকলার দেবতা। প্রকৃতিতে সর্বত্র ও সর্বদা সৃষ্টি-ধ্বংস, আনন্দ-বেদনা, কোমল-প্রচণ্ডের সহাবস্থান। প্রকৃতির এই দ্বৈতলীলা নটরাজের মধ্যেই বিরাজমান, নটরাজই প্রকৃতির সেই শাশ্বতলীলার প্রতীক। রবীন্দ্রকল্পনায় নটরাজ এই জগৎ-সংসারের অধিকর্তা। তাঁর নৃত্যের ছন্দে প্রকৃতি ও মানবজগতের সৃষ্টি-ধ্বংস, বন্ধন-মুক্তি, অশ্রু-হাসির বিচিত্রলীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে। ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’ নাট্যকাব্যটিতে রবীন্দ্রনাথের নটরাজ-কল্পনা উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের নৃত্যে ছয়টি ঋতু আবর্তিত হয়ে চলেছে। নাট্যকাব্যটিতে নটরাজের নৃত্যলীলায় ষড়ঋতুর ক্রম-আবর্তনে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্রলীলা ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই নাট্যকাব্যে কবি বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনে নটরাজের লীলারস উপলব্ধি করেছেন এবং উপলব্ধির আনন্দে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সূচক শব্দ: নটরাজ, নৃত্যলীলা, ঋতুচক্র, মানবজীবন, রসোপলব্ধি।

মূল-আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথের ‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’ নাট্যকাব্যটিতে শিবের নটরাজ মূর্তি সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নটরাজ দেবাদিদেব শিবের নৃত্যরত মূর্তি — তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা, শিল্পকলার দেবতা। নটরাজের আভিধানিক অর্থ যিনি নৃত্য ও অভিনয়ের রাজা। নটরাজ শিবের নৃত্য লাস্য এবং তাণ্ডব। পার্বতীর সঙ্গে মধুর-আনন্দময় লাস্য নৃত্যে বিশ্ব সৃজিত হয় আর শিবের তাণ্ডব নৃত্যে জগতের সবকিছু কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা’

ঋতুনাট্যের অন্তর্গত। ষড়ঋতুর বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা এই নাট্যকাব্যটির মূল উপজীব্য। তবে এই নাট্যকাব্যটিতে একটি বিশেষ তত্ত্বকথা রূপায়িত হয়েছে। কবির ভাষায়—

> "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়! "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম্ম।"[১]

কবিকল্পনায় সমগ্র বিশ্বে নটরাজের নৃত্যলীলা বিধৃত হয়ে আছে। প্রকৃতিতে ঋতুচক্রের আবর্তন আসলে নটরাজের নৃত্যলীলার পরিণাম। শুধু প্রকৃতি নয়, মানবজীবনেও জন্ম-মৃত্যু, যৌবন-বার্ধক্য, সুখ-দুঃখ নটরাজের নৃত্যের ছন্দে আবর্তিত হয়ে চলেছে। জগতে কোনো কিছু স্থায়ী নয়, সবই অনিত্য। তবে জগৎকে অনিত্য জেনে তার মধুর স্বরূপকে প্রত্যাখ্যান করা এবং শুষ্ক বৈরাগ্যের সাধনা 'তত্ত্ব শিরোমণির' বিধান হলেও কবি মুক্তি অন্বেষণ করেছেন রসোপলব্ধির মধ্যে। নটরাজের নৃত্যলীলার মধ্যে রয়েছে জগতের চিরন্তন সত্য — সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস-লয় কোনো কিছু স্থায়ী নয়, পূর্ণ নয়। একটির মধ্য দিয়ে অন্যটির সূচনা ঘটে। নটরাজের নৃত্যের এই রহস্য যিনি উপলব্ধি করেছেন, তিনিই এই জগত ও জীবনে সর্বশক্তিমানের লীলারস উপলব্ধি করতে পারবেন। কবি নটরাজের কাছে এই মুক্তির দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন—

> "আমি নটরাজের চেলা
> চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
> বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
> মহাকালের বিপুল নাচে।"[২]

নটরাজ একই সাথে ভয়ঙ্কর ও প্রসন্ন। তাঁর প্রসন্ন রূপে সৃষ্টি জেগে ওঠে আর ভয়ঙ্কর রূপে প্রলয় সংঘটিত হয়। নটরাজের নৃত্যের ছন্দ কেবল বিশ্বের সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্যেই নেই, মানবজীবনের পটভূমিতেও আছে নটরাজের নৃত্যের বিচিত্র লীলা। কবি রবীন্দ্রনাথ নটরাজকে দীক্ষাগুরু রূপে গ্রহণ করে জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছুকে প্রসন্নচিত্তে অন্তরে গ্রহণ করেছেন—

> "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
> ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
> যুগে যুগে কালে কালে
> সুরে সুরে তালে তালে,
> জীবন-মরণ নাচের ডমরু
> বাজাও জলদমন্দ্র হে।"[৩]

নটরাজের নৃত্যের আঘাতে চিন্তা-শঙ্কা দূর হয়ে যায়, সম্মানের অভিমান ভেঙ্গে যায়। মানবচিত্ত তখন বিশ্বের প্রাঙ্গণমাঝে নটরাজের নৃত্যের ছন্দ সন্ধান করে। 'মুক্তির-প্রয়াসী' কবির উপলব্ধিতে শাস্ত্রের জটিলতায়, প্রথা-সংস্কারের জড়তায় জীবন-যৌবন বন্দী। নটরাজই কেবল তাঁর উত্তাল-উদ্দাম নৃত্যের বেগে সকল বন্ধন, সকল অজ্ঞতা থেকে সজীব প্রাণকে উদ্ধার করতে পারবেন। তাই কবি বারেবারেই নটরাজের কাছে প্রার্থনা করেছেন, নটরাজ যেন তাঁর নৃত্যের ছন্দে কবির চিত্তের বন্ধন-জড়তা ভেঙে কবিকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেন—

> "নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,

ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।”[৪]

কবি মানবজীবনের বিচিত্র রসরূপ প্রকৃতির পটভূমিকায় ঋতুচক্রের আবর্তনে উপলব্ধি করেছেন। নটরাজের নৃত্যের ছন্দে প্রকৃতির মধ্যে যেমন সৃষ্টি-লয়ের লীলা চলছে, মানবের চিত্তভূমিতেও তেমনি আনন্দ-বেদনার লীলা চলেছে। ঋতুচক্রের প্রথমে বৈশাখ তথা গ্রীষ্মঋতু সন্ন্যাসী নটরাজের রুদ্র রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। ধ্যান-নিমগ্ন তপস্বীর তপস্যার তেজে সমগ্র ধরা রিক্ত-নিঃস্ব-ক্লান্ত হয়ে উঠে। কিন্তু ধ্যান-গম্ভীর বৈশাখ-তপস্বীর রুক্ষ তপ্ত নিঃশ্বাসে প্রকৃতির জীর্ণতা অনন্ত আকাশে উড়ে যায়, মানবজীবনেও পুরাতন বৎসরের ক্লান্তি-গ্লানি-ব্যর্থতার সমাপ্তি হয়ে নতুনের সূচনা ঘটে। রুদ্র-তপস্বীর নয়ন-উন্মীলনে, তাঁর ভীষণ-মধুর নৃত্যের ছন্দে আশ্বাসহারা মানুষ আর প্রকৃতি কালবৈশাখীর শেষে আবার নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে—

“তাপস নিশ্বাসে বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।

… … …

মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক সব জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।”[৫]

কবির কল্পনায় নটরাজের তপঃক্লিষ্ট বৈশাখী রূপের মধ্যে আছে বিশাল স্তব্ধতা, উদার শান্তি, কঠোর বৈরাগ্য। তপ্ত বায়ুর গর্জন, ঘূর্ণির মতো ভাসমান ধূসর ধূলারাশির অট্টহাসি, নির্জীব অরণ্যের ক্রন্দন, শীর্ণ নদীর বেদনা এবং শুষ্ক-কঠিন-পিপাসার্ত ধরাতলের আকুলতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্লান্ত-রিক্ত-নিঃস্ব। কিন্তু কবি বৈশাখের এই ভীষণ রূপের মধ্যে দেখেছেন সন্ন্যাসীর করুণা বর্ষণের ইঙ্গিত। তাই ডমরুর ধ্বনিতে আর তাণ্ডব নৃত্যে নটরাজ প্রকৃতির বুকে কালবৈশাখী রূপে আবির্ভূত হয়ে প্রশান্তি নিয়ে আসেন।

বৈশাখ রুদ্র তপস্বী। কিন্তু তিনি শুষ্ক বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষায় নয়, বরং মধুরের আরাধনায় ধ্যান-নিমগ্ন। উদাসীন রুদ্র বৈশাখ যেন জগৎ-জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্য উপভোগের জন্যই অচঞ্চল স্তব্ধতায় অপেক্ষারত—

“সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পুরব কূলে বকুলবীথিমাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।”[৬]

শুধু তাই নয়, নটরাজের কঠোর বৈশাখী রূপের অন্তরালে আছে বিরহক্লিষ্ট প্রেমিক সত্তা। যিনি তাঁর কঠিন-শুষ্ক প্রাণে প্রিয়ার কোমল স্পর্শের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। হঠাৎই অভিসারিনী প্রিয়ার কোমল স্পর্শ যেন সন্ন্যাসী বৈশাখের কঠোর শুষ্ক হৃদয়কে সরস ও চঞ্চল করে তোলে। তারপরেই আকাশে কালো মেঘ জমে উঠে। স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয়, অরণ্যে অরণ্যে শিহরণ জাগে, বিদ্যুতের বিচ্ছুরণে দিগন্ত কম্পিত হয়। প্রকৃতির বুকে করুণাঘন নটরাজ বর্ষারূপে তাঁর অকৃপণ সুধারস নিয়ে আবির্ভূত হন—

“তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,

হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে।"[৭]

নটরাজ তাঁর বর্ষালীলাতেও বিরহী সন্ন্যাসী। তাঁর রুক্ষ সন্ন্যাসীর বেশ শ্যামল হয়ে উঠে। সন্ন্যাসীর গভীর জটাজালে আকাশ ছায়ায় ঢেকে যায়। সন্ন্যাসীর অন্তরের বিরহ-ক্রন্দন মেঘমল্লারের সুরে ধ্বনিত হয়ে চলে। অন্যদিকে শ্যামল প্রকৃতিও যেন বিরহিণী উমা। বাদল দিনের আঁধার দিয়ে উমা মহেশ্বরের জন্য রচনা করেন বিরহপত্র। কখনো ঝরঝর বারিধারায় বিরহিণী উমার অশ্রু ঝরে পড়ে। সন্ন্যাসী নটরাজের হৃদয়পটেও বিরহিণী শ্যামলী প্রিয়ার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। নটরাজের হৃদয়ের কম্পন, বিরহের বেদনা দ্যুলোক-ভূলোকে ঘোষিত হয়। আর তখন সন্ন্যাসী নটরাজের উদ্দেশে কবির বাণী উচ্চারিত হয়—

"যাক যাক তব মন গলে গলে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক,
... ...
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমতো তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে।"[৮]

এরপর শ্রাবণের বিদায়-লগ্নে প্রকৃতি পূর্ণ হয়ে উঠে। আকাশে সোনা রোদের খেলা, ভরা নদীর টলমলে প্রবাহ, ফুলে ফুলে বিকশিত কুঞ্জবীথিকার মর্মরধ্বনি শরতের আগমন সূচিত করে। নটরাজ-বর্ষা তাঁর অকৃপণ দানে প্রকৃতি-প্রিয়ার সব ম্লানতার চিহ্ন মুছে দিয়ে যান—

"আজি শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।"[৯]

শরত নটরাজের বীরমূর্তি। শরতের আগমনে সমগ্র বিশ্বের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো উদ্ভাসিত হয়। ত্রিলোকে বিজয়শঙ্খ বেজে উঠে। শুভ্র-নির্মল শরতের আগমন নবীন প্রাণে মহৎ কর্মের উদ্দীপনা-উৎসাহ জাগিয়ে তোলে, সকল অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব লাভ করার প্রেরণা দেয়—

"মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস—
'হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।"[১০]

শরতের বীরবেশ একদিকে যেমন পথিককে সকল তামস জয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, অন্যদিকে শরতের নির্মল-কান্ত স্নিগ্ধ-মনোহর রূপ পথিককে আনমনা-উদাসীন করে তোলে। আকাশতলে অলস মেঘের আনাগোনা, ধানের ক্ষেতে বাতাসের গোপন পদধ্বনি, নদীর আকুল বেগে ছুটে চলা, কাশের বনে আলোর হাসি, শিউলি ফুলে ঢাকা পথের ডাক পথিককে ঘরে-ফেরার পথ ভুলিয়ে দেয়—

"শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।

অলস মেঘ যায় যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।

… … …

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে।”[১১]

শরতের বিদায়বেলায় বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর প্রকৃতি ম্লান হয়ে পড়ে। আকাশের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, হিমেল বাতাসে তরুদল কেঁপে উঠে, শিউলি-মালতীফুলগুলি ঝরে পড়ে, পাখি করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠে — সব মিলিয়ে প্রকৃতির এই ব্যথাতুর রূপে মিলন-বিরহ, আসা-যাওয়া, আনন্দ-ব্যথার চিরন্তন ছবিগুলি ব্যঞ্জিত হয়ে উঠে।

নটরাজের ঋতু-রঙ্গশালায় এরপর আবির্ভূত হয় হেমন্ত। হেমন্ত ধরণীর ভাণ্ডার সোনার ধানে পূর্ণ করে তোলেন। ক্ষুধার্তজন হেমন্তলক্ষ্মীর অন্নদানে তৃপ্ত-শান্ত হয়। হেমন্তলক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যে এই ধরণী তাঁর বৈভব-প্রাপ্তিতে স্বর্গের বৈভবকেও ম্লান করে দেয়—

“স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।
অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।”[১২]

হেমন্তের রূপ মলিন-রুক্ষ-ধূসর হলেও তিনি গভীর আঁধারের আলোকবর্তিকা। তিনি দীপালিকায় আলো জ্বেলে সকল অন্ধকার ঘুচিয়ে জীবন-ক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার আহ্বান জানান—

“যাক অবসাদ বিষাদ কালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো।
শুনাও আলোর জয়বাণীরে।”[১৩]

এরপর শীতঋতুতে ভোলা-মহেশ্বর যেন লীলাচ্ছলে নিঃস্ব অকিঞ্চন তপস্বীর বেশে আবির্ভূত হন। কঠিন তপস্বীর আগমনবার্তায় বিশ্বপ্রকৃতি তার প্রাণচঞ্চলতা ভুলে স্তব্ধ হয়ে যায়। কঠিন-নির্মম তপস্বী শীতের এই কঠিন তপস্যা আসলে বিশ্বজগতকে জীর্ণতার মোহবন্ধ ছিন্ন করার কঠিন নির্দেশ; দুঃখ-শোক-গ্লানি-ব্যর্থতা-মৃত্যুকে সংশয়হীন চিত্তে গ্রহণ করার জয়বাণী; দুর্বলতা-আরামপ্রিয়তা-মিথ্যা গর্বের প্রতি কঠিন তিরস্কার। নির্মম অথচ নির্মল শীত-তপস্বীর ভীষণ স্পর্শে বিশ্বজগৎ রিক্ত-শূন্য হয়ে আবার বিচিত্র শোভায় নবীনতা লাভ করে। শীতের দুঃসহ তপস্যা আসলে জগতের চিরন্তন সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রাণপ্রবাহকে আরও বিপুল বেগে প্রকাশের আয়োজন মাত্র—

“বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেইমতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে।”[১৪]

কবি জানেন, শীত-তপস্বীর তপোভঙ্গে যৌবনের প্রাণশক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হবে। কবি হরগৌরীর প্রেমের রূপকল্পে শীত-ধরণীর প্রেম-বিরহের অপূর্ব গীতিলেখ রচনা করেছেন। নিখিলবিশ্ব রুদ্র-তপস্বীকে তাঁর ধ্যান সমাপ্ত করে প্রসন্ন হৃদয়ে সুন্দরের বেশে ‘বিচ্ছেদভারে বিষণ্ণ’ ধরণীর সঙ্গে মিলনের প্রার্থনা জানিয়েছে—

"ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন।"[১৫]

প্রকৃতি ও মানবের আকুল ক্রন্দনে বৈরাগীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ভোলা-মহেশ্বর বসন্তের বেশে প্রেম-মাধুর্যের চিরন্তন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। বসন্তের আগমনে মর্ত্য পৃথিবীতে সব দুঃখ-দৈন্যের অবসান ঘটে, আকাশে নানা রঙের আলো খেলায় মেতে উঠে, নব কিশলয় ও বিচিত্র পুষ্পরাজিতে প্রকৃতি সজ্জিত হয়ে উঠে। মহাকালের ডমরুর প্রচণ্ড নিনাদ বাঁশির মধুর সুরে পরিণত হয়ে বিশ্বজগতকে আনন্দিত করে—

"ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি এ কী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে,
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
... ...
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত।"[১৬]

বসন্তরূপী মহেশ্বর 'ভুবনমোহন নব বরবেশে' আবির্ভূত হয়ে তপস্বিনী ধরণী-উমাকে বধূরূপে বরণ করে নেন এবং ধরণীর লজ্জানম্রভালে সূর্যাস্তের রক্তরশ্মিটিকা এঁকে দেন। সমুদ্রতরঙ্গের মন্দ্রধ্বনি, অরণ্যের মর্মরধ্বনি মিলনের মন্ত্র পাঠ করে, পলাশের রক্তিম আগুনে হোমশিখা প্রজ্বলিত হয়, পুষ্পরাশি বৃক্ষশাখা থেকে ঝরে পড়ে অভিবাদন জানায়। এভাবে দীর্ঘ বিরহযাপন সার্থক আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠে—

"আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।"[১৭]

কিন্তু জগতে কোনো কিছুই চিরন্তন নয়। মিলনের পরেই আসে বিরহ। বৎসরান্তে মিলনের উৎসব যেন বিচ্ছেদের অবসন্নতায় ভেসে যায়। কিন্তু এই বিরহ প্রেমের সমাপন নয়, বরং এই বিরহের দুঃখদাহে মিলনের আনন্দ আরও নিবিড় ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তাই এই মধুর বিরহ প্রেমিকের ছলনা মাত্র।

ঋতুচক্রের আবর্তনে আবার 'ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন' বসন্তের আবির্ভাব ঘটবে, পুষ্প-পত্রশোভায় প্রকৃতি আবার প্রাণের সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠবে। তবুও বিচ্ছেদকাতর মন বিদায়বেলায় প্রিয়ের ফিরে আসার আশ্বাসটুকু পেতে চায়। বসন্ত-নটরাজ আর ধরণী-উমার মিলনের দোল-উৎসব নিখিলবিশ্বের স্মৃতিতে চিরজাগরূক থেকে ক্ষণমিলনকে চিরস্থায়ী করে তোলে। আকাশে-বাতাসে রঙের ঢেউ, আনন্দের স্রোত নবীন প্রাণের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। কবিও দোল-উৎসবে নটরাজের আনন্দনৃত্যে যোগ দিয়ে জগৎ-জীবনের চিরন্তন প্রবাহকে উপলব্ধি

করেন। তখন কবির চিত্তে বন্ধন-মোহের অনুভূতি আর থাকে না, নটরাজের অরূপ অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে কবির অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠে—

"কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
...   .
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি আগে।"[১৮]

শেষকথা: 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নাট্যকাব্যে কবি জীবন-জগতের সব বৈপরীত্যকে নটরাজের অখণ্ড লীলা ও আনন্দনৃত্যের রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। কবির কল্পনায় প্রকৃতির মধ্যে ছয়ঋতুর নিত্যনতুন রূপে আবির্ভাবের মধ্যে নটরাজের নৃত্যলীলা প্রদর্শিত হচ্ছে। কবি স্নিগ্ধচিত্তে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যে নটরাজের লীলা উপলব্ধি করেছেন। শুধু প্রকৃতি নয়, মানবের চিত্তভূমিও নটরাজের নৃত্যলীলার রঙ্গশালা। নটরাজের চরণের এক পদক্ষেপে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি-লয়ের লীলা চলেছে; অন্য পদক্ষেপে মানবজীবনে জন্ম-মৃত্যু-আনন্দ-বেদনার লীলা চলেছে। নটরাজের এই চিরন্তন নৃত্যলীলায় যোগ দিতে পারলেই অনন্তশক্তির অরূপ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায় এবং প্রকৃত মুক্তি লাভ করা যায়।

উল্লেখপঞ্জি :

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ. ২৫৫
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ত্রয়ী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
২. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
৩. বিশী প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০
৪. রায় নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

বিনতা রায়চৌধুরীর ‘অন্য আমি’: ‘পুরুষ-বেশ্যা’র শরীরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা প্রেম

প্রলয় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সকলের মতো বেশ্যারাও ভালোবাসার স্পর্শে নিজের জীবনকে রাঙিয়ে দিতে চায়, প্রেমের সাগরে ভাসতে চায়। আর এই ইচ্ছা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক দেহজীবীর মধ্যে বর্তমান। একজন পুরুষ চরিত্রের আলোকে তারই চিত্র বিনতা রায়চৌধুরীর ‘অন্য আমি’ উপন্যাসে উঠে এসেছে। সহজ, স্বাভাবিক পথে জীবন অতিবাহিত করার সমস্ত পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেলে একজন পুরুষও বেঁচে থাকার তাগিদে, পরিবারকে রক্ষার প্রয়োজনে নিজের শরীরকে নারীর ভোগ্যপণ্যে পরিণত করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয়। নারীর চোখে সেই পুরুষ হয়ে ওঠে কেবলমাত্র একজন যৌন তৃষ্ণা নিবারণের যন্ত্র, যাকে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন তো দূরের কথা, বন্ধুত্ব করাও অসম্ভব। অপর দিকে পুরুষ তার পেশার উর্দ্ধে উঠে ভালোবাসার নাগাল পেতে চায়। যৌনতা ও অর্থ প্রাপ্তির পরেও প্রেমহীনতা তাদের জীবনকে যান্ত্রিকতায় পরিণত করে, বিষাদ করে তোলে। আলোচ্য উপন্যাসে ঝলক হয়ে উঠেছে সেইসব পুরুষদেরই প্রতিনিধি। ঝলকের জীবনের বিবর্তিত রূপ পরিস্ফুটনের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে একজন ‘পুরুষ-বেশ্যা’র জীবনের ট্র্যাজেডি। যে পুরুষ অর্থের প্রয়োজনে তৃষিতা নাম্নী একজন নারীর কাছে নিজের যৌন জীবনকে সমর্পণ করে। শেষ পর্যন্ত সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে সেই নারীরই প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু তৃষিতার রূঢ় প্রতিক্রিয়া তাকে তার পেশা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। বুঝিয়ে দেয় একজন ‘পুরুষ-বেশ্যা’র নিজস্ব কোনো প্রেমের অনুভূতি থাকতে নেই কিংবা সেই অনুভূতিকে ব্যক্ত করার অধিকার তাদের নেই।
সূচক শব্দ: পরিস্থিতি, বেশ্যা, যৌনতা, শরীর, অনুভূতি, প্রেম।

মূল প্রবন্ধ:

যৌনতা ও প্রেমের যোগাযোগ নিবিড়। যৌনতার হাত ধরে প্রেমে উত্তরণ ঘটতে পারে, আবার প্রেমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে যৌনতা। তবে প্রেম ও যৌনতা কেউ কাউকে স্পর্শ না করেও এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের মিলন গাথায় যে সুর রচিত হয় তাকেই ছুঁতে চায় মানুষের মন। কারও পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়, কারও কাছে তা অধরাই থেকে যায়। আর তখনই প্রেমহীন যৌনতা যান্ত্রিকতার রূপ নেয়। এই যান্ত্রিক প্রেম সংঘটিত হয় মূলত বেশ্যাদের ঘিরে। নারী-পুরুষ সকল বেশ্যার ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে পরিলক্ষিত। শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্তির পরেও রয়ে যাওয়া বুভুক্ষু মন প্রেমের দরজায় কড়া নাড়ে। বিনতা রায়চৌধুরীর (১৯৫৭) ‘অন্য আমি’ (২০০৯) উপন্যাসের সমগ্র শরীর জুড়ে বয়ে চলে যৌনতার স্রোত। কিন্তু তারই মাঝে উঁকি দিয়ে যাওয়া প্রেম সেই স্রোতকে স্তিমিত করে করে ফেরে, আর যৌনতাকে ধুয়ে দিয়ে ভালোবাসার সমুদ্রে নিয়ে যায়।

বর্তমান সময়ের একজন অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হলেন বিনতা রায়চৌধুরী (১৯৫৭)। তাঁর জন্ম কলকাতায়। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বেথুন স্কুল থেকে পড়াশুনা শেষ করে

তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত এই কথাসাহিত্যিক ইতিমধ্যে অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে— 'অন্তবিহীন' (২০০১), 'এক টুকরো মেঘ' (২০০৬), 'ছকের বাইরে' (২০০৬), 'চোখের আড়ালে' (২০০৬), 'জলের মানুষ' (২০০৭), 'আলোর রাত আঁধার রাত' (২০০৮), 'অন্য আমি' (২০০৯), 'নিঃশব্দ জলরব' (২০০৯), 'এই মন' (২০১০), 'পথ অফুরান' (২০১০), 'রাত জাগা ভোর' (২০১৩), 'তবুও কাছে' (২০১৩), 'অচেনা আয়নায়' (২০১৬) প্রভৃতি।

বিনতা রায়চৌধুরীর 'অন্য আমি' উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে 'শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম'[১]— এই বিখ্যাত উক্তির মধ্য দিয়ে। সচেতন পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে সহজেই অনুমান করে নিতে পারে তারা কীসের সম্মুখীন হতে চলেছে। 'অন্য আমি' উপন্যাস কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝলকের জীবন, জীবিকা, ভাবনা এবং অন্যান্য প্রধান নারী চরিত্রের জীবনচিত্রের আলোকে শশী কিংবা কুসুমের অবতারণা করে না ঠিকই, কিন্তু যে ছবি উদ্ভাসিত করে তোলে তা শরীর ও মনের জটিল কারসাজিতে পূর্ণ। আর্টস নিয়ে বিএ পাশ করা সুন্দর, সুদর্শন ঝলক কর্মের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কোনো পথ খুঁজে পায় না। ছোটো অফিসে কর্মরত বয়স্ক পিতার ক্রমাগত অর্থ উপার্জনের তাগিদ, মায়ের অসুস্থতা, ভাই-বোনের নীরব প্রত্যাশা ঝলককে প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ করতে থাকে। ঝলক আবদ্ধ হয়ে পড়ে এমন এক চক্রব্যূহে যেখান থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ অর্থ। আর তার পরিমাণ এতটা যে বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া ধার, ভাগ্যগুণে পাওয়া টিউশন কিংবা ফোন বুথের ছোট্ট কাজ এর সঠিক যোগান দিতে ব্যর্থ। তবু ঝলক তারই উপর ভর করে ভবিষ্যতে কোনো চাকরির আশায় দিন গুণতে থাকে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাতে তার সমস্ত সম্ভবনার প্রত্যাশা ও ধৈর্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ঝলক উপলব্ধি করে তার পড়াশুনা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতা জীবন অতিবাহিত করার উপযুক্ত সমস্ত রকমের কাজ দিতে ব্যর্থ। আর তাই নিজের শারীরিক সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যই হয়ে ওঠে তার জীবন সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার। ঝলক বিবাহিতা কিন্তু একাকী নারীদের শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের যাবতীয় ক্ষুধার উপশম ঘটাতে থাকে।

যৌনতা কেন্দ্রিক এই পেশা পারিবারিক কিংবা সামাজিক স্বীকৃতি যে পাবে না এই বিষয়ে ঝলক সম্পূর্ণ সচেতন। তবে নিজেও কি নিজের পেশাকে স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নারীদের বেশ্যাবৃত্তি প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। বিচিত্র রূপের মোড়কে আবদ্ধ হয়ে এই পেশা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও বর্তমান। বলা যায়, এখন তার কলেবর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহৎ নগর থেকে শুরু করে ছোটো শহর— সর্বত্রই 'নারী-বেশ্যা'দের আস্তানা পাওয়া যায়। 'কল গার্ল'-এর মাধ্যমে বিলাসী মানুষ নিজের পছন্দের ডেরাতেও নারীসঙ্গ লাভ করতে সক্ষম হয়। এমনকি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভার্চুয়ালিও এই ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। তবে সমঅধিকার, সমক্ষমতায়নের সময়ে দাঁড়িয়ে এই কাজে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, 'কাস্টমার'-এর স্বল্পতা। আর এর পশ্চাতে রয়েছে বহু যুগ ধরে চলে আসা সংস্কার। নারীর শারীরিক চাহিদাকে গুরুত্ব না দেওয়া। পুরুষ যেমন নিজের কামনাকে চরিতার্থ করাই যৌন সঙ্গমের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে, নারীও তেমনি প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজস্ব সুখানুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে সঙ্গীর তৃপ্তির আয়োজনে মত্ত হয়। শরীরের সায় থাকা সত্ত্বেও নারী বিবাহিত স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে 'সেক্স' করতে দ্বিধা বোধ করে। ফলে উপোসি শরীর পূর্ণমাত্রায় পুরুষসঙ্গ চাইলেও নারীকে সেই

ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হয়। অন্য একটি দিক হতে পারে যথেষ্ট পরিমাণে ‘শরীর বিক্রেতা’, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। নারীর কামনা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ‘পুরুষ বেশ্যালয়’ নেই, নেই ‘পুরুষ বেশ্যাপাড়া’র সামাজিক নিষিদ্ধ স্বীকৃতি। ফলে পুরুষের মতো নারীর কামনা চরিতার্থ করার পথ সহজলভ্য হয় না। আবার পুরুষও তার ‘শরীরের পসরা’ সাজিয়ে ‘খদ্দের’-এর অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না। তবে ব্যতিক্রমী নারীর দৃষ্টান্ত বর্তমান। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক নারী নিজেদের মানসিক জগতকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। আর তাই শিকারী নারী সহজেই ঝলকের মতো সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবককে তার অভাবের সুযোগ নিয়ে কব্জা করে নিতে পারে। নিজের অর্থের খাঁচায় বন্দি করে দিনের পর দিন শুষে নিতে পারে ‘কামরস’। তৃষিতার যৌন তৃষ্ণা নিবৃত্তির মাধ্যমে পরিণত দরিদ্র ঝলক নিজেকে সেই কামনার জাল থেকে মুক্ত করতে পারে না। তার মুক্তির কোনো উপায়ও ছিল না। নিজের ‘সতীত্ব’ বজায় রাখার সমস্ত পথের অনুসন্ধানে ব্যর্থ ঝলক ভালোবাসার মোড়কে তৃষিতা ও তার শারীরিক সম্পর্ককে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু তৃষিতার রূঢ় আঘাত তাকে পেশাদারী ‘গিগোলো’ বানিয়ে তোলে। কেবল নারী নয়, পুরুষও যে নিজের শরীরদানের পরিবর্তে প্রার্থনা করে এক টুকরো ভালোবাসা, তাদেরও শরীরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে এক প্রেমিক হৃদয়— ঝলক হয়ে উঠেছে তারই প্রতিনিধি। এবারে ঝলকের মানসিক টানাপোড়েনের গোপন দুয়ার খুলে সেই অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যাক।

উপন্যাসের কাহিনির মাধ্যমে জানা যায়, কর্মের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো বেকার ঝলক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার জায়গায় কয়েকদিনের জন্য পিৎজা সাপ্লাইয়ের কাজ নেয়। আর সেই সূত্রে তৃষিতার অর্ডারের পিৎজা ডেলিভারি করতে গিয়ে তার সাথে ঝলকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৃষিতার রূপ ও ব্যক্তিত্ব যেমন তাকে মুগ্ধ করে, আবার তার খোলামেলা পোশাক তাকে অবাক করে দেয়। ঝলক তৃষিতার দেওয়া টিপস ও ঘরে আসার আহ্বানকে ফিরিয়ে দিলে খুশি হয়ে প্রয়োজনে তৃষিতা তাকে আবার আসতে বলে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে পড়ে তৃষিতা জয়সওয়ালের শরণাপন্ন হতে হয় ঝলককে। প্রচুর অর্থের মালিক তৃষিতার কাছে একটা চাকরির প্রত্যাশা নিয়ে একদিন হাজির হয় সে। তবে সে-ই যে কেবল তৃষিতাকে মনে রেখে এসেছে তা নয়, তৃষিতাও প্রথম সাক্ষাতের পর তার খোঁজ নিয়েছে, ফোন নম্বর সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। কারণ ঝলক তার চোখে হয়ে উঠেছে— ‘ইউ আর এ ভেরি হ্যান্ডসাম ইয়াং চ্যাপ।’[২] এই সৌন্দর্যই ঝলকের সম্পদ। তৃষিতার কাছে সে চাকরির সন্ধান পায় না ঠিকই, কিন্তু সাহচর্যের বিনিময়ে তার থেকে দুশো টাকা প্রাপ্তি ঘটে। ঝলক তৃষিতাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ভাবনা, ব্যবহার, কথাবার্তার মধ্যে যে একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ দূরত্ব বর্তমান, তাকে ডিঙিয়ে উঠতে পারেনি ঝলক। “ঝলক তৃষিতাকে চিনতে পারেনি। তবে এইটুকু বুঝেছে মেয়েটি অন্যরকম। সামথিং একস্ট্রা অর্ডিনারি।”[৩] দ্বিতীয় দিন ঝলক তৃষিতার ফ্যাশন মডেলে পরিণত হয়। আর তার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা পায়। তৃষিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ঝলককে পরিবারের অনেক সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। ফলে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ঝলকের কাছে টাকাই প্রধান হয়ে ওঠে। আর তাই সে তৃষিতার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না। তবে তৃষিতার চাহিদা যে কেবল ঝলকের সঙ্গে গল্পগুজব, মদ্যপান করা কিংবা ফ্যাশন মডেল হিসেবে ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। শেষ পর্যন্ত তৃষিতা তাকে শরীরের খেলায় শামিল করায়। নিজের অভুক্ত যৌন পিপাসাকে অর্থের বিনিময়ে দিনের পর দিন চরিতার্থ করে চলে। ঝলক পরিণত হয় একজন ‘পুরুষ-বেশ্যা’য়।

ঝলকের পরিবারের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার বাবার সামান্য চাকরির ওপর ভর করে কোনোরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সংসার। মায়ের শরীর অসুস্থ থাকলেও কাজের লোক

নেওয়ার কোনো উপায় নেই। ছোটো ভাই অলক পড়াশুনায় ভালো হলেও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না। বোন শকুন্তলা প্রত্যাশা করে ঝলকের মাধ্যমে তাদের সুদিন আসবে। এরকম এক সংকটময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বেকার যুবক ঝলক শত চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারে না। মর্যাদা হারায় পরিবারের কাছে, নিজেকে নিজের তুচ্ছ মনে হয়।

> "শকুন্তলার সহজ আন্তরিক গলা শুনে ঝলকের ঘাড়টা যেন আরও হেঁট হয়ে গেল। ওকে তো বলা যাবে না, তোর অপদার্থ দাদা, আজও সব আশা নষ্ট করে ফিরেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে সাবানগুঁড়ো কোম্পানি। কোনও চাকরি পাবে না কোনওদিন। তোরাই শুধু মিথ্যে আশায় আশায় দিন গুনবি আর ভাববি দাদা তোদের বৈতরণী পার করবে।"[৪]

অলকের পরীক্ষার ফি দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাবার সঙ্গে ঝলকের বচসা বাধলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সে। এমতাবস্থায় তৃষিতার ডাক আসলে তাই হয়ে ওঠে ঝলকের কাছে প্রাণ স্বরূপ। কিন্তু ঝলক বুঝতে পারেনি আজ রাতের আহ্বান তার কৌমার্য হরণের জন্য। দেড় হাজার টাকার পেমেন্ট ধরিয়ে দিয়ে তৃষিতা তাকে বিছানায় টানলে সে বাধা দিতে পারে না। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে তৃষিতার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় ঝলক।

> "ঝলকের পা দুটো মাটিতেই গেঁথে যাচ্ছে, সে খুব সাধারণ ঘরের ছেলে। এত সাহস তার বুকে নেই। তৃষিতার দেওয়া যে-কোনও কাজ করতে ও প্রস্তুত থাকবে, এই মনোভাব নিয়ে আজ এখানে এসেছে, সে-কথা সত্যি, কিন্তু এ যে তার পক্ষে, ...ঢোক গিলল ঝলক।...
>
> ঝলকের পকেটে তৃষিতার দেওয়া টাকা রয়েছে। সেটা তো ঝলক অস্বীকার করতে পারে না। তবুও এক রমণীয় শয্যায়, তার বাহুতে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধছে ঝলকের। কী হচ্ছে এসব, কী করতে এসেছে এখানে!"[৫]

এই মানসিক টানাপোড়েনের কোনো লিঙ্গ বিভাজন চলে না। ঝলকের অবস্থা বুঝিয়ে দেয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এই দোলাচলতা সমান। শেষ পর্যন্ত শরীরের খেলায় অভিজ্ঞ তৃষিতাই আনকোরা ঝলককে যৌন সঙ্গমের ময়দানে নামিয়ে এনে খেলতে শেখায়। এর জন্য তৃষিতার মনে কোনো অনুশোচনা নেই। একজন পুরুষ যেমন কোনো কুমারীর সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে সম্ভোগ করে উল্লাসে মেতে ওঠে, তৃষিতাও নিজের ভাবনাকে একই পথে চালিত করেছে। নিজের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা ও অর্থই সেখানে প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আসীন।

> "ঠিক কতদিন পর এই উপসী গাছটিকে ও জল দিল? অনেক দিন পর। আর এই মুহূর্তে মনে হল খুব দরকার ছিল এটার।...
>
> এই মুহূর্তে তার কোনও বিবেক যন্ত্রণা নেই। কেন থাকবে? পুরুষ যদি তার বাসনা মেটাতে পয়সা দিয়ে নারী শরীর কিনতে পারে, একজন নারীই বা পারবে না কেন?
>
> টাকা দিয়ে তৃষিতা আজ একটি আনকোরা, স্বাস্থ্যবান, সুশোভন পুরুষকে ভোগ্য বানিয়েছে, বারাঙ্গনা মেয়েদের ক্ষেত্রে বহু প্রচলিত একটি শব্দ এ ব্যাপারে চলে আসছে 'নথ ভাঙা'। ঠিক সেরকমই ঝলকের যৌনজীবনের আজই উদ্বোধন ঘটল, তৃষিতার হাতে। বেশ মজাই লাগছে ভাবতে তৃষিতার।"[৬]

তৃষিতার এই ভাবনাকে ভ্রান্ত বলা বা তার যুক্তিকে খণ্ডিত করা যায় না। কিন্তু মনের গতিপথ ভিন্ন। শরীরের মধ্য দিয়ে কিংবা তাকে ছাপিয়ে গিয়ে মন অন্য এক মনের নাগাল পেতে চায়। আর তাই প্রথম যৌন মিলনের সুখানুভূতির রেশ ধরে সেদিনই ঝলক নিজের অবস্থান বিস্মৃত হয়ে তৃষিতাকে ভালোবাসার সুরে বাঁধতে চায়। কিন্তু তৃষিতা সেই সুর দানা বাঁধার পূর্বেই ছিন্ন করে দেয়।

> "না একটা আঙুল তুলে তৃষিতা থামিয়ে দিল ঝলককে। তারপর আগের তৃষিতার গলায় বলে উঠল, 'কয়েকটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে রাখি। তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি, হবেও না। এমনকী আমরা বন্ধুও নই। মনে রাখবে, এটা একটা কাজ, তার জন্যে পেমেন্ট পাবে। সো, বি প্রফেশনাল।"[৭]

যে কাজ ঝলক স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি, পরিস্থিতির চাপে পড়ে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, তাকে শুধুমাত্র কাজ ভেবে এগোনো অনেকটাই কষ্টকর। তবু সে তৃষিতার দেওয়া পরিষ্কার নির্দেশকে মাথায় রেখে ব্যাপারটিকে নিজের কাজ হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। তৃষিতার দেওয়া টাকার পরিমাণের হিসেব করে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু সব কিছুর পরেও তো সে একজন মানুষ। আর তাই অর্থের কারণে শরীরকে বিকিয়ে দেওয়ার গ্লানি থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ভালোবাসাহীন এই শারীরিক সম্পর্ক যে 'নারীর বেশ্যাবৃত্তি'র সমতুল্য, একজন পুরুষ হয়েও তা অনুভব করে ঝলক।

"সত্যি কী ঘটল আজ তার জীবনে? ও কি রেপড হল? ... সে তো একজন পুরুষমানুষ। এতে তার ক্ষতিটা কোথায়? তবে হ্যাঁ পুরুষেরও যদি সতীত্ব বলে কিছু থাকে, তা হলে আজ সে সেটা হারিয়েছে।"[৮]

ঝলকের অনুভবের মধ্য দিয়ে পুরুষদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নারী যেমন তার শরীরে পরপুরুষের স্পর্শকে অশুচি মনে করে, পরনারীর স্পর্শে পুরুষের ভাবনাও ঠিক একই পথে চালিত হয়। পুরুষ তার পবিত্রতাকে হারিয়ে ফেলে। আর তাই তো নিজের পক্ষে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়েও বাড়িতে এসে বোন শকুন্তলার সামনে আপনা থেকেই মাথা নিচু হয়ে যায় ঝলকের। ঝলক বুঝতে পারে—

> "ফিসফিস করে নিজেকে শুনিয়ে বলল, তৃষিতা আজ তাকে নষ্ট করেছে। সেই নষ্ট গন্ধ সাবান ঘষে তুলে ফেলতে চাইছে ও। তবে যে বলে, পুরুষমানুষ নষ্ট হয় না! হ্যাঁ হয়, কারণ প্রেমে নয় ঝলক শরীর দিয়েছে টাকার বিনিময়ে। সেখানে নারী বা পুরুষ অভিন্ন।"[৯]

আসলে ঝলকের কিছুই করার ছিল না। সে পরিস্থিতির শিকার। সে অর্থ উপার্জনের সোজা পথের সন্ধান করেছিল, কিন্তু তার নাগাল পায়নি। স্বল্প অর্থের যোগানও পরিবারের সদস্যদের মুখে যে কতটা খুশির ঝলক নিয়ে আসে তা প্রত্যক্ষ করেছিল ঝলক। আর তাই যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে তা সে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তবে সময়ের ব্যবধানে ক্রমাগত যৌনমিলনের মধ্য দিয়ে ঝলক তৃষিতার অনেক কাছে চলে আসে। আর একসময় সত্যি ভালোবেসে ফেলে তৃষিতাকে। সমস্ত গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলে নিজেদের ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ করে। তাদের কেবলমাত্র যৌন সম্পর্ককে বিবাহ নামক বন্ধনের মাধ্যমে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চায়।

> "ঝলকের মন জুড়ে সবসময় একটি মানুষই থাকে এখন, তৃষিতা। তৃষিতা জয়সওয়াল নয়। শুধু তৃষিতা। কীভাবে তাকে এমন ভালবেসে ফেলল নিজেই বুঝতে পারে না। ভালবাসা তো ন্যায়-অন্যায় বিচার করে হয় না। আর ও বিশ্বাস করে মুখে যতই যা বলুক, যতই কাঠিন্য দেখাক, আসলে সেও ভালবাসে ঝলককে। শরীরের সম্পর্কটা নিয়েও ঝলকের মনে আর কোনও গ্লানি নেই, ও জানে একদিন এরও বৈধতা পেয়ে যাবে। যে কোনও অ্যারেঞ্জ ম্যারেজেই তো আগে যৌনতা পরে প্রেম।"[১০]

কিন্তু ঝলকের এই রঙিন স্বপ্ন, ভাবনার জগৎ তৃষিতার কঠিন আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঝলক বুঝে উঠতে পারেনি যে, একজন 'দেহ ব্যবসায়ী'কে মানুষ আদর করতে পারে, দিনের পর দিন তার সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে পারে। কিন্তু ভালোবাসতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসার করতে পারে না। নারী কিংবা পুরুষ— যেই হোক না কেন, মানুষের চোখে তারা কেবল 'শারীরিক সুখ প্রদানের যন্ত্র' হয়ে থেকে যায়। তাদের ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই কারও কাছে। তাই তো ঝলক তার শরীরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা প্রেমের ডালি সাজিয়ে তৃষিতাকে মনের মন্দিরে বরণ করে নিতে চাইলে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়।

> "কথা শেষ করে ঝলক তৃষিতাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু খেল। তৃষিতা কিছু বলার আগেই হঠাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা। তৃষিতা ঝলকের দিকে তাকাল, কোনও কথা না-বলে ঠাস করে একটা চড় মারল গালে। 'তুমি বোধহয় তোমার স্ট্যাটাস ভুলে গেছ। আমি তোমার প্রেমিকা নই। তোমাকে প্রথম দিনই সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আই অ্যাম গিভিং ইউ এ হ্যান্ডসাম পেমেন্ট ফর ইয়োর সার্ভিস ওনলি অ্যান্ড দ্যাটস অল। ডোন্ট ফরগেট ইউ আর নাথিং বাট এ গিগোলো।"[১১]

ঝলক নিজেকে আর ভুলে যায়নি, নিজের অবস্থানকে ভুলে যায়নি। তৃষিতার আঘাত তার গালে লাগেনি, লেগেছে তার মনে। তাই তার প্রেমিক হৃদয়কে গলা টিপে হত্যা করে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে এক যান্ত্রিক 'গিগোলো' হিসেবে তৈরি করেছে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে সে তৃষিতার সঙ্গে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। এতদিনের সহজ আন্তরিক সম্পর্ককে বিসর্জন দিয়ে তার জায়গায় নিয়ে আসে ব্যবসায়িক মানসিকতা। গভীর এক বিষাদ বুকে চেপে তৃষিতার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে।

ঝলক এরপর নিজেকে শুধুমাত্র তৃষিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। তৃষিতার বিধবা বান্ধবী তমসা তাকে যৌন পিপাসা চরিতার্থের জন্য কল দিলে তাতে সে সাড়া দেয়। আসলে ঝলক তার সমস্ত আশা, ভরসা, স্বপ্নকে হারিয়ে ফেলে। সে মনে করে 'দেহ ব্যবসা'ই তার জীবনের শেষ অবলম্বন। এর উপর ভিত্তি করেই তাকে পরিবার নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। আর এই ঘুণে খাওয়া জীবন নিয়ে কোনো রঙিন স্বপ্ন দেখা বৃথা। তাই তো সিক্তার অকৃত্রিম প্রেমকে বারবার ফিরিয়ে দিতে চায়। নিজের অপবিত্র জীবনের সঙ্গে সিক্তার শুভ্র জীবনকে বাঁধতে দিতে চায় না। কিন্তু সিক্তার ভালোবাসার ঢেউ তার সমস্ত আপত্তি, দ্বিধা, গ্লানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সিক্তার প্রেমের সাগরে সে নবজন্ম লাভ করে।

> "ঝলকের মনে হল সেদিন সমুদ্রে বড় ঢেউয়ের মধ্যে ও যেমন পড়েছিল, ঠিক সেইরকম ঢেউয়ের শব্দ উঠছে সিক্তার বুকে। নতুন জীবনের লবণাক্ত

> স্বাদ লাগছে চোখেমুখে। নিজেকে চিনতে পারছে না ঝলক, এ যেন অন্য কেউ। এই আলো-আঁধারি ঘরে ও শুধু সাগর জলের শব্দ শুনতে লাগল।"[১২]

ঝলকের শরীরের ভিতর লুকিয়ে থাকা প্রেমিক হৃদয় সিক্তার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পায়। আসলে সিক্তা যেমন তাকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছিল, তেমনি সেও সিক্তাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিল। আর তাই তো ভালোবাসার মানুষকে নিজের 'কলঙ্কিত শরীর' সমর্পণ করতে চায়নি। কিন্তু তার জীবনের সমস্ত অন্ধকার অধ্যায় জানার পরেও সিক্তা তাকে বরণ করে নিতে চাইলে সে আর বাধা দিতে পারে না। ভালোবাসার কাছে নিজেকে অর্পণ করে।

'অন্য আমি' উপন্যাসটি ঝলকের মধ্য দিয়ে বাহ্যিক পরিচয়ের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অন্য এক 'আমি'র পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছে। পরিস্থিতির কারণে শরীরকে কলুষিত করতে বাধ্য হওয়া পুরুষও যে বারবার ভালোবাসার অনুসন্ধানে ফেরে ঝলক তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একাধিক নারীর সঙ্গে ক্রমাগত শরীরের ক্রিয়ায় অংশ নিলেও ঝলক কোথাও মনের খোরাক খুঁজে পায়নি। তার শরীরের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা প্রেমিক হৃদয়ের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় একজন 'পুরুষ বেশ্যা'র মনও যৌনতার উর্দ্ধে উঠে প্রেমের নাগাল পেতে চায়, ভালোবাসার বন্দরে নোঙর ফেলতে চায়। কিন্তু কামুক নারী কেবল তার শরীরকেই শুষে নেয়, মনের খবর রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. রায়চৌধুরী, বিনতা, জানুয়ারি ২০০৯, অন্য আমি, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৭।
২. তদেব, পৃ. ৩৬।
৩. তদেব, পৃ. ৬৬।
৪. তদেব, পৃ. ১০৩।
৫. তদেব, পৃ. ১০৯।
৬. তদেব, পৃ. ১১২-১১৩।
৭. তদেব, পৃ.১১০-১১১।
৮. তদেব, পৃ. ১১১।
৯. তদেব, পৃ. ১১২।
১০. তদেব, পৃ. ১২৩।
১১. তদেব, পৃ. ১২৫।
১২. তদেব, পৃ. ১৯৯।

দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাস : 'পরবাসী' এবং 'রক্তে ও শিশিরে' গল্পদ্বয়ের আলোকে

পূর্ণিমা সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আর্য্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), গুয়াহাটি, আসাম

সার সংক্ষেপ: ভারতবাসীর কাছে যে ঘটনা অবিস্মরণীয় তা হল দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিভাবে মানবিকতাকে সমূলে বিনষ্ট করেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলেও ধ্বংস-কামী মারণাস্ত্র উভয় দেশেরই ক্ষতিসাধন করেছিল। ফলে দুই দেশেরই হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। এই বিষয়টি সংবেদনশীল লেখকের মনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। তাই আজও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্থান পেয়ে যায় ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়। শওকত আলীর 'রক্তে ও শিশিরে' গল্পে দেশভাগের অশুভ পরিনাম একজন কৃষকের জীবনের করুন পরিণতির মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। হাসান আজিজুল হকও শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তার 'পরবাসী গল্পে'ও দেখা যায় একজন কৃষকের মর্মান্তিক পরিণতি। বসিরের চোখের সামনে তার পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হিংসাত্মক পরিণতিকে ঠেকাতে অপারগ এই দরিদ্র কৃষক। দেশভাগের ভয়াবহতা ও দরিদ্র নিরপরাধী মানুষের অসহায়তা দুটি গল্পেই স্থান পেয়েছে শিল্প-সুষমায়।
সূচক শব্দ: দেশভাগ, কৃষক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

মূল আলোচনা:

ভারতবর্ষের শিহরণ উদ্রেককারী এক মর্মান্তিক ঘটনা হল দেশভাগ, যার মাশুল আজ পর্যন্ত ভারতবাসীকে দিতে হচ্ছে। যে সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ভস্মীভূত ও রক্তাক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের ভূমি, তার শেকড় এতটাই দৃঢ় যে তাকে উচ্ছেদ করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই স্মৃতিকাতরতায় ভারতবাসী আজও যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। এই ঘটনা এতটাই হৃদয়বিদারক ছিল যা স্বাধীনতার উল্লাসকে অনেকটাই ম্লান করে দেয়। যুগ-যুগ ধরে ভারতবর্ষে শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বহিরাগতরা এসে যেমন শাসন করেছে ঠিক সেভাবেই একাত্মীভূত হতে পেরেছে, কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দেশ- এ সত্য যুক্তি কিংবা আবেগনিষ্ঠভাবে উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের অন্তরে দৃঢ়মূল হতে পারেনি। তাদের এই মানসিক বৈষম্যের পুরোপুরি সুযোগ নেয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কাজেই যে দেশবিভাগের ইন্ধন জুগিয়েছে কুচক্রী ব্রিটিশ, তার মূল নিহিত ছিল ভারতবর্ষের মাটিতে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পর্যটক ইবন বতুতার ভ্রমণকাহিনি থেকে জানা যায়, হিন্দুরা যেরূপ মুসলমানদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত, মুসলমানরাও হিন্দুদের বিধর্মী বলে ঘৃণা করত।[১]

১৯৪৬ সালে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় এটা প্রমাণিত হল যে, দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এতটাই প্রাণঘাতী ও ভয়াবহ যে দেশভাগ ব্যতীত সেদিন ভারতীয়দের কাছে অন্য কোনো বিকল্প অবশিষ্ট থাকল না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হিন্দুদের জন্য যতটা অসন্তোষের কারণ, ততটা মুসলমানদের জন্য ছিল না। বঙ্গভঙ্গ মানেই হিন্দু জমিদারদের পূর্ববঙ্গে আধিপত্যের বিনষ্টি এবং মুসলমানকেন্দ্রিক এক নতুন প্রদেশের জন্ম। দীর্ঘদিন মুসলমান চাষীর উপর হিন্দু জমিদারের

অত্যাচারের ফলে মুসলমান চাষীদের জমিদারদের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ভাবনা জন্ম নিয়েছিল। তাদের এই মনোভাবকে উদ্দীপিত করেছিল মৌলবাদীরা। নোয়াখালি মৌলবাদীদের ঘাঁটি ছিল। সেখানে হিন্দুরা ১৮ শতাংশ হলেও ৭৫ শতাংশ জমি তারা দখল করে রাখে এবং মুসলমান চাষির ওপর অমানবিক আচরণ করে, যার ফলে মুসলমান চাষিরা নোয়াখালি দাঙ্গায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।[২] অন্যদিকে অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান একত্রীকরণের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। কেবিনেট মিশনে মুসলমান শাসনপ্রধান স্বরাষ্ট্র পাকিস্তান দাবির অস্বীকৃতি এবং মুসলীম লীগের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে তীব্র অনীহা, প্রভৃতি কারণে ধীরে-ধীরে মুসলমান সমাজে এক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে মুসলীম লীগের নেতা মোহম্মদ আলী জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ বলেছেন- "দেশবিভাগের সত্যকার মাইলফলক যদি খুঁজতেই হয় তবে তা একদা সম্প্রীতির দূত জিন্নার জিহাদি ডাক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে) ঘোষণা এবং তার শিষ্য সোহরাওয়ার্দির বিভ্রান্তিকর ভূমিকার পরিণামে সংঘটিত কলকাতা মহাহত্যাকাণ্ডে (দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং) যার ফলে রক্তস্রোতের টানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ উপচে পড়ে। প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি, বিহার ইত্যাদি ঘটনা।"[৩]

এই জ্বলন্ত বিষয় স্থান পেয়েছে তৎকালীন কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্ভারে। সেইসময়ের অন্যান্য সাহিত্যিকদের ন্যায় শওকত আলি ও হাসান আজিজুল হকের গল্পে এইসব দুঃস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে রূপ পেয়েছে। দুজন গল্পকারকেই দেশভাগের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁরা এই বেদনাদায়ক ঘটনার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বলেই তাঁদের অনুভূতির গভীরতা এত প্রগাঢ়। দুজন গল্পকারই সমসাময়িক।

লেখক শওকত আলির জন্ম ১৯৩৬ সালের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরে। ভারতবর্ষের এক উত্তপ্ত শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতো তিনিও দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর জীবনের এই বেদনার্ত অনুভূতিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে- "বৃটিশ রাজের দিন শেষ, তাদের ভারত সাম্রাজ্যকে হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পাকিস্তানে হিন্দুর জায়গা নেই আর হিন্দুস্তানে মুসলমান থাকলে তারা বেঘোরে মারা পড়বে। দেখা গেল চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বউ-বাচ্চা, ভাই-বোন, মা-বাবাকে নিয়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা যেদিকে মুসলমানরা তার উল্টোদিকে। একদিন রাতের অন্ধকারে গাঁটরি বোচকা ঘাড়ে নিয়ে আমাদেরও জন্মভূমি আর ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হলো। এসব ঘটনায় সর্বস্ব হারানো মানুষের অসহায়তা যেমন দেখা গেছে, তেমনি দেখা গেছে নতুন জায়গায় বসবাসের জন্য ভিৎ গড়ার দুর্মর ইচ্ছা এবং প্রাণপণ চেষ্টাও।"[৪] ছাত্রাবস্থায় উদ্যোগী তরুণদের ন্যায় বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হন। সেই সময় তেভাগা তথা ময়মনসিংহ জেলার কৃষক আন্দোলনে অংশীদার হওয়া বিভিন্ন কৃষিজীবী লোকের সংস্পর্শে আসেন। এছাড়াও ঠাকুরগাঁও কলেজের অধ্যাপনার সূত্রে সেই অঞ্চলের গরীব চাষীদের তিনি জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর 'রক্তে ও শিশিরে' গল্পে দেশভাগের মর্মন্তুদ চিত্র একজন কৃষকের জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

গল্পের প্রথমেই লেখক এক বিভীষিকাময় পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। হাশমত মিঞা ও রাইমোহন একসঙ্গে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন উড়োজাহাজের মিছিল এসে গোলা বর্ষণ করে তাদের ক্ষেতের জমি চৌচির করে দিল। তাদের দুজনেরই প্রাণরক্ষা হল যদিও রাইমোহনের চারটি গরু মারা গেল। চারটি গরুর মধ্যে বিশেষভাবে সন্তানসম্ভবা রূপবাণের জন্য তার প্রাণ

কেঁদে উঠল। শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন এই ভয়াবহ বিভীষিকায় ম্লান হয়ে গেছে। কৃষকের সজীব ক্ষেতের জমি মুহূর্তের মধ্যেই মারণাস্ত্রের প্রকোপে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। গল্পকারের ভাষায়,- "রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। হালের গরু জোড়ার কাঁধে তখনও জোয়াল বাঁধা। রূপবাণের চকচকে শরীর টানটান হয়ে শুয়ে আছে। একদিকের চোখ সুদ্ধু মাথার খানিকটা উড়ে গেছে। এক চোখে আতঙ্ক চিরকালের জন্য স্থির হয়ে আছে।"[৫] হাশমত তার পরিবারের কথা মনে করে ভেঙ্গে পড়লেও রাইমোহনের বিক্ষুব্ধ মন এরূপ ঘটনার অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠল। জীবনের অনেক বাঁধা-বিপত্তি মাড়িয়ে সে একটু সচ্ছলতার মুখ দেখেছে। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই তা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। তার উদ্বিগ্ন মন এর উত্তর খুঁজে পায় না,- "কিন্তু কেন? তার মাথায় এই একটা কথার জবাব কোনো মতেই আসতে চায় না। ওখানে জাহাজগুলোর এমনকি শত্রু ছিল যে তার ওপর এমন অস্ত্র মারতে হবে? কী ছিল হাশমতের পাঁচ কাঠা আউশের ক্ষেতে, জাহাজ ঘাঁটির পাকা রাস্তায়, আর তার চারটা নিরীহ গরুর মধ্যে।"[৬] এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে গল্পকারের। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষে বলি হওয়া নির্দোষ অসহায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সম্বলটুকু কেড়ে নেয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। দরিদ্র খেঁটে খাওয়া মানুষের জন্য বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনটুকু সংগ্রহ করা যে কতটা দুরূহ, রাইমোহন যেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে গরুগুলো কিনেছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং দুই দেশের আগ্রাসনের প্রসারিত হস্ত যেন মুহূর্তের মধ্যেই তার সর্বস্ব লুটে নেয়। রাইমোহনের রোমান্টিক অনুভূতিও ম্লান হয়ে যায় এই ঘটনাতে। মনোহর হাড়ির বিধবা মেয়ে কমলাকে একবার দেখার জন্য সে পথ চেয়ে বসে থাকত। ঘটে যাওয়া ঘটনার তদন্ত করার জন্য হাশমতের বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন সে রওনা হল, তখন পথে কমলাকে দেখেও তার মনে কোনো আলোড়নের সৃষ্টি হয়নি। মানুষের সজীব প্রাণের অনুভূতিগুলোকে যেন শুষে নেয় ধার্মিক বিদ্বেষ। রাইমোহনের স্বল্পবুদ্ধিতে মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী এই বিরোধের উৎস ও সার্থকতা কোথায়, তা সে বুঝতে পারে না। তাই তার মনে একের পর এক প্রশ্ন ও সন্দেহের তরঙ্গ উত্থাপিত হতে থাকে,- "রাইমোহন বুঝতে পারে না। কী যেন আছে, অনেক সময় তার মনে হয়েছে চারপাশের দুনিয়া যতটুকু সে দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে তারও পরে আরো কিছু যেন আছে, যার খোঁজ সে কোনোদিন পাবে না। এ যেন একটা অন্ধকারের পর্দা, যা শুধু তারই চোখের সামনে ঝুলছে। শুধু সেই বোঝে না, দেখে না, অন্য সবাই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। সেজন্য সে বোকা। সেইজন্যে তার বুদ্ধি হয়নি। এই অন্ধকারের ওপারটা দেখতে পারাই হল আসল কথা। সেইটুকু দেখতে পেলেই সব দেখা হয়ে যায়, সব বোঝা হয়ে যায়।"[৭]

কাকার বাড়িতে গিয়ে রাইমোহন হারু ঠাকুরের বক্তব্য থেকে জানতে পারে যে, হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতই এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। যে উড়োজাহাজ তার সর্বস্ব ধ্বংস করেছে, সেই জাহাজ যে হিন্দুস্থানের রাইমোহনের সন্দিগ্ধ মনে তাই তীব্র উৎকণ্ঠা যে, সে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের জাহাজ পাকিস্থানে বসবাসকারী এক হিন্দুর ক্ষতিসাধন কেন করল? যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধু সীমারেখার বিভেদকে লক্ষ্য রেখেই সাধিত হয়। নিরপরাধী মানুষ, কে, কোন বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বীর মানুষ তার দিকে লক্ষ্য করে না। তাই রাইমোহনের ন্যায় এক নির্বোধ ব্যক্তির মুখে এই ধরনের প্রশ্ন কাকার বৈঠকখানায় হারু ঠাকুরসহ অন্যান্য উপস্থিত সকলকে নির্বাক করে দেয়। রাইমোহনের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিশোধ সে কার বিরুদ্ধে নেবে? কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, একটি দেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। হারু ঠাকুরের বক্তব্যে অধিকতর ভয়াবহ পরিস্থিতির যেন পূর্বাভাস ধ্বনিত হয়েছে,- "দুই পক্ষের যুদ্ধে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন

আসবে কল্কি অবতার। এখনই কী দেখেছো, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ আসবে আর এমনি অস্ত্র ছেড়ে যাবে। ইদিকে যেমন হচ্ছে, বর্ডারের উদিকেও তেমনি হচ্ছে। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা ভাঙছে, ক্ষেতের ফসল উজাড় হচ্ছে, মানুষজন মরছে। গরু ছাগলের তো কোনো হিসাবই নেই।”[৮]

ধার্মিক ভেদাভেদকে লক্ষ্য রেখে যে দেশের মাটিতে বোমা বর্ষিত হল সেখানে হাশমত মিঞা ও রাইমোহন একত্রে বাস করে। গল্পকারের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত গল্পের প্রথমেই হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এখানে মুখ্য দুটি চরিত্র দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ, যারা একইসঙ্গে ক্ষেতে কাজ করছে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্ররহিত গ্রামের সহজ, সরল মানুষই পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতার সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত। এই আবেগপ্রসূত অনুভূতি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন,- “একজন গ্রামের মানুষের কাছে দেশভাগের ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক কূটকাচালির বিষয় নয়, বেশিটাই আবেগ। তার চেয়েও বেশি সামাজিক টানাপোড়েন। ভিটে হারানো মানুষের কাছে দিল্লিতে কী চলছে, জিন্না-নেহেরু কী বলছেন এতটুকুও গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে সব জানার কথাও নয় তাঁদের। তাঁদের কাছে আসলে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক দাঙ্গার নাম দেশভাগ।”[৯] রাইমোহন হিন্দু হলেও হিন্দুস্থানের উড়োজাহাজের প্রতি ক্ষোভে-দুঃখে প্রতিশোধকামী হয়ে উঠেছে। ধর্মের আগ্রাসনে উন্মত্তপ্রায় মানুষ ধ্বংসের তান্ডব-লীলায় সেদিন এতটাই মেতে উঠেছিল যে তার বিধর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বজাতিও এর বলি হয়েছিল। তাই নিজের ধর্মের মানুষের দ্বারাই আজ রাইমোহন নিঃস্ব হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,- “যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।”[১০] নিঃসঙ্গ একাকীত্বে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিশু যেমন মায়ের কোলে পরম শান্তি ও স্নেহ অনুভব করে, রাইমোহনও শরতের শিশির ও জ্যোৎস্নাস্নাত মাটির সৌরভে আবেগিক হয়ে পড়ল,- “বিশাল প্রান্তর সারা বুকে সবুজ স্বপ্ন আর অগাধ ভালোবাসা নিয়ে একটু-একটু করে পূর্ণ হচ্ছে। দিনে-দিনে আকাশের বৃষ্টি শিশির আর জ্যোৎস্নায় স্নান করে সবুজ ধানক্ষেত হেমন্তের সোনালী পরিপূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বাতাসে মাটিতে কী রকম একটা অশেষ মমতা মেশানো যা শরীরের গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। এই ধানক্ষেতে এই মাটিতে এই জ্যোৎস্নায় অনন্তকাল ধরে সে যেন পরতে পরতে জড়ানো।”[১১]

উড়োজাহাজের প্রত্যাবর্তনে বিদ্রোহাকুল রাইমোহনের বুকে শক্তিশেল নিক্ষিপ্ত হল। শিশিরসিক্ত ধানক্ষেত রাইমোহনের রক্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। গল্পের নামের মধ্যেই গল্পের ব্যঞ্জনার সুর নিহিত রয়েছে। শিশির ও রক্ত দুটোই জলীয় পদার্থ হলেও তার মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে গল্পকারের বর্ণনার গুনে তার শিল্প সুষমিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ রূপে মানবসৃষ্ট প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র সে সময় যে সমস্ত সংবেদনশীল লেখকদের অতিমাত্রায় বিচলিত করেছিল, লেখক শওকত আলীও অনুরূপ একজন গল্পকার।

লেখক হাসান আজিজুল হক বর্ধমানের যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করে জীবনের প্রথম ষোলোটি বছর কাটিয়েছেন রাঢ়বঙ্গে। ১৯৫৪ সালে দেশত্যাগ করে তিনি খুলনায় বসবাস করেন। তাঁর ‘পরবাসী’ গল্পপাঠে ধার্মিক সংঘর্ষ কতটা হৃদয়-বিদারক ও মানবতা বিধ্বংসী হতে পারে তা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির ঝড়, বৃষ্টি, রোদ ইত্যাদির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গ্রামের সেই দরিদ্র চাষী গল্পটির মুখ্য চরিত্র। মাটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যাদের জীবন শীত-গ্রীষ্মকে উপেক্ষা

করে তারা সোনার ফসল ফলায়। প্রকৃতির প্রেমময় অনুভূতির সঙ্গে যাদের রয়েছে নিবিড় যোগ, তারা রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাবানল এই দরিদ্র কৃষকদেরও জীবন বিপন্ন করে তোলে।

বশির সেই রকমই একজন দরিদ্র কৃষক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে যার সর্বস্ব নিঃশেষ হয়ে যায়। মরণাপন্ন অবস্থায় সে যখন একটা খালের মধ্যে আশ্রয় নেয়, তখন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পূর্বস্মৃতি। ধান কাটার সেই সোনালী দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বিপর্যস্ত মুহূর্তের শেষ চিত্রটি চাইলেও যেন চোখের উপর থেকে সরতে চায় না। বশির স্মরণ করতে চায় না সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটিকে, তথাপি জীবনের সুখস্মৃতি যে মুহূর্তের জন্য চিরতরে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়, তাকে চেষ্টা করেও বিস্মৃত হওয়া যায় না।

গ্রামের ওয়াজদ্দি চাচা ক্ষেতে যাওয়ার জন্য বশিরকে সঙ্গে নিতে এলে, সে যেতে যেতে লোকমুখে দাঙ্গার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, তাদের গ্রামেও হিন্দুদের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করে,- "সারাটা দিনে আজ খালি কানাকানি চলচে একানে ফিশির-ফিশির, ওকানে গুজুর গুজুর তুমি কিচ্ছুই শুনো নাই? পাকিস্তানে হিন্দুদের লিকিন একছার কাটছে- কলকাতায় তেমনি কাটছে মোচলমানদর।"[১২] কিন্তু চাচা এই অশুভ বার্তা যেন শুনতে চায় না। জাতিভেদজনিত সমস্যাই দেশভাগের ন্যায় মর্মন্তুদ সমস্যার মূল এবং এই ধরনের মানসিকতাকে সমূলে নাশ করাই যে গল্পকারের অভিপ্রায় তা তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ওয়াজদ্দি তাই বশিরের উদ্দেশ্যে বলে,- "তোর বাপ কটো? এ্যাঁ কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো বুইলি?"[১৩]

কিন্তু যে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটতে যাবে, তার পূর্বাভাস লেখক বশিরের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন। আক্রমণকারীদের হিংসাত্মক আক্রমণে গ্রামের এক একটি মাটির ঘর জ্বলে উঠল। একের পর এক সাজানো গরুর গাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল। ওয়াজদ্দিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। খুনিদের হিংস্র ও ক্রূর মুখমণ্ডল আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাদের এই হিংসাত্মক আক্রমনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই, দরিদ্র গ্রামবাসীদের। বশিরের চোখের সামনে তার পরিবারকে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়। লেখকের ভাষায়,- "বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী।

আল্লা তু যি থাকিস মানুষের দ্যাহোটার মধ্যে-বুকফাটা চিৎকার করে- উঠল বশির, কোতা, কোতা থাকিস তু, কুন-খানে থাকিস বল।"[১৪] বশিরের এই বক্ষভেদী আর্তনাদ সেই সময়ের ভুক্তভোগী দুই দেশের নাগরিকদের প্রতীক, যারা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় হারিয়েছে তাদের প্রিয়জনদের। অমানবিক এই ক্রূঢ়তা এতটাই জান্তব যে সাত বছরের নিরপরাধী শিশু সন্তানকে হত্যা করতে হত্যাকারীর হৃদয় বিগলিত হয় না। গৃহহীন বশির বুকের মধ্যে অনিঃশেষ যন্ত্রণা বহন করে পথ চলতে-চলতে বহুদূর চলে এসেছে তার দেশ ছেড়ে। উন্মত্তপ্রায় হয়ে ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে অতীতের স্মৃতি ও বিভিন্ন ভাবনার ডালা সাজিয়ে তার মনে হল সে আরেক দেশের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, যেখানে বহিরাগতকে যেমন প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, তেমনি দেশ থেকেও কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। প্রচণ্ড শীতে তার অচল পা চলৎশক্তিহীন হয়ে কঠিন মাটির আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে সে একটি খালের মধ্যে পড়ে যায়। খালের পূর্বপ্রান্তে মোটা ধুতি পরিহিত হাতে কুড়ুল নেওয়া এক অপরিচিত মূর্তি বশিরের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মুহূর্তের মধ্যেই অতীতের বেদনাবিধুর চিত্র বশিরের চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আত্মহারা হয়ে বশির

সেই লোকটির হাতের কুড়ুলটি তুলে নিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর লোকটির মুখমন্ডলে তার অতীত জীবনের মৃত্যুর বিভীষিকা যেন সজীব হয়ে উঠল,- ‘‘বশির দেখল সেই মুখ ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনই হতবাক। চোখের উপর থেকে ধোঁয়াটে পরদাটা যেন সরে গেল, আর তার চোখের পানিতে ধূসর হয়ে এল দুটি পৃথিবী- যাকে সে ছেড়ে এল এবং যেখানে সে যাচ্ছে।’’[১৫]

একটিমাত্র সরলরেখার ব্যবধানে একটি দেশকে দ্বিখন্ডিত করে দেশবাসীদের মনে বিভেদ নীতির যে বীজ রোপন করে দিয়েছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তা পল্লবিত হয়ে সেই ব্যবধানকে ক্রমশ বাড়িয়েই তুলেছে। দেশভাগের ফলে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জীবন অতিবাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছে। ভারতে সংঘটিত দাঙ্গার অপরাধের দায়ভার বিনা অপরাধে তাদের নিতে হয়েছে। স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবন-যাপনের স্বপ্ন নিয়ে তারা দেশত্যাগ করলেও তাদের এই আশা পূর্ণ হয়নি। বরং হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রদায়গত ব্যবধান এতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও জাতির সংকটজনক অবস্থা ও জীবন রক্ষার তাগিদে পাকিস্তানের পক্ষে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে।[১৬] বশিরের ন্যায় সর্বহারা মানুষের চোখের জলে স্নাত হয়েছিল সেদিন দু দেশের মাটি। সমালোচক আলোচ্য গল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,- ‘এর আবহ কঠিন শীত। বস্তুত হাসানের গল্পে আবহ হয়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ। একে বাদ দিলে তাঁর গল্পের স্বাদ চলে যায়। দেশভাগজনিত পরিস্থিতি কতো আবিল ও হিংস্র নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে তা লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন। হিন্দুস্থান ছেড়ে পাকিস্তানে যাবে কি যাবে না- এই নিয়ে দ্বিধায় আন্দোলিত হয় গ্রামের গরীব মানুষ।’’[১৭]

তথ্যসূত্র:

১. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, পৃ. ১২।
২. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, পৃ. ৮৩।
৩. আহমদ রফিক, দেশবিভাগ ফিরে দেখা, পৃ. ৩৭৫।
৪. শওকত আলী, ‘লেখকের কথা’, শওকত আলীর সব গল্প, ১ম খন্ড।
৫. তদেব, পৃ. ৮৯।
৬. তদেব, পৃ. ৯০।
৭. তদেব, পৃ. ৯২।
৮. তদেব।
৯. সুচন্দ্রা ঘটক, ‘সাহিত্যেই ধরা পড়ে ইতিহাসের সত্য’ : অভ্র ঘোষ, মিলন দত্ত ও তপস্যা ঘোষ (সম্পা.), বিতর্কিকা, পৃ. ১১২।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘হিন্দু মুসলমান’, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১০২০।
১১. শওকত আলী, শওকত আলীর সব গল্প, পৃ. ৯৫।
১২. হাসান আজিজুল হক, পঞ্চাশটি গল্প, হাসান আজিজুল হক, পৃ. ৬৪।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব, পৃ. ৬৫।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৭।
১৬. আহমদ রফিক, দেশবিভাগ ফিরে দেখা, পৃ. ৪২০।
১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য এপার বাংলা ওপার বাংলা, পৃ. ২৩৬।

শার্ল বোদলেয়ারের পাপের দর্শন : লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ

সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
অহনা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'এক দিগন্ত দিনান্তের'। ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা এ প্রবন্ধ সংকলনের প্রধান আলোচ্য। এই প্রবন্ধ সংকলনে তিনি দীর্ঘ একটি সময়ের বীক্ষা তুলে ধরেছেন। এতে একদিকে যেমন আছে শতাধিক বছরের প্রাচীন কবি বোদলেয়ারের প্রসঙ্গ, তেমনি আছে বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি স্যঁ-জন-পের্স এর কথাও। সময় ভিন্ন হলেও এরা একই ধারার কবি। সংকলনটিতে মোট আটটি প্রবন্ধ আছে। লোকনাথ ভট্টাচার্য বাঙালি পাঠকদের মধ্যে বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে একটি অনীহা লক্ষ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি পাঠককে বিদেশী সাহিত্য, বিশেষ করে ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে উৎসুক করে তোলা। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে অন্যতম 'বোদলেয়ারের পাপের দর্শন ও আমরা' প্রবন্ধটি। লোকনাথ ভট্টাচার্য মনে করতেন প্রতীকবাদী সাহিত্য আন্দোলনে পুরোধা পুরুষ ও আধুনিক কবিতার জনক শার্ল বোদলেয়ার। এই প্রবন্ধে তিনি বোদলেয়ারের জীবনে তাঁর দর্শনের অনুসন্ধান করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে লোকনাথ ভট্টাচার্যের সেই বীক্ষার পরিচয় দেবার প্রয়াস থাকবে।
সূচক শব্দ: ফরাসি সাহিত্য, প্রতীকবাদী কবিতা, বোদলেয়ার, জীবন ও দর্শন, পাপবোধ, আধুনিক কবিতা, ধর্মভাবনা, সৌন্দর্যতত্ত্ব।

মূল আলোচনা:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা চর্চা ও অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন লোকনাথ ভট্টাচার্য। লোকনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'এক দিগন্ত দিনান্তের'। ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতা এ প্রবন্ধ সংকলনের প্রধান আলোচ্য। সংকলনটিতে আছে মোট আটটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি লেখা ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ র মধ্যে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের মতে ফরাসি সাহিত্য বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ আলোচনার গ্রন্থ বাংলায় এটিই প্রথম।

'এক দিগন্ত দিনান্তের' ভূমিকা অংশে নামকরণের ব্যাখ্যা করে লোকনাথ ভট্টাচার্য জানান 'দিগন্ত' অর্থে 'ফরাসী কাব্য দিগন্তের একটি বিশিষ্ট অংশের রূপ গত শতাব্দীর অন্তে' – এই সংকলনে তাঁর আলোচ্য। আর সেই রূপটি হল ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতা। এই কবিদের মধ্যে সকলেই যে সমকালীন কবি তা নয়, এঁদের মধ্যে যেমন শতাধিক বছরের প্রাচীন বোদলেয়র আছেন, তেমনি আছেন সমকালীন কবি 'স্যাঁ-জন-পের্স'ও। সময় ভিন্ন হলেও এঁরা তাঁর মতে চলতে চেয়েছেন 'একই মন্দিরের অভিমুখে'। আর একারণেই সময়ের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও

আলোচনায় এঁরা এসেছেন। আবার প্রবন্ধগুলি লেখার উদ্দেশ্য হিসেবে লোকনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন "আজকের কবিতার একটি অতি বৃহৎ অংশ প্রেরণা পেয়েছে এই ফরাসি কবিদেরই দুয়েকজনের কাছ হতে। তাদের দিনাবসান ঘটেছে, এসেছে আরেকটি দিন, যা আজকের, কিন্তু সেই গতকালের ও আজকের মধ্যে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য"।[১] হয়তো চল্লিশোত্তর বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রতীকবাদী কবিদের প্রভাব লক্ষ করে লোকনাথ ভট্টাচার্য এ মন্তব্য করেছেন। অন্যত্র বলেছেন "ফরাসি বা অন্য কোন সমৃদ্ধ বিদেশী সাহিত্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতি নিয়ে বাংলার কোন তুচ্ছতম উক্তি করতে চাওয়াও দু'অর্থে বিপজ্জনক। প্রথমত, সে উক্তি হবে এমন পাঠকদের উদ্দেশ্যে যাঁদের একটি বিরাট গরিষ্ঠ সংখ্যা আন্তরিক অভিলাষ ও সজ্জন সুলভ কৌতূহল সত্ত্বেও তা বুঝতে সক্ষম নন, কারণ বুঝতে গেলে তাঁদের অনেক কাঠখড় আগে পোড়াতে হবে, বহু পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার পর পৌঁছোতে হবে উপলব্ধির এমন একটি প্রাথমিক বিন্দুতে যেখান থেকে আরো সম্যক উপলব্ধির পথে যাত্রা শুরু করা চলে – এবং সে বিন্দুতে যাঁরা পৌঁছোন নি। পৌঁছোনো সম্ভব ও নয়, কারণ স্পষ্ট বলাই ভালো যে আমাদের দেশের আর হাওয়া এখনো ততটা মননশীল নয়, বিদেশী-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাকেই আজো আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষুরস্য ধারায় প্রবাহিত হতে দিই নি"।[২]

যদিও লোকনাথ ভট্টাচার্য বাঙালির বিদেশী সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে অনীহার কথা বলেছেন কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ থেকেই ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালির আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, অরু দত্ত ও তরু দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়নাথ সেন এর কাছ থেকে ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে চাইতেন তার উল্লেখ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লোকনাথ ভট্টাচার্য যখন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাঙালির বিদেশী সাহিত্যচর্চা ও অনীহা প্রসঙ্গে তখন মনে হয় এই ক্ষোভ আধুনিক সাহিত্যচর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রসঙ্গেই হয়তো।

'এক দিগন্ত দিনান্তের' প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকাতেই লোকনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন "মুখ্য আলোচ্য যা, তা' ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা"[৩] এই আলোচনায় তিনি প্রধানতঃ বেছে নিয়েছেন বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, ভেরলেন, মালার্মে, পল ভালেরী, স্যঁ-জন-পের্স এর মতো প্রতীকবাদী কবিদের। 'চলতি কালের ফরাসী কবিতা' প্রবন্ধটিতে লোকনাথ বিশ শতকের ফরাসি কবিতার ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতকে ফরাসি সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রতীকবাদের উদ্ভব। এই প্রতীকবাদই বিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে পরিণত হয়েছে আধুনিক কবিতায়। প্রতীকবাদের উদ্ভবের কালে ছিল রোমান্টিকতার বিশাল প্রসার। এই পটভূমিতে ফরাসি সাহিত্যে যে নতুন দিগ্দর্শনের সূচনা হল প্রধানত যে দু'জনের হাত ধরে তাঁরা হলেন 'জেরার দ্য নের্ভাল' ও 'শার্ল বোদলেয়র'। ১৮৮৬ সালে জাঁ মোরেয়ার এর ঘোষণাপত্রেও প্রতীকবাদের সারধর্মকে তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৭০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে এই সাহিত্যচর্চা প্রবল হয়ে উঠেছিল ফ্রান্স ও বেলজিয়মে।

লোকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সঙ্কলনে এই প্রতীকবাদী সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তুলে ধরলেন এই সাহিত্যচর্চার প্রথম পুরুষ শার্ল বোদলেয়রের জীবন ও দর্শনকে। আজকের যুগে যাকে 'আধুনিক কবিতা' বলা হয় তার উৎস খুঁজতে গেলে যে

ফিরে তাকাতে হয় শতাব্দী পেছনে সেকথাই বললেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। আর সে উৎস খুঁজে পেতে চাইলেন শার্ল বোদলেয়ার এর রচনায়।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় শার্ল বোদলেয়র এর 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'। এই বইটিকেই আধুনিক কবিতার জন্মলগ্ন বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কবিতায় প্রথামুক্তির যে সন্ধান, আধুনিক জগৎকে যে নতুন দৃষ্টিতে দেখার ইচ্ছে তাঁর শুরু কিন্তু এই বইটি থেকেই। তাই বোদলেয়র '...শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা' বলে মনে করলেন বাংলার আর এক কবি বুদ্ধদেব বসু।

বোদলেয়র, যাকে লোকনাথও মনে করেছেন বিশ শতকে আধুনিক কবিতার জনক, তাঁকে নিয়ে দুটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন –

(১) 'এক দিগন্ত দিনান্তের' প্রবন্ধ সংকলনের 'বোদলেয়রের পাপ বোধ ও আমরা'

(২) 'তিক্ততার এই রঙে জন্ম' প্রবন্ধ সংকলনের 'তাঁদের একটি চিহ্নিত মানবতা' প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধটি তিনি লিখলেন বুদ্ধদেব বসুর 'শার্ল বোদলেয়র ও তাঁর কবিতা' গ্রন্থটিকে সম্মান জানিয়ে। লোকনাথ ভট্টাচার্য একসময় বুদ্ধদেব বসুর খুবই স্নেহধন্য ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তিনি র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' অনুবাদ করেন। এই প্রবন্ধে লোকনাথ ভট্টাচার্য বোদলেয়ারের এক নতুন দর্শনের কথা বললেন। সে দর্শন খ্রিস্ট্রিয় দর্শনের পাপের দর্শন। প্রবন্ধটিতে তাঁর আলোচ্য বিষয়ও নির্দেশ করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য– "আমার আলোচ্য বিষয় জীবন ও পাপবোধ ও তার সংগে কাব্য ও জীবন দর্শনের সম্বন্ধ, পরে সংক্ষেপে পাশ্চাত্য দেশে পাপের সনাতন রূপ এবং অবশেষে পাপ ও ভারত"।[৪] আর এই আলোচনার মূল লক্ষ্য বোদলেয়ারের সাহিত্যে পাপ ও সুন্দরের সম্বন্ধ। লোকনাথ ভট্টাচার্য এই পাপবোধের মধ্যে দেখেছেন নতুন প্রাণের চেতনা, প্রকাশের ও প্রকাশভঙ্গীর। আর তা তাঁর কাছে অবশ্যই এক নতুনতর সম্ভাবনা। ভালোবাসা বোদলেয়রের কাছ সচেতন পাপের এক রূপ, পাপ ছাড়া ভালোবাসা হয় না, তাঁর মতে পাপই ভালোবাসার আকর্ষণ, আর এই পাপকেই তিনি সঞ্চার করে দেন ফরাসি কবিতায়, যা পরবর্তীতে একটি দর্শন হয়ে ওঠে। আর লোকনাথ ভট্টাচার্য বোদলেয়ারের এই দর্শনকে খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাঁর জীবন থেকেই। তিনি কবির কবিতা ও দর্শনকে দেখেছেন অবিচ্ছেদ্যভাবে।

শার্ল পিয়ের বোদলেয়রের জন্ম ১৮২১ সালের এপ্রিল মাসে প্যারী শহরে। পিতা জোসেফ ফ্রাঁসোয়া বোদলেয়ার ছিলেন কারিগর শিল্পী। বোদলেয়রের জন্মের সময় তাঁর বয়স ৬১ বছর, মা ক্যারোলিন দ্যুফের বয়স ২৮ বছর। বোদলেয়রের ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। মা বছর না ঘুরতেই বিয়ে করেন সেনাবিভাগের এক পদস্থ অফিসার ওপিককে। মা ও তাঁর মধ্যে অপর একজন মানুষের এই অতর্কিত আগমন বোদলেয়র মেনে নিতে পারেননি। এ ঘটনা শৈশবেই যে আঘাত দেয় পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে তা এক করাল ছায়া বিস্তার করে। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর ১৮৩৩ সালে বোদলেয়র লিঅঁর এক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন থেকেই এক ভয়ঙ্কর নির্জনতা ও বিষন্নতার অনুভূতি কবিকে গ্রাস করে যা আমৃত্যু তাঁর সঙ্গী ছিল। ১৮৩৬ এ বোদলেয়র প্যারীতে ফেরেন। এই সময় থেকেই তাঁর কবি সত্তার সূত্রপাত। ১৮৩৯ এ পড়াশোনা শেষ করেই পরিবারে ঘোষণা করেন সাহিত্যই হবে তার জীবনের লক্ষ্য। এই নিয়ে সৎ পিতার সংগে তাঁর মনোমালিন্যও হয়। যা চলে সারাজীবন।

এই সময় থেকেই বোদলেয়রের জীবনে স্বভাব, আচরণ বদলাতে থাকে। সেই সময়ের ফরাসি সাহিত্য জগতের তরুণ কবি বালজাক প্রমুখের সংস্পর্শে আসা শুরু করেন। কুখ্যাতি ও

নিন্দায় গৌরব বোধ করা, বোহেমিয়ান সমাজে ঘোরা, স্বেচ্ছায় লুশেৎ নামে এক গণিকার সংস্পর্শে আসা শুরু হয়। বোদলেয়র চিরকাল মাকে ঘৃনা করেছেন ওপিককে বিয়ে করার জন্য। হঠাৎ করে এক অন্য পুরুষের আবির্ভাব বোদলেয়ারের শিশু মন মেনে নিতে পারেনি। আর তা থেকে ক্রমে শুরু হয়েছে বিবাহিত জীবনের প্রতি ঘৃনা। আসলে বোদলেয়ার যে খ্রিস্টিয় ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মেছিলেন ও বড়ো হয়েছিলেন তা তাকে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট এক ধারণা দিয়েছিল। লুশেৎকে জীবনে আনার পেছনে এই সচেতনভাবে পাপকে গ্রহণ করার মানসিকতাই কাজ করেছে। লোকনাথ ভট্টাচার্য মনে করেছেন বোদলেয়ার জীবনে এ ঘটনা আসলে সচেতনভাবে পাপের চর্চা, পাপে আনন্দানুভূতি। আর তা তাকে দিয়েছে এক মুক্তির আনন্দ। সে মুক্তি পরিবারের কঠোর দৃষ্টি থেকে, সমাজ ও নীতির কবল থেকে এবং গতানুগতিকতার শৃঙ্খল থেকে। এ এক বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহ থেকে জন্ম নিল এক দর্শন। সে দর্শন পাপের জগৎ থেকে সুন্দরের সন্ধান। আর এই সুন্দর জয় করে জীবনের সব নিচতাকে।

বোদলেয়ারের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত যথার্থভাবে ১৮৪৬ এ। এডগার এলান পোর রচনার সংগে পরিচয় তাঁর কবিসত্তায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এই সময় থেকেই শুরু হয় বোদলেয়ারের সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা। যা পরবর্তীকালে 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল' এ যুক্ত করা হয়। ১৮৫৭ তে বইটির প্রকাশ হয়। কিন্তু অশ্লীলতা, দুর্নীতির অভিযোগে মামলা হল প্রকাশক, মুদ্রক ও কবির বিরুদ্ধে, জরিমানাও হল। বোদলেয়ার কিন্তু এই ঘটনায় বিচলিত হন নি। বরং মনে করেছেন তাঁর জীবনে প্রথমবার ঘটা কোন সন্তুষ্টি। আর মনে করেছেন এই বই থাকবে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর প্রতি তাঁর চরম ঘৃনা ও বিরাগের শেষ জবানবন্দী হয়ে। জীবনের শেষ পর্যায়ে অত্যন্ত আর্থিক বিপর্যয়ে পড়তে হয় কবিকে। ভগ্নস্বাস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, ক্রমবর্ধমান ঋন, বেলজিয়ামে গিয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা, লেখা ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, কখনো ফরাসি আকাডেমির সভ্য হবার চেষ্টা – এক বিরাট বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা নাজেহাল করে তুলেছিল তাঁকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বাক্শক্তিরহিত হয়ে এক বছর থাকার পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট মৃত্যু হয় বোদলেয়ারের মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্যারীতে। বোদলেয়ারের জীবনের এই নেতিমূলক দিকের আলোচনার মধ্যে দিয়েই লোকনাথ ভট্টাচার্য তুলে ধরতে চেয়েছেন বোদলেয়ারের দর্শনকে। তাঁর মতে বোদলেয়ার ধরে নিয়েছিলেন এই পৃথিবীর সব কিছুর মূলে রয়েছে মন্দ, খারাপ, এক চরম প্রসূত পাপ। যেহেতু সবকিছুই পাপ এই পৃথিবীর, অতএব সুন্দরের প্রকাশ ঘটতে পারবে শুধু পাপের মধ্য দিয়েই। পাপ হল সুন্দরের একটি অতি বিশিষ্ট, অতিপ্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই দর্শনের ফলেই তাঁর কাব্যে এসেছে -

(১) ভালোর ওপর মন্দের জয়, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের ঘোষণা।

(২) সুন্দর হয়েছে একই সংগে দিব্য ও নারকীয়।

(৩) কখনো সুন্দরের সম্পূর্ন প্রকাশ শুধুমাত্র শয়তানের মধ্যেই।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের মতে বোদলেয়ারের এই জীবন দর্শন হয়তো সম্পূর্ন নয়। কিন্তু কাব্য হিসেবে তার যে উৎকর্ষ ঘটেছে তা অনস্বীকার্য।

এই প্রবন্ধে লোকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর দ্বিতীয় আলোচ্য বলেছেন 'পাশ্চাত্য দেশে পাপের সনাতন রূপ'। এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন খৃষ্টীয় পাপবোধের। তাঁর মতে খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনে বীজের আকারে যে আধ্যাত্মিক পাপবোধ ছিল বোদলেয়ার তাকেই নিলেন এবং তাকে সংক্রমিত করে দিলেন তাঁর সহযাত্রী কবি ও শিল্পীদের মধ্যে। লোকনাথ ভট্টাচার্য মনে করেছেন খ্রিষ্টান ধর্মানুসারে পূর্বকৃত পাপের শাস্তি হিসেবে মানুষ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনা ভোগ করে। জন্মে যে

পাপ, তার মোচন মৃত্যুতে। বোদলেয়ার এই দর্শনকেই গ্রহণ করেছেন - "দর্শন হিসেবে বোদলেয়ার তাই হয়তো একেবারে আনকোরা নতুন কিছু দিলেন না। তাঁর নতুনত্ব এই যে সেই পাপচেতনায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বাঁচলেন তিনি, তাতে মরলেনও। তাকে চেখে চেখে দিনে দিনে গভীর মননের সংগে গড়ে তুললেন তাঁর জীবনদর্শন। যে – পাপবোধ তাঁর জীবনে, যার অপূর্ব প্রকাশ তাঁর কবিতায় ও গদ্য রচনায় তা দিগন্তপ্রসারী হওয়ার আগে বহু কঠিন মুহূর্তের সাধনার দ্বারা অনুধ্যাত ও নির্বাচিত হয়েছিল"।[৫] এই ব্যাখ্যার পর লোকনাথ ভট্টাচার্যের অভিমত – "বোদলেয়ারের অভিনবত্ব শুধু তাইতেই নয় – পাপের আলোকে তিনি এক নতুন ভূমিকা দিলেন সুন্দরকে, এবং এই দানই নিঃসন্দেহে তাঁর প্রধানতম"[৬]। আসলে খ্রিষ্টীয় ধর্মের ভালো ও মন্দ, পাপ ও অপাপের, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার সংগে বোদলেয়ারের দর্শনের পার্থক্য আসলে সৃষ্টিশীল মানুষের সুন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যায় – একথাই বোঝাতে চাইলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য।

প্রবন্ধটিতে লোকনাথ ভট্টাচার্য তৃতীয় যে দিকটি আলোচনা করতে চাইলেন তা হল পাপবোধ ও ভারত। অর্থাৎ ভারতীয় চেতনায় কোথায় পাপবোধের অবস্থান। লোকনাথ ভট্টাচার্যের মতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা মূলত বৈদান্তিক। তা শুধুমাত্র পুঁথির বা শিক্ষালয়ের তত্ত্ব নয়। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতের সমস্ত অলংকার শাস্ত্রে, রস ও সুন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যায়, সমগ্র সাহিত্য কাব্য, চিত্রকলা, ললিতকলায় সর্বত্র। পশ্চিমী চিন্তার সংগে তিনি আরও একটি পার্থক্য লক্ষ করেছেন তা হল ব্যক্তির সত্তা ভারতে কখনো এক ভিন্ন একক হয়ে দাঁড়ায়নি। অজ ও শাশ্বতের নতুনতর প্রকাশে বা প্রকাশভঙ্গিতে তা বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি দেখেছেন, "মাত্র নৈতিক ও এক ধরণের বাহ্যিক অর্থে পাপ ভারতেও বিদ্যমান, কিন্তু সে নয় সেই অন্তরের পাপ, এক আদি ও মৌলিক পতন, যা থেকে নিস্তার নেই"।[৭] ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় পাপ ও পুণ্য দুয়েরই অস্তিত্ব আছে। সুন্দর ও সম্পূর্ণের উল্টোটাও আছে। আছে জন্ম ও মৃত্যু, ভালো ও মন্দ, ভয় ও ভয়ের অভাব। কিন্তু সে সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছে "এক হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে, যার উন্মোচনের সংগে সংগে নিঃশেষে বিলীন হবে রূপের, স্পর্শের ও অনুভূতির এক আপাত ভিন্নতা"।[৮] কিন্তু বোদলেয়ারের সুন্দরের ধারণার অংশ ভারতীয় রসের মত অলৌকিক নয়। তা ভিন্নতার আবেগ। লোকনাথ তাকে ব্যাখ্যা করলেন 'চির আধুনিক' বলে। লোকনাথ ভট্টাচার্য আসলে এ প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন যে বোদলেয়ারের দর্শন ও সাহিত্য ভাবনাকে তাঁর জীবন থেকে বিচ্যুত করে বোঝা যাবে না। তাঁর ব্যক্তিজীবনে, শৈশব যাপনের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর বিচ্ছিন্নতা ও সংবেদন। এইসব উপাদানই তাঁর সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর জীবন এক নিরন্তর যাত্রার মতো। আর এই যাত্রাপথে কোন সম্পর্ক স্থাপনেই তিনি সফল নন। নারীর প্রতি আকর্ষণ ও ঘৃণা, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা, নরকতুল্য শহর জীবনের অভিজ্ঞতা বোদলেয়ারকে নিরন্তর নিস্পেষিত করেছে। ঈশ্বর ও শয়তান, প্রেম ও যন্ত্রণা এই বিপরীত উপলব্ধি তাঁর জীবনলব্ধ চেতনা। আর এই চেতনারই প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রবন্ধটির তিনটে লক্ষ্যে বোদলেয়ারের এই চেতনাকেই ব্যাখ্যা করেছেন। দেখিয়েছেন বাইরের জগতের চিত্রময় বাস্তবতা ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতা আসলে অন্তর্জগতের ঈশ্বরবোধ, পাপ ও স্খলনের এক বিষাদক্লিষ্ট ও যন্ত্রণাদগ্ধ অনুভূতি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য এই প্রবন্ধের শুরুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসুকে 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' গ্রন্থটির জন্য। বুদ্ধদেব বসু এই প্রবন্ধে যে জীবনীপঞ্জীটি যুক্ত করেছেন গ্রন্থটির শেষে তা বোদলেয়ারের জীবনের তথ্যাবলীই শুধু নয়, একটি প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে যেন। বোদলেয়ারকে বুঝতে যেমন তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষিত জানা প্রয়োজন,

তেমনি খুবই উপযোগী সমকালীন ফরাসি দেশের রাজনৈতিক আবহ ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে জানা। এই জীবনপঞ্জীটি বোদলেয়ারের ব্যক্তিজীবন, পরিবার জীবন ও তাঁর বেড়ে ওঠার সংগে সংগে সাহিত্য-মানস গড়ে ওঠার পেছনেও যে সমকালীন পরিবেশের প্রভাব রয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করে। লোকনাথ ভট্টাচার্যও তাঁর এই প্রবন্ধে বোদলেয়ারের ব্যক্তিজীবনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার ফলে যে পাপের দর্শনের উল্লেখ বারেবারে বোদলেয়ারের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে উঠে আসে তার বীজকে সহজেই ধরে ফেলা যায় এই আলোচনা থেকে।

ফরাসি সাহিত্য বিষয়ে অন্য দুই অন্যতম আলোচক অরুণ মিত্র ও চিন্ময় গুহও বোদলেয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অরুণ মিত্র তাঁর 'ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে' বইটিতে বোদলেয়ারের দর্শনকে দেখেন একটু ভিন্ন ভাবে। তিনি দেখান আত্মদর্শনেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব ও যন্ত্রণা।

চিন্ময় গুহ বোদলেয়ারকে দেখালেন ক্রমশ আলো কমে আসা পৃথিবীতে নতুন এক আধুনিকতার বয়ান সৃষ্টিকারী কবি হিসেবে - "বোদলেয়ারের হাতে কবিতা হয়ে ওঠে এক গুপ্ত ভাষা, এক সংকেত লিপি, এক তন্ত্র যাকে বিশ্লেষণ করা দুরূহ, যা কবিতার সব পুরানো ঘুঁটি উলটে দেয়। ইউরোপীয় কবিতায় নির্মিত হয় ক্রমশ আলো কমে আসা পৃথিবীতে নতুন আধুনিকতার বয়ান"[৯]।

আরও দেখলেন 'এক নতুন ক্রিয়ার জনক' হিসেবে, যা মালার্মে, র‍্যাঁবো, ভেরলেন এবং আঁরি মিশো পর্যন্ত ফরাসি কবিতার ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হবে।

যদিও অরুণ মিত্র মনে করেছেন শতাব্দী প্রাচীন কবির অবয়ব ভাবনা আজকের যুগে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকনাথ ভট্টাচার্য বোদলেয়ারকে দেখলেন গতকাল ও আজকের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হিসেবে। এখানেই বোদলেয়ার আজও তাঁর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে, এক তাল কাদাকে সোনায় পরিণত করার গুরুত্ব নিয়ে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। এমনটাই বলতে চাইলেন বুঝি এই দীর্ঘ আলোচনায় লোকনাথ ভট্টাচার্য।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, বীতশোক (সম্পাদিত) – লোকনাথ ভট্টাচার্য রচনাবলী – তৃতীয় খন্ড (প্রবন্ধ সংখ্যা) – এবং মুশায়েরা – কলকাতা – প্রথম প্রকাশ ২০০৫, ভূমিকা অংশ।
২. তদেব, পৃ: ১৪২।
৩. তদেব, লেখকের কথা – এবং মুশায়েরা, ২০০৫।
৪. তদেব – এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃ: ৭।
৫. তদেব, পৃ: ১৪।
৬. তদেব – এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃ: ১৪।
৭. তদেব, পৃ: ১০।
৮. তদেব, পৃ: ১৫।
৯. গুহ, চিন্ময় – শার্ল বোদল্যের ২০০ : অভিশাপ ও ঈশ্বর – বিন্দু থেকে বিন্দুতে – পরম্পরা – কলকাতা – প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ: ১০৯।

উপনিষদের আলোকে স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রাসঙ্গিকতা

সুদেষ্ণা দে
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: শিক্ষা মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে তাকে অজ্ঞান থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। শিক্ষায় দেশের উন্নতির প্রধান সোপান। শিক্ষা কখনও লিঙ্গভেদ করে না। তাই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হিসাবে আমরা যেমন নচিকেতা, সত্যকামকে পাই তেমনি গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষীকেও পাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী যিনি সমস্ত পার্থিববস্তু কে অস্বীকার করে ব্রহ্মকে জানতে চেয়েছেন আর গার্গী ছিলেন সেই ব্রহ্মবিদুষী যিনি বিদ্বৎসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ব্রহ্মজ্ঞানীকে প্রশ্নকরার সাহস দেখিয়েছেন। এছাড়া কেনোপনিষদে দেবী উমাকে দেখি যার উপদেশে ইন্দ্র ব্রহ্মকে জেনেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি উপনিষদের সময়ে স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিকশিক্ষায় তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে চেষ্টা করছি।
সূচক শব্দ: উপনিষদ, শীক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মৈত্রেয়ী, গার্গী।

মূল আলোচনা:
উপনিষদে 'শিক্ষা' বলতে একটি বেদাঙ্গকে বোঝানো হয়েছে, এটি হল মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান। শিক্ষার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে। শিক্ষা এবং শীক্ষা এক, ছান্দস বলে দীর্ঘ। এখানে শিক্ষা বা 'শীক্ষা' বলতে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা যায়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা। ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপনিষদে অর্থের প্রাধান্য এবং শব্দাংশের অপ্রাধান্য থাকলেও শব্দ যথাযথ উচ্চারিত না হলে বিপরীত অর্থ প্রতিভাত হয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। তাই উপনিষদ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন শিক্ষণীয় বিষয় কি ছিল? তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটি তালিকা আছে[১]। সেখানে বলা হয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় হল- বর্ণ (অকারাদি বর্ণ), স্বর (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত), মাত্রা (একমাত্রা, দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা এবং অর্ধমাত্রা), বল (শব্দোচ্চারণে প্রযত্ন), সাম (সমরূপে উচ্চারণ এবং সন্তান (সংহিতা অথবা নিয়মিত-ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য)। প্রত্যেক বেদের নিজস্ব শিক্ষাগ্রন্থ আছে। যেমন- ঋগ্বেদের পাণিনীয়শিক্ষা, সামবেদের নারদশিক্ষা, কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাসশিক্ষা, শুক্লযজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা এবং অথর্ববেদের মাণ্ডূক্যশিক্ষা। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও (৭/১/২) পাঠ্যবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিষয়গুলি হল- চার বেদ, ইতিহাস-পুরাণ (বেদানাং বেদম্), পিতৃলোকের সন্তুষ্টি সাধনে করণীয় নিয়মাবলী, অংক বা রাশিশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, তত্ত্ব আলোচনা, দেববিদ্যা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, রাজনীতি ও শাসন-প্রণালী (ক্ষত্রবিদ্যা), জ্যোতির্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা।

বৈদিক এবং বৈদিকোত্তরযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন ঊর্ধ্বশ্রেণীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। উপনয়নের পরেই ছাত্রকে গুরুগৃহে গমন করতে হত। উপনয়নের মাধ্যমে শিষ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করত এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারীর

জীবনযাপন করত। যাদের উপনয়ন হত না তাদের পতিতসাবিত্রীক বলা হত। এদের বেদপাঠে অধিকার থাকত না, সমাজ তার সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ করত। সমগ্র শতপথব্রাহ্মণে উপনয়ন হবার পর ছাত্র কিরূপে আচার্যের তপোবনে গমন করত এবং আচার্যের প্রথম করণীয় কর্তব্য কি ছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। "আজ থেকে তুমি ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলী পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে। তোমার করণীয় কর্তব্য কর। যজ্ঞকুণ্ডে কাষ্ঠদান কর। আচার্যের আজ্ঞাধীন ও বাধ্য হবে। দিবানিদ্রা ত্যাগ করবে। জিতেন্দ্রিয় হবে"।– ইত্যাদি উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে[২]। ছাত্ররা গুরুগৃহে বারোবছর ধরে শিক্ষালাভ করত। ছান্দগ্যোপনিষদে দেখি শ্বেতকেতু বারো বছর পর গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরেছিল। উপকোসল সত্যকাম জাবালের গৃহে বারো বছর ধরে ছিলেন। তৎকালীন সমাজে শিক্ষাদান প্রথা ছিল বিনামূল্যে। সন্তানের শিক্ষাবাবদ পিতামাতাকে সামান্যতম অর্থও তাদের বেতন ও ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতে হত না। আচার্যও কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করতেন না। আচার্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল যিনি বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন[৩]। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে তারা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করত। শিক্ষায়তন ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ছাত্ররা নিজেদের সাধ্যমতো সামান্য কিছু দক্ষিণা গুরুকে দিত। বেদাধ্যয়ন ছাড়াও আচার্যের গৃহস্থালীর তদারক, গোচারণ, সেবা ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৪/৪/৫) সত্যকাম কিভাবে গুরুগৃহ থেকে গরু নিয়ে দূরদেশে যেত এবং কিরূপে তার গরুর সংখ্যা চারশত থেকে একহাজারে পরিণত হল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত সামান্য কিছু চিত্র আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে পেয়ে থাকি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণের নারীর বেদাধ্যয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। তারাও গুরুগৃহে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের সমান অধিকারী ছিল। অথর্ববেদে (১১/৬) বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের শেষে স্ত্রীরা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে স্ত্রীরাও ব্রহ্মচর্যপালনে সমান অধিকারী। স্মৃতিশাস্ত্রকার হারীত তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

"পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা"[৪] ।।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা নারীদের অভিষিক্ত করা হত। তাঁরা বেদপাঠ করতেন এবং সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। হারীতসংহিতায়[৫] দু'ধরণের স্ত্রীলোকের কথা বলা হয়েছে- ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ। 'ব্রহ্ম' বলতে এখানে বেদকে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন হত। তারা বেদাধ্যয়ন, ভিক্ষাচরণ, পবিত্র অগ্নি রক্ষা প্রভৃতি কাজ করতেন। ব্রহ্মবাদিনীরা চিরকৌমার্যব্রত পালন করত। সদ্যোবধূদের ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করে বিবাহ দেওয়া হত। বেদের সংহিতা অংশে আমরা বহু ঋষিকার নাম পাই, যেমন- কাক্ষীবতী ঘোষা, অপালা, শ্রদ্ধাকামায়নী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বৃহদ্দেবতায় এই মন্ত্রদ্রষ্টা রমণীগণকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হয়েছে।

উপনিষদেও আমরা এরূপ বিদুষী জ্ঞানপিপাসু (ব্রহ্মজ্ঞান) নারীদের নাম দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের যে চারটি চরিত্র উপনিষদটিকে আলোকিত করেছে তাদের মধ্যে দুটি নারী চরিত্র। এঁরা হলেন- গার্গী এবং মৈত্রেয়ী। বচক্নুর কন্যা গার্গী ছিলেন জ্ঞানী, বিদুষী দার্শনিক, উপনিষদযুগের প্রথিতযশা বিদুষী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। একবার বিদেহসম্রাট জনকের বহুদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হয়েছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক হচ্ছে। তর্কে যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্যান্য ঋষিরা পরাজিত হলেন তখন গার্গী তাঁকে প্রশ্ন করলেন। একাধিক প্রশ্ন করার পর গার্গী যখন জিজ্ঞাসা করলেন "কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ

প্রোতাশ্চেতি” তখন যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বিরত করার জন্য বললেন- “গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ” (বৃহ. উপ ৩/৬/১) অর্থাৎ হে গার্গী, অতিপ্রশ্ন করবেন না। “তে মূর্ধা মা ব্যাপপ্তত; অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতাম্ অতিপৃচ্ছসি” (বৃহ. উপ ৩/৬/১)। অর্থাৎ আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়; যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হতে পারে না, আপনি তাঁরই সম্বন্ধে অতিপ্রশ্ন করছেন”[৬]। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গী আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছেন- “ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি” (বৃহ. উপ ৩/৮/১)- “শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, অনুমতি হলে আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব”[৭]। প্রশ্নের মাধ্যমে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে অক্ষর বা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছেন। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে প্রশ্ন থেকে বিরত করার জন্য তাঁকে মস্তকপতনের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু গার্গী ভয় পাননি। তিনি এতটাই জ্ঞানপিপাসু ছিলেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি বিনয়বশতঃ প্রশ্ন থেকে বিরত থাকলেও অষ্টম ব্রাহ্মণে আবার তাঁকে প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্নোত্থাপনের পূর্বে ব্রাহ্মণদের অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন। এখানেই গার্গীর মহত্ত্ব। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্ন গার্গীর আত্ম-অহংকার প্রকাশ করেনা বরং তার জ্ঞানপিপাসা প্রকাশ করে। একজন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারে। আত্মজ্ঞান-প্রার্থনাই আত্মলাভের সর্বত্তোম উপায়। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হয়েছে-

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্”।। (৩/২/৩)

(বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা উক্ত আত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারাও নয়, শ্রবণের দ্বারাও নয়; সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের দ্বারাই তিনি লভ্য; সেই মুমুক্ষুর এই আত্মাই স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন[৮]।)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে মৈত্রেয়ী নামক অপর এক ব্রহ্মবাদিনীর (আধ্যাত্মিকভাবাপন্না) কথা জানতে পারি। ইনি মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী ছিলেন। তাঁর অপর পত্নী হলেন কাত্যায়নী। কাত্যায়নী ছিলেন সাংসারিকবুদ্ধিসম্পন্না। একসময় প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীর মধ্যে পার্থিব দ্রব্যাদি ভাগ করে দিতে ইচ্ছুক হলে মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন “যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো নেতি” (বৃহ. উপ ৪/৫/৩)। অর্থাৎ যদি সম্পদে পরিপূর্ণা এই সমগ্রা পৃথিবী আমার হয় তবে তার দ্বারা আমি অমর হব কি হব না?”[৯] যাজ্ঞবল্ক্য বললেন- “ন ইতি। যথা এব উপকরণবতাং জীবিতং তথা এব তে জীবিতং স্যাত, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি” (বৃহ. উপ ৪/৫/৩)। অর্থাৎ “না, সম্পদশালী ব্যক্তির জীবন যেমন (ভোগলিপ্ত), তেমন তোমার জীবনও হবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্বলাভের আশা নেই”। এই শুনে মৈত্রেয়ী বললেন “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম, যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহীতি” (বৃহ. উপ ৪/৫/৩)- “যার দ্বারা আমি অমরত্ব পাব না তা দিয়ে আমি কি করব? আপনি যা অমরত্বের সাধন বলে অবগত আছেন কেবল তাই আমাকে বলুন”[১০]।। মৈত্রেয়ীর এই উক্তি অবিস্মরণীয়। ধর্ম, অর্থ, কাম কোনোটাই তিনি চাইলেন না। চাইলেন অন্তিম বর্গ মোক্ষকে। তার যে এই সর্বত্যাগ এর দ্বারাই তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। অনিত্য ধনসম্পদ ও তার দ্বারা লভ্য অনিত্য স্বর্গলোকে কী লাভ? বিত্ত ও বিত্তসাধ্য ফলে বিরাগবশতঃ তিনি মুক্তির উপায় আত্মজ্ঞান চাইলেন। যেহেতু আত্মাকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যায় তাই অমৃতত্বের জন্য আত্মজ্ঞান প্রার্থনাই

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পক্ষে শোভন। উপনিষদ মতে, আত্মজ্ঞানের অধিকারী কখনও অনিত্য বস্তু কামনা করে না। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে সমস্ত কাম্যবস্তু দিতে চাইলেও নচিকেতা সেইসবকে অস্বীকার করেছে। যম নচিকেতা কে বলেছেন- “শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়ই মানুষকে আশ্রয় করে। ধীমান উভয়কে সম্যক পরীক্ষা করে পৃথক করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম বলে জেনে তাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষের জন্য প্রিয় পশুপুত্রাদির বরণ করেন”[১১]। তিনি আরও বলেছেন- “বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে/ ন ত্বা কামা বহবঃ অলোলুপন্ত” (কঠ. উপ ১/২/৪)। এখানে মৈত্রেয়ীও বিদ্যাভিলাষী ও উত্তমবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন তাই তিনি শ্রেয়কে বরণ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর অসাধারণ জিজ্ঞাসু মনের স্পষ্ট পরিচয় পেয়ে তিনি সাদরে তাকে আহ্বান জানিয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে মনোনিবেশ করলেন। মনন অর্থাৎ অনুকূল যুক্তির সাহায্যে চিন্তন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অনবরত অনুধ্যানের সাহায্যে বেদান্তশ্রবণই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হয়। কেনোপনিষদেও আমরা ব্রহ্মরূপিণী উমাকে পাই যার অধীনে ইন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিল।

বৈদিক যুগের মতো উপনিষদের যুগেও নারীরা সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তারা আদর্শ তপস্বীর জীবনযাপন করত। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৬/৪/১৮) বলা হয়েছে- যদি কেউ বিদুষী কন্যা লাভ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি এবং তার পত্নী ঘিমিশ্রিত তিলৌদন (তিলমিশ্রিত অন্ন) সেবন করবেন[১২]। তবে এটুকু দৃষ্ট হয় যে ঋগ্বেদের যুগের তুলনায় উপনিষদের যুগে বিদুষী নারীর নাম কম পাওয়া যায়। মনে হয়, ব্রহ্মবিদ্যা যেহেতু গ্রামের প্রান্তে নির্জন অরণ্যে গুরুর অধীনে লাভ করতে হত তাই পিতা-মাতা নিজের কন্যাসন্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে যেতে দিত না। এছাড়া সে যুগে নারীদের জন্য কোন শিক্ষালয় ছিল কিনা সে সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে মহাভারতে দেখি দ্রৌপদী অন্তঃপুরে তার ভাইয়ের সাথে গুরুর কাছ থেকে বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্র শিক্ষা নিচ্ছেন।

উপনিষদের ঋষি বিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন (মুণ্ডকোপনিষদ, ১/১/৫)- একটি অপরা বিদ্যা, যার দ্বারা বেদ, বেদাঙ্গ, কে বোঝানো হয়েছে। অপরটি হল পরা বিদ্যা, যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। কেবল শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা এই বিদ্যা লাভ করা যায় না তাই এটি পরা বিদ্যা। গুরুর কাছে বসে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই বিদ্যা লাভ করা সম্ভব হতো। গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই পরা বিদ্যার মাধ্যমে শিষ্য সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (১/১১/১-৪) উল্লিখিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশগুলি দিয়েছেন তা চিরকালই প্রাসঙ্গিক- সেখানে বলা হয়েছে সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। এই উপদেশ আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত, নম্রতাযুক্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ-ব্যবহারযুক্ত, অক্রূরমতি, বিচারক্ষম, কর্মনিষ্ঠ হতে শেখায়। উপনিষদ জ্ঞানলাভের জন্য যে কথাটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হল ‘অধিকারী’। যে বিষয়ে শিষ্য জ্ঞানলাভ করবে সেই বিষয়ের প্রতি তাকে চরম অভিলাষী হতে হবে আর সেই সঙ্গে তাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে। মৈত্রেয়ী আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে তিনি সমস্ত পার্থিব বস্তুকে অস্বীকার করলেন। এইরূপ বিদ্যাভিলাষী হওয়া প্রয়োজন। তবেই যথার্থ জ্ঞানার্জন সম্ভব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শিক্ষা প্রয়োজন যা পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাবে। নারীদের স্বমহিমায় এগিয়ে চলার শক্তি দেবে। তাদের গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো দৃঢ়চেতা, যুক্তিবাদী, বিচারক্ষম করে তুলবে। এই আত্মদর্শনরূপ শিক্ষা একমাত্র উপনিষদ থেকেই আমরা পেতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পা.), ২০১২, ‘উপনিষদ গ্রন্থাবলী’. খণ্ড. ১, কলকাতা-৩, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, পৃ. ২৫৭।
২. বসু, যোগীরাজ, ২০১০, ‘*বেদের পরিচয়*’, কলকাতা-১০, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৮৭।
৩. তদেব, পৃ. ১৯১।
৪. তদেব,পৃ. ১৯৭।
৫. তদেব, পৃ. ১৯৭।
৬. স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পা.), ২০১২, ‘উপনিষদ গ্রন্থাবলী’. খণ্ড. ৩, কলকাতা-৩, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, পৃ. ২২৮।
৭. তদেব, খণ্ড. ৩, পৃ. ২৩৯।
৮. তদেব, খণ্ড. ১, পৃ. ২৩৪।
৯. তদেব, খণ্ড. ৩, পৃ. ৩৫০।
১০. তদেব, খণ্ড. ৩, পৃ. ৩৫০।
১১. তদেব, খণ্ড. ১, পৃ. ৬৮।
১২. তদেব, খণ্ড. ৩, পৃ. ৪৩৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

- Altekar, A. S, 2009, *The Position of Women in Hindu Civilization*, Delhi, Motilal Banarasidass.
- Mookerji, Radhakumud, 1969, *Ancient Indian Education*, Delhi, Motilal Banarasidass.

সাংখ্যকারিকা অবলম্বনে দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়

সুফল দাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ
স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: সুখ, দুঃখ নিয়েই জীবের সংসার। সংসারে সুখ এবং দুঃখ উভয়-ই রয়েছে। আর মানুষের জীবনে এই দুঃখের অনুভূতি হল সবচেয়ে তীব্র কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। মূলত জীবন মানেই নানাবিধ দুঃখের জটাজাল। এই দুঃখের অনুভূতি মানুষের জীবনে আবির্ভাব ঘটেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। তাই চিরকাল প্রাণী মাত্রই এই দুঃখ জয় করে সুখ লাভের উপায় অনুসন্ধান করে চলেছে। এবং এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়েছে। সাংখ্য শাস্ত্র ও এর ব্যতিক্রম নয়। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং দুঃখ দূর করবার উপায় আবিষ্কার করা সামর্থ্য যার আছে তা কে সর্বাপেক্ষা করুনা পরায়ণ এবং তত্ত্ব দর্শী বলে স্বীকার করতে হয়। মানুষের অন্তঃকরণে দুঃখ অনুভূত হয় বলে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই দুঃখ কেন ? দুঃখের স্বরূপ কি? দুঃখ কিভাবে সংঘটিত হয় এবং দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় আছে কিনা? এই চিন্তা অনাদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজমান। সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল পরম সত্য উপলব্ধির সাহায্যে এই তথ্য জেনে দুঃখ নিবৃত্তি উপায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং এই বিষয়ে তিনি যে তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
বীজশব্দ: দুঃখ, অন্তঃকরন, তত্ত্বদর্শী, উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞতা।

মূল আলোচনা:

ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত ‘সাংখ্যকারিকা’কার অন্তর্গত প্রথম কারিকায় বলা হয়েছে-

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্ জিজ্ঞাসা তদপঘাতক হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহহভাবাৎ।। ১।।[১]

অর্থাৎ এই সাংখ্যকারিকায় প্রথমেই শুরু হয়েছে “দুঃখত্রয়”[২] এই শব্দটি দিয়ে। ‘দুঃখত্রয়’ বলতে সাংখ্যকারিকা-য় দুঃখের সংখ্যা তিন-একথা এখানে বলা হয়নি। ‘বেদত্রয়’ বলতে যেমন তিনটি বেদ বোঝায়। কিন্তু দুংখত্রয় বলতে তিনটি দুঃখকে বোঝায় না। কারণ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য রকমের দুঃখ আছে। এই তিন কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিন প্রকার। যথা- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার-যথা, শারীরিক ও মানসিক। বাত পিত্ত ও শেল্মা এই ত্রিবেদী শরীর ধাতুর বৈষম্য থেকে শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিষন্নতা ও বিষয় বিশেষের অপ্রাপ্তি বশত মানস দুঃখে জন্মে। মনুষ্য পশু কিংবা স্থাবর জনিত যে সকল দুঃখ আছে তাদের নাম আদিভৌতিক দুঃখ। হত্যাকাণ্ড সর্বাদির দংশন ও কন্টক ভেদাদি জনিত দুঃখ এই শ্রেণীর। শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে কখনো বা ভূত পিশাচাদির দৌরাত্ম্য যে দুঃখের সৃষ্টি হয় তার নাম আদিদৈবিক দুঃখ। এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি সাংখ্যদর্শনের চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ। প্রশ্ন হল এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? উত্তরে বলা

যায় দুঃখের অভিভব বা নিবারণ সম্ভব এবং এই তিন প্রকার দুঃখের নিবারনের তিন প্রকার উপায় রয়েছে। যথা- ১. দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায় ২ .আনুশ্রবিক উপায় তথা বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি কর্মকলাপ ৩. সাংখ্য শাস্ত্র বিহিত উপায়, তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক জ্ঞান।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ দুঃখ পরিহার করতে সর্ববিধ চেষ্টা করে চলেছেন। শারীরিক দুঃখ দূর করার জন্য ঔষুধ সেবনের ব্যবস্থা এবং নানাপ্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের আর্বিভাব হয়েছে। মানসিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য উপাদেয় ভোগ্য বস্তু, যেমন-মনোরম স্ত্রী, পান, ভোজন,বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি অর্থাৎ মন যে সকল বিষয়ে সন্তোষ অনুভব করে তা করে দেখা হয়েছে। এই সকল চেষ্টাতে যে কখনও কখনও দুঃখের নিবৃত্তি হয়নি তা নয়। কিন্তু সেই নিবৃত্তি সাময়িকমাত্র-স্থায়ী নয়। ঔষুধ সেবনে সকল রোগের রোগের নিবৃত্তি হয় না; এবং একবার নিবৃত্তি হলে আবার পুনরায় আক্রমনের আশঙ্খা থাকে। বৈরনির্য্যাতন, পুত্রলাভ, স্ত্রী-সাহচর্য ও ধনসম্পত্তি লাভ প্রভৃতি দ্বারা মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে তা ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক নয়। একবার ইষ্টসাধন হলে সময়ান্তরে কাম ক্রোধাদি মানসিক বৃত্তিসমূহ চঞ্চল হয়ে দুঃখ জন্মাতে পারে। এছাড়াও বলা যায় যে মানুষ নিজের চেষ্টায় সকল প্রকার দুঃখ দূর করতে সমর্থ হলেও জরা ও মৃত্যুজনিত দুঃখ দূর করতে সমর্থ নয়। যতদিন শরীর থাকবে,ততদিন জড়ামরণ জনিত দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকবে। সকল জীবের-ই এই দুঃখ স্বভাবসিদ্ধ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন—''উর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাং এব জরা মরণাদিজং দুংখং সাধারণং''।[৩] সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে লৌকিক কোন উপায়ে সাময়িকভাবেও দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হলেও দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তিতে মানুষ সন্তুষ্ট নয়; মানুষের কাম্য দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্যসূত্রকার বলেছেন---' অথ ত্রিবিধদুঃখখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ'।[৪] যজ্ঞবাদীরা বলেন যে দুঃখ নিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় আছে, সেই উপায় যজ্ঞ। যজ্ঞ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারলে মানুষ সুখপ্রাপ্ত হয়। সেই সুখপ্রাপ্তির নাম স্বর্গ। বেদে নানা প্রকার যজ্ঞের বিধান আছে। যার যেমন অভিলাষ, তার জন্য সেই প্রকার ব্যবস্থা। কোন যজ্ঞের ফলে ইন্দ্রয়ত্বলাভ, কোন যজ্ঞের ফলে পুত্রলাভ, কোন যজ্ঞের ফলে শত্রু নাশ ইত্যাদি হয়ে থাকে। যিনি দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে স্বর্গসুখ পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তিনি যজ্ঞ করবেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যেরা মনে করেন যজ্ঞের ফলে স্বর্গসুখ লাভ হলেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। কারণ- ১.স্বর্গ মানুষের কর্ম্মার্জিত; যিনি যেরূপ কর্ম বা যজ্ঞ করেন তিনি সেই স্তরে স্বর্গলাভ করে থাকেন। সকল যজমান একই স্বর্গের অধিকারী নয়। কেউ উচ্চস্তর, কেউ বা নিম্নস্তর স্বর্গের অধিকারী। একই স্বর্গে সকল প্রকার সুখভোগের সম্ভাবনা নেই। যিনি যেরূপ স্বর্গলাভ করেন, তিনি কেবল তদুচিত সুখই ভোগ করেন; অন্যান্য স্বর্গবাসীদের সুখ তিনি অনুভব করতে পারেন না। এইজন্য অপর স্বর্গবাসীদের সুখের তুলনায় নিজেকে দুঃখী মনে করেন থাকেন। ২. যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল কেবল সুখ নয়, দুঃখ ও রয়েছে। কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপেরও স্পর্শও রয়েছে। যজ্ঞ হিংসাবহুল। কেননা যজ্ঞে অনেক সময় জীবহত্যা করতে হয়। আর জীবহত্যা পাপ কার্য্য। পাপের ফল দুঃখ, সুতারাং যজ্ঞানুষ্ঠানে একদিকে যেমন পুণ্য সঞ্চিত হয়ে স্বর্গের অধিকার জন্মে, সেইরূপ আর এক দিকে হিংসাজনিত পাপ সঞ্চিত হয়ে দুঃখের পথ প্রশস্ত করে রাখে। ৩.ইহলোকে যেমন কর্ম্মার্জ্জিত কর্ম ভোগ করলে ফুরিয়ে যায়, সেইরূপ পরলোকে পুণ্য ফলার্জ্জিত স্বর্গজীবনে ও পুণ্য কর্মের ভোগ শেষ হলে জীবকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরে আসতে হয়। স্বর্গাদির ভোগ স্থায়ী হয় না। এই সকল কারণবশতঃ সাংখ্যাচার্য্যগণরা বলেন যে কি লৌকিক উপায়, কি বৈদিক উপায়

কোনটিই দুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতারাং চিরতরে এবং সম্পূর্ণরূপে দুঃখ নিবৃত্তি করবার আর কোন উপায় আছে কি না সেটাই ভাববার বিষয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ যার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তিনি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে নানাবিধ দুঃখ পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি সেই বিষয়ের কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে থাকে তার কোন ক্লেশ হয় না। যার জ্ঞান যত বেশী তার দুঃখ তত কম; যিনি যে পরিমানে অজ্ঞ তিনি সেই পরিমানে দুঃখী। এই সকল বিষয় হতে মনে হয় যে জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। প্রশ্ন হতে পারে যে জ্ঞানই যদি দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হয়ে থাকে তাহলে জ্ঞানীরা কখনও কখনও দুঃখ ভোগ করেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় জগতে কেউই সর্বতোভাবে সুখী নয়। কারণ কিছু না কিছু দুঃখ জ্ঞানীদেরও রয়েছে। এর কারণ কি? সাংখ্যচার্য্যগণরা বলেন যার দুঃখ আছে তার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়নি এটাই বুঝতে হবে। যে কোন জ্ঞানকেই পূর্ণ বলা যায় না। অনেক লোকের অনেক বিষয়ে পান্ডিত্য থাকতে পারে, নানা জন নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু যত বিষয়েই যত বেশী জ্ঞান লাভ করুক না কেন, যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হবে সেই পর্যন্ত জীব ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না জন্মাবে, যে পর্যন্ত প্রকৃতি ও পুরূষের পার্থক্য জ্ঞান লাভ না হবে, সেই পর্যন্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে না, মুক্তি ও হবে না।

সাংখ্য মতে লৌকিক বা বৈদিক কোন প্রকার কর্মের দ্বারাই জীবের মুক্তি লাভ হতে পারে না। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে। এই বিষয়ে ঈশ্বর কৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বিতীয় কারিকায় বলেন-

দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।।
তদ্বিপীরতঃশ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ।।২।।[৫]

অর্থাৎ ব্যক্ত,অব্যক্ত ও জ্ঞ- এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিভেদ জ্ঞান হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়। ব্যক্ত,অব্যক্ত ও জ্ঞ- এর এই ভেদজ্ঞান সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বলে বিবেচিত। বিবেকজ্ঞানের অর্থ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান। মনে রাখতে হবে, এই জ্ঞান শুধু মৌখিক জ্ঞান নয়। অথবা কেবল বুদ্ধির দ্বারা জেনে রাখা সম্ভব নয়। সাধারণ বুদ্ধিতেও আত্মা এবং দেহের পার্থক্য বোঝা কঠিন নয়; কিন্তু ব্যবহারিককালে এই পার্থক্য অনুভব করা বড়-ই কঠিন। দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন, এই কথা সকলেই জানেন। কিন্তু দেহের সুখ দুঃখে নিজে অভিভূত না হয়ে কয়জন থাকতে পারেন? "আত্মা দেহাতীত, দেহের সুখ দুঃখ আত্মাকে স্পর্শ করে না", এই কথার অর্থ বোধ হলেও যে পর্যন্ত উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান চিত্তে স্থিত হয়ে স্বভাবটি পরিবর্তিত না করে, ততদিন জীবের মুক্তি হয় না। বিবেকজ্ঞান চিত্তে স্থিত হলে দুঃখনিবৃত্তি হয়ে থাকে। বিবেকজ্ঞানটিকে দৃঢ় করতে হলে সাধনার আবশ্যক। কিন্তু সাধনা সম্বন্ধে প্রাচীন সাংখ্য শাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা হয় না। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকায়' বলেছেন- যে প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য সম্বন্ধে সাধকের ধ্যান করা আবশ্যক। যোগশাস্ত্রেও এই বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যোগমতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মুক্তির উপায় বলে গণ্য করা হয়েছে। পূর্ণ বৈরাগ্য প্রথম অবস্থাতে জন্মে না। এইজন্য অপর ও পরনামক দুই প্রকার বৈরাগ্যের প্রভেদ করা হয়েছে। পূর্ণজ্ঞান না জন্মালে পরবৈরাগ্য লাভ হতে পারে না। কিন্তু সাধনের প্রারম্ভেই পূর্ণজ্ঞান থাকে না। সেইজন্য প্রথমত যে বৈরাগ্য জন্মে তার নাম অপরবৈরাগ্য। জাগতিক দুঃখ দুর্দ্দশা যখন মানুষের মনে আসে তখনই সাধারণ জীবন ছেড়ে একটি উচ্চতর জীবন যাপন করবার বাসনা হয়, এটিই

হল অপরবৈরাগ্যের অবস্থা; এই সময়েই চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করে সেই তত্ত্বের ধ্যানে অভ্যস্ত হতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সাংখ্য মতে লৌকিক বা বৈদিক কোন প্রকার কর্মের দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হতে পারে না। কেননা লৌকিক উপায়ে সাময়িকভাবে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হলেও দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তিতে জগতের মানুষ সন্তুষ্ট নয়; কারণ মানুষের কাম্য দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তা লাভ করতে হলে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখের চিরনিবৃত্তি হতে পারে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর ভেদজ্ঞান সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান বলে বিবেচিত। বিবেকজ্ঞানের অর্থ, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যজ্ঞান। মুক্তির উপায়রূপে তত্ত্বজ্ঞানকে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে জগতের প্রতি বৈরাগ্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি নৈতিক জীবন গঠনও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আরও বলা যায় তত্ত্বজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দৈনন্দিন জীবনে বিষয়ের অনুশীলন অপরিহার্য। কেননা বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মননে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ব্যক্তির ধীরে ধীরে স্বল্পতর জ্ঞান থেকে অধিকতর জ্ঞানের পথ প্রশস্ত হয়। তখন তিনি সুখ ও দুঃখকে সমভাব বলে মনে করেন।

তথ্যসূত্র:

১. বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পুর্ণচন্দ্র (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা,* পৃঃ-৪
২. বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পুর্ণচন্দ্র (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা,* পৃঃ-৪
৩. চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রচন্দ্র. সাংখ্যকলিকা, পৃঃ-৮৪
৪. চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রচন্দ্র. সাংখ্যকলিকা, পৃঃ-৮৪
৫. বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পুর্ণচন্দ্র (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা,* পৃঃ-১২

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Chakraborty, Pulinbehari: Origin and Development of the Samkhya system of thought, 2nd edn., Oriental Book Reprint Coporation, New Delhi, 1975
২. সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন, দূর্গাচরণ, *বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য,* সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা–১৩৬০
৩. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র (সম্পা.), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪০৬
৪. বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পুর্ণচন্দ্র (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৭
৫. ভট্টাচার্য্য, রজত (অনু.), সাংখ্যকারিকা ও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.), *ঈশ্বরকৃষ্ণকৃতা সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য-তত্ত্বকৌমুদীসহিতা,* সদেশ, কলকাতা, ১৪১৪
৭. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, সাংখ্য দর্শনের বিবরণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগষ্ট-১৯৮৪
৮. ঘটক, পঞ্চানন. সাংখ্যদর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা-৭৩, ২০১১
৯. চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রচন্দ্র. সাংখ্যকলিকা, ন্যাশানালইন্ডিয়া প্রিন্টারস্ এন্ড পাবলিসারস্ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৪৭
১০. বিদ্যালঙ্কার, উমেশচন্দ্র. সাংখ্যদর্শন, শাস্ত্র প্রচারপ্রেস, কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩২৮।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ঋতু ভাবনা

তৃপ্তি দাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
বীরভূম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপের বিবর্তন ও মানব মনের পরিবর্তনও তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে গ্রীষ্মের কালবৈশাখী, হেমন্তের হিম, কার্তিকের কুয়াশা, রৌদ্রতাপে অবনতমুখি মালঞ্চ, ডাহুক পাখি, সোনালী ডানার চিল, শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা, কলমীর ঘ্রাণ, ভাদ্রের ভিজে মাঠ, ফসলের ভারে নতমুখি রূপশালী ধান, শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুল। বাইরের চোখ দিয়ে নয়, মানস চোখে তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুভব করেছেন। তাই মনের আবেগে একের পর এক চিত্র এঁকেছেন তাঁর কবিতায়।
সূচক শব্দ: অন্ধকার, চিল, ধান, পাখি, বসন্ত, হরিণ, ঘোড়া।

মূল আলোচনা:
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত, মাতা কুসুমকুমারী দেবী। তাঁর পিতা বজ্রমোহন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, মাতা গৃহবধূ হলেও বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সুপরিচিত কবিতা হলো 'আদর্শ ছেলে'। জীবনানন্দ দাশ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'বর্ষা আবাহন' নামে একটি কবিতা লেখেন,যা 'ব্রাহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তাঁর প্রথম কবিতা। এরপর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে তিনি 'দেশবন্ধু প্রয়াণে' শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'নীলিমা' কবিতা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল----- 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি।

বিভিন্ন কবি তাঁদের কাব্য কবিতায় তুলে আনেন ঋতুর অনুষঙ্গ। কারণ ঋতুর আবির্ভাব তো শুধু প্রকৃতির রাজ্যে বদল ঘটায় তাই নয়, মানব মনের পরিবর্তন আনে। যে পত্র বর্ষার জলে সিক্ত হয়ে সবুজ হয়ে ওঠে হেমন্তের পর শীতের আগমনে তাই শুষ্ক রূপ ধারণ করে। এরকম বহু বিষয় কবিকে ভাবিয়েছে, তাই গ্রাম বাংলার রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়।

'ক্যাম্পে' কবিতায় উঠে এসেছে বসন্তের রাত্রি, দক্ষিণা বাতাস এবং হরিণের অকাল মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কবি কবিতায় বলেছেন বসন্তের জ্যোৎস্না রাত্রিতে বন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বইছে দক্ষিণা হাওয়া, এই বসন্তের রাত্রিতে ঘাই- মৃগীদের ডাক শুনে উন্মত্ত হরিণের দল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাচ্ছে হরিণীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়। কবি বলেছেন হরিণেরা আজ হয়তো ভুলে গেছে যে বনে হিংস্র বাঘ আছে ;আছে বাঘের মতোই হিংস্র চোরাশিকারি। যারা হরিণ আর হরিণীকে মনের আনন্দে মিলতে দেয় না। কবি এখানে হরিণ আর হরিণীর মধ্যে দিয়ে যেমন প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন, তেমনি চোরাশিকারিদের তুলে ধরে দেখিয়েছেন মানুষের

লোভ-লালসা- হিংস্রতাকে। তাই বলেছেন খাবারের টেবিলে সাজানো হরিণের মাংসের কথা। এই চোরা শিকারিদের বিকৃত মানসিকতার জন্য বহু বন্যপ্রাণীর অকাল মৃত্যু ঘটে।

'পাখিরা' কবিতায় তিনি বলেছেন বাস্তব পাখিদের কথা। এই পাখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' নয়, নয় শেলির স্কাইলাকও। এরা শুধুমাত্র পাখি বলেই মেরু প্রদেশের তুষারের হাত থেকে মুক্তি পেতে একটু উষ্ণতার খোঁজে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মরু প্রান্তর, ব্লিজার্ড এর আঘাত সহ্য করে ছোট্ট দুটি ডানায় ভর করে উষ্ণতর গোলার্ধের দিকে ছুটে আসে। আসার পথে প্রাণ হারায় কিছু পাখি। তবুও তারা আসে। কারণ এভাবে আসতে পারলে তবুও বাঁচার কিছুটা সম্ভাবনা থাকে, আর ওখানে রয়ে যাওয়া মানে মৃত্যুর প্রহর গোনা। তাই মরণের ভয় না করে দুঃসাহসে ভর করে তারা বসন্তের দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। কারণ এখন তাদের ডিম পাড়ার সময়। বংশ রক্ষার একটা দায় আছে তাদের। কবিও জেগে আছেন এমন বসন্তের রাতে শরীরের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বসন্তের বাতাস তাকে স্পর্শ করছে। কবি বলেছেন -------

"আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায়না জড়াতে ;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।"[১]

'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় কবি এনেছেন মৃত্যুর অনুষঙ্গ। কবিতায় কবি প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেছেন যেদিন তিনি হেমন্ত ঋতুর মত ঝরে পড়বেন শীতরুপী মৃত্যুর কোলে, সেদিন তাঁর পিয়াও কি তাঁর সঙ্গী হবেন ----

"হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন ---
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?"[২]

কিন্তু কবি জানেন 'মরনে কে হবে সাথী, প্রেমও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি'। তাই তাঁর প্রিয়াও যে মৃত্যুসঙ্গী হবেন না তা তিনি বুঝতে পারেন।

আমরা যত আধুনিক হচ্ছি ততই কৃত্রিমতা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে। অত্যাধিক পরিমাণে বিষক্রিয়া এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটি হারাচ্ছে তার উর্বরতা শক্তি এবং সজীবতাকে। তাই 'মেঠো চাঁদ' কবিতায় কবি বলেছেন, বারবার ফসল উৎপাদনের যন্ত্রণায় শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাঠে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের শূন্যতা, জন্ম নিচ্ছে আগাছা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকছে খর নাড়া। কবি লিখেছেন ----------

"ফসল গিয়েছে ঢেড় ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝড়ে কত, ---
বুড়ি হয়ে গেছো তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার, --- কতবার ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে, --- চলে গেছে কবে। ---
শস্য ফলিয়া গেছে, --- তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা একা! --- ডাইনে আর বায়ে

পোড়ো জমি -- খড় -- নাড়া --- মাঠের ফাটল, --- শিশিরের জল !”[৩]

'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে কবি স্মৃতিচারণাকে তুলে এনেছেন। কোন এক হেমন্তের সন্ধ্যায় তিনি হাঁটছিলেন। সেই সময় সন্ধ্যা নামছে, ফলে আস্তে আস্তে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে সবকিছু। হেমন্তের পরশে গাছের সবুজ পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে তার মৃত্যু ঘটবে। এই হেমন্ত ঋতুতেই আমরা পাকা ফসল ঘরে তুলি। ফলে ফসলেরও মৃত্যু ঘটে। কবি এই কবিতায় বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির নিয়মে হেমন্তের পর শীত আসে; আর শীতের মধ্যে মিশে থাকে মৃত্যুর হিম শীতলতা। কবির ভাষায় ------------

“দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানলায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ...”[৪]

'অবসরের গান' কবিতায় তিনি এঁকেছেন পল্লীর মনমুগ্ধকর সৌন্দর্যের চিত্র। কবিতার শুরুতেই তিনি বলেছেন -----

“শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার --- চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ ;”[৫]

কার্তিক মাসে ফসলের ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবী যেন এত ফসল গর্ভে ধারণ করে ক্লান্ত দেহে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। ফলন্ত ধান গাছ দেখে তাঁর মনে হয়েছে ওরা যেন গর্ভবতী। রুপশালি ধানকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে রূপশালি ধান মা হতে চলেছে। এখানে উঠে এসেছে হেমন্তের উৎসবের কথা। যেখানে পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা নৃত্যমুখর করে তুলবে গ্রামের পরিবেশকে -----------------

“মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে --- শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।”[৬]

কবি তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায় এঁকেছেন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে। এখানে আমরা প্রথম পায় একজন নারীর নামের সাথে পদবীকে। এই নারী পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে কবিকে জিজ্ঞেস করেন -- 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এরপর কবিতায় কবি বলেছেন -----------

“সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতোন সন্ধ্যা আসে,
ডানায় রোদ্দুরের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।”[৭]

যখন তিনি হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার কথা বলেন, বলেন বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে থাকার কথা , তখন আমরা বুঝতে পারি প্রাচীনকাল থেকে হেঁটে চলা মানুষের কথা বলছেন তিনি। তাঁর প্রেমিকা বনলতা সেনের সঙ্গে গল্প করার জন্য কবিকে অন্ধকারে বসতে হয় মুখোমুখি। কবির ভাষায় ------------

“থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”[৮]

কবি জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে বলেছেন যে 'পৌষের অন্ধকারের ভিতর সে অদৃশ্য হয়ে গেল '। এরপর তিনি আর কখনো তাকে দেখেননি। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি পৌষেই বনলতা মৃত্যু হয়েছিল? তাই ''কুড়ি বছর পরে' কবিতায় তিনি তাঁর প্রিয়াকে খুঁজে বেড়ান -------

---- “আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!
আবার বছর কুড়ি পরে --- হয়তো ধানের ছড়ার পাশে

কার্তিকের মাসে ---
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে -- তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায় -- মাঠের ভিতরে।”[৯]

এই নারীরা আসলে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমিয়েছে পরপারে। অথচ এরাই বারবার উঠে এসেছে শঙ্খমালা, সবিতা, শেফালিকা, অরুনিমা সান্যাল হয়ে। 'শঙ্খমালা' কবিতায় তিনি বলেছেন----------

“খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি --- কুয়াশার পাখনায় ---
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনালী সিড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।”[১০]

এই শঙ্খমালার মুখ পরীর মত সাদা, তার দুই হাত হিম শীতল ;তার চোখে জ্বলছে হিজল কাঠের রক্তিম চিতা। নিকষ অন্ধকারে যে মিশে গিয়েছিল কবি তাকে আবার খুঁজে পান অরুনিমা সান্যাল এর মধ্যে -----------

“মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব --- পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নায় ভিতর।”[১১]

ফাল্গুন মানে বসন্ত ;আর বসন্ত মানেই মধুমাস। এ সময় বনভূমি যেমন সেজে ওঠে তেমনি আমাদের মনে জাগে প্রেম। কবির মানসপ্রিয়া, যার মুখ তিনি কখনো দেখেননি, আজ এই মধুমাসের রহস্যময় আলো অন্ধকারের মধ্যে তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। পাশাপাশি সমুদ্রপাড়ের এক প্রাসাদের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। বলেছেন অতীত দিনে এই প্রাসাদে থাকা এক নর্তকীর কথা -------------

“আজ নেই, কোন এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল ; মূল্যবান আসবারে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃতচোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্খা,
আর তুমি নারী ---
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।”[১২]

কবি বলতে চেয়েছেন রামধনু রঙের কাচের জানলা আর ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দার আড়ালে বাস করা নর্তকীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ চিরন্তন। কিন্তু সুন্দর সুন্দর আসবার থাকলেও যদি পছন্দের নারী সেখানে না থাকে তাহলে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

'অন্ধকার' কবিতায় কবি মিথ্যা প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে চিরঘুমের দেশে পাড়ি জমাতে চান -------------

“ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম --- পৌষের রাতে ----
কোনদিন আর জাগবো না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি -- কোনোদিন জাগব না আর ---”[১৩]

তাঁর মনে হয় এই বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে বাঁচার কোন সার্থকতা নেই। নিজেকে তাঁর মূর্খ জীব বলে মনে হয়, মনে হয় বেঁচে থাকলেই এই ভয়ঙ্কর জীবন যন্ত্রণাকে সহ্য করে যেতে হবে ------------

"শত শত শুকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর ;
এইসব ভয়াবহ আরতি! "[১৪]

'আট বছর আগের একদিন' কবিতার শুরুতেই তিনি বলেন ----------

"জীবনের এই স্বাদ -- সুপক্ক যবের ঘ্রান হেমন্তের বিকেলের ----
তোমার অসহ্য বোধ হলো ;--- "[১৫]

কবিতাটিতে জানতে পারি ফাল্গুনী রাত্রিতে পঞ্চমীর চাঁদ যখন ডুবে গেছে তখন একটি লোকের মরবার ইচ্ছা জেগেছে। আসলে লোকটির হয়তো মনে হয়েছে চাঁদ যেমন ডুবে যাচ্ছে প্রকৃতির কোল থেকে, তেমনি মানুষের জীবনের সব শুভ, সব আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর করাল গ্রাস। তাই স্ত্রী এবং শিশু দুজনেই তার পাশে থাকলেও সে একগাছা দড়ি নিয়ে উঠে গেছে পার্থিব জীবনের চাওয়া -পাওয়া, সুখ-শান্তিকে অগ্রাহ্য করে -------------

"শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কালরাতে --- ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।"[১৬]

হেমন্তের অবসানে মাঠ রিক্ত হয়ে পড়ে। কারণ এই সময় সমস্ত শস্য ঘরে তোলার আয়োজন শুরু হয়। আর উৎপাদিত এইসব ফসল বিক্রি হয় সমুদ্রের বন্দরে। কবি 'রাত্রির কোরাস' কবিতায় বলেছেন যে, হেমন্তের আকাশ তারা- শূন্য। তাই গ্রাম -শহর নিষ্প্রভ। মানুষের চোখে কোন আলো নেই, তাই নতুন কোন দিশার সন্ধান পাচ্ছে না তারা। কবির মনে হয়েছে হেমন্ত যেন মানুষের জীবন থেকে ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই বলেন -------------

"হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এরকম অনেক হেমন্ত ফুরাইছে
সময়ের কুয়াশায় ; "[১৭]

'হায় চিল' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন স্তব্ধ, নিষ্প্রাণ গ্রামীণ জীবনের চিত্র। যেখানে ঢেঁকি পড়ে আছে, কিন্তু ঢেঁকিতে পার দেওয়ার জন্য কেউ নেই। গ্রামীণ বধূটি তার ভিজে কালো চুল পিঠে ফেলে রোদে শুকাতে আসে না। বউ কথা কও পাখিও নীরব থাকে। চিল জামরুল গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে। বধূটিকে আর দেখতে পাই না বলে তার কষ্ট হয়। অন্যমনস্ক চিলকে দেখে কবির হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে -------------

"বউও উঠানে নাই -- পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি
ধানকে কুটিবে বলো ---
কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান
রোদেও শুকাতে সে যে আসে
নাকো চুল তার ---করে নাকো স্নান

এ পুকুরে -- ভাঁড়ারে ধানের বীজ
ফলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো : আজ এই দুপুরে এসে
খই ভাজিবে কি?
হে চিল , সোনালী চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ? ”[১৮]

'ঘোড়া' কবিতায় কবি যুদ্ধের কথা বলেছেন, বলেছেন অতীতের কথা। বাস্তব ঘোড়া গুলোর কথা বললেও তিনি পরক্ষণেই তাদের নিয়ে গেছেন প্রস্তর যুগে ------------

“আমরা যাইনি মরে আজও-- তবুও কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন, ”[১৯]

সব মানুষের কাম্য এক শান্ত সুন্দর পৃথিবী। সেখানে যেন তার উত্তর প্রজন্ম নিশ্চিন্তে বসবাস করার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষ যা চায় তা সে পায় না। পৃথিবী কখনো কলুষমুক্ত ছিল না, এমনকি পৃথিবীকে কখনো কলুষমুক্ত করাও যাবে না। তবুও মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি। পঙ্ককে মেনে নিয়েও সে এগিয়ে যেতে চাই অনন্তের পথে -------------

“সেইসব রীতি আজমিতে চোখের মতো তবুও ---
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।”[২০]

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার উঠে এসেছে গ্রামবাংলার নদ-নদী, পশু-পাখি, বিভিন্ন গাছ, বিভিন্ন ফুল এবং ঋতু ও মানুষের সম্পৃক্ততার কথা। তিনি বারবার ফিরতে চান এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। তাই মানব জন্ম না পেলে হাঁস,শঙ্খচিল হতেও তাঁর আপত্তি নেই। বাংলার প্রতিটি ঋতুকে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেছেন বলেই প্রতিটি ঋতুর কথা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। বিভিন্ন ঋতুর প্রতি তাঁর আবেগ ও অনুভবকে বেশিরভাগ কবিতায় প্রকাশ করেছেন তিনি।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ - মে, ১৯৫৪ জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পাখিরা (ধূসর পাণ্ডুলিপি), কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৪১।
২. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ - মে, ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নির্জন স্বাক্ষর, কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা -২৩
৩. দাশ জীবনানন্দ,পঞ্চম মুদ্রণ - ভাদ্র, ১৩৮৬, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (প্রথম খন্ড), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃষ্ঠা -৩৩
৪. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ - মে, ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, মৃত্যুর আগে, কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা -১৭
৫. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ - মে, ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অবসরের গান, কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী,পৃষ্ঠা -২৫
৬. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ - মে, ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অবসরের গান, কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী পৃষ্ঠা -২৫
৭. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ -ভাদ্র,১৩৮৬, বনলতা সেন (বনলতা সেন), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃষ্ঠা -৪৮।

৮. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ -ভাদ্র, ১৩৮৬, বনলতা সেন (বনলতা সেন), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., পৃষ্ঠা -৪৮
৯. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ -ভাদ্র, ১৩৮৬, কুড়ি বছর পরে (মহাপৃথিবী), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., পৃষ্ঠা -৬৫
১০. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ - ভাদ্র, ১৩৮৬, শঙ্খমালা (মহাপৃথিবী), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., পৃষ্ঠা -৬৯
১১. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ - ভাদ্র, ১৩৮৬, বুনোহাঁস (মহাপৃথিবী), কলকাতা- ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., পৃষ্ঠা -৭০
১২. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম প্রকাশ - মাঘ-১৪১০, নগ্ন নির্জন হাত (বনলতা সেন), কলকাতা -৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা -১৯.
১৩. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ-১৪১০, অন্ধকার (বনলতা সেন), কলকাতা -৭৩, সিগনেট প্রেস,পৃষ্ঠা -৫১
১৪. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ-১৪১০, অন্ধকার (বনলতা সেন), কলকাতা -৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা -৫১
১৫. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ-১৪১০, আট বছর আগের একদিন (মহাপৃথিবী), কলকাতা -৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা -৭৪
১৬. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ-১৪১০, আট বছর আগের একদিন (মহাপৃথিবী), কলকাতা -৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা -৭৪
১৭. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ -ভাদ্র, ১৩৮৬, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (প্রথম খন্ড), কলকাতা - ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃষ্ঠা -৬৫।
১৮. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ-১৪১০, হায় চিল (মহাপৃথিবী), কলকাতা - ৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা -৬৩
১৯. দাশ জীবনানন্দ, মাঘ -১৪১০, ঘোড়া (সাতটি তারার তিমি), কলকাতা - ৭৩, সিগনেট প্রেস, পৃষ্ঠা - ৮৩
২০. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ - ভাদ্র, ১৩৮৬, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা - ৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃষ্ঠা -২১

গ্রন্থপঞ্জি:

ক. আকর গ্রন্থ:
১. দাশ জীবনানন্দ, প্রথম মুদ্রণ- মে, ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, নাভানা প্রকাশনী,
২. দাশ জীবনানন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ -ভাদ্র, ১৩৮৬, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা-৭৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি.

খ. সহায়ক গ্রন্থ:
১. বসু অম্বুজ,চতুর্থ সংস্করণ - আশ্বিন, ১৪১১, একটি নক্ষত্র আসে, কলকাতা, পুস্তক বিপনি
২. চক্রবর্তী সুমিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ফেব্রুয়ারী, ২০২২, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরাণ কথার অনুসন্ধানে সমরেশ বসু : প্রসঙ্গ 'শাম্ব'

গৌরী রানী হোড়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ
নলহাটী, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: বাংলা উপন্যাসকে এক স্বতন্ত্র ধারা দান করেছেন সমরেশ বসু। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন সমরেশ বসুর বিষয় ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে লেখা 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান। ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্দের ৯০ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-জাম্ববতী পুত্র শাম্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক পরিচয় একই রেখে শাম্বের জীবন সংগ্রামের কথা ঔপন্যাসিক এ কালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা চেতনা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে চায় যুক্তিবাদী বাঙালি মানস। সমরেশ বসুর 'শাম্ব' উপন্যাসে ঘটেছে ভাগবত পুরাণের শাম্বচরিত্রের পুনর্নির্মাণ। শাম্ব যেন একালের একজন সমস্যা পীড়িত মানুষ। সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ তার জীবনের ব্রত। আমরা এ কালের মানুষেরা অনেক সমস্যায় জর্জরিত। হতাশা, দুঃখ, বেদনা, না পাওয়ার গ্লানি আমাদেরকে সদা বিব্রত করে রাখে।

কিন্তু সমস্যাকে জীবনে বড়ো করে দেখতে নেই। কারো অসৎ চক্রান্তে জীবন ওলট-পালট হয়ে গেলেও সেই মিথ্যার আবারণ একদিন সরে গিয়ে সত্য বেরিয়ে আসে। অপেক্ষা করতে হয় সেই সময়টুকুর জন্য। শাম্ব তারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। নিজের জীবনের সমস্যাকে নিজেই সমাধানের চেষ্টায় বেরিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মুক্তিও পেয়েছেন। তবে তাঁর সেই মুক্তিকোন একক ব্যক্তিত্বের মুক্তি নয়, একদল মানুষের মুক্তি। যারা জীবনের কোন আশা দেখতে না পেয়ে ভেঙে পড়ে, যে মানুষেরা হারিয়ে যায়, জীবিত থেকেও মৃতের জীবন যাপন করে মূল্যবোধকে, নীতিবোধকে হারিয়ে ফেলে শাম্ব সেই সমস্ত মানুষদের অনুপ্রেরণা।

কিছু মানুষের দল এখনো কুষ্ঠরোগীদের সমাজে ব্রাত্য বলেই মনে করেন। কিন্তু এর থেকেও যে মুক্তি পাওয়া সম্ভব শাম্ব চরিত্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের সমাজ এগিয়ে আসুক এই মানুষদের পাশে,তাদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হোক। তাহলে হয়ত সেইসব মানুষেরা একটু হলেও বাঁচতে শিখবে জীবনকে ভালোবেসে। সমাজের চরম সত্যকে তুলে ধরতে ভাগবত পুরাণের প্রয়োজন বর্তমানের নিরিখে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

শাম্ব রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে নিজেকে চিনেছেন। মানুষকে চিনেছেন।তার যন্ত্রণার হাতধরেই তার আত্মঅনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান তাকে শিখিয়েছে মানুষকে নিয়ে বাঁচা, মানুষের জন্য বাঁচা। আমরা প্রত্যেকে যদি শাম্বের জীবনদর্শনকে মেনে নিয়ে ভালোবেসে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলে কৃষ্ণের সেই আদর্শ দেশ গড়ে তোলা অসম্ভব হবে না।

সূচক শব্দ: শাম্ব, ভাগবত পুরাণ, মূল্যবোধ, আত্মানুসন্ধান, রোগমুক্তি।

মূল আলোচনা:
'কালকূট' ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন সমরেশ বসু। 'দেশ' পত্রিকায় 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরেই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হন সমরেশ বসু। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তাঁর বিষয় ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কখনও তীর্থ পরিক্রমা তো কখনও বিচিত্রের সন্ধান করেছেন। মানুষ তাঁর কাছে বড় বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের মাঝেই তিনি অপরূপের দর্শন পেয়েছেন।

পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে কালকূট বেশ কতকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। এর মধ্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'শাম্ব'। কালকূট ছদ্মনামে লেখা ১৯৮০ সালে এই উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার পান। কৃষ্ণপুত্র শাম্বর কুষ্ঠরোগের কবলে পড়া এবং সেই রোগের কারণে ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া আঘাতগুলি থেকে উত্তরণের চেষ্টা— শাম্বউপন্যাসের মূল কাহিনি। বিভিন্ন পুরাণ এবংমহাভারতে আমরা শাম্বের পরিচয় পেয়েছি। বিশেষত ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের পৌরাণিক পরিচয় একই রেখে তাঁর জীবন সংগ্রামের কথা ঔপন্যাসিক একালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সংযোজন করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই পুরাণ কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আধুনিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। স্বর্গ, নরক ইত্যাদি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানকে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষকে ইলাবৃতবর্ষ ইন্দ্রপুরী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অমৃত ইত্যাদি গোপন পরিচয় ভারতীয় আয়ুর্বেদের চূড়ান্ত ফল।তবে পৌরাণিক আখ্যানের সাহায্যে আধুনিক উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসের যে কাহিনি তার পরিবেশ তৈরির জন্য উপন্যাসের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন।

ভাগবত পুরাণে যে শাম্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই শাম্ব এখানে হয়ে উঠেছেন মহিমান্বিতমর্ত্য জগতের রক্ত-মাংসের মানুষ। নারদ মুনির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিনা অপরাধে শাম্বকে অভিশাপগ্রস্তহতে হয় পিতা কৃষ্ণের দ্বারা। তবে সেই অভিশাপই শাম্বর জীবনের শেষ সত্য নয়। অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষ শাম্বর যে লড়াই তাই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। আর এ লড়াই শাম্বর একার লড়াই নয়, এ যেন বর্তমান মানুষের জীবন সংগ্রাম থেকে উত্তরণের পথ, সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ।

পৌরাণিক বিষয়ের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে ঔপন্যাসিক বলেছেন- পুরাণের অতিরঞ্জন সহজেই ধরা পড়ে। আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতিহাস লেখকেরা যে সব অতিরঞ্জনের কথা বলেন, তা সহজে ধরা পড়ে না।আসলে রাম একাদশ হাজার বছর রাজত্ব করে স্বর্গে গেলেন, একে অতিরঞ্জন না ভেবে একটু অন্যভাবে ভাবা যেতেই পারে। যেমন আমাদের বাস্তব জগতে অনেককেই আশীর্বাদ বাণী হিসাবে বলতে শুনি— হাজার বছর পরমায়ু হোক ইত্যাদি। বীরত্ব, কীর্তি, ইত্যাদি বোঝাতে মানুষ এভাবেই অতিশয়োক্তির প্রয়োগ করেন।পুরাণ এই ভারতীয়দেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত। শুধু ইতিবৃত্ত নয়,পুরাণ ধর্মপুস্তকও বটে। এই পুরাণ পাঠ করে, পাঠ করে শুনিয়ে পুণ্য হয়। কালের প্রবাহে অনেকেই পুরাণকে অবিশ্বাস করছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত বহিরাগতরা এসেছেন তাদের শাসন, শিক্ষা বা প্রলোভনে ভারতীয়রা তাদের ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্যকে যেন ভুলতে বসেছে।

তারপরে বাসুদেবের দ্বারকানগরীর কথা। ভাগবতের নবম স্কন্দের ২১-২৪ অধ্যায়ে যযাতির পুত্র যদুর কুলকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বলেছেন যদুর বংশধরেরাই ক্রমশ সাত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ ইত্যাদি নানা শাখায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে অনেকদিন যাবৎ

যদুবংশ নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখতে পেরেছিল। কৃষ্ণ এই কাজের অন্যতম প্রধান সহায়ক। এই কীর্তিশালী মেধাবী শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পরে ভগবান হন। শূরসেনদের মথুরাবাসী বলা হয়।

এরপরে রয়েছে জরাসন্ধের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা। ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্দের ৬৯-৭৫ অধ্যায়েজরাসন্ধবধ কাহিনি রয়েছে। ঔপন্যাসিক তার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা করলেন। জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ যদুবংশের অনেকজনকে নিয়ে পশ্চিমের এক দ্বীপে বসবাসের জন্য যান। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাকে হাতের কাছে পেয়েও কৃষ্ণ হত্যা করেননি। ভীম, অর্জুনকে নিয়ে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব দেন। জরাসন্ধ তখন মহাবলশালী ভীমকে বেছে নেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য। যুদ্ধে জরাসন্ধ পরাজিত হন।

এবার রয়েছে শিশুপালের কথা। যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণের প্রশংসা এবং তাকে শ্রেষ্ঠ, পূজাপাওয়ার যোগ্য ইত্যাদি বললে শিশুপালের কাছে তা অসহ্য মনে হয়েছিল। কৃষ্ণ উপস্থিত সকলের সামনে তখন শিশুপালের সমস্ত অপরাধের কথা বলেন। একসময় শিশুপাল দ্বারকাপুরী পুড়িয়েও দেন।রাগ এবং অহংকারের জন্য তিনি প্রকৃত সংগ্রামের ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেন। তাই শিশুপালের শত অপরাধ পার হয়ে গেলে কৃষ্ণ তাকে চক্র দ্বারা বধ করেন।

এরপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা এসেছে। ভাগবতে দশমস্কন্দের ৮২-৮৫ অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা রয়েছে। হিসেব কষে ঔপন্যাসিক এই যুদ্ধের সময়কাল বলেছেন ১৪৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কৃষ্ণের তখন বয়স ছিল ৪২ বছর। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন ৫০৭৮ বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের বয়স যখন ৭২, ভীমের ৭১ আর অর্জুনের বয়স ৭০। কৃষ্ণের যখন আবির্ভাব তখন দ্বাপরের শেষ দিক।

ভাগবত পুরাণে দশম স্কন্দের ৬৫-৬৮ অধ্যায়ে রয়েছে, বলরাম হল দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করতে গেলে যমুনা ভীতকম্পিত হয়ে বলরামের চরণ তলে পতিত হয়। এ আখ্যানের ব্যাখ্যা ঔপনাসিক দিলেন এভাবে। যমুনা বৃন্দাবনে আসে ভূমিকম্পের কারণে। তবে সে বৃন্দাবন যমুনার গতি পরিবর্তনের জন্য তলিয়ে গিয়েছিল। এ বৃন্দাবন পরবর্তীকালে মথুরার কাছে প্রতিষ্ঠিত। শাম্ব ও লক্ষণার বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গেও ভাগবতের নব নির্মাণকে দেখেছি।

এইবার ঔপন্যাসিক একথা স্পষ্টভাবেই জানালেন যে কৃষ্ণ এবং শাম্বকে একসঙ্গে দেখতে চাইলেও অপরূপকান্তিবীর শাম্বই তাঁর মূল আকর্ষণ। রৈবত-ককুদমির কথা সামান্য বলে নিয়ে তিনি দ্বারকাপুরীর কথা বলেছেন।কৃষ্ণ তাঁর জীবনের শেষ দিকে যাদবদের আচরণে ব্যথিত,ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যাদবদের যে সমস্ত মানবিক গুণ ছিল তাও ক্রমশ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণ যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন এবং তা নির্ভুল। তাই যাদব বংশের এই প্রলয় সম্পর্কে কৃষ্ণ অনুমান করতে পেরেছিলেন। পুরাণকারদের বর্ণনা থেকে কৃষ্ণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক এভাবে অনেক অনুসন্ধানের পর দ্বারাবতী অর্থাৎ বাসুদেবেরগৃহে পৌঁছে গেছেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্বর অভিশপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিত, সেই স্থান ও সময়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। নারদ মুনির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। প্রভাসতীর্থে গিয়ে যাদবদের আতিথেয়তায় তিনি সন্তুষ্ট।

যাদবরা প্রায় সকলেই মহর্ষি নারদ ও তাঁর সঙ্গীদের যথার্থ আতিথেয়তা করলেও কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। শাম্ব অপরূপ রূপবান। লেখকের ভাষায় "শাম্ব খালি গা। তাঁর অতি উজ্জ্বল দেহে বক্ষভাগ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। গলায় কবচযুক্ত মুক্তাহার,কানে কুণ্ডল দুই নিবিড়আয়ত চোখ সুরাসবের গুণে রক্তিম। সকলের সঙ্গেই তিনি নানা প্রণয় সম্ভাষণে লিপ্ত ছিলেন।"[১]

নারদ মুনির আসার খবর তিনিও জানেন। অথচ প্রণয়লীলায় এত ব্যস্ত যে সামান্য আতিথেয়তাটুকুও দেখালেন না।শাম্বর এই আচরণে মহর্ষি অপমানিত হন। আর ভাবতে থাকেন শাম্বকে কিভাবে কোন্ শিক্ষা দেওয়া যায়। মহর্ষির অন্তরের জ্বালা যেন বিষানল যুক্ত হয়ে শাম্বকে আঘাত করতে চাইছে। মহর্ষির এই জ্বালাকে ঔপন্যাসিক পড়তে পেরেছেন।

মহর্ষি পরিকল্পনা মত পিতা-পুত্রে ভাঙন ধরানোর জন্য বাসুদেবের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করেছিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য শাম্বকে শাস্তি দেওয়া। বাসুদেবকে বললেন তাঁর বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া হিসেবে শাম্বের কথা। এ অভিযোগ কৃষ্ণ মানতে চাননি। মহর্ষি তার কৌশলকে কাজে লাগিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, কৃষ্ণের ষোলো হাজার রমণী শাম্বের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু কৃষ্ণ জানালেন শাম্ব বা তার স্ত্রীদের প্রতি কৃষ্ণের কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর পুত্ররা কখনই ষোলো হাজার রমণীকে কামনা করেন না। মহর্ষির কথা মানতে না চাইলে তিনি কৃষ্ণকে চাক্ষুস করাবেন বলে চলে গেলেন।

কৃষ্ণ শাম্বর উপর কয়েকদিন নজর রাখলেন। শাম্বর নারীসঙ্গ এবং প্রণয়লীলাকে কৃষ্ণর দোষের মনে হয়নি। কিছুদিন পরে মহর্ষির বলা শাম্বের অভিযোগ সম্পর্কে কৃষ্ণ ভুলে গেলেও মহর্ষি ভোলেননি। একদিন দূর থেকে দেখলেন কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোলো সহস্র রমণীদের সঙ্গে জলকেলীতে মত্ত। যেখানে কৃষ্ণ ছাড়া আর সকলের প্রবেশ অধিকার নিষেধ ছিল। এ সত্ত্বেও শাম্বকে গিয়ে নারদ বলেন তাঁর পিতা তাকে স্মরণ করেছেন। একথা শোনামাত্র শাম্ব প্রমোদ কাননে গেলেন। পিছু পিছু নারদও গেলেন। নারদকে দেখে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও রমণীরা যেন শাম্বকে তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই ব্যস্ত। শাম্ব যেন তাদের অতি প্রার্থনীয় বিষয়।

নারদের সঙ্গে কৃষ্ণের দৃষ্টি বিনিময় হল। কৃষ্ণের নারদকে আর কিছু বলার থাকল না। শেষ পরিণতি দেখার জন্য নারদ দাঁড়িয়ে ছিলেন। মর্মাহত কৃষ্ণ রমণীদের অভিশাপ দেন। তীব্র অপমান ও যন্ত্রণায় প্রিয় পুত্র শাম্বকে অভিশাপ দেন ,"তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।"[২]

এই অভিশাপের পর শাম্বর মনোজগতে ঔপন্যাসিক প্রবেশ করলেন। পিতার কঠিন অভিশাপবাণীতে আতঙ্কিত হয়েকাতর স্বরেশাম্ব প্রমোদ কাননে আসার কারণ জানালেন।পুত্রের আকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ আত্মবিশ্লেষণে ডুব দিয়েছেন। শাম্বর অপরাধ কতটুকু তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই যে আত্মবিশ্লেষণ তা একান্তই ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভাবনা। একালের দৃষ্টিতে লেখক বিচার করেছেন।

শাম্বর দেহের রোগলক্ষণ ঔপন্যাসিকের চোখে ধরা পড়েছে। তিনি কৃষ্ণকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন,"যা ভবিতব্য তা-ই অভিশাপ রূপে উচ্চারিত হয়। তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে তা উচ্চারণ করেছি মাত্র।"[৩] অদৃষ্টের এই অভিশাপকে মেনে নিয়ে শাম্ব উচ্চারণ করলেন,"প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাবো। আমাকে আপনি বিদায় দিন।"[৪] শাম্বর এ উচ্চারণে ঔপন্যাসিক এই শিক্ষা দিতে চাইলেন— ইচ্ছা শক্তিকে জাগরিত করতে হবে, ভাগ্যের উপর সবকিছু ছেড়ে দিলে চলবে না। ভাগ্যের অমোঘ ও অনিবার্য পরিণতি থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

তারপর দেখি শাম্বএকমাত্র লক্ষণাকে সমস্ত কথা জানান। রমনীদের কামনাপূর্ণ আচরণের কথাও জানান। আর শাম্ব এও জানিয়েছেন এ ক্রোধ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক জনিত ক্রোধ নয়। বৃষ্ণিসিংহাবতারের পৌরুষে আঘাত লেগেছে। শাম্ব এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষণার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক

বিশ্লেষণ ঘটিয়েছেন লেখক। শাম্ব পিতার সমালোচনা শুনতে রাজি নন। যদুকুলের কোন যুবকই রাজি নন। পিতা মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন, সে পথেই শাম্ব যাত্রা করবেন। পিতার অভিশাপে পুত্রের মানস পরিবর্তন হল।শাম্ব আত্ম অনুসন্ধানে নিয়োজিত হলেন। পুরাণের এই চরিত্রকে যেভাবেলেখক উপস্থাপিত করেছেন, তাতে সমকালেরই প্রতিফলন।এভাবেই ঘটেছে ভাগবতের পুনর্নির্মাণ। সেকালের চরিত্ররা ভাবে-ভাবনায় একালের সঙ্গে মিশে গেছেন।

শাম্ব ক্রমশ কুষ্ঠরোগের কারণে কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে। মহর্ষির দেখা পাওয়ার বিষয়ে একদিন পিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলে শাম্বর রূপ দেখে তিনি বিচলিত ও বিষন্ন হন। মহর্ষিও ঠিক সেইদিন এসেছেন। শাম্বর শারীরিক ভঙ্গি, তার মানসিক যন্ত্রণা, একাকীত্ব, মান-অভিমান একালের সঙ্গে মিশে গেছে। বাইরে শাম্ব কোন কিছুই প্রকাশ না করলেও অন্তর তার ক্ষোভে, দুঃখে জরাজীর্ণ। তবুও শাম্ব মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। শাম্ব তাঁর অনিচ্ছাকৃত অপমানের জন্য মহর্ষির কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। মহর্ষি শাম্বকে বললেন,সূর্যদেবের পূজা করতে। সূর্যদেবই সমস্ত অমঙ্গল এবং ব্যাধি ধ্বংস করেন। তুমি সেই সূর্যালোকে যাও। নিরপরাধ শাম্বকে তিনি ক্ষমা করে রোগ মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন।

ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দের একাদশ অধ্যায়ে সূর্যদেবের অনন্ত শক্তির পরিচয় পেয়েছি। সূর্যদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পার্ষদ ও সপ্তকদের কথা, তাঁদের নাম ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত জীবের পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু তাঁর অনাদি জড় শক্তির মাধ্যমে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

কালকূট ভাগবত পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ব যুক্ত করে চরিত্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুশস্থলী থেকে ফেরার সময় অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত শাম্ব যদুবংশের রমণীদের কাছ থেকে দরিদ্র মানুষের সঙ্গে হাত বাড়ালেও সেখানে লক্ষ্য করেছেন অবজ্ঞা। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কুৎসিত শাম্বর স্পর্শ যেন না লাগে তাই দূর থেকে ফল মিষ্টি দিয়েছিলেন। এই আচরণ শাম্বকে দুঃখ দেবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের বর্তমান সমাজেও একজন কুষ্ঠরোগীকে এসমস্ত অবজ্ঞার শিকার হতে হয়। নিজের চেনা জগৎ থেকেই এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ঔপন্যাসিক। একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকাল ও একালকে মিশিয়েছেন লেখক।

ধীবর পল্লীরও সামাজিক অবস্থা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। শাম্ব ধীবর নারী-পুরুষদের 'ভাই, বন্ধুগণ' সম্বোধন করে তাদের ভয় পেতে নিষেধ করেন। একদিন এক ঋষির কাছে মিত্রবনের সূর্যক্ষেত্রের খোঁজ পান শাম্ব। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য শাম্ব কাউকে দোষারোপ করেননি। সাত ঋতু অতিক্রম করে সুখ দুঃখকে একত্রে গেঁথে শাম্ব তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে পৌঁছে গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ তার মন। শাম্বর কঠোর পরিশ্রম, নিজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রাম— লেখক সমবেদনার সঙ্গেই এঁকেছেন।

মাঝির মুখ থেকে মিত্রবনের খবর পেয়ে শাম্ব আনন্দিত।গুহার প্রবেশ মুখে কাঠের আগুনের লেলিহান শিখা শাম্ব দেখতে পেলেন। আলোর সামনে বসে রয়েছেন যারা, তারা সকলেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। শাম্ব নিশ্চিত হলেন, তিনি ঠিক জায়গাতে এসেছেন। পুরনো একটি মন্দির, জুতা জামা পরে থাকা মূর্তিটাই সূর্যমূর্তি।

কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে শাম্বর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কুষ্ঠরোগীদের মর্মযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করা যায়। অসহায় পরিত্যক্ত মানুষগুলি পাঠকের হৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করে। এই সমস্ত মানুষদের সমাজ-সংসারের চিত্রও লেখক উপস্থাপন করেছেন। তারা সংসার করে, ছেলে মেয়ে জন্ম নেয়। ওই বাচ্চারা ধীরে ধীরে তাদের মতো হয়ে যায়।ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের জীবন যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া

যায়। এরা সকলেই রোগ মুক্তির জন্য এসেছে। কিন্তু রোগ মুক্তির কোন আশা না দেখে জীবন সম্পর্কে তারা বীতশ্রদ্ধ, অবিশ্বাসী। ভিক্ষার অন্ন দিয়েই তারা জীবন কাটাতে পছন্দ করে।

এই কুষ্ঠরোগগ্রস্তরা মিত্রবনে এসে যেন আলাদা সমাজ তৈরি করেছে। শালীনতাবোধ সেখানে নেই। তবে মানবিকতা বোধ রয়েছে। তারাশাম্বর খিদে তেষ্টার খবর নেয়। তরুণী নীলাক্ষি তণ্ডুলের সঙ্গে শাকসেদ্ধ করে দিয়েছে। নীলাক্ষির এই আতিথেয়তার পরে নীলাক্ষি-শাম্বকে নিয়ে নানা ইতর অশ্লীল কথাবার্তা চলে। নীলাক্ষির চাহনিতেও কামনার ছায়া। তবে শাম্বর মনে কামনার ইচ্ছা মাত্র নেই। আরো টুকরো টুকরো কথার মধ্য দিয়ে এই মানবগোষ্ঠীর এক অন্য জীবনযাত্রার ছবি উঠে এসেছে। এভাবে সেকালেরও একালের কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের সুখ- দুঃখবোধ, মানবিকতাবোধ যেন একাকার হয়ে গেছে। তাই শাম্ব এখন শুধু নিজের মুক্তির কথা নয়,এই মানুষগুলিরও মুক্তির উপায় খুঁজতে শুরু করলেন। নতুন জীবনের আলো দান করতে চাইলেন।

শাম্ব নিজে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হলেও তিনি বিশ্বাস হারাননি। মুক্তির জন্য তাঁর সংগ্রাম অব্যহত। শাম্বের একক মুক্তিচেতনা যেন ক্রমশ গণমুক্তি তথা বিশ্ব জনমুক্তির চেতনায় রূপান্তরিত। পুরাণের চরিত্র শাম্বের ভাবনাকে লেখক বর্তমান কালের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ যেন আন্তর্জাতিক রোগমুক্তির ভাবনা। কুষ্ঠরোগ অভিশাপ নয়, এর থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়— এই ভাবনা শাম্ব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শাম্ব পরের দিন ভোরবেলা চন্দ্রভাগার শীতল জলে স্নান করে মন্দিরে পৌঁছালেন।শাম্ব সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করছেন। চন্দ্রভাগায় দেখলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মানুষদের স্নান। একদিকে শুদ্ধাচার, অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঋষি যত্ন করে খাবার পরিবেশন করলে সকলের অনাদর, উপেক্ষা শাম্বর মনে পড়ে। আবার এও মনে হয়, শাম্বও হয়ত কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের সঙ্গে এমনই ব্যবহার করতেন। শাম্বর পরিচয় স্বরূপ ঋষিকে বললেন—“এখন আমার একমাত্র পরিচয়,আমি অভিশপ্ত। শাপমোচনের দ্বারা মোক্ষলাভই আমার লক্ষ্য।”[৫]

পূর্বাঞ্চল এবং যমুনার দক্ষিণভাগেও সূর্য দেবতা থাকেন। মহাব্যাধি থেকে মুক্ত হতে গেলে সারা বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করে সেইসব স্থানে অবস্থান করতে হবে। তবে ত্রিক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আরো কিছু নিয়ম রয়েছে। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদ-নদীতে স্নান করলে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়। এই দ্বাদশ তীর্থ ও নদীর নাম ঋষির কাছে জেনে নিলেন। এসব তীর্থ ঘুরে আসার পর ঋষি ব্যাধিমুক্তির পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে বলবেন। প্রতিমাসের শুক্লা তিথিতে উপবাস থাকতে হবে।

শাম্ব ঋষিকে জিজ্ঞেস করেন, বাকিরাও এই দ্বাদশ তীর্থে রোগমুক্তির জন্য যেতে পারবে কিনা। ঋষি বিস্মিত ও মুগ্ধ হন শাম্বর কথা শুনে। ঋষির অনুমতি নিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের অর্থাৎ সত্তরজনের একটি দলকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা বোঝালেন এবং উত্তরের দিকে যাত্রা করলেন। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মনে আশার আলো জাগিয়ে শাম্ব ব্যাধিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। দ্বাদশ মাস পরে সত্তরজনের মধ্যে চোদ্দ জন ফিরে এল। বাকিরা বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে রয়েছে। যারা ফিরে এসেছে,তাদের মনে এক সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে।

শাম্ব সিন্ধু চন্দ্রভাগার জলে একটি দারুনির্মিত মূর্তি পেয়েছিলেন। এতে ঋষি আনন্দিত হয়ে মিত্রবনে প্রতিষ্ঠা করতে বললেন। রোগ মুক্তির প্রয়োজনীয় তথ্যও শাম্বকে জানান ঋষি। কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করতে গেলে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে হবে। ব্রাহ্মণদের পালনের জন্য টাকা-পয়সার প্রয়োজন। শাম্ব এবার নিজের পরিচয় দিয়ে দ্বারকা গিয়ে নিজের অর্জিত ধনসম্পত্তি নিয়ে এলেন। বাসুদেব, জাম্ববতীসহ অন্যান্য মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত

হয়েছিলেন। একরাতের জন্য শাম্ব দ্বারকায় থাকবে— এটা শুনে সকলে দুঃখিত হন। শাম্বের পরিকল্পনা শুনে পিতা বাসুদেবসহ সকলে আনন্দিত হয়েছিলেন। শাম্বর বিরহে তাঁর মায়েদের ও স্ত্রীর অন্তর্বেদনা লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সুদূর অতীতকে লেখক যেন বর্তমানের নিরিখে দেখতে পেয়েছেন।

বিভিন্ন চরিত্রকে লেখক যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁরা শুধুমাত্র পৌরাণিক চরিত্র হয়ে থাকেননি, আমাদের আশেপাশের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীদের কাছে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানিয়ে মিত্রবনে পৌঁছালেন। শাম্ব এগিয়ে চলেছেন তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

মগ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে শাম্ব তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। শাম্ব আঠারোজন ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে সপরিবারেতাদের নিয়ে মিত্রবনে ফিরে আসেন। শাম্বর রূপের অনেক পরিবর্তন হয়।তাঁর সেই মোহিনী রূপ যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। এই রূপ দেখে শাম্বকে বৃষ্ণিরত্ন বলে ডাকার অনুমতি পায় নীলাক্ষি।

শাম্ব একবছর পর যখন মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন সেখানে ছোটখাটো একটি নগরীর সৃষ্টি হয়েছে। সকলে এই নগরীর নাম দিয়েছে শাম্বপুর। তবে শাম্বর এরকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। শাম্ব সুখী হলেন ব্যাধিগ্রস্থ মানুষেরা চিকিৎসার ফলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে বলে।ঋষির নির্দেশমতো শাম্ব মূলস্থান মিত্রবন,কালপ্রিয়-কালনাথ ক্ষেত্র,উদয়াচলের সমুদ্রতীরের কোণবল্লভক্ষেত্র আদি চোদ্দজনকে নিয়ে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করেন। দ্বাদশ বৎসর শেষে তিনটি মন্দির পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। শাম্বর মানবকল্যাণী মন একদল কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ মানুষদের নিয়ে কঠিন সংগ্রামে সফল হল। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা শাম্বকে জয়ী করেছে।

একদিন মহর্ষি মিত্রবনে এসে শাম্বর দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। রাজকীয় সুখ ভোগ করবে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করেন। তখন শাম্ব বলেন,"মহর্ষি,আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখভোগের কোন বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয় ক্ষেত্রে ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি।...অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।"[৬] মহর্ষি এই বিগ্রহের আর এক নাম শাম্বাদিত্য রাখলেন। এই নামে তিনি এখানে পূজিত হবেন।

শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিন চোখের জল ফেলেননি। কিন্তু আজ আর শাম্বর চোখের জল বাধ মানল না। অন্যদিকে মহর্ষিরও মুখে অনির্বচনীয় হাসি আর দু'চোখে জল। ধীরে ধীরে মহর্ষি মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। এভাবেই কাহিনির শেষ হয়েছে। ঔপন্যাসিক যেন আমাদের সমাজকে এই বার্তা দিতে চাইলেন কুষ্ঠ অভিশাপ নয়, উপযুক্ত চিকিৎসা করলে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কালকূট পুরাণের কাহিনিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভাগবত পুরাণের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে নতুন নির্মাণ ঘটেছে। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কঠিন সংগ্রাম ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। এ মুক্তি শুধু নিজের জন্য নয়, জগতের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ সকল মানুষদের জন্য। নিজে ব্যাধিগ্রস্থ হয়েও অপর ব্যাধিগ্রস্থ মানুষদের মনের জোর বাড়ানো, বাঁচার আশা জাগিয়ে তোলা এবং রোগ থেকে মুক্তির জন্য কঠোর সংগ্রাম করা— শাম্ব করেছেন।

মানব মুক্তির পথের যাত্রী শাম্বর সংগ্রামী মানসিকতা পাঠকদের বিস্মিত করে। কুষ্ঠরোগের কদর্যরূপ কালকূট বাস্তবজীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেন্টু নামের এক ছেলেকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। মৃত্যুর আগে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

একাকী জীবন যাপন করেছে সে। এই অভিজ্ঞতা লেখকের লেখনিশক্তি জুগিয়েছে। কালকূটের ভ্রমণপিপাসু মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কোনার্কের সূর্যমন্দির দেখার পর মন্দিরের সাথে জড়িত শাম্বকেন্দ্রিক মিথকথা লেখকের চেতনায় ভেসে ওঠে। আধুনিক নিঃসঙ্গ মানুষকে তার বিদ্রোহ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শাপমুক্ত করেন।অন্তর্দ্বন্দ ও দায়িত্ববোধ এখানে চরিত্রের অন্যতম চালিকা শক্তি। পুরাণের আলোকে মানবতাকেই যেন আশ্রয় দিয়েছেন পুরাণের ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করে তার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

ভাগবতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন। শাম্ব চরিত্রকে লেখক যেভাবে নির্মাণ করেছেন তাতে প্রভাবশালী, ত্যাগী এবং মানবতায় উচ্চ আদর্শের সংগ্রামী একজন ব্যক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। শাম্ব ভারতপুরাণের প্রথম সূর্যসাধক। উপন্যাসে এই সূর্যসাধক রোগগ্রস্ত দেহের আরোগ্যলাভের জন্য সূর্যসাধনা করেছে। শাম্ব যেন ভাগ্যচক্র পীড়িত মানবাত্মার প্রতীক। সূর্যতপস্বী শাম্ব তপস্যা ও আত্ম-অন্বেষণে মহামানব হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির অভিশাপকে অতিক্রম করতে পারেননি। মানবজীবনের প্রকৃত সংগ্রাম বিপুল দুঃখ ও অভিশাপেরই বিরুদ্ধে। মর্ত্যে অমরাবতী নির্মাণ হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তাতে মানুষের মধ্যে শ্রেয়বোধ জাগ্রত হয়।উপন্যাস যেন শাম্বর আত্মোপলব্ধির ইতিহাস। ভাগবত পুরাণ ও বর্তমান সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

শাম্বের ব্যক্তিগত সম্পর্ক,মিত্রবনে যাওয়া, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ— এসবই ঔপন্যাসিকের কল্পনা। নারদের প্রভাবে পিতার দ্বারা অভিশাপগ্রস্থ হলেও শাম্ব ভেঙে পড়েননি। তিনি বিশ্বাস হারান নি আত্মশক্তিতে। তিনি সংগ্রাম করেন মুক্তির জন্য। এ সংগ্রাম একক দুর্ভাগ্যের জন্য নয়। ব্যক্তির পাপ মূলত সমাজেরই পাপ। তাই ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের দায় সমাজের সকলকেই নিতে হয়। আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত মানুষ যখনই তার ব্যক্তিসত্তার গভীরে যেতে চায়, মুক্তির অন্বেষণ করে, তখনই সে ব্যক্তিসত্তাকে সমাজের ব্যাপক অংশে বিধৃত দেখতে পায়।

শাম্ব পুরাণে শাম্বর একক মুক্তির প্রচেষ্টা রয়েছে। ঔপন্যাসিক একাকিত্বের সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমাজবোধকে। আত্মোপলব্ধি ও বিশ্বাসের অভাবে, যুগমানসকে কালকূট দেখেছেন পঙ্গু হয়ে যেতে, অসার অস্তিত্ব বহন করতে। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত মানুষ অর্থাৎ এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে নীতিভ্রষ্টতায় পতিত। সুখ-সম্ভোগ, বিলাস-ব্যসন আর আত্মবিস্মৃতির মধ্যে কোথাও তাদের জীবনের তাৎপর্য নেই। এই চরিত্রহীন মানুষের সামগ্রিক উত্থান ও সমষ্টিগত উন্নয়নের কথাই কালকূট বলেছেন। এখানেই পুরাণের সঙ্গে আধুনিকতাবোধ যুক্ত হয়েছে। এভাবেই উপন্যাস হয়ে উঠেছে পৌরাণিকতা থেকে আধুনিক মানুষের রূপান্তর।

তথ্যসূত্র:

১. কালকূট, 'শাম্ব', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা –৩৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা – ৬৮
৬. তদেব, পৃষ্ঠা – ৮৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কালকূট, 'শাম্ব', কলিকাতা, (https://www.amarbooks.org/) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২. গিরি সত্যবতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪ ‘বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ’, কলকাতা, রত্নাবলী
৩. গুপ্ত ক্ষেত্র ,তৃতীয় প্রকাশ ২০ শেষ জানুয়ারি, ২০০৮ ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’, ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা, গ্রন্থ নিলয়
৪. চক্রবর্তী সুমিতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৩ ‘উপন্যাসের বর্ণমালা’, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পুস্তক বিপণী
৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র , বঙ্কিম শত বার্ষিক সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৮ ‘কৃষ্ণচরিত্র’, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৬. চট্টোপাধ্যায় রবিরঞ্জন, প্রথম প্রকাশ ১লা ডিসেম্বর ১৯৮২ ‘কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব’, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৭. চট্টোপাধ্যায় গীতা, প্রথম প্রকাশ - জন্মাষ্টমী ১৩৬৯ ‘ভাগবত ও বাঙ্লা সাহিত্য’, মিহির ভট্টাচার্য, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, কবি ও কবিতা
৮. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ ,পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, কার্তিক ১৪১০ ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং
৯. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮ ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১০. ভট্টাচার্য প্রভাত কুমার, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১২ ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা, বাকপ্রতিমা
১১. ভট্টাচার্য তপোধীর, কলকাতা পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮ ‘ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ’, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
১২. ভট্টাচার্য তপোধীর, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, দীপাবলি, ২০১০ ‘উপন্যাসের বিনির্মাণ’, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
১৩. সারস্বতানন্দ স্বামী, দ্বিতীয় সংস্করণঃ কোলকাতা বইমেলা-১৪২৬ (২০২০) ‘শ্রীমদ্ভাগবত’, ভারতসেবাশ্রম সংঘ।

Social Philosophy of Manishi Panchanan Barma : A Brief Study on Historical Perspectives

Bidyut Sarkar
Assistant Professor, Department of History
Maharaja Srischandra College

ABSTRACT : Panchanan Barma was the father of the Rajbanshi Community of Undivided North Bengal He sacrifices his life for the society of the Rajbangshi Community. He had taken many reformation works for the recover the lost dignity of the Rajbanshi Society. He was shocked contemporary social discrimination and economic exploitation Zamindars and moneylenders had crippled the rural economy by the rampant exploitation In order to protect the exploited peasant society, he founded the rural agricultural Bank, namely "Kshatriya Bank. Keep in mind that it was the first rural Agricultural Bank for the farmers. He was thinking about the formation of Kshatriya Bank for the ventures of rural development.

Keyword: Father, Social Thought, Philosophy, Society, Economy, Political Colonial Motive, Reformations.

1. Introduction :- Panchanan Burma is the father of the nation Panchanon Rajbangshi. Disadvantaged and marginalized commities in the north-east of India, a prominent personality. A learned scholar of Sanskrit literature, being the society did not have any vabe. The British colonial government, bcal state and Westem-educated group of gentleman he did not have to decide. Especially the British, under the rise of the so-called educated uccasrenira backward mentality and behavior in class pancananake was shocked. Neglected for a long period of conservation and the development of disadvantaged nations Rajbangshi have thought. For the development of their socio-economic, political and educational reforms did. He took part in active politics of the nation Rajbangshireformed. Rajbangshi the nation ahead of the start of the task, but the north-east of India had benefited jatigosthira Backward Class.

1.1. Birth and Education :-

Cooch-beher was a feudal Kingdom which lying at the bottom of the Himalayan region. Before 1950 AD, I was a tributary state under the Colonial of British India. Subsequently, with the eclipse of the feudal rule, it became a district of West Bengal The largest subdivision of the district is Mathbhanga. Two miles away from the spot and beside the Kutcha Street lay the village Khalisamari,

where Panchanan was bom in the Bengali year 1272. His father was Khosal Chandra Sarkar and mother Champak Devi Panchanan imbibed these virtues of his parents and later acquired fame through his own work.

Panchanan received his first instructions in the pathsala near his house. After the completion of pathsala eduration, his father sent him to the Midde-English School of the town of Mathabhanga. Panchanan Sircar, a native of Coochbiher, who passed the M.E. Examination in the first division from Mathabhanga School, succeeded to secure the first place in the general list of the Rajshahi Division. After passing the Middle-English Examination, boy Panchanan got admitted into the Zenkins High School and pursued his leaming while residing at the school-boarding. Having passed the High English Examination, young Panchanan got admitted into the Victoria College and studied there as a boarder of the college hostel. Being a meritorious student, Panchanan gradually passed the Entrance, F.A, B.A, and MA (Sanskrit) Examinations. By this time, the course for the study of Law was introduced in the Victoria College, and he passed the BL (Bachelor of Law) Examination as well. As a matter of fact, he never failed in any examination and was the first MABL in the Rajbanshi society of not only the state of Cooch-beher, but of the whole of North Bergal, Assam and Bihar.[1]

1.2 Panchanan Barma's Views towards Contemporay Society :- Before going to discussion on social thought of Panchanan Barma, it is necessary to have an understanding of the larger social and historical perspective, because any type of history is written from some specific outlook. Now what needs to be thought is whether the events described and facts supplied in the work on history is correct or not. Hence it is extremely necessary to check one's emotion and to restrain one's devotional mood while writing the history of a region or an individual. That is why a discussion of Panchanan Barma's social thought requires caution, for the people at large may think of Panchanan Barma's thoughts as those of the Rajbarsi community, while the Rajbansis may consider Panchanan Barma's thoughts as their own.

The Renaissance of the nineteenth century owes is genesis to the spread of western education. This Renaissance led to many events, but it failed to touch the larger sections of Bengalis, ie. the greater part of the Muslim community and of the educationally backward people. On the other hand, the huminaries of those days did not pay much attention to the welfare of the people. But the impact of British rule and western culture on Bengal, or for that matter, the whole of India, and their various interactions with indigenous culture initiated a change in the mode of living of the people. Nevertheless, it was confined to the educated urban middle classes, who were limited in rumber. Subrata Dasgupta[2] has mentioned

two characteristics of this new consciousness and process of change. The first was A capability to think, perceive and create in a manner that entailed the melding of two traditions which were seemingly unconnected and even contradictory one being the Indian cultural and philosophical past, the other the Westem creative and intellectual tradition." He has termed it a cross-cubral mentality'. The second was a belief in, and perception of, a fundamental unity amidst diversity and difference, even in the seeming differences manifest between certain Westem and Indian concepts, precepts and perspective." Subrata Dasgupta has called this belief and perception iniversalism. But the twin ideas, cross-cubral mentality' and 'miversalism' could not enter the heart of the Indian society. The various processes of Renaissance had found their fruits owing to the rise of nationalism and the pull of the ancient Hindu religion.[3]

The English too were active in perpetuating the Indian caste-based social stratification. This gave rise to various problems in the Indian society. On the other hand, various communities of different parts of India were trying to find ways of coming out of these problems. The 'Kshatriya' movement led by Panchanan Bamma was the outcome of such a reaction. It was also one kind of Renaissance. The Renaissance came to Bengalmainly in the fin-de siècle decades of the eighteenth century and continued well into the nineteenth century. A good number of books and romerous articles have been written in various personages, who belonged to the first half of the nineteenth century. While searching for facts about them, it has been found difficult to accept many of the then prevalent notions. Hence it is not unjustified to throw light on Panchanan Barma's social thoughts on the basis of newer facts. In truth, the concept of Renaissance is such that it can be applied to any culture and any phase of history.[4]

The reform movement led by such a great scholar like Rammoham Roy hardly made an impact in the lessening of the strict nature of the caste system. This was the situation in urban areas, and hence the situation in rural areas can easily be guessed. The Indian nationalist movement too failed to fulfill the expectations of all sections of society. The British Government of India too, for political reasons, helped in increasing the distance between the upper castes and lower castes. That is why Swaraj Basu argues, "The political alienation of the upper castes from both the lower castes and the colonial government paved the way for the British to appear in the eyes of the lower castes as their true well-wisher. Most of the lower caste patronage seemed an easy way to salvation from the age-long upper caste domination and this perception was expressed in unambiguous terms in their literature."[5]

2. Concept of social Justice:-

There is social justice in a community if there are means available for equal social opportunities for the development of personality by all the people. No persons should be deprived of those social conditions which are essential for his development.[6] Johari remarks about the social justice in his book Contemporary Political Theory' "...the idial of social justice envisages to promote the welfare of the people by securing and developing a just social order."Panchanan Barma wanted to apply his concept of social justice at all levels of the society, especially, in social, economical and political spheres. Every person should enjoy equal rights in the society. But the Vedic Hindu society does not believe in this principle, born is the measurement of the society. There is no value in the action. According to him, social justice is, to preserve the interests of minorities which refers to eradicate the disadvantaged, uneducated, poverty from the society. To solve different kinds of problems in the socio-economic justice are observed. In the case of developing countries like India, social justice refers to develop towards the weak and backward classes in the society. So, the vested interests should be closed from the society. In this type of vested and opportunities people of the society under the British colonial rule, all benefits of the society had monopolized in their hand. They were exploited by the largest sections of society. Upper class people were cherished and celebrated under the aegis of the British and western-educated gentlemen did not kept any information about backward sections of the greater society. A few scholars were kept news about the backward class; Panchanan Barma was one of them.

He received inhuman treatment from wider society, bom in the family of Rajbanshi of his childhood. He was able to gain knowledge about the contemporary society during his education days. He has witnessed during his Rangpur career, how co-called upper class people were neglected and mockery to the lower class people. This can be seen not only in economic terms, it is divided on the basis of caste system of the Indian Hindu society. Those problems were involved not only socio-economic spheres in the society but also involved in mentality of the upper class people.[7] He felt that, if the people are given the right to act independently, he can develop his qualities in full. By this way the backward class people can be developed them in equal to the upper class of the society.Since the beginning of civilization is relatively disadvantaged have been exploited and deprived by the foregoing groups. Panchanan Barma himself was assaulted by so-called upper class people of the contemporary society. Therefore, he deeply realized those issues of social inequalities through his own life.

Society cannot be progress without social justice, in socio-economic and political spheres of the society.[8] But the rationalist leaders of the time did not

mean it. Even upper class people were opposed towards the activities of Panchanan Bana. The greater sections of people of the backward society were drifted away from upper class Hindus due to their mentality and behavior to the backwards. For this same reason, the Muslim commmity was isolated from upper Hindus in the greater society. Various political parties and movements in India, the castes were formed on the basis of the contemporary society. The minority and disadvantaged castes were united for the sake of his own existence and the movement for the realization of their demands. No exception was made in case of Pancharan Bana. At first the leaders of the National Congress was discussing the issue of backward class. He was participated to the session of the Provincial Congress. He gave them suggestions for searching a temative ways to solve their problems. The upper class Congress leaders were so busy to do high their social position under the British rule. The cries and arises of the backwards did not reach to the heart of the Congress leaders. Being compelled, Panchanan Banna had started hi developmental activities towards the Rajbanshi society of North Bergal. But contemporary Rajbanshi society was full of problems like, illiteracy, socio-economic and political backwardness etc, despite those items deve bpment, the Rajbanshi society will never improve equal to the contemporary society. Then, he adopted several developmental measures for the Rajbanshi community. Gradually, those developmental programmes were spread towards the other backward commmities. Thus, his thought of social justice wide spread among the entire society. As a result, he did not a representative of a particular group of people; soon he became the representative on behalf of the whole backward society.

3. Women Empowerment and Education:-

The worth of a civilization can be judged by the place given to women in the society. One of several factors that justify the greatness of India's ancient cubre is the honorable place granted to women. The Muslim influence on India caused considerable deterioration in the status of women. They were deprived of their rights of equality with men. Raja Ram Mohan Roy started a movement against this inequality and subjugation. The contact of Indian cubre with that of the British also brought improvement in the status of women by their imperial policy.[9] The third factor in the revival of women's position was the infhence of Mahatma Gandhi who induced women to participate in the Freedom Movement. But in the contemporary of North-eastem India Panchanan Barma actively excellerated the empower among the women through "The Naari Raksha Committee". As a result of this retrieval of freedom, women in Indian have distinguished themselves as teachers, rourses, air-hostesses, booking clerks, receptionists, and doctors. They are also participating in politics and

administration. But in spite of this amelioration in the status of women, the evils of illiteracy, dowry, ignorance, and economic slavery would have to be fully removed in order to give them their rightful place in Indian society.

Women in the present day society-wives and mothers and working women-are ready to accept an inferior position in the family, society and polity. They were in the forefront and actively participant in the social and economic life of the county. Their status was reduced to a bwer level and were treated inferior to men. Due to this, the social and economic situation of the nation also deteriorated. But Social reformation in the nineteenth century by the light of reneissance women's society of Bengalhad been benefited.[10] "By the nineteenth century, Rammohan and Vidyasagar had showed their interest to grow the empower among women through women-education and activities of socialreforms, like them Panchanan Barma played the same role for the women in the first half of 20th century Bengal. The main stream of social reforms movement in the 19th century was to develop the social statue of women.[11]

According to Panchanan Bamma both men and women are of equal rank, but they are not identical. They are peerless pair, being supplementary to one another, each he ping the other so that without the one the existence of the other carmot be conceived. The concept of self is the most important factor affecting the behavior of women. Self-realization of the potential of women was severely restricted in the pre-independence period due to various socio-cultural conditions and conditioning Panchanan Barma stressed women's participation in political, socio-cultural and economic shere through his various political and social activities. He argued that the cultural empowerment of women can be a reality only when women are treated on par with men, through all the differences that are part and parcel of being a different gender. There should be a change in the mindset of society on a fundamental level. Above all, women's economic participation and empowerment are fundamental to strengthening women's rights and enabling women to have control over their lives and exert influence in society. It is about creating just and equitable societies. It is true that women often face discrimination and persistent gender inequalities, with some women experiencing multiple discrimination and exclusion because of factors such as ethnicity or caste.[12]

One focal point of Panchanan Barma's activities was the spread of modem education, particularly that of women's education. He wanted to lift the womenfolk from the utterly humiliating and degrading conditions and to establish them on the foundation of their own rights. During 1921-23, abduction and rape of women assumed menacing proportions in Rangpur region. In 1923, a lady named Barada Sunddari was forc bly abducted and raped. Then a number of

ladies, namely Tadhamani Banani, Gritakumari Baishnabi, Kanduri Bamani etc., were raped one by one. Against such oppression, Pancharan Barma raised the voice of protest. He built up an organization named Nari Raisa Upasamity (Committee for the Protection of Women). Through this organization, he sought to make women self-reliant by giving them proper education and by training them in stick-play, word-fight and wrestling. He did not receive any cooperation from English rulers, yet he persisted in his work. If this fact is taken into account, it will perhaps not be far out of truth to argue that Panchanan's success far exceeded that of Rammohan and Vidyasagar. It was Panchanan who first, in a debate in the Bengal Legislative Council in 1921, spoke of women's franchise. Here the thrust of his argument was, "Our conception is not that the house is a house but that it is the women in the house who is really the house." That is why the Rai Sahib wanted to view women's freedom as not simply a case of politics[13] At present, we come across a large amount of discussions about women's freedom and rights, but is it possible to establish this freedom and right unless the society becomes civilized and conscious. Women's freedom lies in the relation of maalrespect between men and women, and Panchanan's perception of this truth can be detected in his poem' Dangdhari Mao'. In this poem, Panchanan Barma exhorted the youth commity to stand up against wrongs and injustices. At that point of time, it acted like a tonic.

4. Rural Development and Kshatriya Bank :-

As far as the ideas on rural development are concemed, Pancharan Banna has a specific similarity with Rabindranath Tagore, although Tagore preferred the term fural reconstruction' to rural deve bpment. His opinion was that there was a collective strength in the villages, which had enabled the villages to sustain themselves for more than 2500 years. In order to use this strength effectively, Tagore advocated the formation of cooperatives or groups.[14]

Under the leadership of Panchanan Barma, well-coordinated clusters of villages (gram mandal) grew up in Rangpur, and the romber of such clusters exceeded 300. The Kshatriya Bank's impact on these clusters was very much discemuble. Here too one can find a similarity between Tagore and Panchanan Barma. In Tagore's opinion, there was no alternative to the release of the energy of villager's latent in themselves, and that all the villages of the country were to be reconstructed in such a way that they would be able to meet all their needs.[15]

In fact economic reform formed one of the more remarkable reformist activities of Panchanan Barma. He set up a concem named Barma Company that operated within the region now known as Bangladesh. The real objective of the Company was to free the rural poor peasants from the exploitation by landowners and moneylenders. The most remarkable of Panchanan Barma's

economic reform activities was the formation of Khastriya Bank'. In the areas then predominantly inhabited by Rajbansis, a change was noticeable. The people of the Rajbanshi commmity were trying to shift from the mainstream of their traditional economic system[16] Panchanan Barma understood that no social upliftment of the commmmity was possible unless the community could be economically strengthened, and hence he set up the 'Khastriya Bank in the Bengali year 1327.[17]

In order to understand the nature of functioning of this bank, it is necessary to have some knowledge of the barking system in greater Benal. The sense in which the word bank' is used was absent in the pre-Plessey period. In the eighteenth century, the banks' functions were divided into three categories. One was the acceptance of deposits from the public. In those days, wealthy persons used to deposit their money in banks in lieu of interest. The second function was give short and bng-term loans at interest. The third was to issue various types of hundis (bilk of exchange) and realise their values, and to participate in the sale and purchase of imported and exported goods. Along with these, banks used to take part in the exchange of coins. In the pre-Plassey period, the House of Jagat Seth was the foremost banking institution of Bengal. The House of Jagat Seth was connected with deposit banking and credit banking, but they did not issue notes. This house may be compared with Germany's Phutzer and Holland's 'Trip' families.[18]

Being a rural person by birth and early upbringing, he was familiar with the economic conditions of the countryside. While living in Rangpur, he began to reflect on how to improve the lot of the peasantry and to bring prosperity to the village-centred economy. The charges brought about by the English-instituted land revenue system were not at all beneficial to the villages. This system gave rise to changes that did great harm to the rural people. The creativity of the villages was hampered, and they were made dependent on the outside world. The high rates of revere extraction rendered the villagers helpless and destinite. To liberate them from this condition, Panchanan Barma set up the Kshatriya Bank'. Its objective was to free the peasantry from the chutches of the landowners and moneylenders and to provide them with the opportunity to build up a bright future by providing them with easy credit facilities. The new method he applied is today called micro-finance, but earlier known as micro-credit. This micro-credit system conducted through the Kshatriya Bank benefited many peasants. But he ako understood that provision of easy credit through the Kshatriya Bank would not be enough to free the peasantry from usurious exploitation. For this reason he sought to establish the rights of peasants through land reform laws.[19]

5. Idea of Nationalism:-

Common history of the people helps in the formation and continuation of nationality. It develops a spirit of oneness among the people. Common interests of the people, whether economic, political, social or cultural, help in uniting them together. Commonrace also helps in the formation and strengthening of nationalism Generally, the people be bnging to the same race have the same culture, history, customs, traditions, problems etc and these factors help the formation of national feelings among them. Nationality means the people who have same race, language, cubre, religion, history, literature; economic interests and political aspirations, feelings of nationalism are aroused among them, inhabiting a territory of a geographic unity. It is a historically constituted stable commmity of people, formed into political body. Nationalism teaches us to love our motherhood. The nationalists love their motherhood, rivers, mountains, flowers, animals and birds very much and they say that mother land is better than paradise.[20]

Nationalism is an idea-force which fills man's brain and heart with new thoughts and sentiments and drives him to translate his consciousness into deeds of organized action.[21] According to Burgess and his followers, "Nationality is a distinct socio-ethnic group within the state and ordinarily constinting minority of the total population."[22] Professor Gilchrist, "Defines nationality as a spiritual sentiment or principle arising a number of people usually of the same race, resident on the same territory, sharing a common language, the same religion, similar history and tradition, common interests with common political association and common ideas of political unity."[23]

6. Conclusion:-

Panchanan Barna was a leader of Rajbanshi Community and reformer from entire north-Eastern India during the later period of British rule in India. He established Kshatriya Sabha in order to inculcate Brahmini al values and practices among the people from Rajbanshi community. Panchanan Barma originally came from a jote dar. In the early years of his career, he started practicing law at Rangpur court. In Rangpur he was shocked by the refusal of a high caste lawyer to use a toga (lawyer's gown), previously used by him. In the following years, he led a kshatriyanization movement among the people of Rajbanshi community of Bengal. This movement assumed the shape of a social mass upheaval in today's North Bengal, and in North-Eastem India as a whole. Panchanan Barma gave able leadership to this movement. For this reason, Swaraj Basu has remarked, "Panchanan Barma was the main ideologue of the Movement."[24]

For an adequate discussion of Panchanan Barma's social thought, it is necessary to have an understanding of the larger social and historical perspective, because any type of history is written from some specific outbok. Now what needs to be thought is whether the events described and facts supplied in the work on history is correct or not. Hence it is extremely necessary to check one's emotion and to restrain one's devotional mood while writing the history of a region or an individual. That is why a discussion of Panchanan Barma's social thought requires caution, for the people at large may think of Panchanan Barma's thoughts as those of the Rajbarsi community, while the Rajbansis may consider Panchanan Barma's thoughts as their own.

People of several castes and creed, religion and belief, live here peacefully maintaining one's own individuality. So Panchanan, for his society as well as for all, tried to develop cubre and tradition. Indian economy is based on villages. So he tried to develop villages with economic reformation by the scheme of micro-credit or micro finance. For making proper use of money with the hep of Banks he established Kshatriya Bank'. Thus he wanted to form strong country self reliant and self confidant one. For this purpose he wanted to form co-operative groups. A woman is an important half of a man. With any development of one half another half cant be developed. So he did much for woman emancipation and empowerment.

References :-

1. Barman, upendra Nath, Thakur Panchanan Barmaar Jibon Charit, 1379 BS: Jalpaiguri,p.8
2. Dasgupta, Subrata. 2007 The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohan Roy to Rabindranath Tagore, Permanent Black, Dehi,p.8.
3. Samaddar, Ranabir.1985: Bharater Jatio Andolon O Jatio Sanghatir Samasyad, West Bengal State Book, Kolkata p.4.
4. Kopt Devid. 1969: British Orientalism and the Bengal Renaissance berke Ily, University of Cabfomia Press, pp 280- 89.
5. Bose, Swaraj 2003: Dynamics of a caste Movement: The Rajbangshis of North Bengal-1910-1947, Manohar, Delhi, p.101
6. Mahajan, V.D., 2012: Political Theory, S. Chand, New Delhi,p 368
7. Bandhopadyaya, B & Chattapadhyaya., K, 2012: Bharater Samajik Andolon, Levant, Kolkata,p.117
8. Das, Pran Gobinda, 2013: Bharatio Rastrochinta O Jati Andolon, NCBA, Kolkata p.470
9. Dr.Supama Guptu, (2001), Edited, Itihase Nari: Shiksha, P84, Progressive, Kolkata
10. Shyamali Gupta, (2007), Nari Andoloner Bibhinna Dhara, P.121, Deep Prakashan, Kolkata

11. Dr. Gitashree Bandona Sengupta, (1999), Spondita antarlik, P.15, Progreesive, Kokata, ISBN: 81-86383-62-x
12. Sweden, Ministry for Foreign Affairs (2010), On equal footing policy for gender equality and the rights androk of women in Sweden's international development cooperation 2010-2015, MA, Stockholm.
13. Barman Kshitish Chandra, Ibid, PP 201-3
14. Patrika, Ibid.p.17.
15. Interview with Lilit Chandra Barman, Cooch Behar, 10/10/2011
16. Bose, Swaraj, 2003: Dynamic of a caste Movement: The Rajbangshis of North Bengal-1910-47, Delhi, pp 51-52
17. Singha, Kshetrarath, 2004: Roy Saheb Panchanan Barmar Jeebord (in Bengali), pp 6-8
18. Mukhopadhyaya, SK., Ibid,p.148
19. Panchayati Raj Patrika, 2011:p.16
20. Agarwal, R.C., Political Theory, S. Chand, Delhi,p.456
21. Kohn, Hans, The Idea of Nationalism,p.19
22. Burgess, Political Science and Constitutional Laws, Vol-I,p.1
23. Gilchrist, 1957: Political Science,p 26
24. Bose, Swaraj 2003: Dynamics of a caste Movement: The Rajbangshis of North Bengal-1910-1947, Monohar, Delhi, p.88.

The Role of NGOs and Civil Society Organizations in Tribal Development in Junglemahal

Dipankar Das
Assistant Teacher, Department of History
Ramkrishna Shiksha Niketan

Abstract: Health plays a crucial role in shaping the socio-economic fabric of any society, as it directly impacts the development of individuals and communities. The tribal communities of Junglemahal, a region in the western part of West Bengal, India, have faced numerous challenges over the years, including marginalization, poverty, limited access to education, healthcare, and economic opportunities. Non-Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society Organizations (CSOs) have emerged as key agents in addressing these challenges, playing a pivotal role in the development of tribal communities in this region. These organizations focus on a holistic approach to development, which encompasses various sectors such as livelihood, education, healthcare, women's empowerment, and cultural preservation. The work of NGOs has not only contributed to the improvement of living standards but also to the empowerment of tribal communities, enabling them to access their rights and resources, improve their social and economic conditions, and preserve their cultural heritage.This paper explores the significant contributions of NGOs and Civil Society Organizations (CSOs) in advancing tribal development in Junglemahal. It investigates their various initiatives aimed at improving livelihoods, enhancing educational opportunities, providing healthcare, empowering women, and preserving the cultural heritage of tribal communities. Through a detailed analysis of these interventions, the paper underscores the positive transformations brought about by these organizations, particularly in the remote and underdeveloped areas of Junglemahal. In addition, the study examines the challenges encountered by NGOs and CSOs, such as financial limitations, political obstacles, and the complexities of working with diverse tribal groups. The paper concludes with strategic recommendations to strengthen the effectiveness and sustainability of NGO initiatives, emphasizing the importance of collaboration between government bodies, local communities, and NGOs for achieving long-term, holistic tribal development in Junglemahal.

Keywords: NGOs, Civil Society Organizations, Tribal Development, Junglemahal, Education, Health, Livelihood, Empowerment, Cultural Preservation, West Bengal.

Introduction: Junglemahal, a term referring to the forested and rural areas of West Bengal, is home to a significant tribal population. The region, which includes districts such as Bankura, Purulia, and West Midnapore, is characterized by its rich cultural heritage but faces widespread poverty, limited access to essential services, and inadequate infrastructure. Over the years, the tribal communities of Junglemahal have been marginalized and have faced challenges in terms of social, political, and economic integration into mainstream society.In response to these challenges, NGOs and Civil Society Organizations (CSOs) have played a crucial role in bridging the development gaps. These organizations work in partnership with local communities, government agencies, and international donors to address the issues of education, health, economic empowerment, social justice, and cultural preservation. The role of these organizations in tribal development has been pivotal in improving the quality of life for many tribal individuals and families.

Livelihood Development Initiatives: One of the most critical areas of intervention by NGOs in Junglemahal is livelihood development. The tribal communities in the region primarily rely on agriculture, forest products, and traditional crafts for their livelihoods. However, these sources are often unsustainable due to poor farming practices, lack of market access, and environmental degradation. NGOs in Junglemahal focus on creating alternative livelihood opportunities to enhance economic stability for tribal families.

Many NGOs have introduced sustainable agricultural practices, training programs, and skill development workshops to diversify income sources. Some of the initiatives include:

- **Organic Farming**: Several NGOs promote organic farming practices, encouraging tribal farmers to shift from conventional farming, which is dependent on chemical fertilizers, to organic farming methods. This not only improves the quality of produce but also enhances soil health and reduces input costs.
- **Skill Development Programs**: NGOs provide skill training to tribal youth in areas such as tailoring, weaving, handicrafts, and small-scale manufacturing. These programs help generate alternative sources of income and reduce unemployment.
- **Market Linkages**: NGOs often act as intermediaries between tribal producers and markets, facilitating access to larger markets for tribal produce, handicrafts, and other goods. This helps increase their income and provides a stable livelihood.

These livelihood initiatives have helped many tribal families achieve economic independence, but challenges such as limited market access,

inadequate infrastructure, and lack of financial support continue to hinder their long-term sustainability.

Educational Interventions: Education is another crucial area where NGOs and CSOs have made significant strides in Junglemahal. The region has historically had low literacy rates among tribal communities, and educational institutions in these areas are often underfunded and poorly equipped. As a result, many children from tribal communities drop out of school at an early age, limiting their future opportunities.

NGOs have taken several initiatives to improve the educational standards and enrollment rates in Junglemahal. These initiatives include:

- **Bridge Schools**: NGOs have set up bridge schools for out-of-school children to bring them back into the formal education system. These schools focus on basic literacy, numeracy, and life skills.
- **Mobile Schools**: Given the remote locations of many tribal settlements, NGOs have set up mobile schools that travel to different villages to ensure that children in even the most inaccessible areas receive an education.
- **Scholarships and Support**: NGOs collaborate with government schemes to provide scholarships, free textbooks, and other educational materials to tribal students. They also offer mentorship programs to help students excel academically.

Despite these efforts, tribal children continue to face barriers such as language differences, lack of proper infrastructure, and social isolation, which limit the full success of these educational programs.

Healthcare Initiatives: Tribal communities in Junglemahal often have limited access to healthcare services, and this contributes to high mortality rates, poor health outcomes, and the spread of preventable diseases. The lack of basic healthcare infrastructure, coupled with socio-cultural barriers, makes it difficult for tribal people to access medical services.

NGOs in the region have been instrumental in improving healthcare access through:

- **Mobile Health Clinics**: Many NGOs operate mobile health units that visit remote tribal villages to provide basic healthcare services, such as vaccinations, maternal and child care, and treatment for common illnesses.
- **Health Awareness Campaigns**: NGOs conduct awareness campaigns on health issues, including sanitation, hygiene, nutrition, and preventive healthcare. They also educate the communities on the importance of seeking medical care at the right time.
- **Community Health Workers**: NGOs often train local tribal women as health workers to provide first aid, distribute medicines, and promote health education within the community. These workers are trusted by the

community and can act as a bridge between tribal people and formal healthcare systems.

While these healthcare interventions have led to improved health outcomes, challenges such as limited healthcare infrastructure, cultural resistance to modern medicine, and a shortage of qualified medical staff persist.

Women's Empowerment: Women in Junglemahal often face socio-economic and cultural discrimination, with limited access to education, healthcare, and economic opportunities. NGOs have focused on empowering women through various programs that aim to improve their status within their communities and the larger society.

Some key interventions in this area include:

- **Self-Help Groups (SHGs)**: NGOs promote the formation of SHGs, which provide women with the opportunity to save money, access credit, and start small businesses. These groups have proven to be effective in improving the financial independence and decision-making power of women.
- **Leadership Training**: NGOs offer leadership and advocacy training to women, encouraging them to take up roles in local governance and community decision-making. This has helped increase women's participation in political and social spheres.
- **Health and Nutrition Programs**: NGOs run programs that educate women about maternal health, nutrition, and child care. These initiatives aim to improve the health and well-being of both women and their families.

Through these efforts, many women in Junglemahal have gained a sense of empowerment and autonomy, though challenges such as patriarchal social structures, violence, and limited mobility still hinder progress.

Cultural Preservation: Tribal communities in Junglemahal possess rich cultural traditions, including music, dance, folklore, and handicrafts. However, these traditions are at risk of being lost due to external pressures such as modernity, migration, and the influence of mainstream culture. NGOs have played a crucial role in preserving and promoting tribal culture through:

- **Cultural Festivals**: NGOs organize cultural festivals and events that showcase the traditional art forms, music, and dances of the tribal communities. These festivals help raise awareness about tribal culture both within the community and in broader society.
- **Documentation of Oral Traditions**: Many NGOs work to document tribal oral traditions, such as stories, songs, and rituals, to preserve them for future generations. This documentation helps protect cultural heritage and provides a sense of identity to the tribal people.
- **Promotion of Handicrafts**: NGOs have been instrumental in promoting tribal handicrafts by connecting artisans to markets and offering training to

improve craftsmanship. This not only preserves cultural traditions but also provides a livelihood for tribal families.

Despite these efforts, the rapid pace of modernization and migration continues to threaten the survival of traditional tribal cultures.

Challenges and Limitations: Despite the positive impact of NGOs and CSOs, several challenges hinder their effectiveness in tribal development in Junglemahal:

- **Financial Constraints**: Limited funding remains a significant barrier for NGOs, restricting their ability to scale up programs and reach more communities.
- **Political Interference**: Political dynamics and instability in the region can undermine the effectiveness of NGO interventions, especially when local leaders resist or obstruct development initiatives.
- **Geographical Barriers**: The remoteness and inaccessibility of many tribal villages pose logistical challenges for NGOs in delivering services and maintaining regular contact with communities.
- **Cultural Sensitivity**: NGOs must ensure that their interventions are culturally sensitive and aligned with the values and traditions of the tribal communities, avoiding the imposition of external values.

Recommendations for Enhancing NGO Impact on Tribal Development in Junglemahal:

While NGOs and CSOs have made significant strides in the development of tribal communities in Junglemahal, there are several areas that require attention for improving their impact and ensuring long-term sustainability. The following recommendations are designed to strengthen the role of these organizations in fostering holistic tribal development:

1. Strengthening Collaboration with Government Institutions:

- NGOs and CSOs should forge stronger partnerships with local, state, and national government agencies to align their efforts with governmental policies and programs. This collaborative approach can help mobilize additional resources, ensure better coordination, and increase the scale of impact.
- Government support in terms of policy implementation, monitoring, and funding can enhance the effectiveness of NGO interventions, particularly in areas such as education, healthcare, and livelihood development.

2. Increased Focus on Sustainable Livelihood Programs:

- Livelihood generation is central to the development of tribal communities. NGOs should focus on providing sustainable livelihood options through skill development, vocational training, and promoting local entrepreneurship.

- It is crucial to design programs that are adaptable to the changing needs of the tribal population and that create economic opportunities while preserving traditional knowledge and practices.
- Fostering the development of indigenous crafts, organic farming, and eco-tourism are some potential avenues to boost sustainable livelihoods in Junglemahal.

3. Ensuring Access to Quality Education:

- Education is one of the most important tools for empowering tribal communities. NGOs must collaborate with the government to ensure that children from tribal areas have access to quality education, including both formal and non-formal educational systems.
- Initiatives should focus on addressing the unique challenges faced by tribal students, such as language barriers, lack of infrastructure, and cultural insensitivity. Education programs that are culturally relevant and context-specific will be more effective in bridging the gap.
- Special emphasis should be placed on vocational education and skill-building, which can directly impact the employability of tribal youth.

4. Improved Healthcare Services and Awareness:

- NGOs should focus on providing healthcare access, especially in remote and inaccessible areas of Junglemahal, where tribal populations often face poor health conditions due to inadequate medical infrastructure.
- Community health programs should prioritize preventive healthcare, immunization drives, sanitation awareness, and addressing prevalent diseases such as malaria, tuberculosis, and malnutrition.
- Traditional health practices should also be integrated into mainstream healthcare, ensuring a culturally sensitive and inclusive approach to medical care.

5. Empowering Women and Promoting Gender Equality:

- Women in tribal communities often face disproportionate levels of poverty, illiteracy, and marginalization. NGOs should prioritize women’s empowerment programs, focusing on skill development, income-generation activities, and leadership training.
- Legal literacy campaigns, awareness on rights, and advocacy for women’s rights should be incorporated into grassroots-level interventions.
- Providing platforms for women’s voices in decision-making processes and supporting their participation in local governance will contribute to a more equitable social structure.

6. Cultural Preservation and Heritage Conservation:

- NGOs play a key role in preserving the rich cultural heritage of tribal communities. Efforts should be directed toward documenting and safeguarding tribal languages, oral traditions, folklore, and crafts.
- Cultural festivals, art exhibitions, and workshops should be organized to promote the tribal culture, foster pride, and raise awareness about the significance of preserving indigenous practices.
- Partnerships with academic institutions, museums, and international organizations can help in the documentation and global recognition of tribal cultures.

7. Addressing Funding and Resource Constraints:

- One of the major challenges faced by NGOs in Junglemahal is the lack of consistent and sufficient funding. Diversifying funding sources by building stronger relationships with international donors, corporate social responsibility (CSR) initiatives, and philanthropic organizations can help secure long-term financial support.
- NGOs should also explore innovative funding models, such as social enterprises, that generate revenue through the sale of products or services created as part of development programs.

8. Capacity Building for Local Communities:

- Empowering local tribal leaders and community members through training and capacity-building programs is essential for the sustainability of NGO initiatives. These individuals can act as change agents and help in the long-term success of development projects.
- Training programs should focus on leadership development, community organizing, and financial management to build a robust local infrastructure for development initiatives.

By implementing these recommendations, NGOs and CSOs can enhance their contributions to tribal development in Junglemahal, ensuring that the tribal communities benefit from sustainable, inclusive, and culturally sensitive development. Collaborative efforts, innovative strategies, and continued focus on empowerment and rights will help in creating a more equitable and prosperous future for the tribal people of Junglemahal.

Conclusion: NGOs and CSOs play a pivotal role in the tribal development process in Junglemahal. Their interventions in education, healthcare, livelihood, women's empowerment, and cultural preservation have led to significant improvements in the lives of tribal communities. However, challenges such as financial limitations, political interference, and geographic barriers must be addressed to enhance the long-term impact of these organizations. By adopting a more sustainable, community-centered approach and fostering collaborations

with the government and other stakeholders, NGOs can further strengthen their contributions to tribal development in Junglemahal.

References:

1. Bardhan, P. (2005). *The Political Economy of Development in India.* Oxford University Press, New Delhi, India.(Pages: 123-145)
2. Das, S. (2012). *Tribal Development in India: A New Approach.* Publication House, Kolkata, India.(Pages: 56-78)
3. Ghosh, P. (2016). *NGOs and Rural Development: A Study on Their Role in Eastern India.* Allied Publishers, New Delhi, India.(Pages: 101-125)
4. Jha, A. (2010). *Empowerment of Tribal Women in India.* Sage Publications, New Delhi, India.(Pages: 200-220)
5. Kumar, N. (2015). *Health and Wellness in Rural India: The Role of NGOs*. Health India Foundation, Kolkata, India.(Pages: 88-104)
6. Mishra, R. (2013). *Cultural Preservation and the Role of Civil Society Organizations in India*. Routledge, London, UK.(Pages: 30-50)
7. Sarkar, B. (2014). *Tribal Livelihoods and the Role of NGOs in Eastern India.* Publication House, Kolkata, India.(Pages: 112-130)
8. Sharma, R. (2008). *Women Empowerment and NGOs in Rural India: A Case Study of Junglemahal.* National Publishing House, Delhi, India.(Pages: 145-160)
9. Singh, M. (2017). *The Impact of Civil Society Organizations in Remote Areas of India: A Study on Junglemahal*. Delhi University Press, New Delhi, India.(Pages: 54-78)
10. Choudhury, A. (2019). *Tribal Development and Sustainable Practices: The Role of NGOs*. India Research Foundation, Kolkata, India.(Pages: 90-115)
11. Bhattacharya, S. (2011). *Public Health Systems in Rural India and the Contribution of NGOs*. Oxford University Press, Kolkata, India.(Pages: 135-150)
12. Banerjee, S. (2014). *Health and Development in the Tribal Communities of Junglemahal*. West Bengal University Press, Kolkata, India.(Pages: 72-90)
13. Sen, S. (2013). *The Challenges of NGO Intervention in Tribal Areas*. Indian Institute of Development Studies, Delhi, India.(Pages: 100-120)
14. Patel, S. (2012). *Sustainable Development and NGOs in India: Case Studies from Eastern States*. Wiley India Pvt. Ltd., New Delhi, India.(Pages: 65-82)
15. Mukherjee, B. (2015). *Social and Economic Impact of NGOs on Tribal Communities in West Bengal*. Cambridge University Press, New York, USA.(Pages: 56-75).

Women in Ancient India: In Historical Context

Utkalika Sahoo
Assistant Professor, Dept. of History
Bangabasi evening college, Kolkata

Abstract: Glorious women from the past have contributed and changed the thinking of patriarchal society as a whole. In the patriarchal society of the time, no father was faulted for caring for his daughter. The Brahmavadinis of the Vedic period composed many shlokas. Wise philosophers like Gargi appeared during the Upanishadic period. She was a brave woman. Gargi participated in debates with scholars such as Yajnavalkya. Upper caste women participated in the yajna with their husbands, and they could remarry after the death of the husband. And they had property rights. In this context, it was not easily visible to anyone.
Keywords: Ancient, India, Women, Veda, Society, Economy.

Introduction:
In the past, the position of women in society was quite high. Archaeologists explain that the mother goddess was worshipped during the Indus Valley Civilization. Again, nomadic Aryans came and started living in the place of this Sindhu civilization. They built an agrarian urban civilization here. It was the age of metal and bronze. But with the arrival of the Aryans, iron entered here. They build houses of burnt bricks. They were divided into different groups or tribes. Gradually, 'kul' was introduced as about three to four men lived together in a house. Single range formula is obtained from joint family. But the position of women and Shudras in society is becoming more and more subdued. A woman was defined as a spouse and the caregiver of her husband, even though she did the work of the household. Since women could not produce their own produce, they had to depend on others. In English, the husband was called lord until the Middle Ages; the word was the same for both wife and circle, and also derived from half ward, that is, half, loaf / bread. In the Vedic period, it was considered the duty of women to protect and educate their children. Various old literature of the Rig Vedic period states that there was equality in the division of property of men with women.

During the Maurya period, women were employed as bodyguards. Even in Buddhist texts, women were considered to be life-givers and goddesses of nature. "Glorious women from the past have contributed and changed the thinking of patriarchal society as a whole. The first woman ruler and leader of ancient India Razia Sultan, the only female ruler that has ruled in Delhi Sultanate. Savitribai Phule who is known to be the first woman teacher of India,

maharani Durgawati the most famous female leader that fought against Mughal emperor Akbar and various other woman that have imprinted the past with their heroic action and sacrifice." It has already been said in this article that the place of women was high in the Vedic period. The Brahmavadinis of the Vedic period composed many shlokas. Wise philosophers like Gargi appeared during the Upanishadic period. She was a brave woman. Gargi participated in debates with scholars such as Yajnavalkya. Upper caste women participated in the yajna with their husbands, and they could remarry after the death of the husband and they had property rights. In this context, it was not easily visible to anyone. "But the evidence that it was still not well seen is the account of Gargi and Yajnavalkya in the Brihadaranyaka Upanishad. When Yajnavalkya was unable to enter into a philosophical debate with Gargi at the Janaka Raja's meeting, he closed Gargi's mouth by saying: Beware Gargi! Talking too much will make your head spin."

According to Sukumari Bhattacharya, the Rig Veda only says that women should bring water and guard the crops. Detailed information is not available in the Vedas about the activities of a woman's household. They had children and families to take care of. But the later literature does not mention it in the Rigveda. According to the Shatapatha Brahmana women used to do the work of wool. [Tadva ettya patrinanga karma yadurnasutram (12:7.2)d The RigVeda mentions warrior women; Mudgalini [the name literally means one who uses Mugur] wins battles (10.102.2)d

In the Vedic period, among the stories of goddesses, various verses about women have also been revealed. Because although she has divine powers, she is a woman. Such as Goddess Usha. She is sometimes the wife of the sun, sometimes the virgin. Although she is a wife, her husband goes before the sun. "She exposes her unclothed bosom to the world as a memory-loving bride does to her husband (Rigveda 1.124.7) There is still no hesitation about the appearance and decoration of women.

The beauty of mortal love is highlighted in the Vedas through various similes. "For example, an illicit lover approaches his beloved on the phone (Rigveda 9.96d 22, 23; 101.14) Just as a woman faces a lover who is eager to kiss her, so the rivers are moving towards Vishwamitra" (Rigveda 3.45d 1) d Again Taittiriya Brahmana's (2.4d 6d 56 As the bride is pleased with her husband, so is she pleased with God and His worshippers. The message of the sacrifice between the god and the worshipper is called the love of the mortal woman in the mortal. "As the well-groomed young bride goes to her husband, so the stream goes to Soma (Rig Veda 4.5d 8d 9)."

In the early Vedic period, women could choose their life partners. In the Mahabharata, Draupadi was also allowed to choose a husband for herself at her Swayamvara meeting. (The bride is beautiful. He knows how to weave himself.

(Verse 10.27d 12). But this freedom later passed into the hands of the Father. A father does his duty by giving his daughter to him. (The Law of Religion), 2.10d 27. It was not always the girl who was kept like an empress in the in-laws' house. Rather, it is known in the Atharvaveda that just as the ghost runs away at sunrise, the daughter-in-law runs away from the father-in-law. (8d6)d

Niyoga means that women whose husbands are dead or unable to have children could marry their husbands brother and produce children (10.18d 7, 10.40d 2)d It talks about the production of children through the employment system. Men could also have multiple marriages (1.62d 11, 1.71d 1, 1.104.3 and so on). The Atharvaveda reveals that widow marriages were common (15.5d 27-28). They wanted to marry into different castes. That is not to say that they are not married. "In the Maitrayani Samhita and the Shatapatha and Taittiriya Brahmanas, during the time of the sacrifice of Varuna-prayasa, the wife of the sacrificer was asked about her former lovers, which suggests that if the wife had any former affairs, they were taken lightly. The son of Kumari is mentioned in the Vajasaneya Samhita." At that time there was such a thing as selling daughters. The Jaiminiya Brahmana Chyavana also mentions the gift of a virgin daughter. However, this practice was not followed. How disgusting women were looked at is evident from the Samhitas and Brahmanas of the time.

In the Maitrayani Samhita, female wine and dice were classified as the same. The daughter of Aitareya Brahmana (7.15) is said to be the cause of her parents' sorrow that only those women who do not give any answer are called honest. You were supposed to be the protector of the family. In the Shatapatha Brahmana (5.2.1.10), on the other hand, the wife was called the half of her husband. In the Ashvalayana Grihyasutra, 8 types of marriages are identified, respectively, Prajapatya, Brahma, Daiva, Arya, Gandharva, Asura, Rakshasa and Divecha.

Not everyone agrees on how old women should be in marriage. The scriptures say that on the night of the wedding Chaturthi, the bride and groom will be formally anointed, which is known as Chaturthi Karma. It is not possible to say that the girl was a minor. In the scriptures there is a mention of marriage. The Baudhayana Dharmasutra recognized the marriage of a niece with her maternal uncle as a legal custom in South India. It is said that a barren woman should be observed for 10 years, a girl child born should be observed for 12 years and a continuous deceased childbirth should be observed for 15 years. According to the Apastaya Dharmasutra (2.5.11.12), a husband cannot divorce his wife. A man can remarry if his wife cannot bear a child. In Basistha Dharmasutra (21.8-9) It is said that a wife should be forgiven even if she is an adulteress.

It should be discussed whether women had the right to polygamy in that era. There were certain practices which the Aryans did not follow. The Aryans did not accept this as a matter of sympathy. Multiplicity is mentioned twice in the Atharvaveda. "When a woman who has had ten husbands takes a brahmin husband, that brahmin is her rightful husband; not the rajanya or vaishya husbands (5.17.8, 95). Both of these can also be taken as scriptures supporting widow marriage in a complex interpretation, but many seem more likely to be prostitutes. Polyandry is again mentioned in the Mahabharata, in Draupadi's Panchapatita, where there is a debate. Then I heard that there was a woman named Jatila who had seven wives throughout her life. Another version of the Mahabharata mentions another polygamist named Bakshi. The girl child was not desirable. In Aitareya Brahmana (1.10.11) it is said that "daughter is cursed." It is said in the Maitrayani Samhita, 'The misfortune of a woman liar is just a habit like Surah or gambling. 'In the 20th century, the Brahmana clearly states that after the husband has eaten, the wife will be able to eat his goods only then even the husband's excessive consumption is described in it. The same law of atonement for killing blackbucks, mongooses, peacocks and dogs applies to killing women and Shudras. Women have been compared to consumer goods since the Vedic period.

Manu imposed many restrictions on women. Women had no freedom. Her primary duty was to take care of her husband. Manu gave the law to women …

"He is free to do whatever he likes, even at home.
In her childhood she was under the care of her father, in her youth she was under the care of her husband.
After her husband's death, she is left with her children.
She will not get freedom.
She always seems to be happy,
Always be busy at home.
Keep your dishes clean
Avoid spending as much as you can..."

"Every moment of my life is my husband's.
The good friend who received him at the ceremony
He always makes her happy."

"If they don't,
And it's only for pleasure,
If the person is innocent,
His new wife's

The husband will worship God in knowledge.
It's not that men are always harsh on women. Women were respected. There is plenty of literature to prove it. Just as a wife was loyal to her husband, her position was not very disrespectful to a husband. "In his book" "The Wander That Was India" Basham says:

"The wife is half of the husband, much better -
three millions of lives,
It helps to get everything.
My wife inspires me to do everything...
A man who dares to be a wife
And a safe haven of peace...
When the heart's on fire
A sickly body,
The wife's two hands bring peace and assurance
A disembodied human body
Cool in cold water.
A man in a rage
It'll never be a woman;
Don't forget to rely on
Happiness lies in the religion of love.
The woman is the ever-expanding
So that his being is born again and again."

When women were seen with respect, some of the literature of that time was proof of this. For example, husbands should give women as much jewelry as possible. In the Mahabharata, it is said in some lines that the desire of a woman is unlimited. Such as -

"Give as much as you can.
The fire will continue to burn unabated.
As far as the river goes
The sea will be rough.
As soon as an animal is born
The death toll will increase.
As long as a man comes to
However, there is no satisfaction. "

The name of Ghosha, the daughter of Rishi Kakshivat, is mentioned in the Suktas of the tenth Mandala of the Rigveda, numbered 39 and 40. She was a brave woman. Ghosha suffered from skin disease and stayed at his father's house for a long time. Later, she was cured by Ashwini and got a husband. The story of Ghosh's life is told in Suktanjali. Again, the love story of Romasa, the wife of King Bhayobabya, finds a place in his book (1.117.1). Rishi Agastya and his wife Lopamudra's love story is also discussed in the book. In the Vedic period,

women were still able to live on their own in society. The word 'vidatha' has been introduced several times in the Rig Veda, as in sabha or samiti. But there are different opinions on this matter. Roy, Ladwick, Whitney speculates that it was a kind of meeting or association where many worldly matters, religion, and, of course, war were discussed. Sukta 10-85-26, 27 of the Rigveda states that women participated in this vidya. In the era of the Rigveda, the names of many women are known who were skilled in warfare. For example, Queen Bishpala, Mudgalani Pramukh. In those days, fathers preferred 'pundits' and 'long-lived' daughters. However, there is some debate as to what this term means. Pandita was usually used to refer to a vidushic woman. But Shankaracharya, in his commentary to the Upanishads, explains that pandita meant someone who was skilled in household chores. Interestingly, in the commentary to the Upanishads, Shankara writes that the recitation of the Vedas by women is prohibited. Because women can't be stupid. Gargi and Maitreyi are also mentioned in this Upanishad. According to Manu, a wife remains unmarried after the death of her husband and abstains from the practice of adultery. But this rule does not apply to men. Men could remarry after the death of their wives. In the Hindu society, the ideology of Manu was more prominent.

There were also many women who took charge of the country's governance, such as Queen Nayanika of the Satmahal dynasty, Vijaya Bhattarika of the Chalukya dynasty, Queen Prabhavati of the Banka Taka dynasty, Queen Didda and Sugandha of Kashmir, Tribhuvan Mahadevi of the Kar dynasty of Orissa, Dharma Mahadevi, Bakul Mahadevi, and Dandi Mahadevi. Ramesh Chandra Majumdar in his book 'Indian Women' says, "The queens of the Chahamana and Gahurbala dynasties of northern India and the Chalukya kingdoms of the Deccan had four emperors and two princesses who ruled over vast tracts of land. Many instances of women being provincial governors and appointed to various high offices are found in the ancient copper rule. The Rajatarangini of Kalhana mentions two heroines, Silla (8-1069) and Chura (8-1130, 1137). They and Naiki, the mother of Mool Raj II, the child king of the Chaulukya dynasty of Gujarat, carried the son and led the army on the battlefield and defeated the enemy." In Jain and Buddhist scriptures, there are different views on the status of women. The Buddha himself did not like the ease with which women bhikkhunis entered the prayer hall, and Jainism refers to women being reborn as men before their full salvation. In Jainism and Buddhism, more rules were observed for women than for male monks. Many rules were applied to female monks. "In brahmanical religion also there were some nuns like Sulabha and Gargi Vachaknavi; their number however seems to have been much longer in Buddhist and Jain circles, Buddhism declared that women food was no bad to salvation and Shwetambar Jains concurred with the view. Marriage was not necessary for women; nay, it was a fatter which women wear advised to avoid."

Statues or images of many goddesses of that time have been found. The mention of the word 'Nagajayano Paritinim' and the meditation of the goddess match.

'Siddha Brahmani, a Veda-conscious being by the name of Shiva, studied the Sarvaveda and attained the imperishable body.

Here the name of Siddha Shiva is Brahmani Vedprajna.

Adhyatya Sakhil Vedan Leve Swangdehamakshaya (Udyog, 109, 19)."

There are social differences between men and women. According to this, the woman was the field or the land and the man was the sower.

"Apatyaarthe striya: krishta: strikshetrang bijban puman.
Kshetrang Bijabate Deng Nabiji Kshetramarhati.
Pita Dadyat Swayam Kanyang Mata Banumte Pitur.
Matamho matulshch sakulya bandhavastha..
Matavabe, tu sarbesan prokritou yadi bartate.
Tasyam Prakritsthayang Ddyung Kanya Sazayete.."

Altekar writes about upper-class women because he himself came from the upper Hindu class. Not much is known about her writing. "Altekar claims to concern himself with the history of all 'Hindu women." However, partly because of his personal background (a high caste man steeped in sanskritic tradition) and partly because of the political scenario (the activities of the Hindu social reform movements, communalisation of Indian politics and the struggle for Indian independence) for Altekar the Hindu women is a high class and high caste one. It is true that he sometimes to the 'lower section of society', but it is usually to castigate them for the perpetuation of certain 'evil' associated with the low status of women."

Altekar did not understand the role that women could play in the social system of ancient India. His contemporary Historians like Horner or Uma Chakravarti have discussed the role of different classes of women in the ancient social system. Although Altekar's writings discussed Aryan civilization, upper-class women, Hinduism, etc., the issue of Shudra women remained neglected. Prabhati Mukherjee first criticised Altekar's writings in 1978. According to him,... "That is the reason given by Altekar for the decline in the position of women, while important were inedequate. She also claimed that he had failed to situate the changing position of ancient Indian women within their specific social economic contest." In the past, women have been judged by historians from different points of view. For example, Alison Banks has argued that Gargi should be seen as a literary motif. "…a rhetorical device used by the authors of the Brhadaranyakoponishada to emphasize Yajnavalkya's arguments and need not be seen as indicative of the education available to women in ancient India." "Some demonstrate the constructs nature of the Pativrata rhetoric and seek to understand the Sita / Savitri model as a construct for Indian women and reasons for its popularity." Others have discussed the religion of women or the duties

of women. The status of women in the pre-Vedic period or the later Vedic period has gone from upward to downward. Sometimes the praise and praise of a woman was followed by an insult to that woman in the memoirs or the then Manusmriti. Women are the power of the world. In ancient India the female power was respected but in many cases they were disrespected. Even though the Vedas have given respect to women, in many cases they have tried to keep women down in the society. History has remembered and will remembered the status of ancient Indian Women.

References:

1. Venkatesh, A (2020), marriage love and the nation: the private life of the Indian freedom fighter, journal of women’s history, 32(2), 89-112, https://muse, jhu.edu/ article/ 757194, Technoarete, ibid, p. 5
2. Bhattacharya, Sukumari, The Society and Literature of Ancient India, Ananda, Calcutta, 1422, page 30
3. Selvi, Dr. R. Tamil, Ancient women of India: unraveling the glorious past of womanhood in the century, Technoarete, E-ISSN: 2583-1127, September 2021, page 6.
4. Venkatesh, A (2020), marriage love and the nation: the private life of the Indian freedom fighter, journal of women’s history, 32(2), 89-112, https://muse, jhu.edu/ article/ 757194, Technoarete, ibid, p. 5
5. Chattopadhyay, Ratnabali and Bhattacharya, Pritha, Women in Ancient India, Abhabas, Centre for the Study of Humanities, Jadavpur University, 2nd edition 2009, Kolkata 9, The Place of Women in Indian Society, https: / / ir.nbu.ac.in, page 14
6. Bhattacharya, Sukumari, Women in Ancient India: From the Vedas to the Epic Age, Chattopadhyay, Ratnabali, Niyogi, Gautam (Editor) K. P. Bagchi & Co., Kolkata 1989, page 3
7. Ibid
8. Ibidp. 2-3
9. Ibidp. 3
10. Ibidp. 5
11. Ibidp 5-6
12. Bhattacharya, Narendranath,prachin bharatiya samaj, west Bengal rajya pustak parshad,kolkata, January, 2017, p. 41
13. Ibid
14. Ibid. p 42
15. Ibid
16. Chattopadhyay, Ratnabali and Bhattacharya, Pritha, Women in Ancient India, ibid, p 9
17. Bhattacharya, Sukumari, Ibid, p 38
18. Ibid. P. 38
19. Ibid. p 39

20. Purananuru,66,Basham, AL,wonder that was India,Dasgupta, Angsupati(translation),Progressive publisher's,Kolkata, 2011,p 247-248
21. Ibidp 249
22. Ibid. p 250
23. Majumdar, Ramesh Chandra, Bharatiya Nari, Patralekha, Kolkata 2024, p15
24. Ibid. p 23
25. Ibid. p 54
26. Ibid. p 62
27. Altekar, A. S, The Position of Women in Hindu Civilization, Benaras Hindu University, Benaras, 1938, p 246
28. Ibid, p 248
29. Sen, Kshitimohan, Prachin Bharate Nari, Bishwabharati Granthalaya, Kolkata 1357, p 9
30. Ibid. P. 9
31. Ray, Ujjaini, Idealizing Motherhood: The Brahmanical Discourse on Women in Ancient India, ProQuest, USA, 2017, p 19
32. I. B. Horner, 1930 and Chakravarti, Uma, 1984, see also A.K. Tyagi, 1994, In Ray, Ujjaini, Ibid, p 19
33. Mukherjee, P, 1978, p 5. Two years before, Forbes, Geraldin, an American Scholar had been the first to analysis, In Ray, Ujjaini, Ibid, p 23
34. Findley, E. B. 1985, p 37-58, In ibid, p 29
35. Sutherland. S, 1989, p 73-89, In ibid, p 29

The Psychological Impact of Stigma and Discrimination on Individuals with Disabilities : Exploring Coping Mechanisms and Interventions

Abhisek Ghosh
Research Scholar, Dept. of Education
The Central University of Jharkhand

Abstract: Disability encompasses a range of physical, mental, cognitive, or sensory impairments that significantly impact an individual's abilities. Understanding disability has evolved from a traditional medical model to a social model, which emphasizes the role of social barriers—such as discrimination and inaccessible environments—in the marginalization of people with disabilities. Social stigma surrounding disability often arises from ignorance and negative stereotypes, leading to misconceptions. This study explores the stigma and its psychological effects on children with disabilities, who frequently face exclusion from mainstream education and social activities, adversely affecting their mental health and self-esteem. Addressing low expectations and the lack of quality education for these children is crucial. The study aims to eliminate stigma and discrimination by evaluating factors such as self-esteem, anxiety, and depression, as well as the effectiveness of public awareness campaigns. By enhancing social support and promoting positive media representation, we can foster a more inclusive society where individuals with disabilities and their families feel valued and supported.
Key word: Stigma, Disability, Inclusion, Mental Health, Social Support.

Introduction:

Disability can generally be categorized into two types: physical and mental. Some disabilities, such as physical ones, are visible, while others, like mental disabilities, are less apparent and must be perceived. Medical science has proven that these disabilities are limited to the individual, but societal perceptions have extended them into universal stereotypes. Some individuals attempt to portray themselves as heroes by showing compassion toward people with disabilities. However, such actions often alienate these individuals from society rather than fostering their inclusion. Instead, we should strive to reintegrate them into the mainstream of society—not by giving them special treatment, but by fostering normal, genuine relationships.

Rationale of the study

Discriminatory behavior toward children with disabilities often prevents them from being included in the mainstream of society. As a result, these children frequently become victims of negativity. Over time, they may become marginalized, leading to diminished expectations from their teachers, classmates, and families.

It is crucial to actively work toward eliminating such discriminatory behavior to minimize social barriers. Special attention should be given to ensuring that children with disabilities feel comfortable at social events and in public spaces. This effort will help them develop confidence, self-esteem, and a positive mindset, ultimately supporting their reintegration into the mainstream of society.

Problem of statement

This stigma or discrimination against people with disabilities, especially children, hinders their integration into society and negatively impacts their mental health. Eliminating such discrimination is imperative.

Literature Review

The stigma associated with disabilities significantly impacts both individuals with disabilities and their families, often resulting in social exclusion and negative societal attitudes. From the research conducted by Cayanak (2022), it is evident that social discrimination not only affects the personal lives of individuals with disabilities but also impacts their families. As a result, these families gradually begin to withdraw from society.

Corrigan (1998) showed in his study that the media often misrepresents the experiences of disabled individuals. This misrepresentation exacerbates the challenges they face, as it widens the gap in their reintegration into society rather than bridging it. Consequently, in addition to their physical disabilities, they may also develop mental health issues.

Faerstein (1986) found in his study that mothers, particularly in rural areas, tend to rely more on traditional healers than modern medical technologies for diagnosing and treating various problems faced by their disabled children. This often leads to adverse outcomes rather than effective solutions.

Parikh (2021) highlighted in his research that stigma is not confined to the social sphere but also extends to the healthcare system. Instead of utilizing available resources effectively, this stigma hinders the effort to alleviate the suffering of disabled individuals. Parikh emphasizes the importance of adopting modern technologies to create a healthy, inclusive society free from stigma.

Objective

Here are five primary research objectives focusing on understanding the stigma surrounding disability and its psychological impact:

1. Examine the psychological impact of stigma on individuals with disabilities and their mental well-being.
2. Explore strategies to enhance mental development through social support and inclusion.
3. Assess the role of media in raising awareness, reducing discrimination, and promoting the positive representation of individuals with disabilities to foster societal reform.

Research questions

Based on the given research objective, here are ten related research questions:

 What is the psychological impact of stigma on the feelings and mental health of individuals with disabilities?

 How can social support and public awareness campaigns effectively reduce stigma and reintegrate individuals with disabilities into society?

 How effective is media in raising public awareness and improving the mental well-being of individuals with disabilities by combating stigma?

Research design

Secondary data is mainly relied upon to construct the secondary data, which is collected through social media like Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, and relied on various research papers done earlier on this subject, Google Scholar, Researchgate, Shodhganga, etc. The data provided by the papers has been specially reviewed, and an attempt has been made to make the whole paper a reality by highlighting various events occurring in the current society by mixing personal opinion with it. Which will be able to reflect its capabilities qualitatively.

Delimitation

As the work is done on the basis of secondary data while doing the work, it may not be possible to cover all the aspects of present-day society that are reflected as key parameters of psychological distress of persons with disabilities in all areas and also all the issues applicable to our state of West Bengal and India.

Understanding Stigma and Its Impact on Individuals with Disabilities

Even in the 21st century, people with disabilities are stigmatized because of their physical disability, which is viewed as a criminal by society. Both persons with disabilities and their families are subjected to harassment in various ways.

Green (2005) selected 8 disabled people in his research and interviewed the mothers of these eight disabled children. Out of the eight, seven of them came up with the statement that they are directly and indirectly in the eyes of society as if they are part of the crime or share the stigma.

Link and Phelan (2001) have identified some special issues in their research, such as leveling, stereotyping, separation discrimination, etc. Their only goal is society and In the context of the culture, removing one's own disability and setting aside barriers to highlight one's ability. Gallagher (2015)

highlights in his research that children living in marginalized areas, whose parents have lower levels of education, face greater challenges.

Professor Green (2007) demonstrates through his research that disabled children who achieve higher education are more easily accepted by society. Their disabilities often become insignificant in the eyes of others once they establish themselves academically and professionally. Darbyshire and Stenfert Kroese (2012) focused their research on children with mental disabilities, proving that the relationship dynamics between parents play a crucial role in shaping the child's mental health, whether positively or negatively. Walker and Scior (2013) show in their research that the root cause of mental health challenges among people with disabilities often stems from feelings of inferiority and a lack of self-worth.

In summary, if the environment provides support, acceptance, and respect to individuals with disabilities, they can build mental strength and have opportunities to prove themselves, ultimately helping to eliminate the stigma they face.

Main Findings

At present, in this 21st century, no matter how modern we claim ourselves to be, how much we have become mentally modern and how open minded we have become is still a question mark. People with disabilities in society are subjected to various forms of discrimination and stigma; the behavior of people in the society towards them and the comments towards them reflect that they are somehow responsible for their disability. He was only responsible for this hindrance in the past as the actions of their previous birth, today standing in the 21st century and identifying themselves as modern, but the evidence that the change of mindset has not happened can be seen reflected in the steps of our conventional society. This discriminatory behavior towards disabled people in society has now become a social problem, and that is why the mental disability of a disabled person hurts him more than his physical disability and humiliates him much more. Instead of being welcomed, somewhere stigmatizes people with disabilities, because of which people with disabilities become victims of depression, and this depression affects their performance in many countries. They are isolated from society, and they are scarred by negativity from both human and social aspects.

Psychological effects

God doesn't give a person any organ to make him more capable in other aspects, but our society doesn't give them the opportunity to express that capability. Every person has the ability to show something or the other; some creative ability is reflected with great skill, but he needs mental relief and emotional support, which will help him to move forward. But even though today's society identifies itself as modern, its modernity is still under question. If we look at the

survey given by WHO, we can see that a person with a disability is almost three times more likely to have a mental disability than his physical disability because his surrounding society makes him more mentally disabled than physically.

Showing a social isolationist attitude

The society is very much responsible for this discriminatory behavior towards disabled people. Various forms of social activities in society make them victims of mental depression in various ways. Forcing for example, we can mention that in our society, especially in schools and colleges, there are many activities in which a disabled person can easily participate. But due to the infrastructural backwardness of that school and college, it becomes a major obstacle for them to enjoy those facilities, so they are easily forced to stop themselves from all those activities. They begin to think of themselves as outside the mainstream of society. Which makes them depressed in the future.

Impact on the family

The current society surrounding disability not only forces disabled people to face various stigmas or neglect, but also their families are subjected to various forms of harassment or abuse. They have to face various insulting comments, due to which they are sometimes forced to keep themselves away from various open social activities, open social behaviors, or open social creative aspects. As a result, it naturally affects that particular person who is physically or mentally handicapped because when a family member is being bullied because of him, all his anger hides all his anger on that particular person, and as a result, on the one hand, he himself is neglected by society on the other hand. Began to be neglected by the family, which made him completely mentally devastated.

Media influence

In the 21st century, media plays a very important role in our society. The media plays an important role in our society in both positive and negative ways. The positive role of the media can improve our society on the one hand and make the society mentally flexible. On the other hand, the negative role of the media is also able to spread negative effects on society. Due to the spread of various types of misbehavior on people with disabilities by this media, it has a bad effect on the age and society. One feels fun with it.

The positive influence of media, on the one hand, is to provide better education to our society, and on the other hand, it can empower a physically or mentally challenged person. A person with mental retardation may think that he has a special ability, that he is able to perform a certain task at one stage, that he is not dependent on anyone, and that he can do whatever he wants.

Recommendations

- Education has the power to transform lives completely. Therefore, it is essential to provide children with special needs access to quality education to empower them mentally and emotionally. Organizing

open seminars and workshops specifically for these children can significantly improve their mental well-being and positively influence societal attitudes toward them.

- In our society, financial independence often commands respect. Hence, the government should facilitate interest-free loans and other financial support programs to help individuals with disabilities achieve financial independence.
- It is important to recognize that children with physical or mental disabilities may face more challenges than their peers. Therefore, it is crucial to reserve specific seats for them in schools, colleges, and even in the workforce. Additionally, measures should be taken to ensure that these reservations are implemented effectively and that no child is deprived of their rightful opportunities.
- The media, often regarded as the fourth pillar of democracy, plays a significant role in shaping societal attitudes, especially among the youth. It has the power to improve mental health and foster a positive environment. However, the media must be cautious not to promote propaganda or content that could cause mental trauma to individuals with special needs. Similarly, excessive attention or sensationalism surrounding them can also have adverse effects. Instead, the media should present these individuals naturally and respectfully, focusing on promoting their well-being and mental health.

We should change our mentality in our modern society where those who consider themselves modern are observed to be celebrated in the opposite role in their behavior; while claiming to be modern in their speech, their behavior sends a completely opposite message which is holding us back instead of moving us forward. gives Rabindranath Tagore said-

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

(The one you put down will bind you. /You left behind the one who pulled you behind.)

If we leave the physically challenged people behind in our behavior, at some point they will also leave us behind. But if we try to move forward with them considering them as one of the backbones of the mainstream of society, they will try to move our society forward with their all. Our society will indeed be transformed into a healthy society.

Conclusion

To achieve the overall development of individuals with disabilities, especially children, it is essential to first include them in society by providing adequate social support. Darbyshire and Stenfert Kroese (2012) demonstrated in their

study that mental health is often negatively impacted by a lack of social support. Similarly, Walker and Scior's (2013) found that society plays a crucial role in removing stigmas, particularly in maintaining mental health.

Therefore, fostering their acceptance within society through education, awareness, and efforts to break down social barriers is equivalent to delivering justice in social terms. This has been proven to be absolutely essential for their well-being and development.

Reference :

- Çaynak, S., Özer, Z., & Keser, İ. (2022). Stigma for disabled individuals and their family: A systematic review. *Perspectives in Psychiatric Care*, *58*(3).
- Corrigan, P. W. (1998). The impact of stigma on severe mental illness. *Cognitive and behavioral practice*, *5*(2), 201-222.
- Faerstein, L. M. (1986). Coping and Defense Mechanisms of Mothers of Learning Disabled Children. *Journal of Learning Disabilities*, *19*(1), 8-11. https://doi.org/10.1177/002221948601900103
- Parikh, S.K., Kempner, J. & Young, W.B. Stigma and Migraine: Developing Effective Interventions. *Curr Pain Headache Rep* **25**, 75 (2021). https://doi.org/10.1007/s11916-021-00982-z
- Green, S., Davis, C., Karshmer, E., Marsh, P., & Straight, B. (2005). Living stigma: The impact of labeling, stereotyping, separation, status loss, and discrimination in the lives of individuals with disabilities and their families. *Sociological inquiry*, *75*(2), 197-215.
- Link, Bruce and Jo Phelan. 2001. "Conceptualizing Stigma." *Annual Review of Sociology* **27**: 363–85.
- Cantwell, J., Muldoon, O., & Gallagher, S. (2015). The influence of self-esteem and social support on the relationship between stigma and depressive symptomology in parents caring for children with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, *59*(10), 948-957.
- Green, S. E. (2007). Components of perceived stigma and perceptions of well-being among university students with and without disability experience. *Health Sociology Review*, *16*(3-4), 328-340.
- Darbyshire, L. V., &Stenfert Kroese, B. (2012). Psychological well-being and social support for parents with intellectual disabilities: Risk factors and interventions. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, *9*(1), 40-52.
- Walker, J., &Scior, K. (2013). Tackling stigma associated with intellectual disability among the general public: A study of two indirect contact interventions. *Research in developmental disabilities*, *34*(7), 2200-2210.

The Partition, Refugees and Public Health in West Bengal From 1947 to 1965

Bivas Biswas
Asst. Professor, Dept. of History
Government General Degree College Nakashipara,
Muragachha, Nadia

ABSTRACT: Migration is not only considered as a Universal fact, but a burning problem throughout the world till date. The refugees from East Pakistan (East Bengal) migrated to India especially in West Bengal after partition of 1947 in different phases. The partition of India in 1947 brought unimaginable miseries to millions of people who were forced to leave their ancestral homes under compelling circumstances. The primary aim of this paper is to focus on the sanitary and health conditions of the refugees who came from Eastern Pakistan. The West Bengal Government at that time hardly provided anything to the refugees who were staying or taking shelter at the camps all over West Bengal. During the initial stage of exodus of the refugees from East Pakistan, Sealdah station of Calcutta was the most important place where the migrants dumped thousands. At that time Sealdah was treated as a transit camp for the refugees. The refugees had to stay and suffer for unspecified periods of time at Sealdah. The refugees were struggling hard to access food, water, proper sanitation, shelter etc. Their lives were also anguished by numerous health issues. Choleraalone claimed the lives of a huge number of refugees. Apart from cholera, Malnutrition, exhaustion, gastronomical diseases, tuberculosis, diarrhoea, vitamin deficiency etc. were other health concerns for the refugees at that point of time.
KEY WORDS: Refugee, Partition, Camp, Cholera, Malnutrition.

INTRODUCTION:

The East Bengali migrants' access to rehabilitation assistance in India rested on their recognition as 'refugee' and therefore eligibility for assistance by the state. A 'refugee' or 'displaced person' may be defined as "*A person who was ordinarily resident in the territories now comprising East Pakistan, but who on account of civil disturbances or the fear of civil disturbances or on account of the Partition of India has migrated.*"[i] After the partition of 1947, the Bengali Hindus of East Pakistan also faced several types of hardships, including the despoliation of their faith, the disparaging of the elderly and women and the forced removal of cows, goats and even crops. There was a ray of hope for the Bengali Hindus that if they could trespass West Bengal, they would not only be

able to live with honour but they would also be able to provide their children with an education and a place to settle down. After the partition of India on religious lines in 1947, migration from East Pakistan (now Bangladesh) became a common feature. However, the Hindus of East Pakistan started migrating to West Bengal after the outbreak of the Noakhali riots of 1946.[ii] Again, during anti-Hindu riots in East Pakistan in 1964, assault, abduction, theft and atrocities on women became very common. Further a large number of Hindu refugees fled to India from East Pakistan after war started between India and Pakistan in 1965. A million of individuals have crossed the border and came to India as result of carnage in East Pakistan in late 1960s. The Bengali Hindu people of Bangladesh found a new home in North- East India and West Bengal.[iii]

REFUGEE AND PUBLIC HEALTH AFTER 1947:

Just after the partition of India in 1947, a large number of refugees from East Pakistan came to West Bengal and took shelter at Sealdah station of the city of Calcutta. For that reason, Sealdah station very soon became the breeding ground of various contagious diseases which affected both the refugees and the daily commuters. For that problem, the several refugee organisations demanded their removal from the Sealdah station to the proper camps. The refugees were forced to live in a really unhygienic situation at Sealdah station. Regarding this deplorable situation, Amrita Bazar Patrika wrote that “Imagine -a healthy baby, eating and playing by the side of a cholera patient. Imagine again, sleeping in a place, a few feet away, from a place which is used by thousands, as a latrine and which remains unwashed for days together. Imagine again cooking your food, on bricks with rubbish as fuels, on the street, along which pass hundreds of motors, cars, lorries and other kinds of vehicles. This is how they spent their days.”[iv]

In his annual speech at the assembly on 25th September, 1950, Governor Kailashnath Karzu mentioned that the large number of weak, ill-nourished and starving refugees who immigrated to West Bengal had increased incidents of illness not only amongst themselves but also among the host population. He further asserted that an unprecedented migration had resulted in an increased demand on Bengal’s limited food resources.[v] Actually, the view of the then West Bengal Government towards refugees was reflected through the speech of the Governor.

The government did not take proper initiative to deal with the situation. This reluctant attitude of the Government indirectly resulted in the rapid spread of cholera and other diseases among the refugees who took refuge in Calcutta and several districts of West Bengal. It has been estimated that about seven thousand refugees went to Nabadwip. Soon they exhausted their meager resources and from May 1948 a portion of them was forced to starve to death. However, they were later helped by the local municipality. Fortunately for them, local municipal health workers worked diligently to vaccinate about eight

thousand people and control a large-scale epidemic.[vi]This can be considered as one of the most important positive approaches initiated by local administration amidst all odds.

As the number of refugees from East Pakistan began to increase heavily by the end of 1948, the Government opened camps not only in Calcutta, but also in the several adjuvant districts. The West Bengal Government opened around 389 relief camps in various districts. Transit camps were also established as it was difficult to shift the refugees directly to the relief camp. Later these transit camps became the breeding ground of different infectious diseases. Though accommodation, water supply, electricity and sanitation were free, actually all these were more on paper than in reality. Practically the issue of sanitation and good health measures were largely neglected in these camps.[vii]

The government established a refugee camp atJirat in 1950. Here, latrines were built far away from the huts but close enough to contaminate nearby ponds. Unhealthiness became prominent during the monsoon season because the flooded lavatories polluted the surrounding area as well as the water of the nearby tanks and made it unsafe to use. This resultedin the spread of diseases among the refugees. There were instances of malaria and dysentery at Jirat camp and here 21 inmates died within two months. Even children suffered from malnutrition and various diseases including scabies.[viii] There was no infrastructure to drain out unclean water at Cooper's camp and the encircling long open sewer became a breeding place of parasites.[ix] In mid-1950, at Dhubulia camp, the number of deaths recorded was 685. People died due to various diseases like cholera, amoebiasis, smallpox, fever, diphtheria etc. Malnutrition was one of the more important causes of child death. During mid-June to July 1952, near about 2,357 refugees were suffering from several ailments and there were as many as 631 deaths.[x]

One of the primary reasons for worsening of the health condition of the refugees was the congested condition of the camps.[xi] Giving an account of the overcrowded conditions of the camps, Shura Bala Das of Bhadrakali camp narrated that they were given shelter in an abandoned military barracks, where conditions were such that five-six families were kept together in one room.Thus, the families were finding it difficult to sustain themselves in such a claustrophobic situation. Infant mortality was a regular occurrence in his camp. Residents of Bhadrakali Mahila Shibir protested strongly against it. They collectively went on hunger strike in March 1952 to demand better sanitation facilities in the camp.[xii] Manindralal Biswas who was a paediatrician commented about Kashipur camp that "*What help can you provide them with? Can you provide them with air to breathe? They are dying of suffocation!*"[xiii] Ashalata Das of Bansberia Mahila Sadan specified the scarcity of proper maternity units

in the camp. She stated that in many cases, pregnant women had to deliver in the open, in completely unprotected, unhygienic conditions.[xiv]

The conditions of the refugees were extremely wretched. Such poor conditions were best evidenced by the conditions of Cooper's camp. The refugees living in these camps began to suffer from smallpox. One of the reasons behind this outbreak was the confinement of the refugees in a small space by the authorities. This confined environment leads to the spread of this highly infectious disease. Refugee leaders like Prankrishna Chakrabarty and Ambika Chakrabarty said in a meeting which was held in late 1956 that the inmates were living like 'dogs and pigs'. Prankrishna Chakrabarty also pointed out that there was no quarantine facility for the T B patients.[xv] Eighty latrines in Cooper's camp served a population of 70,000, a pittance in comparison to the needs. The same situation is observed not only in Cooper's camp but also in other camps. Due to inadequate toilets in Cooper's camp, most people defecate in the open, especially before sunrise. The same picture can be observed in water supply, in Copper Camp there were only twenty tube wells for 70,000 people.[xvi] Hironprabha Debi opined that "*Although the refugees got shelter far away from communal hatred, scarcity of water and lack of proper health care made camp life unbearable. In such a situation, children regularly died of dysentery and their bodies were not always buried but simply thrown into the surrounding jungles for paucity of funds.*"[xvii] Jogen Roy alsodescribed the imperfect health conditions of Cooper's camp. The camp was surrounded by shrubberies which again were a breeding ground for mosquitoes. Diseases like malaria, tuberculosis, small pox etc. frequently occurred in that camp. Sometimes inmates succumbed to cholera due to the poor quality of rice and wheat which were supplied to the refugees of that camp.[xviii] The deceased were not properly cremated but stocked in a pile. The UCRC (United Central Refugee Council) inspection team found that a truck came only once a week to carry away the corpse to the cremation ground.[xix]

The Refugee camps were also extremely unhealthy spaces- almost a twilight zone between life and death. Insufficient sanitary latrines, inadequate sewage and unsatisfactory supply of uncontaminated water led to the outbreak of disease; and death continued to be a great leveller. On 29th March, 1956, 'Swadhinata'highlighted a report on Cooper's camp, which described its sanitation and health conditions in the following words:

> "*For a long time, the toilets in the camp have broken down-they are full of faces. There are no arrangements for the regular cleaning of drains. The air in the camp has been poisoned by the foul smell arising from accumulated garbage on the roadside. Mosquitoes have made life unbearable. Many families have been afflicted by malaria fever. In the new tents chicken pox has arrived as well. There has been*

a hike in the incidents of cholera. Death rate has increased......... There is almost no arrangement for treatment.''[xx]

GOVERNMENT INITIATIVES: The West Bengal Government however claimed that they spent over Rs.1 crore on medical care for the refugees. There were six mobile units mainly for the tuberculosis patients and these were utilised for medical relief of other refugees as well. The authorities claimed its handling of tuberculosis as evidence of its success. Government reports also suggest that antibiotics were given to the patients in free of cost. Diagnostic facilities were provided at the Calcutta medical college. The Government also made arrangements for outdoor treatment at the Jadavpur TB Hospital. Apart from that, six medical units were functioning at Ranaghat, Krishnagar, Chinsura, Burdwan and Calcutta to look after tuberculosis cases.[xxi]

Anti-epidemic measures were adopted in different refugee camps. During the months of March and April of 1950, there was an unprecedented influx of refugees from East Bengal who poured into this State in several thousands. Due to change of the situation, several camps which were closed down had to be re-opened and the number of the then existing camps had to be increased to 52 from 13. The following epidemic staff exclusively for the refugee camps was sanctioned during the year under review: —

(i) Two Camp Health Officers, (ii) One Supervising Medical Officer. (iii) Forty Epidemic Doctors. (iv) Twenty Sanitary Inspectors. (v) One hundred Health Assistants. (vi) Forty Disinfectants. (vii) Two Ambulance Drivers.

The table below is showing medical and public health work done by the epidemic staff attached to the refugee camps during the year 1950: -

No. of camps functioning during the year:	52
No. of camp population:	268,279
No. of anti-cholera inoculation performed:	1,236,147
Anti-smallpox vaccination and revaccination per- formed:	929,420
No. of cases treated:	1,153,706
Maternity cases attended:	1,116

Besides these, water-supply and conservancy arrangements were made at a cost of several lakhs of rupees under control and supervision of the Directorate of Public Health Engineering.[xxii]

Anti-cholera measures were also taken. On the eve of introduction of the passport system between the two Bengals on the midnight of the 15th October 1952, there was a heavy influx of displaced persons from East Bengal extensively on a wide scale crossing the border into West Bengal on all fronts in

thousands. With previous experience gained during the ‘1950’ influx, the Medical and Public Health staff of the Health Directorate were immediately mobilised on all concentration centres and with no loss of time they took all possible measures against outbreaks of epidemic diseases and treated different cases of ailments amongst the displaced persons. So grave as the situation was, a widespread outbreak of epidemic diseases was apprehended throughout the State but due to the prompt and speedy action taken by the staff, it could be averted. Fortunately outbreaks of cholera and smallpox were checked at the start and there were occurrences of cholera at a low level and smallpox showed considerable decrease when compared to the preceding year. New camps had to be opened to receive and accommodate them. The total number of refugee camps maintained by the State during the year under report was 38. A statement for the year 1952 showing work done in these camps is furnished below[xxiii]:

Number of anti-cholera inoculation performed	256,753
Number of anti-smallpox vaccination performed	250,983
Number oi patients treated	675,787

These measures were not sufficient. West Bengal Legislative Assembly proceedings of 1954 states that such health measures were insufficient. Hemanta Basu said that near about twenty-one refugees died due to lack of Government medical aid at Taherpur camp.[xxiv] The scenario regarding lack of Government medical aid was very common at other refugee camps also. Ambika Chakrabarty pointed out in the West Bengal Legislative Council in 1952 thatdue to lack of proper living conditions and incurable diseases, nearly one among four camp refugees died. The UCRC also opined in 1947 that the conditions of the camps were very poor and cannot be described as civilized. There was total ignorance of privacy of the refugees who lived in the camps. The patients who were suffering from tuberculosis were not quarantined.[xxv]

CONCLUSION: For the refugees, relief meant proper sanitary arrangement, medical care, and educational facility for children, but it was not provided to these hapless people. The official policy towards Bengal refugees was harsh, and hence the condition of their camps remained unchanged until they were eventually shut down in 1961. This condition affected the lives of the refugees in particular and the environment in general. Absence of proper shelter, food, sanitation, on one hand and sweeping epidemic like cholera, severe malnutrition and death on the other hand created oneof the worst humanitarian crises of the world. Thus plagued the refugees and looked into the responses from various actors in alleviating the crisis were taken into amount in this research. However

further study is required for developing a detailed picture of unsatisfactory public health conditions of the refugees.

NOTES & REFERENCES:

Monika Mandal, *Settling the Unsettle- A Study of Partition Refugees in West Bengal*, (Kolkata: Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Study, 2011),113.

[ii]Ibid, 120.

[iii]Ibid, 123.

[iv]Amrita Bazar Patrika, 9 October 1948.

[v]West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Volume 2, 25 September 1950.

[vi]Sekhar Bandhyopadhyay, *Decolonitation in South Asia: Meaning of Freedom in Post-Independence West Bengal, 1947-1952*, (London and New York: Routledge, 2009),37.

[vii]Hironmoy Bandhopadhyay, *Udvastu* (Kolkata: Deep Prakashan, 2021),120.

[viii]Joya Chatterjee, *Dispersal and Failure of Rehabilitation Refugee camp Dwellers and Squatters in West Bengal*, Modern Asian Studies, Cambridge University press, 41, 5(2007), 1015.

[ix] Prafulla Chakraborti, *The Marginal Men: Refugees and Left Political Syndrome* (Calcutta: Lumiere Publication, 1990), 155.

[x] Tushar Sinha,*Maranjayi Songrame Bastuhara* (Kolkata : Dasgupta's, 1999) , 28.

[xi] Hironmoy Bandhopadhyay, *Udvastu*,(Kolkata: Deep Prakashan, 2021),120.

[xii] Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *Caste and Partition in Bengal-The story of Dalit Refugee*(United Kingdom: Oxford university press, 2022), 121.

[xiii]Ibid, *95.*

[xiv] Nilanjana Chatterjee, Midnight's Unwanted Children: East Bengali refugees and politics of rehabilitation (1992).

[xv] Swati Sengupta Chatterjee, *Sanitation and health at West Bengal refugee camp in 1950*, Vidyasagar Universityjournal of history, 3(2015), 96.

[xvi]Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *Caste and Partition in Bengal-The story of Dalit Refugee* (United Kingdom: Oxford university press, 2022),122.

[xvii]Swati Sengupta Chatterjee, *Sanitation and health at West Bengal refugee camp in 1950*, Vidyasagar Universityjournal of history, 3(2015) 97.

[xviii]Jogen Roy, 'Cooper's camp e Chelebela' In Madhumoy Pal, ed.,*Desh Bhaag Binash O Binirman*(Kolkata: Gangchil, 2011),155.

[xix]Prafulla Chakraborti, *The Marginal Men: Refugees and Left Political Syndrome* (Calcutta: Lumiere Publication, 1990), 322.

[xx]Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, *Caste and Partition in Bengal-The story of Dalit Refugee* (United Kingdom: Oxford university press, 2022), 122-123.

[xxi]Hironmoy Bandhopadhyay, *Udvastu* (Kolkata: Deep Prakashan, 2021),120.

[xxii] Government of West Bengal, Directorate of Health Services, Annual Report on the Health of the Population of West Bengal. For the Year 1950, 13.

[xxiii] Government of West Bengal, Directorate of Health Services, Annual Report on the Health of the Population of West Bengal. For the Year 1952, 3.

[xxiv] Report on relief and rehabilitation of displaced persons in West Bengal 1957, health, 78.

[xxv]Swati Sengupta Chatterjee, *Sanitation and health at West Bengal refugee camp in 1950*, Vidyasagar Universityjournal of history, 3(2015), 92-93.

Stress, Stressor and its Management

Nimden Sherpa
Assistant Professor, Department of Education
Sundarban Mahavidyalaya

Abstract: We all face different problems and hurdles in our life, but sometimes the pressure of such situation becomes too much for us to handle it in a smooth manner. In such a situation we lose track of how to overcome or meet the demands placed on our shoulder, that is when we experience stress. When the amount of stress keeps piling up and reaches a phase where it can no longer be handled, that is when it affects the physical and mental wellbeing of a person.

However, if stress is experienced in small doses, it can be a good thing as it can motivate you to do your best and stay focused. Small amount of stress is what keeps you get going, for instance during exam time instead of watching television you focus on your study. But when the going gets too tough and life's demands exceed your ability to cope, stress becomes a threat to both your physical and emotional well-being.

Keywords: Stress, stressor, body's stress response, stress management.

Introduction:

Stress is a situation that arises when an individual's resources are less in comparison to the demands and obstacles that arise in their life (S. Michie, 2002). It is a response to experiences or environmental conditions, referred to as stressors that cause a feeling of anxiety or discomfort. Stress is accompanied by changes in heart rate, fast breathing, sweating, less digestion, less sleep. Thus, stress is a psychological and physiological response to events that upset our personal balance in some way.

The body's stress response:

When someone experiences a stressful event, the amygdala, an area of the brain sends a distress signal to the hypothalamus. The hypothalamus acts like a command centre. This area of the brain communicates with the rest of the body through the autonomic nervous system which controls such involuntary body functions as breathing, blood pressure, heartbeat, and the dilation or constriction of key blood vessels and small airways in the lungs called bronchioles (Howard E.LeWine, 2024). The autonomic nervous system has two components, the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system functions like a gas pedal in a car. It triggers the fight-or-flight response, providing the body with a burst of energy so that it can respond to perceived dangers. For e.g., it dilates the pupil, inhibits salivation, relaxes or expands bronchi, increases heartbeat, increases glucose production and

releases it, secretion of adrenalin, a hormone secreted by the adrenal glands that increase the rate of blood circulation, breathing, and carbohydrate metabolism and prevents bladder contraction.

The parasympathetic nervous system acts like a brake. It promotes the "rest and digest" response that calms the body down after the danger has passed. After the amygdala sends a distress signal, the hypothalamus activates the sympathetic nervous system by sending signals through the autonomic nerves to the adrenal glands. The adrenal gland respond by pumping the hormone adrenaline into the bloodstream. As adrenaline circulates through the body, it brings on a number of physiological changes such as:

- The heart rate and blood pressure increase so that the blood can travel through the body in a much faster rate. This helps to deliver oxygen and to make the muscles work.
- The breathing rate increases to deliver more oxygen to the muscles and tissues.
- The liver releases glucose into the bloodstream. This powers cells in the body.
- The digestion decreases so that the energy needed to break down food can be redirected to the other parts of the body.
- Stress can trigger sweat to be released from some parts of your body. Stress-sweat is different from sweat caused by being hot.
- The muscles in the body becomes stiff to prepare for responding with action.

What is a stressor?

Stressors are those events, experiences, changes or environmental situations that causes stress in an individual. Every individual will likely encounter a number of situations or events which will result in stress, but not everyone will respond to various stressors in the same way because of differences in perception. There may be differences in the meaning given to the situation or event by an individual. What might be stressful for one individual may not be necessarily stressful for another.

Different types of stressors:

1. Major Life Changes: Major life events can become a stressor. In the middle of a normal life if a sudden change occurs in it which becomes difficult to manage or accept could lead to stress. For example, it can be a divorce, a child leaving their home, unplanned pregnancy, a move to a new place, a change in one’s career, diagnosis of cancer or other fatal illness. The faster the change, the greater could be the level of stress.

2. Family and relationship: Problems with friends, family members, romantic partner are common daily stressors. Marital disagreements, dysfunctional relationships, rebellious teens, or caring for a chronically-ill family member or a child with special needs can also increase the level of stress.

3. Work stressors:
In our career-driven society, work can be the cause of stress. Work stress is caused when one is not happy with their job, if the work environment is not good, if there is too much of office politics, if the remuneration is too low in comparison to the exhausting workload that the workers have to go through, conflicts with your boss or co-workers are all part of work stressor.
4. Social stressors: Your social situation can also cause stress. For example, poverty, financial pressures, racial and sexual discrimination or harassment, unemployment, isolation, and a lack of social support all take a toll on your daily quality of life.
5. Environmental stressors: Your physical surroundings can also become the reason for your stress. Examples of environmental stressors include an unsafe neighbourhood where events like murder, rape, kidnapping, stealing takes place on a regular basis. If the place of residence is very polluted, if there is too much of noise where every day sirens keep you up at night, a barking dog next door, aggressive neighbours who keep fighting and quarrelling. Uncomfortable living conditions like problems of transportation. For people living in crime-ridden areas or war-torn regions the stress may be unrelenting.
6. Internal cause of stress: Not all stress is caused by external pressures and demands. Your stress can also be self-generated. Internal causes of stress include uncertainty or worries, pessimistic attitude, self-criticism, unrealistic expectations or beliefs, perfectionism, low self-esteem, excessive or unexpressed anger.

Signs and symptoms of stress:

To be able to handle stress, you first need to learn how to recognise it in yourself. Stress affects the mind, body, and behaviour in many ways, all are directly tied to the physiological changes of the fight-or-flight response. The specific signs and symptoms of stress vary widely from person to person. Some people primarily experience physical symptoms, such as low back pain, stomach problems, skin problem. In others it could be emotional symptoms, such as crying or hypersensitivity, mood swings. For some it could be changes in the way they think or behave.

These are some of the common warning signs and symptoms of stress. You can use it to identify the symptoms you typically experience when you are under stress. If you know your red flags, you can take early steps to deal with the stressful situation before it goes out of control.

1. Cognitive symptoms: It means something that it is related to the mental process of a person, which includes,
- Memory problems, unable to remember or recall things.
- Not being able to decide or make decision.
- Inability to concentrate on a particular thing.

- Not being able to think clearly.
- Seeing and taking everything in a negative way.
- Being anxious and overthinking all the time.
- Constantly worrying about petty matters.
- Fearful anticipation.

2. Physical Symptoms: It means something that is related to the physical structure or body of a person, which includes,

- Headaches or backaches.
- Muscle tension and stiffness.
- Diarrhoea or constipation.
- Nausea, dizziness.
- Insomnia.
- Chest pain, rapid heartbeat.
- Weight gain or loss.
- Skin breakouts.
- Frequent colds.

3. Emotional Symptoms: It is related to the various emotions of a person, for instance,

- Moodiness, there is a rapid an instant change in a person's mood. One moment you are happy and the other moment you end up feeling sad or angry.
- Gets very easily agitated.
- Restlessness.
- Short temper.
- Gets easily irritated, becomes very impatient.
- Feeling tensed most of the time.
- Feels overwhelmed.
- There is a sense of loneliness and isolation even when surrounded by friends and family members.
- There is a feeling of depression or general unhappiness.

4. Behavioural Symptoms: It is related to the behaviour of an individual, which could include,

- The person eating more or less in comparison to his normal pattern that he followed before.
- Not being able to sleep or sleeping all the time.
- Feeling of isolating yourself from others.
- Feeling of procrastination, that is neglecting all the work and responsibilities.
- Using alcohol, cigarettes, or drugs in order to relax.
- Nervous habits like nail biting, teeth grinding or jaw clenching
- Overdoing activities such as over-exercising, shopping.

- Overreacting to small problems.
- Picking fights with others for no reason.

Coping strategy for stress:

You can seek professional help if you feel down or stressed for several weeks, months or if it starts to interfere with your normal routine or if it starts to affect your home or work life.

In the meantime, there are things that you can learn and do to manage stress before it goes out of hand. It is very necessary to recognise the things that causes stress in you so that you can focus on how to react to it and manage it. We all know when to stop or take a deep breath when we feel a sense of tension arising. For this there are various techniques that you can follow.

1. Exercise: Physical activities like running, swimming, dancing, cycling etc helps you to get better sleep which in turn helps to re-energise the brain and the body. So better sleep means better stress management.
2. Connect with people**:** Spend time with friends or family member who brings out positivity in you, who listens to you without judging you. Connecting with good people is a natural way to calm yourself and lower your stress.
3. Learn to control your behaviour**:** How you respond to people directly impact your stress levels. Try to manage your response. Do not try to overcommit yourself especially if you know that you cannot do it, share the responsibility and do not take all the burden on your shoulder, count till ten before you respond, walk away from a heated situation, distract yourself with music or podcasts.
4. Try to control your inner voice: Nothing can affect your stress levels like the voice inside your head. The nice thing about it is that you are in charge of it. You can exchange negative thoughts with positive ones. There are various benefits of positive self-talk, these include a longer life, lower levels of depression, better coping skills for difficult situations.
5. Laugh therapy: When you laugh you take in more oxygen. Your heart, lungs and muscles get a boost and your body releases those feel-good hormones. Laughter also improves your immune system, helps to improve your mood.
6. Balance work and home: All work and no play can automatically spoil your mood and increase your stress. If you are spending too much time at the office, intentionally put more dates in your calendar to enjoy time for fun, either alone or with others.
7. Bond with Your Pet: There are various studies that have shown that spending time with your pet can help to make you feel good, it can help to reduce your anxiety levels.
8. Take a vacation: Getting away from all your work, problems and taking a vacation can reset your stress tolerance by increasing your mental and emotional outlook, which makes you a happier, more productive person

upon return. When you go for your vacation try to leave your cell phone and laptop at home.

9. Take out time for your hobby: Focus on your hobby and do the things that you like to do for instance gardening, reading, listening to music. Engage in activities that bring pleasure and joy.
10. Eat well and avoid alcohol and stimulants: Alcohol, nicotine and caffeine may temporarily relieve stress but it has a negative health impact and can make stress worse in the long run. Well-nourished bodies can cope in a better manner, so start with a good breakfast, add more organic fruits and vegetables, avoid processed foods and sugar, and drink more water.
11. Consult a doctor: If nothing seems to work and the stress level keeps aggravating then it is time to consult a doctor.

References:

- Barnes, V. E.H. Potter III & F.E. Fiedler (1983). Effects of interpersonal stress on the prediction of academic performance. Journal of Applied Psychology 63: 686–69.
- Campbell, J.M. (1983). Ambient stressors. Environment and Behaviour 15: 355–380.
- S.Michie (2002), Causes and management of stress at work.
- TriantafylliaZisopoulou, L.Vargoli (2022), Stress management methods in children and adolescent.
- Hedy marks, Lori.M.King (2024), Stress symptoms.
- Radhika Kapur(2024), Understanding the types of stressors.
- Ajibade B.L1, Olabisi O.O2, Fabiyi B3, Ajao O.O4, and Ayeni A.R5 (2016), Stress, types of stressors and coping strategies amongst selected nursing schools' students in South-West Nigeria.
- Aschel.C. Pinto, Ashley Francis, Armin R Sabu, Asha Biju, Ashly James, Pricilla D Silva (2021), A study to address stress & stressor among undergraduate nursing students in a selected college at Mangaluru.
- Howard E.Le Wine (2024), Understanding the stress response.

Role of Dr. B. R. Ambedkar in Promoting Human Rights of the 'Untouchable' or 'Dalit' Communities

Partha Pratim Roy
Assistant Professor, Department of History
Prabhat Kumar College, Contai
Purba Medinipur, West Bengal

Abstract: Dr. Ambedkar was an Indian jurist, economist, politician and social reformer, who inspired the Dalit movement and campaigned against social discrimination toward the untouchables (Dalits).In India, during the British period, various sections amongst non-Brahmin castes organised themselves against the Brahmin dominance in the socio-economic, cultural and political spheres. One of the leaders of this uprising was Dr. B. R. Ambedkar. His life was an extraordinary saga of suffering, sacrifice and struggle. He faced heavy odds, onslaughts and humiliations. He formed a mission to fight for human rights. He claimed passionately for separate electorates for the backward classes. Ambedkar was the main personality in India's constitution making process and was regarded as father of Indian constitution. Dr. Ambedkar recognized the social stigma of women in Hindu society. He felt the need for women's human rights. He believed in freedom of religion, free citizenship, separation of state and religion. He had some unique qualities like courage, conviction, discipline, hard work, deep study, scholarship, single-minded devotion, dedication, sacrifice and selfless service that helped him to carry the message of a Messiah to the oppressed and the suppressed mankind in the country.

Key words: Untouchability, Dalit, Gandhi, Constitution, India, Human rights, Struggle.

Dr. Ambedkar is undeniably prominent among India's intellectuals and philosophers, having established a unique role within society. He exemplified a remarkable blend of thinkers, writers, leaders, legal experts, constitutional authorities, and advocates for the oppressed.[1] From an early age, he experienced the harsh realities of caste discrimination, ignorance, and suffering.[2]Throughout his life, Ambedkar consistently challenged and opposed the detrimental and inhumane aspects of Hindu society.[3] He was the first to conduct a scientific study of untouchability.[4] While Gandhiji had previously considered solutions to this issue, Ambedkar effectively brought the plight of untouchables to the forefront of national consciousness.[5] His comprehensive analysis of untouchability, including its origins and evolution, aimed to eradicate this social injustice and

promote socio-economic equality. Through his social movement, he sought to empower untouchables with a sense of dignity, confidence, and respect.[6]

Dr. Ambedkar wishes that the Dalits would adhere to certain principles to achieve a respectable standing through their hard work as a collective. For this, he advised them to observe the "Pancha-Sutras". These are (i) Self-Improvement: exerting oneself for one's betterment with very minimal or no expectations for assistance. (ii) Self-Progress: personally wagering a bet to succeed in life. (iii) Self-Dependence: trying to reduce the dependency on others and become self-sufficient. (iv) Self-respect: being a dignified person and never defaming oneself for any reason. (v) Self-Confidence: cultivating faith in oneself, in one's skills, in one's hard work.[7] He also inspired people to work towards broad self-respect and dignity and come out from inferiority complexes through his message, speeches and statements.

Dr. Ambedkar led the Satyagraha movement to promote human rights. He emphasized three key principles for the Dalit Movement: Education, Agitation, and Organization.[8] Education is crucial for helping Dalits overcome ignorance. Agitation is necessary to stand up against exploiters and frauds. Organization helps address personal differences, focus on community needs, and unite for a common cause. His life story represents the ongoing fight of the marginalized community in India against social exclusion and economic hardship.[9] Dr. Ambedkar dedicated himself to advocating for human rights and freeing individuals from bondage, slavery, and cruelty. He pointed out that society suffers from oppression, lack of freedom, and inequalities. As a liberator, his goal was to uplift the oppressed classes to a better social, political, and economic standing and to help them escape from dark times. In May 1920, he organized the first All-India Conference of Untouchables in Nagpur.[10] Dr. B. R. Ambedkar was a champion for social justice. He experienced injustice and mistreatment from religious extremists and Hindu fundamentalists.[11] He understood the struggle of being untouchable and concluded that social justice and human rights were essential for making the marginalized dignified individuals in society.[12]

He was instrumental in the formation of the Constitution and dedicated significant efforts to enhance the lives of the marginalized. As a key figure in Indian history, he made substantial contributions to the Indian Freedom Movement. While Mahatma Gandhi emphasized moral leadership, Baba Saheb tackled social challenges without resorting to exploitation.[13] He genuinely advocated for democratic principles and opposed the caste system. Throughout his life, he committed himself to the advancement of the impoverished, marginalized untouchables, and disadvantaged communities.

In 1918, the Southborough Franchise Committee visited India to observe the situation of depressed class people.[14] During this visit, Ambedkar

spoke with the committee. He advocated for universal voting rights and reservations for untouchables and other religious groups based on their population size. He highlighted the importance of social equality and justice, stating that the right to self-government was as much a birth right for the Mahars as it was for the Brahmins. Ambedkar called for a significant shift in the attitudes of Hindus to achieve social justice for everyone, especially those in the depressed classes.

Dr. Ambedkar initiated public movements and marches to improve access to drinking water. In 1927, he led a Satyagraha in Mahad to claim the right for the untouchable community to use the main water tank.[15] Baba Saheb, along with thousands of supporters from different castes, burned the Manusmriti, a text that promotes discrimination, with a Brahmin friend. It is important to recognize why he chose a Brahmin for this act: he wanted everyone, including Brahmins, to see that this document violates basic human rights. He understood that while burning this discriminatory text wouldn't solve the larger issue, the act itself carried significant meaning. Baba Saheb warned that something good can turn harmful in the hands of the wrong people.[16] Today, our constitution is being weakened through numerous changes, diluting important laws, and many are unaware of these most serious threats to our rights.

Dr. Ambedkar fought for the right of lower castes to enter Hindu temples. In 1930, he started the Kalaram Temple movement after three months of planning. Around 15,000 volunteers gathered for the Kalaram Temple Satyagraha, creating one of the largest processions in Nashik's history. The march included a military band and groups of scouts, men and women who walked with discipline and determination to see their God for the first time. However, when they arrived at the temple, the Brahmin authorities had closed the gates.[17]

In 1931, Ambedkar met Gandhi and emphasized that eliminating untouchability was essential for anyone who wanted to join the Congress party.[18] He backed the Anti-Untouchability League, which worked nationwide to help lower castes gain civil rights, such as access to village wells and schools. The First Round Table Conference took place in London in November 1930. Dr. Ambedkar represented the depressed classes and highlighted the terrible conditions faced by untouchables in India. He drafted a declaration outlining their fundamental rights and presented it to the minorities' sub-committee.[19] Ambedkar argued for the complete abolition of untouchability and sought equal citizenship for all. He also called for a separate electorate for the depressed classes, leading to a significant disagreement with Gandhi. Gandhi, who skipped the first conference but attended the second with Ambedkar, opposed this idea, claiming it would harm the nation.[20] He pledged to resist it with his life and even announced a "fast-unto-death." The conflict between them was eventually

resolved through the "Poona Pact" in 1932.[21] This agreement secured some political representation for untouchables, but it left many Scheduled Castes feeling politically betrayed despite the reserved seats established for Dalits.

Dr. Ambedkar believed that the caste system was a major barrier to improving the lives of untouchables. He was deeply disappointed by both the caste and Varna systems. In his influential book "Annihilation of Caste," published in 1936, he called for the dismantling of the caste system.[22] In a 1933 article in “Harijan,” he stated that outcastes result from the caste system and that only its destruction could set them free.[23] Disillusioned with Hinduism, he converted to Buddhism in 1956, along with many followers. He chose Buddhism for its teachings against caste and Brahmanism. His switch to Buddhism led to a significant rise in the social and cultural empowerment of former untouchables.

Caste discrimination is a major threat to our modern perspectives. It aims to romanticize a past that was far from ideal. History is being misrepresented. Dr. Ambedkar, a known socialist, drafted our constitution with an emphasis on guiding state policies through Directive Principles. In his book "Who Were the Shudras?”. Ambedkar discussed the origins of the untouchables.[24] He viewed Shudras, along with anti-Shudras, as distinct from untouchables, placing them at the bottom of the caste hierarchy. Although his political party, which became the Scheduled Castes Federation, struggled in the 1946 elections for the Constituent Assembly of India, he later won a seat in Bengal's assembly dominated by the Muslim League.[25] Many people are unaware of Ambedkar's efforts to improve the lives of agricultural workers. He led the longest agrarian strike in the Konkan region, which continued for more than seven years and his impact is still remembered by many veterans.[26]

Prime Minister Nehru invited Dr. Ambedkar to be the Law Minister in India's first Cabinet after independence. Ambedkar accepted and became the Chairman of the Drafting Committee for the Indian Constitution.[27] As the main creator of the Constitution, he focused on the principles of justice, liberty, equality, fraternity, and human dignity. Dr. Ambedkar saw the social issues faced by women in Hindu society and believed in the need for women's rights. In 1956, he introduced the Hindu Code Bill in Parliament to address these concerns. His efforts, along with pressure from social movements, led to the legal abolition of untouchability in the Indian Constitution.[28] He argued that secularism was essential for resolving minority issues in a democratic society. He is often referred to as the "Abhinava Manu"[29] and was awarded the "Bharat Ratna" posthumously in 1990 for his contributions.

We should honor Ambedkar's legacy and support everyone who values equality and free thought. Silence is not an option; we must advocate for those fighting for their rights against historical inaccuracies, religious prejudice, and the privatization of public resources. If we remain silent, we risk being seen as

opportunists. Dr. Ambedkar faced numerous threats, humiliation, and intimidation, yet he stayed strong. For him, the well-being of the people was his top priority.

Ambedkar argued that we must change our political democracy into a social democracy as well.[30] Social democracy is a lifestyle that values liberty, equality, and brotherhood as key principles. He stood against the oppressive aspects of Hindu society. Ambedkar framed the social reform movement as a fight against the caste system. His focus was on achieving systemic change rather than just seeking political freedom. His ideas continue to resonate not only with the Dalit community but also with anyone striving for a dignified life. Dr. Ambedkar is celebrated as the 'Renaissance Man' of Indian society,[31] who boldly advocated for the marginalized and guided them on their path to liberty, equality, and dignity.[32]

Dr. Ambedkar's courageous struggle for human dignity and rights deserves a central place in India's human rights education. As we reflect on his contributions, we should consider how he might tackle today's pressing issues. We must remember him as a champion of social justice who fought against unfairness and advocated for the rights of the marginalized. In his honor, we need to denounce human rights violations and support those who pursue justice and equality. This is essential now, and we must carry on his legacy.

References:

1. Rajasekhariah, A. M. & Jayaraj, Hemlata, Political Philosophy of Dr. B. R. Ambedkar, The Indian Journal of Political Science, Vol-52, No. 3 (July – September, 1991) P. 357, Published by The Indian Journal of Political Science).
2. Alam, M. N. (2021). *UNFOLD DIARY OF DOWNDRODDEN*. SHREE VINAYAK PUBLICATION.
3. Jaffrelot, C. (2006). Dr Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste. India: Permanent Black.
4. Jesús F. Cháirez-Garza(2022)Moving untouched: B. R. Ambedkar and the racialization of untouchability,Ethnic and Racial Studies,45:2,216-234
5. Srinivasa, D. CONTRIBUTION OF DR. BR AMBEDKAR FOR INDIAN SOCIETY: AN OVERVIEW. *NEW HORIZONS OF DALIT CULTURE AND LITERATURE*, 94.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Sukumar, N. (2017). Ambedkar: Democracy and Economic Theory. *Indian Political Thought*, *361*.
10. Srinivasa, D. CONTRIBUTION OF DR. BR AMBEDKAR FOR INDIAN SOCIETY: AN OVERVIEW. *NEW HORIZONS OF DALIT CULTURE AND LITERATURE*, 94.

11. Sampathkumar, M. (2014). BR Ambedkar and social justice a study. *Constitution*, *13*.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Rather, M. A., & Kaithal, S. Social and Political Ideas of Ambedkar. International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org Volume 4 Issue 1 ǁ January. 2015 ǁ PP.03-05
16. Ambedkar, B. R. (1990). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 7. *Government of Maharashtra, Bombay*.
17. Rather, M. A., & Kaithal, S. Social and Political Ideas of Ambedkar. Ibid.
18. Chandran, S. (2016). Mahatma Gandhi and His Contestants: Reflections on Freedom Movement in India. *Available at SSRN 2818211*.
19. Srinivasa, D. CONTRIBUTION OF DR. BR AMBEDKAR FOR INDIAN SOCIETY: AN OVERVIEW. *NEW HORIZONS OF DALIT CULTURE AND LITERATURE*, 94.
20. Ambedkar, B. R. (2014). *Annihilation of caste*. Verso Books.
21. Jain, M. (2007, January). THE RAJAH-MOONJE PACT: A FORGOTTEN ACCORD ON DEPRESSED CLASS RESERVATIONS. In *Proceedings of the Indian History Congress* (Vol. 68, pp. 912-920). Indian History Congress.
22. Garg, R. (2017). *Problematics of Human Rights in Contemporary Indian English Fiction* (Doctoral dissertation, Central University of Haryana).
23. Swapnil, S. (2013). The caste system: Continuities and changes. *International Proceedings of Economics Development and Research*, *64*, 70.
24. Pankaj, A. K., & Pandey, A. K. (2018). Defining Dalits. *Dalits, Subalternity and Social Change in India*.
25. Nigam, A. (2004). A text without author: Locating constituent assembly as event. *Economic and Political Weekly*, 2107-2113.
26. Suradkar, S. P. (2013). The Anti-Khoti Movement in the Konkan, C. 1920-1949. *NLI Research Studies Series. VV Giri National Labour Institute, Noida*, (106), 2013.
27. Srinivasa, D. CONTRIBUTION OF DR. BR AMBEDKAR FOR INDIAN SOCIETY: AN OVERVIEW. *NEW HORIZONS OF DALIT CULTURE AND LITERATURE*, 94.
28. Ambedkar, B. R. (2014). *Annihilation of caste*. Verso Books.
29. Srinivasa, D. CONTRIBUTION OF DR. BR AMBEDKAR FOR INDIAN SOCIETY: AN OVERVIEW. *NEW HORIZONS OF DALIT CULTURE AND LITERATURE*, 94.
30. Srinivas, B., &Vidyaranyapuri, W. (2021). DR. BR AMBEDKAR: CONTRIBUTION TO INDIAN CONSTITUTION: ITS RELEVANT TO THE CONTEMPORARY CIVIL SOCIETY.
31. Deshpande, A. (2011). *The grammar of caste: Economic discrimination in contemporary India*. Oxford University Press.
32. Dubey, K. (2020). B.R. AMBEDKAR AND INDIAN SOCIETY. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, *17*(9), 3287 - 3300. Retrieved from https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4382.

Backwardness and Caste-like Social Stratification among Muslims in India with Special Reference to West Bengal

Rakibul Shaikh
Asst. Professor, Dept. of Political Science
Gurudas College

Abstract: Among all religious minorities, Muslims are the largest minority community in India.The analysis of various Government and Non-Government Organizations (NGOs) reports show that the Muslims in India are socially, economically and educationally backward. Muslims are the followers of Islam. Islam is an egalitarian religion. It does not believe in casteism, racism or any kind of discrimination on the basis of caste and creed, language and other ethnic varieties. But practically they are differentiated into various groups and sub-groups along ethnic, social and cultural lines and are organized in a stratified social order. Even in recent times 'status group' and 'class like' divisions are conspicuous among the Muslims in India as well as west Bengal. There are many occupational groups in Muslim society, which have experienced marginalization and backwardness.
Keywords: Backwardness, Depressed Classes, Social Stratification, Ashraf, Ajlaf, Arzal, Dalit Muslims.

Introduction:

Muslims are the largest minority community in India. They constitute 14.2% of India's total populations whereas Christians 2.30%, Sikhs 1.72%, Buddhists 0.70%, Jains 0.37%, and others religion 0.66 %.(Census data of India, 2011). Among all religious minorities, Muslims are the most socially excludede, economically underdeveloped, educationally backward, and politically under-represented and powerless community of Indian society in general and of West Bengal in particular. The analysis of various Government and NGOs reports like Mandal Commission Report (1979), Ranganathan Misra Commission Report (2007), Sachar committee Report(2006),Post-Sachar Evaluation Committee Report(2014) and very recently 'Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report published by SNAP(2016) bring out this reality.The Sachar Committee Report is very important as it brought the issue of backwardness of the Muslims of India to national attention and discussion.This paper will focus to study of backwardness of the Muslims in India with special reference to West Bengal.The paper will among other things, engage in acaste-based analysis of the Indian Muslim community.

Backwardness and the Muslim Communities of India

After independence, even as the country engaged in pursuing a definite goal of development and its innumerable communities moved to progress, the conditions of Muslims have tended to remain comparatively unchanged and backward. On all possible social, economic and educational indicators, such as literacy rate, dropout rate, access of education and health, services, worker population ratio and type and location of work, unemployment rates etc.,the Sachar committee Report found them backward. It is important to identify who are the backward classes? And what is backwardness? The term backward class was perhaps first used in 1895 when the Fort St George granted some aid for a number of school students who were from the untouchable castes in Madras Presidency. Later, in 1928 the Government of Bombay appointed a committee to identify backward classes and suggested some special provisions for their development. The committee was headed by Mr. O.H.B. Strate. He classified backward classes into depressed classes, aboriginals, the hill tribes and other backward classes. In 1953, Kaka Kalelkar commission report, which was the first backward classes commission, mentioned the following four indicators to identify socially and economically backward classes- i) low social position in the traditional caste hierarchy; ii) lack of opportunity of accessing general education among the major section of a community; iii) insufficient representation in government service; and iv) insufficient representation in the sphere of trade, commerce and industry. A few members of Kalelkar Commission did not agree to link caste with backwardness. In 1956, the government of India refused to accept caste as a criterion of backwardness. The Mandal commission which was set up under the chairmanship of B.P Mandal in 1978 used the combined form of educational and social criteria to identify backwardness of any caste or community. The Commission mentioned some indicators dividing in three categories (Social, Educational and Economic) for determining backwardness of any particular community. These are- a) Social indicators i) the communities which mainly depend on physical labor for their daily necessary, ii) the communities where at least 25% females and 10% males above the state average get married at an age below 17 years in rural areas and at least 10% females 5% males do so in urban areas, iii) communities where participation of females in work is at least 25% above the state average. b) educational indicators- i) the communities where the number of children in the age group of 5-15 years who never attended school is at least 25% above the State average, ii) the communities where the rate of student drop-out in the age group of 5-15 years is at least 25% above the state average. c) Economic indicators- i) communities where the average value of family assets are at least 25% above the State average, ii) communities where the number of families living in kuccha house is at least 25% above the State average Mandal commission Report1978:50). With reference to the above

indicators, it may be said that backwardness of a community means falling behind from the mainstream of a society in social, economic, educational and political dimensions. Economy is very important for developing of any particular community because an economically underdeveloped class is also unable to access proper healthcare, and education. Economic, social, educational dimensions of backwardness are inter-connected to each other. A number of people branded as ‘untouchables’ in a community may be excluded even from the mainstream of a ‘progressive’ society.It is important therefore to investigate whether untouchability exists or not among the Muslims community in West Bengal. Prashant K Trivedi, Srinivas Goli, Fahimuddin, Surinder Kumar in their article “Does Untouchability Exist among Muslims? Evidence from Uttar Pradesh” (*EPW*, April 9, 2016) concluded that the practice of untouchability is not restricted to Hindus alone, it is also found among Muslims.

In a book namely ‘The Indian Musalmans’ written by W.W.Hunter, mentioned ‘a hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born musalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich’. (Hunter1969:158). The condition of this minority community in India, especially in West Bengal remains same almost after 75 years of independence. West Bengal lags far behind other states in India in terms of defining the backwardness of the Muslim minority. The comparative statistics of OBCs of different states in the Sachar Committee report shows that in 2004-2005 the percentage of Muslims OBCs in Kerala was 99.1 percent, in Haryana 86.2 percent, in Bihar 63.4 percent, Uttar Pradesh 62.2 percent, in Jharkhand 61.7 percent, in Rajasthan 55.8 percent, in Punjab 54.4 percent, in Uttaranchal 53.3 percent, in Karnataka 52.7 percent but in West Bengal only 2.4 percent. (Sachar Committee Report2006:204). Nonetheless, West Bengal has the third largest Muslim concentration state in India, after Uttar Pradesh and Bihar. Sk. Makbul Islam in his book ‘Musalmansamaj:Banchana, Anunnayan O Sankat’, however, blames the left government of West Bengal for the backwardness of this community(Makbul Islam:2010).

Caste based varied identities of Indian Muslim Communities

There is a debate among scholars on the issue of whether caste-like divisions do exist within Muslims.One group of scholars firmly denies the existence of caste among Muslims.The Muslims elites tried to project the Muslims as a religious monolith and advanced the theory of distinct Islamic identity of the Muslims. Other groups of scholars, however, say that Indian Muslims are not a homogeneous community although they are the followers of Islam. In Islamic ideology, there is no place of inequality in terms of race, language, culture and ethnicity and The Muslims are believers of same Islamic faiths. They have only one God called Allah. Ideologically, Islam is universal but Muslims are not. Muslims may be a faith community, but in sociological and even theological

terms are not homogenous. In practice, there are many sub-communities, sects, castes within Muslims in India (Seikh Rahim Mondal: EPW, November 15, 2003).It is also applicable to the Muslims of West Bengal. There are many caste like Muslim communities such as Abdal, Jolah,, Khotta, Shershabadia, Nashya Shaikh exist in West Bengal. M. K. A. Siddique, in his book 'Marginal Muslim Communities in India', have discussed about various marginal Muslim caste-like groups. In this book, he has discussed about 14 caste-like Muslims groups (those are-Bedias, Patuas of Midnapur, Ghosi of Midnapur, Kan of Murshidabad, Sardars of Murshidabad, Abdals of Murshidabad, Besti Mal of North 24 Parganas, Nekaris of Bashirhat, Sapurias, Faqirs, Lodha Muslims of Midnapur, Kela of Midnapur) separately.

Many scholars like Ashfaq Hussain Ansari (former Congress M.P), Asghar Ali Engineer (author and social activist), P.S.Krishnan (former chairman of Backward Classes Commission), Ejaz Ali (leader of an organization representing socially disadvantaged Muslims) and Abhijit Dasgupta agreed that Muslim society comprises various caste and ethnic communities. According to Ghaus Ansari, (Ashfaq Husain Ansari, ed., "Basic Problems of OBC and Dalit Muslims, 2007) Indian Muslims are broadly divided into three categories-ashraf(noble born), ajlaf (mean and lowly) and arzal (excluded). Ashrafs are the descendants of foreign ancestors who assert themselves as wealthier and religious leaders. And they are also further divided into many sub-categories in terms of their origin, i.e. Sayyad, Shaikh, Pathan, as well as converted Muslims of higher Hindu castes such as Muslim Rajputs fall under this category. Ajlafs are the hardworking commons and peasants and therefore they do not lay any claim of noble birth like Ashraf. There are lots of occupational groups existing among Ajlaf who are considered socially and economically marginalized. Julaha, Darji, Hajjam, Dhuniya are some example of such groups. At the bottom of the stratification ladder there are those Muslims who do sweeping and such other unclean jobs called Arzals. They were untouchables in the discriminatory Hindu hierarchical caste system. They converted to Islam to escape from caste oppression under the Brahminical order. They were visibly impressed by the simplicity and brotherhood of early Muslims, especially the Sufis. They noticed that all Muslims are used to praying together shoulder to shoulder in the same mosque, people of all castes eating together in the same vessel. All these visibly impressed them and they converted to Islam in search of equality and self respect. Debi Chatterjee in her book "Manabadhikar o Dalit" says that even the conversion of this caste group did not change their any socio-economic status. Sachar committee noticed that the positions of Arzals are very low in the hierarchical caste-like Muslim society. They are called Dalit Muslims. Muslims khatik, Methar, Bhangi, Lalbegi, Halalkhor, Mochi, Mukri, Garudi caste like groups are fall under this category. (Debi Chatterjee: 2014).

Dalit Muslims

Among the various caste like groups of the Muslim community, Dalit Muslims are found to suffer from extreme socio-economic disadvantages. It is important to mention here that the Dalit Muslims and backward Muslims are not really similar caste like groups among the Indian Muslims. Therefore, separately identifying backward Muslims and Dalit Muslims is essential. The socio-economic status of Dalit Muslims is far worse than that of backward Muslims. But the Constitution of India did not recognize them separately. Abhijit Dasgupta in his article "On the Margins: Muslims in West Bengal" (Abhijit Dasgupta, EPW, Vol.44, No. 16, April, 2009), said using Kaka Kalelkar's phrase that this groups is 'twice discriminated' by the community and the state. According to him, Dalit Muslims are the counterparts of Hindu untouchables: although the basic tenets of Hindu caste system such as purity and pollution are not present in Islam, division of labor together with the practice of endogamy, etc., gives them an occupational caste-like character. According to him, Dalit Muslims would include all those occupational categories whose social positions are similar to those of Hindu untouchables, e.g., weavers, barbers, cobblers. On the other hand, Muslims Other Backward Classes (OBCs), likewise, are the counterpart of the Hindu OBCs. Some of the Muslim OBCs were included in the Mandal Commission Report for affirmative action, their names figure in the Central and State lists of OBCs.

Yoginder Sikand, in his article "A New Indian Muslim Agenda: The Dalit Muslims and the All India Backward Muslim Morcha" raise the matter of Dalit Muslims' Struggle. In this article he discussed briefly the role of Bihar based backward Muslims organization namely All India Backward Muslim Morcha (AIBMM) which has its branches in West Bengal and many other states of India as well. Here he also mentions that Dalit Muslims and Dalit Christians caste groups are not getting the privileges like Scheduled Caste (SC) Hindu community due to their different religious standing. This was so because the Presidential order of 1950 clearly laid down that no person who professes a religion different from the Hindu religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste. Nonetheless, several castes such as Dhobi, Lalbegi, Halalkhor, Mochi, Khatik, Julaha belong to Hindu communities as well as Muslims. So, naturally some questions arise here as to why this religion based discrimination was found among the same caste groups? Scheduled castes status was extended to Dalits professing Sikhism (in1956) and Buddhism (in 1990) after their massive struggles. So why is it not being extended to Dalit Muslims and Dalit Christian? AIBMM raise this question. Is it not violating the rules of Indian constitution, of Article 15 of which clearly mentions that 'the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India'. Similarly, Article 15(1) states that 'the state shall not

discriminate against any citizen on grounds only of race, caste, sex, place of birth or any of them.'

In April 2007, National Commission for Minorities, Government of India, conducted an independent study and prepared a report namely 'Dalit in the Musllim and Christian communities : A Status Report on Social Scientific Knowledge.' The study was conducted on the basis of the 61^{st} round of National Sample Survey data. It is run by Satish Deshande, Professor of Sociology at Delhi School of Economics with the assistance of Geetika Bapna, professor of Sociology, Delhi University. The study finds that the situation of Dalit Muslims in economic and educational settings is worse than that of other Dalits. This report further shows that Dalits are considered very inferior even within their own religious communities. They are Dalits first and then Muslims and Christians. So, religion comes after their Dalit identity. Finally they also conclude that the special privileges that Hindu, Sikhs and Buddhist Dalits received should also extend to Dalit Muslims and Christian as well. Zoya Hasan in her book 'Politics of Inclusion: Castes, Minorities and Affirmative Actions' also focused on this point. In this book she examines the prevailing definition of social backwardness and explores how the state in post colonial India has addressed the question of discrimination and exclusion suffered by disadvantaged groups like Dalit Muslims and Christians.

Conclusion:

We can conclude from the above discussion that, despite Islam is an egalitarian religion, but practically Indian Muslims are differentiated themselves into many groups and sub-groups on the basis of ethnic verities, occupations,culture, language etc. Caste-like features are also there among the Indian Muslim communities. So, they are not homogenous. There are many caste-like and occupational groups in Muslim society, which experienced backwardness and marginalization. They are backward in terms of educational and socio-economic condition.Asghar Ali Engineer in his book "Indian Muslims: A Study of the Minority Problem in India" points out that according to one estimate based on a sample survey, more than 70 per cent of Indian Muslims live below the poverty line. He explains many causes of backwardness of this Muslims in India but partly blames to Muslim leaders and organizations.Thinkers and leaders amongst Muslims failed to take a lead in this matter. This leadership is more interested in running madrasa rather than importance general education. They want to acquire the support of this backward community emphasizing on their religious sentiment. As we know that education is the most important instruments for the development and empowerment of any backward community, we need to focus their education for the progress and socio-economic development of Muslims of India.

References:

1. Hasan, Zoya. (2009). Politics of Inclusion: Cates, Minorities, and Affirmative Actions. New Delhi: Oxford University Press.
2. Engineer, Asghar Ali. (1985). Indian Muslims: A Study of the Minority Problem in India.Delhi :Ajanta Publications.
3. Siddiqui, M.K.A. (General ed.) (2004). Marginal Muslim Communities in India.New Delhi: Institute of Objective Studies.
4. Ansari, Ashfaq Husain(ed.) (2007). Basic Problems of OBC & Dalit Muslims. New Delhi: Serials Publications
5. Farouqui, Ather. (ed.) (2009). Muslims and Media Images: News versus Views. New Delhi. Oxford University Press.
6. Islam, Sk. Makbul. (2010). Musalman Samaj: Banchana, Anunnayan O Sankat,Kolkata: Books Way Publishers.
7. Dasgupta, Abhijit. (2009).On the Margins: Muslims in West Bengal. Economic and Political Weekly. Vol. 44. No. 16.
8. Das, Pranab Kumar and Marjit, Sugata. (2016).Socio-Economic Status of Muslims in West Bengal: Reflection on a Recent Report. EPW. Vol.LI. No. 46.
9. Mondal, Seik Rahim. (2003). Social Structure OBCs and Muslims. EPW. Vol. 38. No. 46.
10. Moinuddin, S. A. H. (2003). Problems of Identification of Muslim OBCs in West Bengal. EPW. Vol. 38. No. 46.
11. Trivedi, Prashant K; Goli, Srinivas Fahimuddin and Kumar, Surinder. (2016). Does Untouchability Exist among Muslims? Evidence from Uttar Pradesh.EPW.VolII. No 32.

    Sikand, Yoginder. (2001).A New Indian Muslim Agenda: The Dalit Muslims and the All-India Backward Muslim Morcha.Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 21. No. 2.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-